পঞ্চকন্যা

মণিভূষণ আচার্য

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৭২

প্রকাশক
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদপট
শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রক
গঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬ তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা ৬

দাম বারো টাকা

শ্রীসুশীল রায়

অগ্রজোপমেষু

প ঞ্চ ক ন্যা

এই লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

হলুদ পাখির ডাক

পলাশ বনের গোধূলি

গল্প

মহুয়ার নেশা (যন্ত্রস্থ)

কবিতা

ধূলি মুঠি সোনা

তৃষ্ণার তিমির থেকে (যন্ত্রস্থ)

সন্ধে হতে না হতেই এই একমুখো গলিটার ওপর রাত্রি গড়িয়ে পড়েছে। উত্তর কলকাতার এই গলিটার বয়েস হয়েছে ঢের। চেহারাও সেই অনুপাতে শীর্ণ। একটা রিক্শা বা ঠেলাগাড়ি হয়তো বা কোনমতে ঢুকতে পারে, কিন্তু বেরুতে গেলেই যেন তাদের দম আট্কিয়ে আসে। তাই বলে এই গলিটা কলকাতার ইতিহাসের প্রথম দিকের পাতায় পড়ে নেই। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেও এগিয়ে এসেছে চৌরঙ্গী, বালিগঞ্জ, সেন্ট্রাল এভিন্যুর মতো। তার বুকে বহু দিনের জমাট-বাঁধা অন্ধকারের তলে তলে গতির দোলা লাগে। সমাজের সকল পরিবর্তন তার অন্তরে ছায়া ফেলে। সেও নতুনের আবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু বাইরের রূপ তার বদ্লায় না।

এরই মধ্যে এত রাত হয়ে গেল?

সুরঞ্জন ভাবে।

এইতো কিছুক্ষণ আগে দেশবন্ধু পার্কে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল। আকাশের অন্তিম আলোয় স্নান করে তারা মেতে উঠেছিল এক আশ্চর্য খেলার আনন্দে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাদের আনন্দের ভাগ নেবার ইচ্ছেও হয়েছিল সুরঞ্জনের। কিন্তু ঠেলাগাড়িটা বড়ো তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে, কাজেই ইচ্ছে থাকলেও সে দাঁড়াতে পারলো না। অন্যদিন হলে সে রেলিঙ্ ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো বা ভেতরে ঢুকে নিজেকে কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়ে ফেলতো তাদের কলরবের মাঝখানে।

দেশবন্ধু পার্কের ছেলেমেয়েদের কোলাহল এখনও শোনা যাচ্ছে। এরই মধ্যে অন্ধকারে মুখ ঢেকে ফেলেছে গলিটা।

সামনে কে এসে পড়তে ঠেলাওয়ালা হেঁকে উঠল: খবরদার! তার গলার আওয়াজে নিস্তব্ধ বাড়িগুলোর পুরোনো ইঁটগুলোও যেন ভয়ে আঁৎকে উঠছে। কিন্তু মজা পাচ্ছে মিঠুয়া। নামটা অবশ্য সুরঞ্জনের দেওয়া। ঐ নামে সুরঞ্জন তাকে ডাকে।

মিঠুয়া পুরোনো বাসায় খাট, বাক্স, বিছানা, সুটকেশ, উন্নুন, হাঁড়ি, কলসী—সব গোছগাছ করে নিজেই ঠেলাগাড়ি ডেকে এনেছে। জিনিসপত্র সব ঠেলাগাড়িতে তুলে দিয়ে তার ওপরে জেঁকে বসেছে সে। ঠিক সিংহাসনে বসার ভঙ্গিতে। ভূপেন বোস এভিন্যু, শ্যামবাজারের মোড়, মোহনলাল স্ট্রীট, দেশবন্ধু পার্ক ছাড়িয়ে যখন হালদার বাগান লেনের অন্ধকারে ঠেলাগাড়িটা ডুবে গেল, তখন ঠেলাওয়ালা কাউকে সামনে দেখে কিংবা ভয় পেয়ে ডেকে উঠলো : খবরদার!

ভারি মজা পেল মিঠুয়া। সেও তার মাতৃভাষায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো : তফাৎ যাও!

: খবরদার!

: তফাৎ যাও!

এম্‌নিতেই মনে হবে, দুজনের মধ্যে যেন কোন বোঝাপড়া আছে।

পেছনে সুরঞ্জন নিজের মনে হাসে।

সুরঞ্জন পেছন ফিরে তাকায়।

গলির মুখে লাইট পোষ্টটার কাচগুলো পাড়ার ছেলেদের হাতে কবে চুরমার হয়ে গেছে। সময় বুঝে বাল্‌ব্‌টাও অন্তর্হিত হয়েছে। আলোর অহংকারে হালদার বাগান লেনের অন্ধকার এতটুকু বিব্রত নয়।

গলির সাম্‌নাসাম্‌নি বাড়িটার দরজার গা ঘেঁষে ঠেলাগাড়িটা থামলো। মিঠুয়া মালপত্রের পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে এলো। যেন সিংহাসনচ্যুত হলো সে।

বাহির থেকে ঠেলা দিতেই দরজা খুলে যায়। একটা মুমূর্ষু আলো সিঁড়িটাকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছে। সুরঞ্জন দোতলায় উঠে গিয়ে একটা দরজার তালা খুলে অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে গোটা কয়েক সুইচ টিপে যায়। একটি বাল্‌ব্‌ জ্বলে উঠলো। খিল খিল করে সারা ঘরটা হেসে ওঠে।

ঠেলাওয়ালা আর মিঠুয়া দুজনে ধরাধরি করে মালপত্র তুলছে। সুরঞ্জন ঘরের ভেতরটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। একটি মাত্র শোবার ঘর,

একটি কিচেন, ওপাশে একটা বাথরুম। এইখানে সুরঞ্জনকে কাটাতে হবে দিনের পর দিন। রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটের পুরোনো বাসাটার কথা তার মনে পড়ে। ভাঙাচোরা আর জীর্ণ হলেও বাসাটা ছিল তার অতি পরিচিত। আজ অপরিচিত বাসাটার সঙ্গে তাকে নতুন করে পরিচয় করে নিতে হবে। তাকে পরিচিত হতে হবে এর প্রতিটি দরজা, জানলা আর এর অন্ধকারের সঙ্গে।

ঘরের মেঝের ওপর কতকগুলি পরিত্যক্ত জিনিসপত্র ছড়ানো। বোধহয় আগের ভাড়াটে যে ছিল, সে ওগুলি অপ্রয়োজনায় মনে করে ফেলে রেখে গেছে। কী আশ্চর্য! দেওয়ালে তুটি ছবিও ফেলে রেখে গেছে ভুলে। একটি সম্ভবত স্বামী-স্ত্রীর ছবি। অন্যটিতে সেই ভদ্র-মহিলা শুধু একা। সুরঞ্জনের মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি লাইন—'পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিন্দুর।' ছবিটির চার-পাশে বেলফুলের একটা শুকনো মালা। মালাটি শুকিয়ে গেছে, কিন্তু প্রাণের টান শুকিয়ে যায় নি। সুরঞ্জন ছবি তুটো নামিয়ে রাখলো।

ঠেলাওয়ালা আর মিঠুয়া খাটটাকে ধরাধরি করে ওপরে তুলে আনলো। মিঠুয়া বাংলা দেশের জলবায়ু আর তার ভাষার সঙ্গে ইতিমধ্যে পরিচিত। সে জিজ্ঞেস করেঃ কোথায় পাতবো দাদাবাবু?

সুরঞ্জনের নির্দেশ মতো তারা খাটটা একপাশে পেতে দিয়ে নিচে নেমে গেল। সুরঞ্জন ঘরের চারদিকে তাকায়। দরজার মাথার ওপরে একটা তাক। তাকে টিনের একটা ভাঙা সুটকেশ। সুরঞ্জন রঙ-চটা সুটকেশটা নামিয়ে আনে। ঢাকা খোলাই ছিল। কতকগুলি কাগজ, কয়েকখানা চিঠি আর একটি ডায়েরি। চিঠিগুলির তুখানা আবার পোষ্ট করা হয়নি। চিঠি তুখানি তুজন মহিলাকে লেখা। ঠিকানা দেখে জানা গেল, একজনের নাম রমা, থাকেন জব্বলপুরে; আর একজনের নাম মনোরমা, থাকেন দিল্লীতে। চিঠি তুটো আলাদা করে রেখে সুরঞ্জন ডায়েরিটার পাতা ওল্টায়। একমাস আগে থেকে ডায়েরি লেখা বন্ধ।

চিঠি দুটো আর ডায়েরিটা সরিয়ে রাখলো সুরঞ্জন। চিঠি আর ডায়েরি থেকে সে একটা জিনিস আঁচ করে নিতে পারলো। তার আগে এ ঘরে যিনি ছিলেন, তিনি বৃদ্ধ এবং নিঃসঙ্গ। তাঁর নাম গিরিজা প্রসন্ন চক্রবর্তী। ডায়েরির প্রায় সব পাতাতেই তিনি তাঁর পত্নী মায়াদেবীকে উদ্দেশ করে অনেক কথাই লিখেছেন। মায়াদেবী তাঁকে ছেড়ে আগেই চলে গেছেন। তাঁর কথা গিরিজাবাবু একটি দিনের জন্যেও ভুলতে পারেন নি। ডায়েরির পাতায় তিনি নিঃশব্দে মায়াদেবীর সঙ্গে কথা বলেছেন দিনের পর দিন।

রাত বেশি হয়নি। সুরঞ্জনের ঘড়িতে মাত্র সাতটা। কিন্তু এরই মধ্যে যেন এই একমুখো গলিটায় হেমন্ত কালের রহস্যময় গন্ধ-ভরা রাত থম্ থম্ করছে।

মিঠুয়া কাজের ছেলে। সে ঠেলাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে টিফিন্ কেরিয়ার নিয়ে কোন হোটেলে খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে গেছে। সুরঞ্জন বাথরুমে যাবার আয়োজন করছে। এমন সময় সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ হলো।

ঃ সুরঞ্জনবাবু এসে গেছেন নাকি?

বাড়িওয়ালা গুরুদাসবাবু।

ঃ আসুন, ভেতরে আসুন—

গুরুদাসবাবু একমুখ হাসি নিয়ে ভেতরে এলেন।

ঃ আপনার মতো ভাড়াটে পাওয়া একটা 'লাক্' মশাই। অতবড় কাগজের স্টাফ রিপোর্টার। সমাজে আপনাদের কদরই আলাদা।

সুরঞ্জন ভীষণ লজ্জা পেল। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এত বড় একটা মানুষের মেয়েলি গলা শুনে সে যেন আরো বেশি লজ্জিত হলো। গুরুদাস বাবুর একটা বড় গুণ, তিনি এক নিশ্বাসে অনেকগুলি কথা বলে যেতে পারেন। সেই তুলনায় সুরঞ্জন অনেক বেশি ধীর, মন্থর। চেহারায় শুধু সে কেন, অনেকেই গুরুদাসবাবুর পাশে দাঁড়াতেই পারে না।

গুরুদাসবাবু থামেন না।

ঃ আমি কিন্তু আপনাকে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবেই দেখছি না। আমি দেখছি, আপনি 'এডিটার' হয়েছেন। আপনাকে যেদিন আমি প্রথম দেখেছি—

গুরুদাসবাবু আরও অনেক কিছুই হয়তো বলতেন। সুরঞ্জন তাড়াতাড়ি তাঁর কথায় ছেদ টেনে দেবার জন্যে বলেঃ মাপ করবেন, তোমার তেমন কোন 'অ্যাম্বিশান' নেই।

গুরুদাসবাবুকে সামলানো গেল না। তিনি বলে চললেন, 'অ্যাম্বিশান' হতেই হবে। ইউ আর এ প্রমিসিং ইয়ংম্যান্। আমার বাড়িতে যারা এসেছে, তারাই উন্নতি করেছে। আপনিও বাদ যাবেন না—

সুরঞ্জন এবার চুপ করে থাকে।

গুরুদাসবাবু অন্য কথা পাড়লেনঃ এখানে আপনার কোন অসুবিধেই হবে না। ভালো 'এসোসিয়েশান' পাবেন এখানে। জমিদার, উকিল, অফিসার, আর্টিষ্ট—সমাজের যারা 'টপ্ র্যাঙ্কিং' সবাইকে এখানে পাবেন।

একটু থেমে তিনি বলেনঃ আমিও ক্যাল্‌কাটা য়ুনিভার্সিটির ফিলসফির এম. এ।

ঃ তাই নাকি? বাঃ—

বিশ্বস্তভাবে গুরুদাসবাবু কাছে এগিয়ে আসেন। সুরঞ্জন চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বলেঃ তাহলে একটু বসুন না—

ঃ না, থাক। ব্যাঙ্কে চাকরি করছিলাম। মড়কের মতো ব্যাঙ্ক-গুলো যখন ফেল মারতে আরম্ভ করলো, তখন আমিও চাকরিটা খোয়ালাম। সেই থেকে বসে আছি। কিন্তু কাগজের অফিসে চাকরি করা আমার অনেক দিনের শখ। দেন না মশাই, আমাকে আপনার অফিসে ঢুকিয়ে।

সুরঞ্জন হাসতে হাসতে বলেঃ দেখুন, কাউকে চাকরি দেওয়া বা না দেওয়া আমার হাতের বাইরে। ও ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ হেল্‌প্‌লেস্।

ঃ না না। হেল্প্লেস্ হবেন কেন? হবে, হবে, সবই হবে। এখন আমি চলি, কেমন? এখন থেকে তো রোজই দেখা হবে।

গুরুদাসবাবু চলেই যাচ্ছিলেন। সুরঞ্জন বলে ঃ দেখুন, আগে যিনি এখানে ছিলেন, তাঁর কতকগুলো জিনিস পড়ে আছে এখনো। সেগুলো—

গুরুদাসবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন।

ঃ জিনিস বলতে তো একটা মাত্র ভাঙা সুটকেশ, কয়েকখানা চিঠি আর একটা ডায়েরি। ভদ্রলোক এমন যে, কিছু না বলেই এক মাসের ভাড়া বাকি ফেলে চলে গেলেন। যাক্, ওগুলো আপনি জানলা দিয়ে ফেলে দেবেন। কাগজকুড়োনোয়ালারা কুড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। কেমন?

গুরুদাসবাবু আর দাঁড়ালেন না। শুঁড়-তোলা চটি জুতোর শব্দ তুলে ওপরে উঠে গেলেন। ওপরে তিন তলায় তিনি থাকেন।

মিঠুয়া কাজের ছেলে। সুরঞ্জন আর দেরি না করে বাথরুমে ঢুকে পড়লো। এরই মধ্যে কখন সে তার জন্যে স্নানের জল ভরে রেখে গেছে। সুরঞ্জন মনের আনন্দে স্নান করলো। বাতাসে একটু শীতের আভাস। মাত্র কদিন আগে পূজো শেষ হয়েছে। এরই মধ্যে জলে শীতের আমেজ লেগে গেছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে সে দেখতে পায়, একটি বছর-ছ-সাতেকের ছেলে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে সে থতমত করে একপাশে সরে দাঁড়ালো। সুরঞ্জন এগিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ তোমার নাম কি?

ঃ বাচ্চু—

ঃ কোথায় থাকো?

ঃ ওই তো—

বলে সে একতলার দিকে আঙুল দেখালো।

ভারি চট্পটে আর মিষ্টি ছেলেটি। এক নিমেষে সুরঞ্জনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললো।

ঃ তুমি বুঝি এই ঘরে থাকবে?

সুরঞ্জন তার কথা বলবার ভঙ্গিতে অবাক হলো। কিছু না বলে সে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে।

ঃ বলোনা, তুমি বুঝি এই ঘরে থাকবে?

ঃ হ্যাঁ। কিন্তু তোমার রাত্তিরে ভয় করে না?

ঃ ভয় করবে কেন? তুমি বুঝি ভয় পাও?

সুরঞ্জন হেসে বললেঃ পাই বৈ কি! বেশি নয়, একটু একটু—

সুরঞ্জনের পেছনে পেছনে বাচ্চু বেশ ভয়ে ভয়েই ঘরে এসে ঢুকলো। চারদিকে তাকাতে লাগলো কেমন যেন ভয়-ভয় চোখে।

সুরঞ্জন খাটের ওপর তার বিছানাটা পাততে লাগলো। বাচ্চু সেই দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। এক সময়ে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলোঃ তোমার আর সবাই কই?

ঃ আর তো আমার কেউ নেই, ভাই?

ঃ তোমার বড়দি নেই?

সুরঞ্জন তার মুখের দিকে একবার তাকালো। হেসে বললোঃ না। নেই—আমার আর কেউ নেই।

একটা করুণ অহংকার বাচ্চুর মুখে ফুটে উঠলো।

ঃ বড়দি আমার বিছানা পেতে দেয়, ঘুম পাড়িয়ে দেয়

ঃ তাই বুঝি? বড়দি তোমাকে খুব ভালবাসে, না?

ঃ তুমি জানলে কি করে?

সুরঞ্জনের মুখের দিকে বাচ্চু এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে চেয়ে রইলো।

সুরঞ্জন বললেঃ আমি জানি।

ঃ কি করে জানলে?

ঃ এই, এমনি—

বিশ্বাস হলো না বাচ্চুর।

ঃ বলোনা, কি করে জানলে? বড়দি বুঝি সব বলে দিয়েছে--

সুরঞ্জন মিঠুয়ার কথা ভাবছিল। তার ফিরতে বড় দেরি হচ্ছে। তবে কি সে খাবার যোগাড় করতে পারছে না? ধারে কাছে বোধহয় কোন হোটেল নেই।

অন্যমনস্কভাবে সে বলে ঃ হ্যাঁ, সব বলে দিয়েছে।

ঃ কি বলেছে তোমাকে বড়দি ?

রিপোর্টার হিসাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করাই সুরঞ্জনের স্বভাব। ভি. আই. পি.-দের প্রশ্নবাণে উত্যক্ত করে তুলতে তাদের জুড়ি নেই। কিন্তু বাচ্চু বড়ো শক্ত রিপোর্টার। তার হাত থেকে সে যে সহজে রেহাই পাবে, মনে হয় না।

ঃ আমি যে রাত্তিরে বিছানা ভিজিয়ে ফেলি, তাও বুঝি বড়দি তোমাকে বলে দিয়েছে ?

বলেই বাচ্চু খুব লজ্জা পেয়ে গেল। তার গোপন সংবাদ এভাবে সুরঞ্জনকে বলা মোটেই বড়দির উচিত হয়নি।

ঃ দাঁড়াও, আমি বড়দিকে ভীষণ বকবো।

সুরঞ্জন বাচ্চুর সরলতায় হো হো করে হেসে উঠলো। লজ্জা পেয়ে বাচ্চুও হেসে উঠলো তার সঙ্গে।

ক্রমে ভাব আরও ঘনিষ্ঠ হলো।

সুরঞ্জনও যেন তার বয়সের বেড়া ডিঙিয়ে অনেক নিচে নেমে এলো। একেবারে বাচ্চুর কাছাকাছি।

রাত বাড়ছে। মিঠুয়ার দেখা নাই। সুরঞ্জনকে হয়তো একবার বেরুতে হতে পারে। সে বাচ্চুকে বলে ঃ রাত হলো। এবার ঘুমুতে যাও, বাচ্চু। তোমার বড়দি আবার বকবে—

ঃ আমি অনেক রাতে ঘুমোই। বড়দি আমায় বকে না—

হঠাৎ দেওয়ালের দিকে চোখ পড়তেই বাচ্চু থমকে গেল।

ঃ ওখানে দাদুর ছবি ছিল। তুমি নামিয়ে রেখেছ বুঝি ?

ঃ দাদু কে ?

সুরঞ্জন প্রশ্ন করে।

ঃ বারে, আগে এখানে একজন দাদু ছিল না ? তার ছবি তো—

বাচ্চু যে গিরিজাবাবুর কথা বলছে, সুরঞ্জনের এবার তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয়নি। বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে এবার বাচ্চু মুখটা নামিয়ে এনে বললো ঃ দাদু এখানে মরেছে জানো ?

গিরিজাবাবু এই ঘরে মারা গেছেন ? কই, সে তো তা জানে না ? গুরুদাসবাবুও তো তাকে বলে নি। আজও তো এই কয়েক মিনিট আগে তিনি বলে গেলেন, ভাড়া বাকি ফেলে গিরিজাবাবু নাকি তাঁর জিনিসপত্র ফেলে রেখে কোথায় সট্‌কে পড়েছেন। গুরুদাসবাবু কি তাহলে তাঁর সঙ্গে চালাকি করে গেলেন? কিংবা, গিরিজাবাবুর মৃত্যুর তিনি একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন ? পৃথিবীতে বাঁচা নয়, এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াটাই বড়ো কথা। গিরিজাবাবু তাহলে পৃথিবীকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও পালিয়ে বেঁচেছেন ?

বাচ্চু তার বড়ো বড়ো দুটো চোখ তুলে জিজ্ঞেস করেঃ মানুষ কেমন করে মরে ?

বড়ো শক্ত প্রশ্ন! সুরঞ্জন চট্‌ করে তার কোন উত্তরই দিতে পারলো না। বাচ্চুও তাকে সহজে ছাড়বে না। বাধ্য হয়ে তাকে একটা জবাব দিতে হয়। সে বলেঃ মানুষ ঘুমিয়েই মারা যায়। মারা-যাওয়া মানে একটা বড়ো ধরণের ঘুম। সেই ঘুম আর কখনো ভাঙে না।

কথাটা বাচ্চুর বেশ মনে লেগেছে। সে অতি সহজেই কথাটা বিশ্বাস করে ফেলল। কেমন যেন গভীর হয়ে উঠলো তার দুচোখের চাউনি। সুরঞ্জনও এত সহজে এমন একটা চমৎকার উত্তর দিতে পারবে, ভাবে নি। হঠাৎ যেন তার মুখ থেকে উত্তরটা বেরিয়ে গেল। অনেকদিন পরে এই হঠাৎ-দেওয়া উত্তরের কথা সুরঞ্জনের মনে পড়েছিল। কিন্তু তখন কি সুরঞ্জন জানতো যে তাকে ভবিষ্যতে এই উত্তরটার পায়ে একদিন মাথা কুটে মরতে হবে ?

তার নিজেরই গলার স্বর ঘুরে ফিরে তার কানের কাছে বাজতে থাকেঃ মানুষ ঘুমিয়েই মারা যায়। মারা-যাওয়া মানে একটা বড়ো ধরণের ঘুম। সেই ঘুম আর কখনো ভাঙে না।

বাচ্চু বললেঃ এ ঘরের দাদুও ঘুমের মধ্যে মরেছিল। আমায় কেউ আসতে দেয় নি। আমি লুকিয়ে দেখে গিয়েছিলাম। নিশীথদা, তুষারদা—এরা সবাই তো খাটে করে নিয়ে গেল দাদুকে।

দরজার বাইরে কে যেন খিল খিল করে হেসে উঠলো।

সেই হাসিতে সুরঞ্জনের দেহের রক্তকণারা যেন চমকে উঠলো। কিন্তু বাচ্চুর এতটুকু ভাবান্তর হলো না। সে ধমকের সুরে বলে উঠল : অ্যায় মেজদি! কি করছিস্ ওখানে? হাসছিস কেন? এ্যাঁ? যা—এখান থেকে।

বাচ্চুর মেজদির কি হলো বোঝা গেল না। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো : না, না। ছেড়ে দাও, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও—

সুরঞ্জন বিস্মিত হয়ে বাচ্চুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বাচ্চুর গলায় ধমকের সুর বেজে উঠলো ; যা, নিচে যা, মেজদি—

সুরঞ্জন বাচ্চুকে বলে : তুমি এবার ঘরে যাও বাচ্চু—

: মেজদিটা ভারি দুষ্টু। জানো, কারো কথা শোনে না। খালি খালি চেঁচায় আর হাসে।

: আচ্ছা, তুমি এখন নিচে যাও—

নিচে কারা যেন কথা বলে ওপরে উঠে আসছে। সুরঞ্জনের মনে হলো, হঠাৎ যেন বাড়িটা তার চেতনাশক্তি ফিরে পেয়ে মুখর হয়ে উঠেছে। কারা যেন চুপি চুপি কথা বলছে। এই মুহূর্তে অবাঞ্ছিত কোন কিছু বুঝি ঘটতে যাচ্ছে। এই বাড়ির সবাই তা লুকোবার জন্যে 'হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে!

সিঁড়িতে একসঙ্গে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে যেন অতিদ্রুত ঘরের মধ্যে ছিট্‌কে এসে দাঁড়ালো।

: না না। ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা—

মেয়েটির সমস্ত শরীরে, শরীরের বেশ-বাসে একটা বন্য উচ্ছৃঙ্খলতা। তাকে বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না। বেশিক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। অল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে আসে। বিস্ময়ে সুরঞ্জনের সমস্ত অন্তর যেন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। সে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। মুখের ভাষাও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। আজ তার শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা।

দরজার আড়াল থেকে কে যেন ডাকছেঃ আয়, চলে আয়, বলছি—

বাচ্চুর মেজদি সুরঞ্জনের দিকে চেয়ে একটু গম্ভীর হয়ে উঠলো। যেন একটু আত্মস্থ হলো সে। পেছন দিকে হাত ঘুরিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে সে নিঃশব্দে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বাচ্চু তাকে ঠেলা দিয়ে বলেঃ তুই আবার এখানে এলি কেন, যা—

ঃ যাবোনা—

দরজার বাইরে থেকে সমানে ডাক আসছেঃ আয়, চলে আয় বলছি।

রাত্তিরে ভদ্র লোকের ঘরে—ছি ছি!

বাচ্চুর মেজদি কি যেন ভাবলো। তারপর এগিয়ে এসে বাচ্চুর হাত ধরে বললোঃ আয়, চলে আয়, বলছি—

বাচ্চু 'যাবোনা যাবোনা' বলে চেঁচালো খুব।

সুরঞ্জন বললোঃ আজ যাও বাচ্চু, কাল সকালে আবার এসো।

মেজদি ততক্ষণে বাচ্চুকে টেনে নিয়ে বাইরে চলে গেছে।

দরজার বাইরে আবার সেই হাসি। সেই রক্ত-কাঁপানো হাসি। সে হাসি শুনলে বুকের ভেতরে কেমন যেন শির-শির করে ওঠে। সেই হাসির মধ্যেও যেন কেমন-একটা আদিম উচ্ছৃঙ্খলতা আছে।

না। সুরঞ্জন তা একেবারেই সইতে পারে না।

বড়ো বিব্রত বোধ করছে সুরঞ্জন।

এবাড়িতে আজ প্রথম যখন সে এলো, তখন কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল তার। কিন্তু ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যে ভরে উঠেছে সেই শূন্যতা। কিন্তু তাকে বড়ো ভাবিয়ে দিয়েছে আজকের এই সন্ধেটা। এই বাড়িতে তাকে অনেকদিন হয়তো কাটাতে হবে। তাহলে এখানে অনেক অভিজ্ঞতা জড়ো হয়ে আছে তার জন্যে। কিন্তু কি এই বাড়ির চরিত্র? যাই হোক, তাকে জানতে হবে এই বাড়িকে, এই বাড়ির প্রতিটি মানুষকে।

মাঝে মাঝে সমাজের দিকে তাকিয়ে এমনি বিব্রত বোধ করে সুরঞ্জন। যে সমাজে আমরা বাস করছি, সেখানেও এই বাড়ির মতো অনেক অন্ধকার জমেছে। আমরা সবাই জীবনের মূল্যে সেই আঁধারের পদাবলী রচনা করে চলেছি। আগামী কালে যখন ইতিহাস লেখা হবে, তখন এই অন্ধকারময় যুগের কি নাম হবে? সমাজ ভাঙতে সুরু করেছে অনেক দিন আগেই। সেই ভাঙার কাজ এখনকার মতো চূড়ান্ত আর কোন কালেই হয় নি। এর পর যে সমাজ গড়ে উঠবে তার চেহারাই বা কেমন হবে? সে যাই হোক। আজকের এই সমাজটা ভাঙছে, কেবলই ভাঙছে। ভাঙার আর কিছুই বাকি নেই।

সুরঞ্জন একটা ইংরেজি বই টেনে নিয়ে পাতা ওল্‌টাতে থাকে।

পাতাই শুধু ওল্‌টায়, মন বসে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে মিঠুয়া খাবার নিয়ে ফিরে এলো। মিঠুয়া আর সুরঞ্জন দুজনে খাবার নিয়ে বসে গেল।

সেদিন রাতে ভালো ঘুম এলো না সুরঞ্জনের। শেষ রাতের দিকে ঘুম এলো। গাঢ় ঘুম।

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, তখন তাকে বাচ্চু ডাকছেঃ দাদা, চা খাবে না?

ঘুম থেকে জাগতেই যেন ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়লো।

মনের ওপর কাল রাতের ঘটনাগুলো একে একে ভেসে উঠলো। গিরিজাবাবু, গুরুদাসবাবু, বাচ্চু, বাচ্চুর মেজদি—সব একে একে মনে পড়তে লাগলো। উনিশ শো তেতাল্লিশ সাল থেকে সে কলকাতা শহরকে দেখছে। সে এই কলকাতার যুদ্ধের ক্লেদাক্ত রূপ দেখেছে, তার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আর দেশ-বিভাগের পরবর্তী করুণ ভয়াবহ রূপও দেখেছে সে। তবু কলকাতাকে দেখা হয় নি তার—দেখা হয় নি বর্তমান কালকে, বর্তমানের নিজেকে।

বাচ্চু বললোঃ এ ঘরের বুড়ো দাদু কতো গল্প বলতো। তুমি গল্প জানো না?

কোন কথা না বলে সুরঞ্জন বাচ্চুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

ঃ এক রাজার ছিল দুই রাণী—সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী।

বাচ্চু গল্প সুরু করে দিল। কোন ভূমিকা নেই, পরিবেশ নেই, বিশেষ করে এখন কি গল্প বলার সময়?

সুরঞ্জন বলেঃ পরে শুনবো তোমার গল্প। এখন থাক, কেমন?

বাচ্চু যেন চুপ্‌সে গেল।

সুরঞ্জন জোর করে উঠে পড়লো। ব্রাশ্ মুখে পুরে বাথরুমে ঢুকলো সে। একটা বেশ মিষ্টি বাতাস এসে সমস্ত দেহমনকে জড়িয়ে ধরলো।

ঃ মিঠুয়া, চা বানাবি না দোকান থেকে—

মিঠুয়া কাছে এগিয়ে আসে।

ঃ নিচের মাইজি তোমাকে চা খেতে ডেকে গেছে। নিজে এসে বলে গেছে।

সুরঞ্জন কিছু না বলে বাচ্চুর মুখের দিকে তাকায়।

ঃ হ্যাঁ। মা এসেছিল তো। তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে।

সুরঞ্জনের ভীষণ লজ্জা করছিল। বড়ো লাজুক প্রকৃতির সে। কারো বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করবার সময় জগতের যত লজ্জা যেন তাকে পেয়ে বসে। তা ছাড়া বাচ্চুদের ফ্ল্যাটে চা খেতে যেতে বড়ো সংকোচ লাগছিল তার। সে এ বাড়িতে সবে মাত্র কাল এসেছে। জানা নেই, শোনা নেই, ঘনিষ্ঠতা নেই কোন রকম। আবার কাল রাতে বাচ্চুর মেজদি এমন কাণ্ড করে গেছে, যার ফলে ওদের সামনে দাঁড়াতে ওর যথেষ্ট অসুবিধে হওয়ার কথা। আর ওরাই বা কেমন? কাল রাতের ঘটনার পর আজ সকালে তাকে কি করে চায়ের নিমন্ত্রণ করতে পারলো? সে কি তবে কাল রাতের ঘটনাকে ফিকে করে দেবার জন্যে? নয় তো অন্য কিছু?

নিচ থেকে ডাক শোনা গেলঃ বাচ্চু—

এবার বাচ্চু হাত ধরে টানতে আরম্ভ করে দিল ঃ মা ডাকছে যে—

সুরঞ্জন কাপড় বদলে একটা জামা গায়ে দিয়ে বাচ্চুর হাত ধরে নিচে নামতে লাগলো।

নিচে নামতেই দেখা হয়ে গেল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে। গায়ের রং আশ্চর্য রকমের সাদা। তার সঙ্গে মিল রেখে মাথার চুল-গুলিও ধপ্‌ধপে সাদা হয়ে উঠেছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ সুরঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

সুরঞ্জন তার দিকে না তাকিয়ে পারলো না। ভদ্রলোকের চোখে চোখ পড়তেই তিনি জিজ্ঞেস করে বসলেন ঃ নতুন এলেন বুঝি ?

হেসে মাথা নাড়লো সুরঞ্জন।

ঃ ওপরের ওই গিরিজাবাবুর ঘরটায় ?

সুরঞ্জন মাথা নাড়লো।

ভদ্রলোক কেমন-যেন অস্বাভাবিকভাবে তার দিকে চেয়ে রইলেন। ও রকম দৃষ্টির সামনে পড়ার একটা বড়ো অসুবিধে হলো, কিছু না বলে চলে যাওয়া যায় না।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনি এ বাড়িতে অনেক দিন আছেন বুঝি ?

ভদ্রলোক তার কথার জবাব না দিয়ে বলতে লাগলেন ঃ বেশ বেশ। নতুন মানুষ দেখলে ভালো লাগে।

সুরঞ্জন হেসে বলে ঃ বেশ তো। আপনার ফ্ল্যাট্ কোনটা বলুন। সময় মতো গিয়ে গল্প করা যাবে।

ভদ্রলোক সে কথার কোন জবাব দিলেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখন কোথায় যাচ্ছেন ?

ঃ এই ওদের ফ্ল্যাটে একটু—

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। হাসিতে বোঝা গেল, মুখটা তাঁর একটু বাঁকা। সুরঞ্জন দেখলো, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পেছনে কখন একজন

ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। যেন দরজার ফ্রেমে আঁটা একখানি ছবি। এই সকালেই মুখ 'পেইণ্ট' করে, ভুরু এঁকে তিনি একটি বিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছেন।

সুরঞ্জন কয়েক পা গিয়ে ফিরে তাকালো। ভদ্রলোক তখনও দাঁড়িয়ে হাসছেন। সেই বাঁকা ঠোঁটের হাসি! সুরঞ্জনের ভারি বিশ্রী লাগছিল।

এই সংক্ষিপ্ত কথাবার্তায় সুরঞ্জন বুঝতে পারলো, ভদ্রলোক সুস্থ নন। কেমন যেন অসুস্থ দেখাচ্ছিল তাঁকে। ফ্যাকাশে গায়ের রং, মাথার চুল সাদা, কথা বলার অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে তাঁর অসুস্থতা অত্যন্ত স্পষ্ট।

এ পাশের দরজার আড়াল থেকে শব্দ তুলে হেসে উঠল বাচ্চুর মেজদি।

সঙ্গে সঙ্গে শাসানি : এই যূথী, কি হচ্ছে কি?

বাচ্চুর হাত ধরে সুরঞ্জন ঘরের মধ্যে পা দিল। সেই বন্য উচ্ছৃঙ্খলতা!

সুরঞ্জনকে দেখে সে মাথা নিচু করে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

: আসুন, আসুন—

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

রাস্তার ওপরে ঘর। সেদিকে একটা দরজা আর একটা জানলা খোলা। যেন ভিক্ষুকের মতো ওরা বাইরের পৃথিবী থেকে করুণ মুখে আলো প্রার্থনা করছে। তবু ঘরে আলো জ্বালতে হয়েছে।

: কাল রাতে গলিতে ঠেলাগাড়ির শব্দ শুনেই বুঝেছিলাম, আমাদের দল ভারি করতে কেউ আসছেন। পরে বাচ্চুর মুখে শুনলাম, আপনি এলেন। শুনে আনন্দ হলো। দুঃখও হলো সঙ্গে সঙ্গে—

সুরঞ্জন কথাটা বুঝতে পারলো না। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো উকিল হেরম্ব গাঙ্গুলির মুখের দিকে। হেসে জিজ্ঞেস করলো : দুঃখ কেন? একটু থেমে হেরম্ববাবু বললেন : এ গলিতে যে এসেছে, সে

আর বেরুতে পারে নি। অন্তত প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি। পাশের বাড়ির মিঃ গোমেশ পারেন নি, ওপরের গিরিজাবাবু পারেন নি, ও পাশের অবিনাশবাবু পারছেন না, আমিও না। এখানে পড়ে পড়ে মরতে হবে। আমাদের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের বয়েস হয়েছে। যা ছিল সব গেছে। আমরা এখন খরচের খাতায়। কিন্তু আপনি ইয়ংম্যান্। আপনি এখানে এলেন কেন?

সুরঞ্জন হাসতে হাসতে বলেঃ আপনারা বয়স্ক বলে আপনারা যে খরচের খাতায়, এমন কথা বলছেন কেন? আমি কিন্তু আপনার মতো নৈরাশ্যবাদী নই।

একটা নিশ্বাস ছেড়ে হেরম্ববাবু বললেনঃ নৈরাশ্যবাদী কোন কালেই ছিলাম না। বরং উল্‌টোটাই ছিলাম। কতো আশা করেছি, কতো রঙীন কল্পনা। কখনো যে এরকম হবে, তা কি কখনো ভাবতে পেরেছিলাম। আজ তাই মাঝে মাঝে ভাবি—

হঠাৎ থেমে গেলেন হেরম্ববাবু।

সুরঞ্জনকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজের মনে কথা বলে চলেছেন দেখে লজ্জিত হলেন তিনি। আগন্তুককে বসতে বলাও হয়নি। ছি ছি—

ঃ ছি ছি, আপনাকে বসতেও বলা হয়নি। বসুন বসুন—

সুরঞ্জন একটা চেয়ারে বসলো। হেরম্ববাবুর ঠিক মুখোমুখি।

হেরম্ববাবু বললেনঃ আপনার সঙ্গে ঠিক মতো আলাপ হবার আগেই কিন্তু প্রলাপ বকতে সুরু করেছি। কিছু মনে করবেন না।

সুরঞ্জন বলেঃ না না। এতে মনে করবার কি আছে?

হেরম্ববাবু বললেনঃ যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

সুরঞ্জন বলেঃ কি বলুন—

ঃ কি করা হয় আপনার?

ঃ একটা কাগজের অফিসে কাজ করি।

ঃ কাগজের অফিসে মানে?

ঃ রিপোর্টার।

এমন সময় বাচ্চুর পেছনে ঢুকলেন বাচ্চুর মা। বাচ্চু তাকে এ ঘরে রেখে কখন চলে গিয়েছিল, কেউ জানে না।

বাংলাদেশের পথে-ঘাটে এমন অনেক মহিলার সঙ্গে দেখা হয়, যাদের দেখেই চিনতে ভুল হয় না যে, তিনি মা। যোগমায়া দেবী তেমনি একজন সর্বজনীন মা।

বাংলাদেশের পূজো মণ্ডপগুলিতে এই মূর্তিরই পূজো হয়।

সবেমাত্র স্নান সেরে এসেছেন যোগমায়া দেবী। পিঠের চুল বেয়ে জল ঝরছে টস্ টস্ করে। ঠোঁটে লেগে আছে সেই স্নেহ-স্নিগ্ধ হাসি। হাতে জলখাবার আর চা।

ঃ দেরি হয়ে গেল বাবা। আগে খেয়ে নাও। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

যেন কতোদিন আগের শোনা কণ্ঠস্বর! যেন কতোদিন শোনেনি সুরঞ্জন।

ঃ এত সকালে লুচি, আলুর দম?

হেরম্ববাবু ছাইদানি থেকে পোড়া চুরুটটার ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেনঃ সকাল কোথায়? গলিতে এখনো আলো পড়েনি বলে সকাল কিন্তু বসে নেই।

যোগমায়া দেবী বললেনঃ আমাদের এই গলিটা বড়ো অন্ধকার! অনেক বেলায় একটু রোদ্দুর এসে পড়ে। পড়তে না পড়তেই তাও মুছে যায়।

সুরঞ্জন লুচিতে কামড় দেয়।

হেরম্ববাবু পোড়া চুরুটটা ধরান। আর যোগমায়া দেবী ডাক দেনঃ কেতকী, দাদার জন্যে এক গেলাস জল দিয়ে যা—

দূর থেকে কেতকীর গলা ভেসে এলোঃ আমার হাত জোড়া। করবী, ও ঘরে এক গেলাস জল দিয়ে আয় তো।

করবী জল নিয়ে এলো।

মা জিজ্ঞেস করলেনঃ যূথী কি করছে রে? ওকে একটু রান্না ঘরে যেতে বল্—

করবী চলে যাচ্ছিল। বললোঃ আমার কথা উনি শুনবেন কিনা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনে হাসছেন খিল্ খিল্ করে।

ঃ শোন্—

যোগমায়া দেবী করবীকে ডাকলেন। করবী ফিরে তাকালো।

ঃ ও তোদের দাদা। শুধু দাদা বলেই ডাকবি তোরা। কেমন?

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানিয়ে করবী সুরঞ্জনের দিকে একবার তাকালো। তারপর চলে গেল।

যোগমায়া দেবী সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ করবী কলেজে পড়ে। এখন বি. এ. পড়ছে ও।

সুরঞ্জন নিজের মনে হেসে উঠলো। বললোঃ নামগুলি কিন্তু বেশ।

যোগমায়া দেবীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

ঃ সব নাম ওঁর দেওয়া। সব ফুলের নামে নাম।

ঃ হ্যাঁ, কেতকী, যূথিকা, করবী—চমৎকার নামগুলি।

হেরম্ববাবু চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলেনঃ 'যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না।'

সুরঞ্জন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হেরম্ববাবুর মুখের দিকে তাকায়।

হেরম্ববাবু বলেনঃ সাধ্য ছিল না, এমন কথা বলি না। ছিল সবই, সবই চলে গেছে।

যোগমায়া দেবী বললেনঃ পাকিস্তান হয়ে গিয়ে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে, বাবা। কিছু নেই—

দরজার আড়ালে যূথিকা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

শাসিয়ে উঠলেন যোগমায়া দেবী।

যূথিকার হাসি আর থামে না।

কিছু না বলে যোগমায়া দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সুরঞ্জন চায়ের কাপটা খালি করে নামিয়ে রাখলো।

ওদিকে যেন ঝড় উঠেছে। দুম্ দাম্ করে কয়েকটা দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আর্ত চিৎকার। সেই চিৎকার জোরে নয়, চাপা ; কিন্তু আর্ত। একটা হাত-পা বাঁধা পশুকে প্রহার করলে যে অব্যক্ত গোঙানি শোনা যায়, সেই রকম। সেই সঙ্গে প্রহারের শব্দ। তবে কি অকারণে হাসির জন্যে যোগমায়া দেবী এইভাবে যূথিকাকে শাস্তি দিচ্ছেন ?

যূথিকার মধ্যে সুরঞ্জন একটা বন্য উচ্ছৃঙ্খলতা দেখেছে, দেখেছে কামনার আদিম জ্বলন্ত রূপ। করবীর মধ্যে তা নেই। হয়তো কেতকীর মধ্যেও তা নেই। যূথিকার বন্য আদিম রূপের পরিবর্তনের জন্যে হয়তো যোগমায়া দেবী এই পন্থা নিয়েছেন। সে যাই হোক, কোন ভদ্র মার্জিত মন এই বন্য পন্থাকে সমর্থন করতে পারে না। সুরঞ্জনের সমস্ত শরীর মন একসঙ্গে যেন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। ওদিকে সমানে চলেছে সেই চাপা আর্তনাদ।

চাবুকের মত সেই আর্তনাদ সুরঞ্জনের সমস্ত চেতনাকে ক্ষত বিক্ষত করতে লাগলো। অনেকক্ষণ সে কোন কথাই বলতে পারলো না। যেমন মুখ নিচু করে বসেছিল, তেমনি বসে রইলো। মাথা তুলে যে সে হেরম্ববাবুর মুখের দিকে তাকাবে, তার সে ক্ষমতাও নেই। কোন নতুন প্রসঙ্গও এ সময় মনে আসে না।

হেরম্ববাবু জানলার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ছেন। বাইরে যে ঝড় উঠেছে, তা যেন তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে নি। কিন্তু সুরঞ্জন বড়ো অবাক হলো। পাশের ঘরে যখন এতো বড়ো একটা নিষ্ঠুর ব্যাপার চলেছে, তাতে বাবা হয়ে একটা মানুষ এমন নির্বিকারভাবে কি করে বসে থাকতে পারেন ?

ওদিকে আর্ত চিৎকার একটু কমেছে, প্রহারের শব্দও থেমেছে।

সুরঞ্জন অনুভব করলো, তার অনুভূতিগুলো যেন আজকের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় একেবারে মরীয়া হয়ে চাঙা হয়ে উঠেছে। অপ্রত্যাশিতের পাথরে ঘষা খেয়ে যেন তারা বড়ো বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে

উঠেছে। এখন অতি সামান্য ঘটনাই তার মনটাকে বিদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট।

কাল রাতের ঘটনা তার মনকে যেভাবে উৎক্ষিপ্ত করে তুলেছিল, তাতে তার মনের শান্তি আর রাতের ঘুম আহত হয়েছিল। ভোর রাতের ঘুম তার মনের ওপর শুশ্রূষা বুলিয়ে তাকে খানিকটা সুস্থ করে তুলেছিল বটে। কিন্তু সকাল হতেই আবার নতুন এক নিষ্ঠুর ঘটনার আবির্ভাব। অথচ হেরম্ববাবু তো বেশ নির্বিকারভাবে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে চলেছেন। তাঁর মনে কি কোন রেখাপাতই করতে পারে না আজকের এই অপ্রত্যাশিত অপ্রীতিকর ঘটনা? হয়তো তাঁর অনুভূতিগুলো সব ভোঁতা হয়ে গেছে। তাঁর সংসারে এই ঘটনা হয়তো নতুন কিছু নয়। বহু দেখে শুনে তাঁর অনুভূতিগুলোর হয়তো অপমৃত্যু ঘটেছে।

হেরম্ববাবু চুরুটের খানিকটা ধোঁয়া গিলতে গিয়ে হঠাৎ কেশে উঠলেন। সুরঞ্জন চম্‌কে উঠে তাঁর মুখের দিকে তাকালো।

হেরম্ববাবু বললেন: চিরকাল কিন্তু ও এরকম ছিল না। বড়ো ভালো মেয়ে ছিল যূথী।

সুরঞ্জন যূথিকার কথাই ভাবছিল। সে জিজ্ঞেস করে: তাহলে ও এরকম হয়ে গেল কি করে?

হেরম্ববাবু একটু থামলেন। তারপর বললেন: পাকিস্তান থেকে আসবার পথে গুণ্ডারা ওর ব্রেইন্‌টা কেড়ে নিয়েছে।

সুরঞ্জন চমকে উঠলো। কোন কথা মুখ দিয়ে তার আর বেরুলো না।

হেরম্ববাবু আরো খানিকটা কেশে গলাটা সাফ করে নিলেন। তারপর তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর জীবনের সকরুণ বিবৃতি। বিচারকের সামনে সাক্ষীকে বা আসামীকে জেরা করাই তাঁর পেশা। কিন্তু আজ তাঁকে কিসের যেন নেশায় পেয়েছে। সেই নেশায় তিনি তাঁর পেশার কথা ভুলে গিয়েছেন। নিজেকে তিনি আজ আসামী কিংবা সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সুরঞ্জনকে বিচারকের আসনে

কল্পনা করে তাকে তিনি বলে চলেছেন তাঁর ভাগ্যের উত্থান-পতনের কথা, তাঁর জীবনের দুঃখ-সুখের কাহিনী।

তিনি বলে চলেছেন।

ফরিদপুর জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম। সুজলা সুফলা গ্রাম-বাংলা বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বাড়িগুলি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো সরে থাকতো দূরে দূরে। ডিঙিই থাকতো এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যাওয়া-আসার একমাত্র উপায়। লগি ঠেলে এক বাড়ির মেয়েরা আরেক বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে চলেছে। হাটে বাজারে যেতে হবে, মেলায়-পার্বণে যেতে হবে? ডিঙিতে চড়ে লগি ঠেলে চলে যাও। যেখানে খুশি যেতে পারো—দুঘণ্টার পথ একঘণ্টায়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে হানিফ, হাসিম, ইয়াকুব, নাসিমুদ্দীন সারি গান গেয়ে ধান কেটে আনছে ক্ষেত থেকে। ধানে ধানে ভরে উঠতো গোলা। মসুর, কলাই, মুগ—রাশি রাশি উঠতো খামারে। পাঁচশো বিঘে জমি, পঞ্চাশ ঘর প্রজা। সুপুরির বাগানই ছিল দশ বিঘের মতো।

অভাব ছিল না কিছুরই।

হেরম্ববাবুরা দুভাই, তিন বোন। বাবা মেয়েদের তেমন লেখাপড়া শেখাতে পারেন নি। কিন্তু ছেলেদের লেখাপড়া বিষয়ে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাঁর সে চেষ্টা সফলও হয়েছে। হেরম্ববাবু হলেন উকিল, ছোট ভাই নরেন্দ্র হলেন ডাক্তার।

পূর্ব বাংলার এক জেলা-শহরের কোর্টে হেরম্ববাবু প্রথম জীবনে প্রাক্‌টিস্ সুরু করলেন। পাশ করে নরেন্দ্রও চেম্বার খুললেন সেই শহরেই। কিছু দিনের মধ্যেই দুভাইয়ের প্রাক্‌টিস্ জমে উঠলো খুব। বিশেষ করে উকিল হিসেবে হেরম্ববাবুর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর জেরা করার কায়দায় সাক্ষীদের মুখ থেকে অনেক সত্যি কথা ফাঁস হয়ে গেছে। অতি বড়ো দুঁদে আসামীও 'কনফেশান' দিতে বাধ্য হয়েছে। কতো 'ক্লায়েন্ট' তাঁকে ঢাকায় 'ফার্ষ্ট ক্লাস ফেয়ার' দিয়ে নিয়ে গেছে। দুটো পকেট ভরে টাকা গুঁজে দিয়েছে।

অর্ধেক বাংলা দেশে উকিল হেরম্ব গাঙ্গুলির প্রচুর সুনাম। কতো জটিল 'কেস' তাঁর হাতে এসেছে। কিন্তু জেরা, 'আরগুমেণ্ট' আর আশ্চর্য বাগ্মিতায় সব সহজ হয়ে গেছে। 'ক্লায়েণ্ট' জয়যুক্ত হয়েছে। আশাতীত ভাবে অর্থাগম হচ্ছে তাঁর। জেলা শহরেই বানালেন নতুন বাড়ি। এমন বাড়ি শহরে আর একটিও নেই। সবাই দেখতো চেয়ে চেয়ে। তারিফ করতো মুক্ত কণ্ঠে : এমন বাড়ি আর হয় না।

অন্যান্যেরা হিংসে করতো।

সেই সময় মানে যে বছর নতুন বাড়ির গৃহ প্রবেশ হলো, সেই বছরই তাঁর বড়ো ছেলের জন্ম হলো। হেরম্ববাবুর বাবা আদর করে তার নাম রাখলেন স্নেহাংশু। সে উনিশ শো তিরিশ সালের কথা। দেশে গান্ধীজির ডাকে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে দেশের অনেক ছেলে 'ইন্‌টার্ণ্‌ড্‌' হলো। বাড়ির ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন স্থির করবার জন্যে ভট্টচায্যি মশাইকে ডেকে পাঠালেন হেরম্ববাবু। কিন্তু যোগমায়া দেবী বললেন : ছেলের অন্নপ্রাশন এখন আমি দেব না।

হেরম্ববাবু আকাশ থেকে পড়লেন।

: কেন ?

: দেশের ছেলেরা রয়েছে জেলে। আর তুমি তোমার ছেলের অন্নপ্রাশন করবে, ঘটা করে লোক খাওয়াবে ? মনে একটুও কষ্ট হচ্ছে না তোমার ? ছি ছি, আমার ছেলে যেমন ছেলে, ওরাও তো তেমনি ছেলে। ওদেরও তো বাপ মা আছে। ওদের জন্যে ওদের বাপ-মায়ের কি বুক ফেটে যাচ্ছে না ?

যোগমায়া দেবীর জিদই বজায় রইলো। ছেলের অন্নপ্রাশন আপাতত বন্ধ রইলো।

হেরম্ববাবুর মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। যে সব ছেলেরা দেশের কাজে জেলে গিয়েছিল, তিনি জামিন হয়ে বিনা পয়সায় তাদের 'কেস' হাতে নিলেন। খদ্দর তুলে নিলেন গায়ে, দেশের

কাজে দরাজ হাতে টাকা দান করতে লাগলেন। দেশের বড়ো বড়ো নেতারা পূর্ববঙ্গ সফরে এলে একবার অন্তত তাঁদের হেরম্ববাবুর বাড়িতে ওঠা চাই।

এলো বিয়াল্লিশের আন্দোলন। এবার হেরম্ববাবু 'ইন্‌টার্ণড্‌ হলেন। তিন তিন বছর তাঁর জেলখানার পাঁচিলের মধ্যে কাটলো। ছাড়া পেয়ে দেখলেন, দেশে রাড্‌ক্লিফ্‌ কমিশন বসেছে। জেলের মধ্যেই তিনি অবশ্য সে খবর শুনেছিলেন। দেশের যে তুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসছে, তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো। উনিশ শো ছেচল্লিশের দাঙ্গা সুরু হয়ে গেল। তিনি গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন। হানিফ, হাসিম, ইয়াকুব, নাসিমুদ্দীন—এদের সবাইকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

ঃ হানিফ, তুমি কি বলো? দেশের যখন এই অবস্থা—

হানিফ মাথা নিচু করে বললোঃ বড়বাবুই আমাদের মুনিব। বড়বাবু যা বলবেন, তাই হবে।

ঃ হাসিম তোমার মত কি?

ঃ সাত পুরুষ বড়বাবুর 'নিমক্' খেয়েছি, নিমক হারামি করতে পারবো না।

ঃ ইয়াকুব?

ঃ আমার ওই মত।

ঃ না। কথাটা ঠিক মতো বুঝে বলো—

ঃ আমার অত শত বুঝে কাজ নেই। আমি হিন্দু বুঝি না, মোছলমান বুঝি না। আমি বুঝি মোটা ভাত, মোটা কাপড় আর গোটা কয় কদ্দু। ব্যস্—

হেরম্ববাবু হাসলেন।

ঃ নাসিমুদ্দীন, তুমি কি বলো?

নাসিমুদ্দীন মাথা তুলতে পারলো না।

ঃ নাসিমুদ্দীন, মুখ তুলছো না কেন? কথা বলো—

নাসিমুদ্দীন জোর করে মাথা তুলে তাকালে

আপনাদের মতো আমাদেরও জাত আছে। জাতের মাথারাও আছে। তেনারা যা বলবেন, তাই হবে।

হেরম্ববাবু বললেন: তারা বলবে, তোমাদের বড়বাবুর মাথাটা কেটে আনো। পারবে?

নাসিমুদ্দীন মুখ নিচু করে বসে রইলো।

গ্রাম থেকে শহরে ফিরলেন হেরম্ববাবু। দুদিন বাদেই তাঁর শহরের বাড়িতে আগুন লাগলো। সর্বস্ব পুড়ে গেল তাঁর।

একটা পাঁজর ভেঙে গেল যেন হেরম্ববাবুর।

সে ব্যথা তাঁর আজও সারে নি।

তারপর দেশ স্বাধীন হলো। পূর্ববঙ্গ হলো পূর্ব পাকিস্তান।

হেরম্ববাবু আবেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন: বলুন তো, এই কি আমরা চেয়েছিলাম! এরই জন্যে কি আমাদের ঘরের ছেলেরা ফাঁসি গিয়েছিলো? এরই জন্যে কি আমরা জেলে গিয়েছিলাম?

গলাটা তাঁর কেঁপে উঠলো। কেশে গলাটা সাফ করে নিলেন হেরম্ববাবু।

সুরঞ্জন বললো: পার্টিশানকে ঠেকাবার জন্যে তো অনেক চেষ্টাই করা হয়েছিল। কিন্তু সফল হয় নি।

: সফল হতেও পারে না। মনের মধ্যে যেখানে আপোষ, সেখানে চেষ্টা কখনো সফল হয় না।

একটু থেমে হেরম্ববাবু বললেন: ইদানীং আপনারা রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী করলেন। বলুন তো, রবীন্দ্রনাথ কি এই ভাঙা বাংলা চেয়েছিলেন? তাঁর সেই বিখ্যাত গান-'বাংলার মাটি, বাংলার জল'-আজও গাওয়া হয়। জানেন, এই গানের ইতিহাস? রামমোহন লাইব্রেরী হল আজও আছে, তাঁর সেই গানটিও আজো গাওয়া হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নেই, রবীন্দ্রনাথের সেই বাংলা দেশও নেই।

হেরম্ববাবু একটু থামলেন।

ঃ এখন কার্তিক মাস, না? হয়তো হানিফ, হাসিম, ইয়াকুব, নাসিমুদ্দীন সারি গান গেয়ে পাকা ধান কেটে আনছে ক্ষেত থেকে। খামার ভরে উঠছে। এখন আমরা তাদের কেউ নই, তারাও আমাদের কেউ নয়। কী আশ্চর্য! কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে?

সুরঞ্জন আঙুলের নখগুলোর দিকে চেয়ে বললোঃ দায়ী আমরাই।

ঃ কেমন করে?

ঃ যেমন ধরুন, ছোট বেলায় আমিই দেখেছি, যখন কোন মুসলমান ফকির ভিক্ষে করতে আসতো, সে চলে গেলে বিধবা পিসিমারা সমস্ত উঠোনটা গোবর জলে চুবিয়ে তারপর ঘরে ঢুকতেন। অপর পক্ষের মনে এর কি কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতো না? দিনের পর দিন এই ঘটনা ঘটে এসেছে আমাদের দেশে।

হেরম্ববাবু বললেনঃ এটাও যেমন একটা দিক, এর অন্য দিকও আছে। আমাদের গাঁয়ে হানিফের মা গরমের দিনে নিজের হাতে ফলার মেখে দিয়েছে, ছোট বেলায় কতো তৃপ্তি করে আমরা খেয়েছি। যাক সে সব কথা। আজ তো রবিবার। বেরুবার কোন তাড়া আছে আপনার?

সুরঞ্জন জানালো আজ তার তেমন কিছু তাড়া নেই।

ঃ তাহলে আর এক কাপ চা—

ঃ না থাক। আবার এত বেলায়—

ঃ তাতে কি হয়েছে? কেতকী—

হেরম্ববাবু ডাক দিলেন।

ঃ যাই বাবা।

পাশের ঘর থেকে কেতকীর গলা ভেসে এলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে কেতকী এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো।

ঃ দাদাকে আর একটু চা দেবে না?

ঃ দিচ্ছি বাবা, এখুনি তৈরী করে দিচ্ছি।

সুরঞ্জন বাধা দিয়ে বললো ঃ না না। আমার জন্যে আর কষ্ট করতে হবে না।

কেতকী চলে যাচ্ছিল। ঘুরে দাঁড়ালো। হাসতে হাসতে বললো ঃ এক কাপ চা করে দিতে আবার কষ্ট হয় নাকি? দাদার জন্যে চা করে দিতে বোনের যদি কষ্ট হয়, সে কষ্ট হওয়া ঢের ভালো।

হেরম্ববাবু বললেন ঃ আমার জন্যেও এক কাপ করিস তাহলে—

শাসনের ভঙ্গিতে তাকালো কেতকী।

ঃ তুমি আবার চা খাবে, বাবা?

ঃ দিস্ মা একটু। আজ কোর্ট বন্ধ। খেতে দেরি হবে।

ঃ একে রাত্তিরে তোমার ঘুম হয় না। বেশি চা খেলে—

ঃ ঘুম আমার আর হয়েছে। চা না খেলেও ঘুম হবে না, খেলেও হবে না।

কেতকী মুখ ভার করে চলে গেল।

হেরম্ববাবু বলে চললেন ঃ ছেচল্লিশের দাঙ্গায় একটা বড়ো সর্বনাশ হয়েছিল। তবু ধৈর্য ধরে ছিলাম। এতদিনের প্রাক্‌টিস্ ছেড়ে আসতে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলাম না। পঞ্চাশের দাঙ্গায় হলো আর এক চরম সর্বনাশ । বললাম, আর নয়। সর্বস্বান্ত হয়ে কলকাতার পথে পাড়ি দিলাম। হানিফ আর হাসিম চোখের জলে বিদায় দিয়ে গেল।

হেরম্ববাবুর বুক খালি করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এলো।

ঃ এখানে এসে আবার নতুন করে সুরু করলাম। কিন্তু এখন শেষের বেলা। এখন আর সুরু করা চলে না। জুনিয়ারদের সঙ্গে শিং ভেঙে বাছুরের দলে বসেছি বটে, কিন্তু মনে আর জোর নেই। গায়ে তো নেই-ই। বয়েস গুঁড়ি মেরে ষাটের দিকে এগুচ্ছে। প্রাক্‌টিস্ আর জম্‌ছে না। জুনিয়ার-রাই আমার থেকে অনেক বেশি পায়। যে কটা দিন আছি, এই এঁদো গলিতে পড়ে পড়ে পচতে হবে।

হঠাৎ হেরম্ববাবুর মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল। নিজের মধ্যে তিনি তলিয়ে গেলেন যেন।

ঃ একটি কানাকড়িও সঙ্গে করে আনতে পারি নি। সঞ্চয় নেই কিছুই। বোধ হয়, সব ক'টিকে ঠিক মতো মানুষ করে দিয়েও যেতে পারবো না।

সুরঞ্জন হেরম্ববাবুর মনে ভরসা জোগাবার চেষ্টা করে ঃ এমন কথা বলেন কেন? এ তো হলো নৈরাশ্যবাদীর মতো কথা।

ঃ নৈরাশ্যবাদীর মতো নয়, নৈরাশ্যবাদীই। এতগুলি দুর্ঘটনার পর আর কি কেউ আশাবাদী থাকতে পারে? অনেক আশা করে এখানে এলাম? কিন্তু একটি আশাও পূর্ণ হয় নি। ক জনের দুমুঠো ভাত জোগাড় করতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। কদিনই বা এভাবে চলবে?

কেতকী চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

হেরম্ববাবুর কথার শেষটুকু বোধহয় তার কানে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে হেরম্ববাবুর মুখের দিকে তাকায়।

ঃ ঘরের কথা এভাবে ওঁকে না শোনালেই কি তোমার চলছে না, বাবা?

ঃ না মা। আমি তো ওঁকে কিছুই বলি নি।

বলে হেরম্ববাবু পোড়া চুরুটটায় আগুন ধরালেন। কেতকী কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুরঞ্জন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনার ভাই নরেন্দ্রবাবু কোথায় রয়েছেন? তিনি আপনাদের সঙ্গে এখন আর যোগাযোগ রাখেন না?

ঃ ডাক্তার মানুষ নরেন। অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছিল তো। তাই চলে আসার পথে তারা দল বেঁধে ওর প্রাণটা কেড়ে নিয়ে ঋণ শোধ করলো।

ঃ মানে ওকে খুন করলো ওরা?

সুরঞ্জন হেরম্ববাবুর কথার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। পূর্ব বাংলার এক বাস্তুত্যাগী পরিবার অনিশ্চয়তার স্রোতে ভাসতে ভাসতে কি

করে এখানে এসে পৌঁছোলো, তারই কথা শুনতে গিয়ে সে দেখতে পাচ্ছিল আরো অনেক লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুখ। তাদের সে দেখেছে দর্শনায়, পেট্রোপোলে, শিয়ালদা স্টেশনে। তাদের কথা শুনেছে সে মন দিয়ে। কাগজের জন্যে সংবাদ সংগ্রহ করতে সে ছুটে বেড়িয়েছে। কিন্তু আজ যে সংবাদ সে সংগ্রহ করলো, তা তার মনের মণিকোঠায় গুছিয়ে রাখবার মতো।

আজ হেরম্ববাবুর চোখের সামনে সব আলো মুছে গেছে। মনের সব আশা আকাঙ্ক্ষাকেও কারা যেন ধারালো ছুরি দিয়ে খুন করেছে। কিন্তু আজও তিনি সেই পূর্ব বাংলার মাটিকে, সেই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে ভুলতে পারেন নি।

ঃ তুমি পশ্চিম বাংলার ছেলে। তা তোমার কথা শুনেই বুঝতে পারছি। পূর্ব বাংলাকে কখনো গ্যাখোনি। আজও চোখ বুজলে আমি দেখতে পাই, হানিফ, হাসিম, ইয়াকুব সারি গান গেয়ে ধান কাটতে চলেছে, বন্যার জল উঠোন ছুঁয়েছে। বন্যার জল নয়তো যেন নদীর ভালোবাসা। সে তুমি বুঝবে না।

একটু গলা নামিয়ে হেরম্ববাবু জিজ্ঞেস করলেন ঃ কবিতা-টবিতা লেখ ?

কথার মধ্যে কখন হেরম্ববাবু 'আপনি' থেকে 'তুমি' তে চলে গেছেন, তা তাঁর খেয়াল হয় নি। খেয়াল সুরঞ্জনেরও হয় নি।

কিন্তু কবিতার কথায় চমকে উঠলো সে। কবিতা কোনদিনই সে লেখেনি। কিন্তু কবিতার মতো কবিতা যারা লিখতে পারে, তাদের সে শ্রদ্ধা করে। অবশ্যি কলেজে পড়ার সময় সমীর বলে একটা ছেলে কবিতা লিখতো বলে সবাই তাকে 'কবি' বলে ক্ষেপাতো। সেও ছাড়তো না তাকে। আজ হেরম্ববাবুর কথায় সে হেসে ফেললো। বললো ঃ না। ওটা আমার আসে না। তবে কবিতা ভালোবাসি।

যোগমায়া দেবী ঘরে ঢুকলেন।

তিনি সেই-যে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, এতক্ষণ এ ঘরে আসেন নি। এতক্ষণ পরে কি ভেবে তিনি আবার এসেছেন ?

দেশের ছেলেদের জন্যে তাঁর এত টান, তাদের জন্যে যিনি নিজের ছেলের উৎসব বন্ধ রাখেন, তিনি নিজের মেয়ের প্রতি এত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন কি করে ?

সুরঞ্জন তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকাতেই পারলো না।

যোগমায়া দেবী বললেন : কাল রাতে উনি সবে এসেছেন। আর ও গিয়ে ওঁর ঘরে এমন কাণ্ড করলো, তাতে লজ্জায় মরে যাই আর কি !

হেরম্ববাবুকে উদ্দেশ করে তিনি কথাগুলি বললেন।

হেরম্ববাবু জিজ্ঞেস করলেন : কে ?

: কে আবার ? যূথী—

: অ।

যোগমায়া দেবী এবার সুরঞ্জনকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি কিছু মনে করো না, বাবা। ও একটু ওই রকমই। মাথায় একটু ছিট আছে কিনা। আমার ভাগ্য বড়ো খারাপ। আমার ভাগ্য যদি মন্দ না হবে, তবে ওর এ অবস্থা হবে কেন ?

যোগমায়া দেবীর চোখে জল এসে পড়লো।

বোধহয় তিনি যে সুরঞ্জনের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছেন, তা নিজে যেন খানিকটা বুঝতে পেরেছেন।

সুরঞ্জন জানালো যে সে মনে কিছু করে নি। পাছে যোগমায়া দেবী কিছু মনে করেন, তাই মিথ্যে কথা বললো সে।

সারা সকালটা মাটি হলো সুরঞ্জনের। কোন কাজই হলো না। কাজ অনেক পড়ে আছে হাতে। আজ একবার অফিসে যেতে হবে তাকে। হোক রবিবার। হোক ছুটির দিন। একটা ফীচার লিখছে সে। তবু একবার তার অফিসে যাওয়া চাই। সকালে একটা বই পড়লেও অনেক কাজ হতো।

সুরঞ্জন ভাবলো : না মাটি হয়নি সকালটা। আজ সকালটা এভাবে ব্যয় না করলে হয়তো তার এতো কথা জানা হতো না। বইয়ের পাতায় এসব কথা লেখা থাকে না। সে পূর্ববঙ্গ-গীতিকা

পড়েছে। এও যেন এক নতুন ধরণের পূর্ববঙ্গ-গীতিকা। বুকের রক্ত আর চোখের জল দিয়ে লেখা এ এক নতুন উপাখ্যান। সে জানে, এ উপাখ্যানের শেষ এখানে নয়। শেষ কোথায়—সে জানে না। কেউ জানে না।

বাচ্চু এতক্ষণ এঘর ওঘর করছিল নিজের মনে।

বড়দি এখন তাকে ডাক দিল ঃ বাচ্চু—

বাচ্চু বুঝতে পেরেছে তার একটা দুঃসময় এসেছে। সে তাই আত্মরক্ষার জন্যে এঘরে পালিয়ে এসে সুরঞ্জনের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

দরজার আড়াল থেকে কেতকীর গলা শোনা গেল ঃ বেলা হয়ে যাচ্ছে। আয়, স্নান করিয়ে দিই—

স্নানের সময়টা সত্যিই বাচ্চুর:পক্ষে বড় দুঃসময়। কিছুতেই সে গায়ে জল ঢালবে না। তাই বড়দির হাতের কয়েকটি চড় এই সময় তার জন্যে ঠিক বরাদ্দ থাকে।

কেতকী ডাক দেয় ঃ আয়—

বাচ্চু সুরঞ্জনের চেয়ারের সঙ্গে প্রায় লেপ্‌টে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঃ মা, ছাখোনা। বাচ্চু আসছে না।

যোগমায়া দেবী বাচ্চুর কাণ্ড দেখে হাসতে থাকেন।

কেতকী আর দেরি না করে বাচ্চুর হাত ধরে টান দেয়। বাচ্চু আর কোন কিছু না পেয়ে চেয়ারের হাতলটাকে জড়িয়ে ধরে অসহায়ের মতো।

সুরঞ্জন উঠে দাঁড়ায়। সস্নেহে বলে ঃ চলো বাচ্চু, আমিও স্নান করতে যাবো। চলো—

ঃ তুমিও স্নান করবে ?

বাচ্চু এবার অনেকটা সহজ হয়েছে।

ঃ আমার সঙ্গে স্নান করতে হবে কিন্তু।

কেতকী বাচ্চুর হাতে একটা মৃদু চড় বসিয়ে দিয়ে তাকে টানতে লাগলো।

এমন সময় রাস্তার ধারের জানলায় এক যুবকের চেহারা ভেসে উঠলো। মাথায় সিনেমার নায়কের মতো চুল। পরনে রং-বেরঙের বুক-খোলা হাওয়াই শার্ট আর কালো রঙের টুইস্ট প্যান্ট। পায়ের জুতোটা দেখা গেল না। তবে তার চেহারাটাও সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়।

সুরঞ্জন এই পোশাক আজও পছন্দ করতে পারে নি। সহ্য করতেও পারে না। সে স্বীকার করে পোশাক বাইরের জিনিস। আসল হলো মানুষ। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের মতো প্রত্যেক পোশাকেরও একটা চরিত্র আছে। সেই পোশাকের চরিত্রের ভেতর দিয়ে মানুষের চরিত্রও সবটা না হলেও কিছুটা প্রকাশ পায়।

ঃ কি করছেন, কাকাবাবু ?

সুরঞ্জন লক্ষ্য করলো, নবাগত যুবকের গলার স্বর বেশ কিছুটা উচ্চগ্রামে বাঁধা।

হেরম্ববাবু বললেন ঃ নিশীথ যে! কি মনে করে ?

নিশীথের ছুঁচোলো জুতো ততক্ষণে ঘরের মেঝের বুকে অহংকার এঁকে দিয়েছে।

ঃ উইক-ডেতে আপনাকে তো আর পাওয়া যায় না। ছুটির দিন ছাড়া—

কেতকীর স্নানের তাড়া থেকে বাচ্চু যেন আপাতত বেঁচে গেল। কেতকী হঠাৎ কেমন-যেন হয়ে যায়। তার এই ভাবান্তর সুরঞ্জনের চোখ এড়ালো না। সমস্ত শরীরে তার যৌবন। শান্ত, স্তম্ভিত। চোখে গাঢ় ইশারা। জোয়ারের প্রথম আবেগের পর ভরা কোটাল। এখন আর ঢেউয়ের উচ্ছলতা নেই, কিন্তু জল কানায় কানায় ভরা।

নিশীথ একবার কেতকীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে হেরম্ববাবুকে বললো ঃ আজ কিন্তু আপনার কবিতা না শুনে যাবো না।

ঃ কতো আর শুনবে ?

ঃ আপনার কবিতা কখনো পুরোনো হবে না। এই আমি আপনাকে বলে রাখছি।

একটু হাসলেন হেরম্ববাবু।

সুরঞ্জনের ইচ্ছে ছিল না। তবু সে জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনি কবিতা লেখেন নাকি ?

ঃ লিখতাম। এখন আর আসে না।

সুরঞ্জন কথার ফাঁকে নিশীথের দিকে তাকায়। কেমন চঞ্চল এই যুবক। কেমন চড়া গলায় তার কথাবার্তা। কেমন বিশ্রী বেশবাস। অথচ কবিতা ভালোবাসে। সে কবিতা লেখে না। কবিতা শুনতে ভালোবাসে। হেরম্ববাবুর অনেক দিনের লেখা পুরোনো কবিতা শুনতে নিশীথের না কি ভালো লাগে।

কেমন আশ্চর্য লাগে সুরঞ্জনের। সে নিশীথের উপস্থিতি সহ্য করতে পারছিল না। হেরম্ববাবু আজ নিশীথকে কবিতা শোনাবেন। সুরঞ্জন এখন থাকবেই বা কেন ? সে বলে ঃ এখন আমি আসছি। আমাকে আবার একটু বেরুতে হবে।

হেরম্ববাবু বললেন ঃ আচ্ছা এসো। আবার এসো। কেমন ?

সুরঞ্জন সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে এলো। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে সে'শুনলো, নিশীথ বলছে ঃ উনি কে, চিনলাম না তো ?

হালদার বাগান লেনের এই জরাজীর্ণ বাড়ির আনাচে কানাচে,এর প্রতিটি ফ্ল্যাটে অনেক কাহিনী জমে আছে। এর প্রতিটি নিশ্বাসে কান্না। সুরঞ্জন সেই কান্না শুনতে পায়। দোতলার দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাটের অমিত রায় ও রিণা রায়ের কণ্ঠে সে সেই কান্নাই শুনতে পেয়েছে।

দোতলায় তিনটি ফ্ল্যাট্

ছোট ফ্ল্যাট্‌টি তো নিয়েছে সুরঞ্জন। বড় দুটির একটিতে থাকে অমিতেশ রায় আর রিণা রায়। দুজনেই শিল্পী। আর্ট কলেজে দুজনেই ফাইন্ আর্ট নিয়ে পাশ করেছে। অবশ্যি পাশ করবার আগেই দুজনের হৃদয় জানাজানি হয়ে যায়। এবং দুজনেই একটি সিদ্ধান্তে এসে পড়ে।

রিণা প্রথমে একটু আপত্তি করেছিল। বলেছিল ঃ এত তাড়াহুড়ো করবার কি আছে ? আগে পাশ করি, তারপর দুজনে দুটো চাকরি জুটিয়ে নিই। তখন একটা ফিনিশিং টাচ্ দিয়ে দেওয়া যাবে। কি বলো ?

রিণার দুচোখে দুচোখ রেখে অমিতেশ বলেছিল ঃ দ্যাখো রিণা, আমার পাশের সম্বন্ধে তোমার কি কোন সন্দেহ আছে ?

আর্ট কলেজের ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র অমিতেশ রায়, বন্ধুমহলে যে 'অমিট্ রে' নামে পরিচিত, তার পরীক্ষায় পাশ নিয়ে কেউ কোনদিন সন্দেহ প্রকাশ করে নি। রিণাও করে না।

রিণা বলেছিল ঃ সন্দেহ নয়, অমিত। আমি বলছি, নিশ্চিত হয়ে কাজ করার কথা। পাশ করে চাকরি জুটিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বিয়ে করা যাবে। তার জন্যে এত তাড়া কেন ?

অমিত বললো ঃ তুমি একটি কথা কেন বুঝছো না, রিণা। জীবনের বর্ণপরিচয় হলো প্রথম ভাগে। প্রথম ভাগেই যত রং যত কল্পনা। চাকরীর ধান্ধায় তাকে হারাতে আমি রাজী নই। আই হ্যাভ্ লাস্ট্ ফর লাইফ্।

ঃ জীবন অনেক বড়। তাকে অত ছোট করে দেখছো কেন ? সারা জীবনই তো তার জন্যে সাম্‌নে পড়ে রয়েছে।

রিণাদের বাড়ির ছাতে আলো নিবে এসেছিল। আকাশে চলেছিল তারার উল্‌কি আঁকার নীরব আয়োজন। সাম্‌নেই মধু-মালতীর লতায় ফুল ভরে উঠেছিল। তার সুগন্ধে সন্ধের সঞ্চারমান অন্ধকার বারে বারে অস্থির হয়ে উঠছিল।

অমিত আকাশের দিকে চেয়ে আকাশের মত উদাস হয়ে গেল।

রিণা জিজ্ঞাসা করলো ঃ কি হলো ? এমন মন-মরা হয়ে গেলে যে ?

একটা নিশ্বাস পড়লো অমিতের। যেন আকাশের স্বপ্নভঙ্গ হলো।

ঃ একটা কথা আমাকে বলবে, রিণা ?

ঃ কি কথা, বলো ? একটা কেন, অনেক কথা তুমি বলবে, আমি শুনবো। কেমন চমৎকার সন্ধেটা বলো তো ?

বরানগরের সেই বাড়িটার ছাতের ওপরকার সন্ধে অমিতের মনকে স্পর্শ করলো বলে মনে হলো না। যৌবন-মদে-মত্তা এক আধুনিকা রমণীর সান্নিধ্যেও এমন রমণীয় সন্ধেটা একেবারে মাটি হয়ে গেল তার!

ঃ সত্যি করে বলো তো, তুমি 'ওর' কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছো ?

ঃ কার কথা বলছো ? সুপ্রিয়র কথা ?

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো রিণা।

ঃ তুমি কি পাগল হলে অমিত ? আমি সুপ্রিয়র কথা মনের মন্দিরে বসিয়ে পূজো করতে যাবো কোন্ দুঃখে ?

ঃ দুঃখে নয়, হয়তো আনন্দে।

ঃ আনন্দে ?

আবার হেসে উঠলো রিণা।

ঃ অনেকদিন তুমি ওর সঙ্গে ঘুরেছিলে কিনা, তাই বলছি।

হঠাৎ রিণার গলা শান-খাওয়া ছুরির মতো ধারালো হয়ে উঠলো।

ঃ হ্যাঁ, ঘুরেছিলাম। ঘুরলেই একেবারে হৃদয় দান করে বসতে হয় নাকি ? তুমি বড়ো সাস্পিসাস্—

ঃ এবং একটু জেলাস্ও—

এবার রিণা কাছে সরে আসে। সন্ধের আকাশে তখন অন্ধকার ঘন হয়েছে। বাতাসে ঘন হয়েছে মধুমালতীর গন্ধ।

ঃ কি সব বাজে কথা বলছো, বলো তো ? আমার এ প্রসঙ্গ একেবারেই ভালো লাগে না।

অমিত দুচোখ তুলে তাকায়। অন্ধকারেও তার দুচোখের ঘনীভূত মায়া রিণা ঠিক দেখতে পেয়েছিল।

অমিত ধীরে ধীরে বললোঃ আমারও ভালো লাগে না রিণা। আর দেরি না করে এসো, আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোই।

ঃ কিন্তু পাশ না করে, চাকরি না জুটিয়ে—আমি কিন্তু ভরসা পাই না। অনেক সমস্যা, তা জানো।

অমিত বেশ জোরের সঙ্গে বলেছিলঃ পাশ আমি করবোই। আর চাকরি?—আমি করবো না।

ঃ বা রে, তাহলে চলবে কি করে আমাদের? অভাব-দুঃখ কষ্ট যে আমি একেবারে সইতে পারি না।

হেসেছিল অমিত। বলেছিল ঃ বাপ-মার একমাত্র ছেলে আমি। হ্যারিসান্ রোডে আমাদের এতবড় বাড়ি। ব্যাঙ্কে আমার নিজের নামেই পঁচিশ হাজার টাকা—

ঃ কিন্তু আমাদের এই ইণ্টার-কাস্ট্ ম্যারেজে তোমার বাপ-মা মত দিলে তবে তো তুমি ওসব পাচ্ছ। নইলে—

ঃ আঃ, ইণ্টার-কাস্ট্, ইণ্টার-কাস্ট্। ম্যারেজের কোন কাস্ট্ই নেই। বাবা একবার বিলেতে গিয়ে তিনবছর ছিলেন। মা-ও, বুঝতে পারছো, কন্জারভেটিভ্ নয়। মত করাবার ভার আমার।

রিণা নিঃশব্দে মধুমালতীর লতাকুঞ্জের নিচে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলো। সেই অন্ধকারে গন্ধের কতো হিজিবিজি রেখা আঁকা? যেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা একখানি দুর্লভ ছবি।

অমিত রিণার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

ঃ সেই টাকা দিয়ে আমরা দুজনে চৌরঙ্গীতে একটা স্টুডিও খুলবো। আমাদের আঁকা ছবি 'ফরেনে' যাবে। 'ফরেনে' এক্-জিবিশন করবো। টাকা আসবে, সেই সঙ্গে আসবে খ্যাতি। রিণা, রিণা—

রিণাকে দুহাতে সে বুকে চেপে ধরলো।

ঃ রিণা, রিণা—

অমিত চুম্বনের চিহ্ন রাখলো তার ঠোঁটের ওপর।

ঃ রিণা—

রিণার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ঃ অবুঝ হয়োনা, অমিত। আমার কথা শোনো—

ঃ না ; বলো, তুমি কথা দিলে—

ঃ দিলাম।

ঃ কবে রেজেস্ট্রি অফিসে যাবে, বলো।

ঃ কালই চলো।

ঃ তবে আজই তোমার বাবা-মাকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিই।

গায়ের কাপড়টা ঠিক করে নিতে নিতে রিণা বলে ঃ চলো—

মনে পড়ে, রিণার বাবা-মা শুনে সেদিন খুব খুশি হয়েছিলেন। রিণার বাবা বলেছিলেন ঃ অনেক ব্যাপারে হয়তো দুজনের মতের অমিল হতে পারে। কিন্তু দুজনকে সইয়ে নিতে হবে, মানিয়ে নিতে হবে। তবেই সুখী হবে। আশা করি, তা তোমরা হবে।

মানুষের কল্পনা আর সাফল্যের মধ্যে চিরকালের গরমিল। একদিক দিয়ে মানুষ নিজের ভাগ্যকে গড়তে চায়, অন্যদিক দিয়ে তা কে যেন ভেঙে দিয়ে যায়। সে সেই ভাঙা-ভাগ্য নিয়ে আবার গড়ার কাজে মন দেয়। কিন্তু এই সৃষ্টির মধ্যে আছে এক এমন ক্রূর শক্তি, যা সব সময় শুধু ভাঙার জন্যে তৈরী। মানুষের মনকে এক মুহূর্তের জন্যে সে বিশ্রাম করতে দেবে না। সামাজিক পরিবেশ সেই ক্রূর শক্তিকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। মানুষকে ঠেলে নিয়ে যায় আলো থেকে অন্ধকারের দিকে।

অমিতের মনের পটে-আঁকা রঙীন ছবিটার ওপর এক-দোয়াত চাইনিজ্ ইঙ্ক যেন গড়িয়ে পড়লো।

পরের দিন তারা রেজেস্ট্রি অফিসে গিয়েছিল।

অমিত আর রিণার সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হলো।

রিণা থাকে বরানগরে তার বাপের বাড়িতে আর হ্যারিসান রোডের বাড়িতে থাকে অমিত। কলেজের ক্লাসে দেখা হয় তুজনের। বিজয়-গর্বে পাশাপাশি বসে তুজনে। সতীর্থ বন্ধুদের তির্যক-দৃষ্টি বা বক্র-সমালোচনা তাদের কোন রকম বিচলিত করতে পারে না।

পরীক্ষায় তুজনেই পাশ করলো।

আর দেরি করা যায় না।

অমিত একদিন মায়ের কাছে সমস্তই খুলে বললো। মা বললেন ঃ বত্তির ছেলে হয়ে তুই কায়েতের মেয়েকে বিয়ে করবি? না, সে হয় না। তোর জন্যে আমি মেয়ে পছন্দ করে রেখেছি। মা ও ছেলের কথা-বার্তার মাঝখানে এসে বাবা দাঁড়ালেন।

ঃ কি? হলো কি তোমাদের? এ্যাঁ? এত কথা-কাটা-কাটি কেন?

অমিতকে কিছুই বলতে হলো না। অমিত চিরকালই বাবাকে একটু ভয় করে। বাবাকে সব খুলে বললেন মা। সব শুনে বাবা বললেন ঃ বেশ তো। ওরা যখন তুজনকে কথা দিয়ে ফেলেছে আর মন ঠিক করে ফেলেছে, তখন তাই হবে।

মা বললেন ঃ তাই বলে কায়েতের মেয়েকে––

বাবা বললেন ঃ ওসব তুশো বছর আগেকার কথা। এখন অচল।

মা চুপ করলেন।

বাবা বললেন ঃ তাহলে সাম্‌নের মাসে—

অমিত কথার মাঝখানে বলে ফেললো ঃ আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।

ঃ সে হয়না। আমি আনুষ্ঠানিক বিয়ের পক্ষপাতী।

তাই হলো। আনুষ্ঠানিক বিয়ের ব্যবস্থাই হলো। আত্মীয়-স্বজন কেউ এলো না। নাই বা এলো আত্মীয়-স্বজন। বাবার বন্ধু-

বান্ধবে, অমিতের বন্ধুবান্ধবে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠলো। অমিত লক্ষ্য করলো, তার বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই আসে নি। সেই সঙ্গে সুপ্রিয়ও এলো না। যাক্, রিণা তাতে হয়তো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে।

বৌমাকে অমিতের বাবার ভারি পছন্দ হয়েছে। একটি দিনের জন্যেও তিনি বৌমাকে কাছ-ছাড়া করতে চান না। উঠতে বসতে, —বৌমা, বৌমা, বৌমা—

মাঝে মাঝে অমিতের নিজেকে বড়ো একা, বড়ো অসহায় মনে হয়। কোন দরকারের সময় সে রিণাকে খুঁজে পায় না। রিণাকে তার বিশেষ প্রয়োজন। সে ডাকে ঃ রিণা, রিণা—

বাবার ঘর থেকে রিণা সাড়া দেয় ঃ বাবা এখন বেরুচ্ছেন—

বাবা বললেন ঃ যাও বৌমা, ও কি বলছে আগে শুনে এসো।

ঃ ঠিক আছে বাবা, আপনি আগে বেরিয়ে যান—

রাগে মুখ গোমড়া করে বসে থাকে অমিত।

রিণা যখন আসে, তখন আর তাকে কোন প্রয়োজন নেই।

ঃ বলো না, কেন ডাকছিলে—

ঃ এখন আর কোন দরকার নেই। তুমি যেতে পারো।

ঃ বলো না, কি যে ছেলেমানুষী করো—

কয়েকদিন পরেই অমিত সেই দরকারী কথাটা রিণার কাছে বলে বসলো। চৌরঙ্গী রোডে স্টুডিও খোলার কথা।

রিণা বললো ঃ অমন কাজ করো না। ওসব ঝামেলার কাজ তোমাকে দিয়ে হবে না।

অমিত বলে ঃ ঝামেলার কাজই আমার এখন চাই। তোমাকে নিয়েই আমি কাজে নামবো। বাবার গলগ্রহ হয়ে আর থাকা যায় না—

রিণা মনে মনে হাসে। বলে ঃ তুমি দেখছি ব্যাঙ্কের ঐ টাকাগুলো নয়-ছয় করতে চাও। তা আমি হতে দেবো না। চাকরি যদি

অমিত নীরব। তার দুচোখে অন্ধকার জমে উঠেছে। কোথাও এতটুকু আলো নেই। রিণা তার পাশে বসে। জিজ্ঞেস করেঃ কথা বলছো না যে?

বিয়ের পর থেকে অমিত একটিও ছবি আঁকতে পারে নি। কদিন চেষ্টা করে একটি ছবি দাঁড় করিয়েছিল সে। ভাবছিল, সে আরও ছবি আঁকবে। আরো পরিশ্রম করবে। দুর্ভাগ্যকে জয় করতে হলে পরিশ্রম না করলে কি চলে?

ছবিটার পাশেই বসেছিল সে। মেঝের ওপর ছবিটা রেখে সে দেখছিল। কোথাও কোন ত্রুটি আছে কিনা। পাশেই কখন চাইনিজ্ ইঙ্কের দোয়াতটার ছিপি খুলে রেখেছিল সে, তার খেয়াল ছিল না।

অমিতের মুখে কথা নেই। রিণা তার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করেঃ চুপ করে আছো কেন? বলো না, কেমন করে আমাদের চলবে?

অমিত একটু সরে বসতে যাচ্ছিল। হাতের ধাক্কায় চাইনিজ্ ইঙ্কের দোয়াত উল্‌টিয়ে পড়লো একেবারে ছবিটার ওপর।

কদিনের পরিশ্রম একেবারে মাটি হয়ে গেল তার।

রিণার দিকে তাকালো সে। রিণার মুখটা যেন দেখা যাচ্ছে না। অমিতের দুচোখেও যেন চাইনিজ্ ইঙ্ক গড়িয়ে পড়েছে।

ছবিটার দিকে করুণ চোখে তাকায় অমিত।

কালি নয় যেন একরাত্রি অন্ধকার।

রিণা ছবিটা তুলতে যাচ্ছিল। অমিত বারণ করলো।

ঃ যা গেছে, যেতে দাও—

ব্যথায় কাতর চোখে তাকালো রিণা। কাছে সরে এসে দুহাতে অমিতের গলা জড়িয়ে ধরেঃ রাগ করো নি তো?

অমিত ছবিটার দিকে যেমন চেয়েছিল, তেমনি চেয়ে রইলো।

রিণা বলেঃ তুমি এতো ভেঙে পড়ছো কেন? এখন ভেঙে পড়লে কি চলে?

একটা গভীর নিশ্বাস রিণার হাতের ওপর গড়িয়ে পড়লো।

সেদিন সেই দৃষ্টিহীন অন্ধকারের মধ্যে রিণা অমিতকে জানালো যে, তাদের আঁধার ঘরে দুঃখরাতের রাজা আসছে। সে মা হতে চলেছে। অমিত রিণার মুখের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকালো।

এত দুঃখ, এত অন্ধকার! এখনই কি রাজার আসার সময়? এখন কি না এলেই চল্‌ছিল না তার?

অমিতের প্রায় চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছিল।

খবরটা শুনে অমিতের বাবা বলেছিলেন: এই দুঃসময়ে সে আসছে বলে তার কোন অনাদর হতে আমি দেব না। আমার যতখানি সাধ্য—

রিণা অমিতকে বলেছিল: বুড়োমানুষ যদি একথা বলতে পারেন, তুমি কি করে এতো ভেঙে পড়ছো বলো তো?

: আমি কি করবো বুঝতে পারছি না, রিণা।

বলেছিল অমিত।

: কেন? করবার কি কিছুই নেই?

একটু থেমে অমিত বলেছিল: ব্যবসা করবো ভেবেছিলাম। স্টুডিও খুলবো। টাকা কই? সে তো আগেই গেছে।

রিণা বলে: ব্যবসা যখন হলো না, তখন অন্য কিছুও তো করা যায়?

: কি করা যায়, বলো?

: কেন? চাকরি? চাকরির দরজা তো বন্ধ হয়ে যায় নি।

চাকরির কথা শুনে অমিত কেমন যেন হয়ে গেল।

: কি হলো? অমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?

: চাকরি আমি করবো না। দারিদ্র্যের চেয়ে আমার আদর্শ বড়ো।

: থাকো তুমি তোমার আদর্শ নিয়ে, আমি বাপের বাড়ি চললাম।

হেরে গেল অমিত।

পরের দিন থেকেই তাকে চাকরির খোঁজে বেরুতে হলো। যেখানে বাপের বন্ধুরা রয়েছেন, সেখানে গেল সে। বললো দুর্ভাগ্যের

কথা। তারা জানালেন তাদের ফাইন্ আর্টিস্টের দরকারই নেই। ভবানীপুরে তার কয়েকজন সতীর্থ' বন্ধুর বাড়ি। তাদের কাছে গেল সে। আশা, যদি একটা চাকরি জোটানো যায়। দেখলো, তাদেরই অনেকে বেকার হয়ে চায়ের দোকানগুলোতে ভিড় করছে। অমিত তার বাড়ি-ফেরার পয়সায় তাদের চা খাইয়ে ভবানীপুর থেকে হেঁটে শুক্‌নো মুখে বাড়ি ফিরে এলো।

রিণা জিজ্ঞেস করলো : কি হ'লো ?

: কিছুই না।

: বন্ধুদের কাছে গিয়েছিলে ?

: গিয়েছিলাম। তাদেরই অনেকে এখনো বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রিণা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পরের দিন সকালে উঠেই অমিত পাড়ার চায়ের দোকানে যায়। হা-পিত্যেশ করে খবরের কাগজটার জন্যে বসে থাকে। হাত-বদল হয়ে খবরের কাগজটা এলেই সে কর্মখালির পাতাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। নিজের কোয়ালিফিকেশান মিলিয়ে দেখে। না, সে কোন কাজেরই উপযুক্ত নয়। ইঞ্জিনিয়ার দরকার, ওভারসিয়ার দরকার, একাউন্ট্যান্ট্ দরকার। কিন্তু আর্টিস্টের কোন দরকার নেই।

খবরের কাগজের কর্মখালি পাতা তাকে কোন আশ্বাসই দিতে পারে না। এসপ্ল্যানেড, ডালহৌসী স্কোয়ার, গনেশ এভিন্যু—সবখানে সে গিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দারোয়ানরা তাকে ভাগিয়ে দিয়েছে। যেখানে দেখা করবার অনুমতি পেয়েছে, সেখানে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে : অফিস এখন ওভারস্টাফ্‌ড্। অদূর ভবিষ্যতে কোন লোক নেওয়া তো হবেই না। দরকার হলে ছাঁটাইও হতে পারে। কেউবা ফাইন্ আর্টিস্টের নাম শুনে হেসেছে। বলেছে : এত সাব্‌জেক্ট থাকতে মরতে ফাইন্ আর্ট নিতে গেলেন কেন ? ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুন, ডাক্তারী পড়ুন, সি. এ. পড়ুন, কস্টিং পড়ুন—তা নয়, পড়লেন কিনা ফাইন্ আর্ট। এই দুনিয়ায় যার কোন

প্রয়োজনই নেই। এক কাজ করুন। ফাইন্ আর্ট পড়েছেন, পড়েছেন। টাইপ রাইটিংটা শিখে ফেলুন। কাজে লাগবে।

অমিত মনে মনে শপথ করলো সে আর চাকরির চেষ্টা করবে না।

কিন্তু চলবে কি করে?

অমিতের বাবা কোন এক সময় আগড়পাড়া স্টেশনের কাছে কিছু জমি কিনে রেখেছিলেন। এতদিন তার দিকে নজর দেননি। নজর দেবার প্রয়োজনও হয়নি। আজ এই দুর্দিনে তাঁর চোখ পড়লো সেই জমিটার ওপর। জমির অর্ধেকটা বিক্রি করে সেই টাকায় ছোট্ট একটি বাড়ি বানিয়ে নিলেন তিনি। বাড়ি মানে দুখানা ঘর, টিনের-চালা দেওয়া একটি রান্নাঘর, একটি বাথরুম আর একটি টিউব্ ওয়েল।

বাড়ির কাজ তখনো শেষ হয়নি। প্লাস্টার-চুনকাম পরে হবে। এখন চাই আপাতত মাথা গুঁজবার ঠাঁই।

বাড়ির কাজ শেষ হবার আগেই হ্যারিসান রোডের বাড়ি থেকে জিনিসপত্র সরানো হয়ে গেল। দিনক্ষণ দেখার বালাই নেই। একদিন অমিতের বাবা বললেনঃ আজ আমরা নতুন বাড়িতে যাবো।

জিনিসপত্র বলতে যা ছিল, তার কিছু ইতিমধ্যে বিক্রি করে ফেলা হয়েছিল, কিছু নতুন বাড়িতে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। আর বাকি যা ছিল, একটা ভাড়া-করা লরীর ওপর তুলে দেওয়া হলো।

অমিত তার বাবা-মাকে বললোঃ তোমরা যাও। আমি আর রিণা বরানগর হয়ে বিকেলে যাবো।

যাবার সময় বাবা একবারও পিছন ফিরে তাকালেন না। কিন্তু মা তাঁর এতদিনের সাজানো সংসার ভেঙে চলে যাচ্ছেন, তাঁর কত যত্নের ঘরকন্না! ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন তিনি। আর চোখ মুছ্ছিলেন বারে বারে।

অমিত আর রিণা বরানগরে গেল। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ওরা বেরিয়ে পড়লো।

রিণাকে কিছু না বলে অমিত চার-নম্বর বাসে উঠে পড়লো।

ঃ এ কি! আগড়পাড়া যাবে না?

অমিত একটা সিটে বসতে বসতে বলেঃ যাবোই তো।

ঃ তবে চার-নম্বরে উঠলে যে!

ঃ এতদিনের অভ্যেস একদিনে যায় না। বসো—

ঃ পাগলামি করোনা। এক্‌খুনি বাস ছেড়ে দেবে। নেমে পড়ি চলো—

অমিত হেসে বলেঃ কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কলকাতাকে শেষ-দেখা দেখে যাবো না?

পাশে বসতে বসতে রিণা বলেঃ কেন? আর কি আমরা কলকাতায় আসবো না?

ঃ আসবো বৈকি! কিন্তু আর তো আমরা কলকাতার কেউ নই। এরপর যখন কলকাতায় আসবো, তখন অতিথির মতো আসবো। মফস্বলের লোক যেমন এসে থাকে।

বাস ছুটে চলেছে। হ্যারিসান রোড পেরিয়ে গেল। অমিত বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রিণার দিকে তাকালো।

রিণা জিজ্ঞেস করলোঃ কি বল্‌ছো?

অমিত বললোঃ তুমি বরানগরের মেয়ে। ঠিকমতো বুঝতে পারবে না কলকাতা ছেড়ে যাবার দুঃখ। কিন্তু আমি জন্ম থেকেই হ্যারিসান রোডেই মানুষ। তোমার কাছে বরানগর আর আগড়-পাড়া এক। কিন্তু আমার কাছে আগড়পাড়া আগড়তলার মতোই সুদূর।

বাস এস্‌প্লানেডে এসে দাঁড়াতেই অমিত আর রিণা নেমে পড়লো।

মেট্রো সিনেমার সাম্‌নে দিয়ে, গ্রাণ্ড হোটেলের তলা দিয়ে দুজনে অনেকক্ষণ লক্ষ্যহীন ভাবে হাঁটলো। হঠাৎ কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেল অমিত।

পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাবার আয়োজন করছে।

সামনেই মনুমেণ্ট, ময়দান, ওপাশে রাজভবন।

ঃ এই কলকাতা—

একটা নিশ্বাস বুক খালি করে বেরিয়ে এলো।

ঃ আজ থেকে আমাদের নয়।

দাঁতে দাঁত ঘষলো অমিত।

ভয় পেয়ে গেল রিণা।

ঃ দাঁড়িয়ে কি বল্‌ছো বিড় বিড় করে? এ্যাঁ? লোকে কি ভাববে? চলো, সন্ধে হয়ে আসছে। আগড়পাড়া ফিরতে হবে না?

ঃ চলো—

অমিতের যেন সম্বিত ফিরে এলো। নিজেরই অজ্ঞাতে কখন তার হাত দুটো মুঠো করে ফেলেছিল সে। হাতের মুঠো শিথিল করে সে আর একবার তাকিয়ে নিল মনুমেণ্ট, গড়ের মাঠ আর রাজভবনের দিকে। বললোঃ চলো—

প্রথমে শিয়ালদা স্টেশন। তারপর আগড়পাড়া।

দীনতম আয়োজনের মধ্যে দুঃখরাতের রাজা এলো।

হাসপাতালের ফ্রী বেডে এক সপ্তাহ কাটিয়ে রিণা খোকনকে নিয়ে আগড়পাড়া ফিরে এলো।

অমিতের বাবা একপাশে একটা টিনের চালা তৈরী করিয়েছেন। খোকনের জন্যে একটা গাই কিনেছেন। ওটা থাকবে ওখানে। তার পাশেই বানিয়েছেন একটা মুরগীর ঘর। সেখানে ইতিমধ্যে কয়েকটা মুরগীও রেখে দিয়েছেন। সাম্‌নে একটু ফাঁকা জায়গা পড়েছিল। সেখানে মাটি কুপিয়ে লাগিয়েছেন লাউ, কুমড়ো আর ঝিঙের চারা। নিজের হাতে বাল্‌তি করে জল বয়ে এনে ঢালেন চারাগুলোর গোড়ায়। ওপরে একটা চলনসই মাচাও বেঁধে দিয়েছেন—লতিয়ে উঠবে গাছগুলো। ইদানীং আবার তিনি রাস্তার ওপরে একটা মুদির দোকান খোলার কথা চিন্তা করছেন।

খোকনের আসার পর থেকে তাঁর বুড়ো হাড়ে যেন দ্বিগুণ উৎসাহ বেড়ে গেছে।

ছেলের চাকরির জন্যে অনেককে তিনি বলেছেন। কিন্তু কেউ কোন আশা দিতে পারেন নি। হতাশ হয়ে তিনি এদিকে মন দিয়েছেন। তাঁর বিলেত-ফেরৎ আভিজাত্য তাতে এতটুকু সংকুচিত হয়নি।

খোকনকে কোলে নিলেই তাঁর উৎসাহ যেন আরো বেড়ে যায়। এই দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে তাকে বাঁচাতে হবে, মানুষ করতে হবে। তাঁর কতো কাজ। তাঁর কি বসে থাকলে চলে?

হ্যারিকেনের আলোয় বসে মুড়ি চিবোচ্ছিলেন তিনি। রিণা তাঁর কোলে খোকনকে দিয়ে গেল। কাছেই বসেছিল অমিত।

অমিতের বাবা রিণাকে বললেনঃ বৌমা, তোমার শাশুড়ীকে একবার ডাকো তো?

এক বছর হলো তাঁরা আগড়পাড়ায় এসেছেন। কিন্তু এরই মধ্যে অমিতের মা বড্ড যেন বুড়িয়ে গেছেন।

ঃ কেন? আমাকে ডাক্‌ছো কেন?

কাছে এসে দাঁড়ালো অমিতের মা।

ঃ ভাবছি, সাম্‌নের মাস থেকে রাস্তার ওপরে একটা মুদির দোকান খুলবো। তুমি কি বলো?

মুখ ঘুরিয়ে অমিতের মা অভিমানাহত কণ্ঠে বললেনঃ আমার বলার কি দাম আছে? যা ভালো বোঝ, করবে। আমার বলার কোনদিনও দাম নেই। আজো নেই।

ঃ এ তো অভিমানের কথা হলো। আমি ভাবছি, দাদুভাইর কথা। ওর যেন কোন অসুবিধে না হয়।

অমিতের মা বললেনঃ দাদুভাই যদি তেমন ভাগ্য করে এসে থাকে, তবে অসুবিধে হবে না।

ঃ তাহলে দাদুভাই, তুমিই বলো—টু বি অর্ নট্ টু বি।

এক বছরের খোকন ইতিমধ্যেই দাহুর কাছে বুদ্ধিমান বলে খ্যাতিলাভ করেছে। সে দাহুর কথার সুর টেনে খিল্ খিল্ করে হেসে বলে উঠলো ঃ তু বি—

হো হো করে হেসে উঠলেন রায় মশাই। বললেন ঃ শুনলে, বৌমা ? কি ইন্‌টেলিজেন্ট ! পারহ্যাপ্‌স্ হি উইল বি এ প্রফেট্।

অমিত এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। সে বলে ঃ আর যা-ই হোক বাবা, তুমি কিন্তু মুদির দোকান করো না।

ঃ হোয়াই নট্ ?

ঃ তাহলে আমাদের প্রেস্টিজ্ বলতে আর কিছুই থাকবে না।

অমিতের মা বললেন ঃ যাতে থাকে, তাহলে তুমি তার ব্যবস্থা করো। দু বছর হলো, পাশ করেছ। কোন ব্যবস্থা করতে পেরেছো ? চোখের সাম্‌নে বুড়ো মানুষটা খেটে খেটে প্রাণপাত করছে। তুমি শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছো, কাটাও। তুমি এ বিষয়ে কিছু বলতে এসো না। বলাও তোমার সাজে না।

ঃ মা—

ঃ গয়নাপত্র ঘরে যা ছিল, সব গেছে। এবার বুড়ো মানুষটা গেলেই—

শেষের দিকে অমিতের মার গলাটা যেন চিরে গেল। তিনি আঁর কথা বলতে পারলেন না।

রায় মশাই রাগ করে বললেন ঃ তুমি যাও এখান থেকে। তোমাকে ডাকাই আমার অন্যায় হয়েছে।

সেদিন রাতে পাশে শুয়ে রিণা অমিতকে বলছিল ঃ আমার আর এখানে থাকা ঠিক নয়, কি বলো ?

অমিত জিজ্ঞেস করেছিল ঃ কোথায় যাবে তাহলে ?

ঃ বরানগরে বাবা-মার কাছে।

ঃ আবার কবে আসবে ?

ঃ তোমার বা আমার—যার হোক একটা ব্যবস্থা হলেই চলে আসবো।

ঃ তার মানে ?

ঃ তোমার চাকরি যোগাড় হয়, ভালোই। নইলে আমাকে একটা খুঁজে পেতে নিতে হবে, আর কি ?

ঃ তুমি যাবে চাকরি করতে ?

ঃ তাছাড়া উপায় কি ? এভাবে কতোদিন আর বাবা-মার গলগ্রহ হয়ে থাকা যায় বলো তো ? আজ উনি এমনভাবে তোমাকে বললেন, আমার বড়ো বিশ্রী লাগছে।

একটু থামলো রিণা। তারপর বললো ঃ এখনকার মেয়েরা তো দিব্যি চাকরি করছে। তোমার কোন আপত্তি আছে ?

ঃ আপত্তি নেই। তবে চাকরি যে পাবে, সে ভরসাও আমার নেই।

অমিত একটু নৈরাশ্যের হাসি হাসলো।

রিণা বলেছিল ঃ চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি ? চাকরি পেলে করবো তো ? কথা দিলে ?

ঃ দিলাম।

ঃ তুমি এতো ভালো।

রিণা অমিতের নিবিড় নিকটে সরে আসে। মুখের উপর মুখ রেখে বলে ঃ সত্যি, তোমার জন্যে আমার বড়ো কষ্ট হয়।

পরের দিন সকালে রিণা কাকেও কিছু না বলে খোকনকে নিয়ে বরানগরে চলে গেল। অমিত তাকে স্টেশনের ওপারে বাসে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

রায় মশাই বাড়ি ছিলেন না। বাড়ি ফিরে তাঁর দাতুভাইকে দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। অমিতের মায়ের কাছে সমস্ত শুনে কাউকে কিছু না বলে মুখ শুকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তুদিন গেল, চারদিন গেল, একটি সপ্তাহ কেটে গেল।

এই সাতদিনে রায়মশাই যেন আরো বুড়ো হয়ে গেছেন। মাথার চুলগুলো আরো সাদা হয়ে গেছে, মুখে ভাঁজ পড়েছে আরো বেশি।

সেদিন বিকেলে তিনি নিজেই বরানগর গেলেন। রিণা এলো না। বলেছে, একটা কিছু ব্যবস্থা না করে সে ফিরবে না। বড়ো জেদী মেয়ে। অমিতের অথবা তার একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়ে তবে সে ফিরবে। এতদিন সে নিজে কোন চেষ্টা করেনি। চেষ্টা যা করবার তা করেছে অমিত। এবার সে নিজে চেষ্টা করে দেখবে। দেখা যাক্, সে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারে কিনা।

বাধ্য হয়ে রায়মশাই খোকনকে নিয়ে ফিরে এলেন।

খোকন মাকে ছেড়ে রায়মশাইয়ের কাছে দিব্যি থাকে আনন্দে। তার কোন অসুবিধেই হয় না।

তাকে ছেড়ে রিণারও কোন অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হয় না। বরং সুবিধেই হয়েছে। এখন সে রোজই বেরুতে পারছে। আগে মার কাছে রেখে গেলেও মনটা খোকনের কাছেই পড়ে থাকতো। এখন তার কোন ভাবনাই নেই।

প্রথমে সে কলেজে-পড়া বন্ধুদের কাছে গেল। অতি কষ্টে ঠিকানা যোগাড় করে সে তাদের অফিসে গিয়ে দেখা করলো। সকলের কাছে তার একটি নিবেদনঃ বড়ো বিপদে পড়েছি, ভাই। অমিতকে একটা চাকরি করে দাও না তোমরা।

ঃ চাকরি কোথায়? চাকরির বাজার বড়ো খারাপ।

সবার মুখে এক কথা।

ঃ চাকরি কোথায়? চাকরির বাজার বড়ো খারাপ।

সতীর্থ সুকুমার চৌধুরীর মুখেও সেই এক কথা।

ঃ সুপ্রিয়র ঠিকানাটা বলতে পারো?

সুকুমার রিণাকে সুপ্রিয়র ঠিকানা যোগাড় করে দিল।

সেইদিনই রিণা সুপ্রিয়র অফিসে গেল। দেখা পেল সুপ্রিয়র। অফিসেই ছিল সে। এতদিন পরে রিণাকে দেখে চম্‌কে গিয়েছিল

সুপ্রিয়। এই রিণাকে নিয়ে একদিন সে কতো স্বপ্নই দেখেছিল। সে-সব স্বপ্ন একদিন ভেঙে দিয়ে রিণা অমিতের হাত ধরে চলে গিয়েছিল।

রিণার চেহারার সে দীপ্তি আজ নেই। তবু রিণাকে দেখামাত্র তার মনের ওপরে অনেকগুলি রমণীয় সন্ধে ময়ূরের মতো রং-বাহার মেলে দিল।

ঃ তুমি সেই রিণা?

রিণা হেসে বললোঃ আমি সেই রিণাই।

ঃ তারপর কি মনে করে?

নখে 'নেল পালিশে'র স্মৃতিচিহ্নগুলিকে তুল্‌তে তুল্‌তে রিণা বলে ঃ বড়ো বিপদে পড়ে এসেছি তোমার কাছে।

সুপ্রিয় হেসে বলে ঃ দু বছর বাদে তোমার দেখা পেয়ে তা আঁচ্ করে নিতে পেরেছি। বিপদটা কি? টাকা?

ঃ না।

ঃ তবে?

ঃ একটা চাকরি—

ঃ চাকরি?

সুপ্রিয়র মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে রিণার মুখটাও।

ঃ ঠিক সময়েই এসেছ। কালই বড়ো সাহেব বলছিলেন একজন 'লেডি ডিজাইনারে'র কথা।

রিণা বলে ঃ আমার জন্যে নয়। অমিতের জন্যে—

ঃ ও—অমিতের এখনও চাকরি হয়নি?

ঃ হতো যদি, তাহলে আমার কি এই দুর্দশা হয়?

সুপ্রিয় একটু ভাবে। বলে ঃ কিন্তু সাহেব বলেছেন লেডি ডিজাইনারের কথা। তবু আমি যাচ্ছি, অমিতের জন্যে বলবো। যদি সাহেব রাজি না হন, তাহলে আর হলো না।

সুপ্রিয় সাহেবকে বলবার জন্যে উঠে চলে যাচ্ছিল। রিণা ডাকে ঃ সুপ্রিয়, শোন—

সুপ্রিয় ফিরে আসে।

ঃ অমিতের জন্যে যদি না হয়, তাহলে আমার কথা বলো।

ঃ তুমি ঠিক করবে তো? ভেবে ছাখো। শেষে আমি না অপদস্থ হই—

ঃ না না। আমি করবোই —

জোর দিয়ে রিণা বলে ফেললো কথাটা।

সুপ্রিয় চলে গেলে সে ভাবলো, কাজটা কি ঠিক হলো? অমিতের মত নেওয়া হলো না। অমিতের বাবাকেও তো একবার জিজ্ঞেস করা দরকার। অবশ্য অমিতকে সে বলেছে, দুজনের একজনও চাকরি পেলেই হবে। রিণাকে চাকরি করবার অনুমতি সে দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে যে-সুপ্রিয়কে অমিত সহ্য করতে পারে না, সেই সুপ্রিয়র অফিসে তাকে চাকরি করতে অমিত দেবে কি? পরক্ষণেই সে ভাবে, না দেবার কি আছে? সে বিবাহিতা, একছেলের মা। এখন সুপ্রিয়র তার সম্পর্কে আগেকার মন হয়তো নেই। এখন অমিতেরও তাকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। সে তো আর উনিশ শতকের কুলবধূ নয় যে তাকে প্রতিপদে স্বামী আর শ্বশুরের নির্দেশ মতো চলতে হবে। এই বাজারে একটা চাকরি জোটানো যে কী অসম্ভব ব্যাপার, তা কি কারো অজানা? সে ক্ষেত্রে সুপ্রিয় যদি তাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দেয়, তাহলে সে কি তা প্রত্যাখ্যান করবে? না কি, তা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে? হোক তা সুপ্রিয়র অফিসে? কি যায় আসে? পুরুষ মানুষ হয়ে নিজের একটা চাকরি জোটাতে পারে না, অথচ 'জেলাসি' রয়েছে ষোল আনা!

না, সে চাকরি করবেই। বাড়িতে এত অভাব। দুটোর বেশি শাড়ি নেই তার। একখানা গয়না নেই গায়ে। চাকরি যদি হয়ে যায়, সে তার সম্মতি জানিয়ে দিয়ে যাবে সুপ্রিয়কে।

কিছুক্ষণ পরে সুপ্রিয় ফিরে এলো।

ঃ কি হলো, সুপ্রিয়?

ঃ আজ সাহেব বড়ো ব্যস্ত। কাল দুপুরের দিকে একবার এসো। এতো ব্যস্ত যে সাহেবের কাছে কথাটা পাড়তেই পারলাম না। কাল এসো। কেমন?

ঃ আচ্ছা—

রিণা বেরিয়ে যায়।

না, সুপ্রিয় আর আগেকার মতো নেই। অনেকখানি দায়িত্বশীল হয়েছে সে। সেদিনের মোহও নেই তার চোখে। এখন রিণাকে সে আর কোন রকমে উত্ত্যক্ত করবে না। বিশেষত, সে এখন পরস্ত্রী এবং সন্তানবতী। সুপ্রিয় এখন অনেক বেশি দায়িত্বশীল, অনেকখানি নির্ভরযোগ্য। সে নিশ্চয়ই আর সেদিনের মতো নেই। ইতিমধ্যে তারও বয়েস বেড়েছে। বয়েসেরও তো একটা ধর্ম আছে?

সেদিন রিণা প্রথমে বরানগরে গেল। বাবা-মাকে খবরটা দিয়ে চলে গেল আগরপাড়ায়।

বাড়ির সবাই অবাক হয়ে গেল তাকে দেখে।

রায়মশাই বুঝি তাকে দেখে একটু ভয় পেয়ে গেলেন। রিণা খোকনকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবার জন্যে আসেনি তো?

খোকন এখন একটু হাঁটতে শিখেছে। রায়মশাই তার হাত ধরে বাড়ি থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে যাবার সময় একবার পেছন ফিরে তাকালেন। মনে মনে বললেন: ছাড়ছি কিনা দাদুভাইকে। নিয়ে যাবো বললেই হলো।

সন্ধের আগে তিনি আর বাড়ি ফিরলেন না।

রিণা দেখলো, এ বাড়িতে আর আগেকার পরিবেশ নেই। এখানে বাসা যেন ভেঙে গেছে। এক মুহূর্ত সে থাকতে পারবে না এখানে।

অমিতই শুধু কথা বললো। সে জিজ্ঞেস করলো: কি হলো?

ঃ একটা চাকরি জোগাড় করেছি। ডিজাইনারের পোষ্ট—

ঃ তাই নাকি? কবে 'জয়েন' করতে হবে, বলো—

অমিত সোজা হয়ে বসলো।

ঃ তোমার নয়, আমার—

রিণা হাসলো। তার হাসিতে বিজয়িনীর গর্ব দেখেছিল অমিত।

অমিত কেমন যেন চুপ্‌সে গেল।

রিণা যে কি অসাধ্য সাধন করেছে, তা সে অমিতকে বোঝাতে চায়।

সে বলেঃ এখনকার দিনে একটা চাকরি জোটানো কি চারটিখানি কথা? এ-অফিস সে-অফিস ঘুরে ঘুরে শেষে সুপ্রিয়র অফিসে—

রিণা আড়চোখে অমিতের মুখের দিকে তাকায়।

অমিত বলেঃ শেষে সুপ্রিয়র অফিসে চাকরি করবে তুমি?

সঙ্গে সঙ্গে রিণা বলেঃ হলোই বা সুপ্রিয়র অফিস? অন্য ডিপার্টমেণ্ট্ তো—

ঃ তাই বুঝি?

অমিত যেন কোন ভরসা খুঁজে পাচ্ছে না। সুপ্রিয়র অফিসে চাকরি করবে রিণা? এবং সে তা সহ্য করবে? আর সহ্য না করেই বা উপায় কি?

রাতে শুয়ে রিণা বলেছিলঃ জানো, সুপ্রিয় আমাকে দেখে প্রথমে তো চিনতেই পারলো না।

অমিত কিছুই বললো না। প্রসঙ্গটা যে তার মোটেই ভালো লাগছে না, তা তার এই নীরবতার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে রিণা নিজের মনে বলে চলেঃ সুপ্রিয় আর আগের মতো নেই। তারও পরিবর্তন হয়েছে। তুমি ওকে দেখলে চিনতেই পারবে না।

একটু থামলো সে।

ঃ ওর এক ডিপার্টমেণ্ট্, আমার অন্য ডিপার্টমেণ্ট্। তুজনের দেখাই হবে না। তাছাড়া—

অমিতের চোখে আজ ঘুম নেই। সে উৎকর্ণ হয়ে রিণার আঁধারের সংলাপ শুনছে।

ঃ তাছাড়া আমিই বা তাকে পাত্তা দেব কেন? আমার ঘর-সংসার, স্বামী-ছেলে। আমি এখন অন্য জগতের।

। অমিত চোখ বুজে সব শুনছে। একটি কথা নেই তার মুখে। আর কী-ই বা বলবে সে? তার বলার কি আছে?

: কাল হয়তো সাহেব 'জয়েন' করতে বলবে। 'জয়েন' করবো তো? তুমি কি বল্‌ছো?

: 'জয়েন' করবে।

: লক্ষ্মী সোনা—

পরের দিন দুপুরে রিণা 'জয়েন' করলো। সুপ্রিয় সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিল। একটা শুধু জয়েনিং রিপোর্ট লিখে দেওয়া আর কাজ বুঝে নেওয়া। ব্যস্—

সুপ্রিয় বলে গেল, রিণা রিপোর্ট লিখে ফেললো। নিচে সই করলো—রিণা রায়।

সুপ্রিয় আরো জানালো যে, সেদিন সামান্য একটু কাজ করলেই রিণা সেদিনেরও মাইনে পাবে।

রিণা তার কথামতো কাজে লেগে গেল।

কাজ করতে করতে সে ভাবে অমিতের কথা, খোকনের কথা, অমিতের বাবা-মার কথা। কখন ছুটি হবে? সে বাড়ি গিয়ে বলবে তার চাকরিতে কথা।

শেষে রিণা কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে সুপ্রিয়র সঙ্গে বেরিয়ে এলো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুপ্রিয় বলে: কিছু যদি মনে না করো রিণা, তাহলে এককাপ চা খেতে বলতে পারি—

: বেশ তো। চলো—

বহুদিন পরে সুপ্রিয় আর রিণা রেস্তোরাঁয় ঢুকলো। আনন্দের আতিশয্যে রিণা আজ বাড়িতে ভালো করে খেয়ে আসতে পারেনি। এখন তাকে দেখে মনে হয় সে ক্ষুধার্ত।

সুপ্রিয় চা ছাড়া কিছু খাবারেরও অর্ডার দিল।

রিণা বলে: বিল্‌টা কিন্তু আমি 'পে' করবো।

সুপ্রিয় বলে: আগে মাইনে পাও, তারপর—

সেদিন খুশিতে ডগমগ হয়ে বাড়ি ফিরলো রিণা। অমিতকে বললো ঃ 'জয়েন' করে এলাম। কিন্তু বড় খাটুনি—

মাস কাবারে মাইনে পেল রিণা। পুরো মাইনে পায়নি। তবু যা পেয়েছে তাতে সে নিউ মার্কেট থেকে খোকনের জন্যে একটা স্লাক্স্ রায়মশায়ের জন্যে একখানা ধুতি, অমিতের জন্যে ধুতি, শাশুড়ির জন্যে একখানা শাড়ি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরলো। নিজের জন্যে কিছুই কেনেনি সে।

অমিত বললো ঃ নিজের জন্যে কিছু কিনলে না?

ঃ তুমি চাকরি করে কিনে দেবে বলে—

রিণা হাসলো।

দুমাস হলো রিণা চাকরি করছে। রিণা দুদিন আগরপাড়ায় থাকে, দুদিন থাকে বরানগরে। তাতে পরিশ্রম হচ্ছে আরও বেশি। এভাবে তার ভালও লাগছে না। কেমন ছন্নছাড়া জীবন। এক জায়গায় ঠিকমতো সংসার পাততে না পারলে হয়? একদিন রাতে সে অমিতকে বললো ঃ চলো, একটা ফ্ল্যাট্ ভাড়া নিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে যাই। বিয়ে হয়েছে আমাদের, কিন্তু ঘর বাঁধা হয় নি।

অমিত বললো ঃ বাঁধার আগেই তো ভেঙে গেল সব।

অমিত কলকাতায় ঘর-বাঁধার কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

পরের দিন থেকে সে কলকাতায় একটা ফ্ল্যাটের খোঁজ করতে লাগলো। অতিকষ্টে সে খোঁজ পেল একটা ফ্ল্যাটের।

অমিত সুরঞ্জনকে বলেছিল ঃ তারপর হালদার বাগান লেনের এই বাড়ি।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেছিল ঃ খোকন কোথায় থাকে? মানে আপনার ছেলে?

ঃ ও বাবার কাছেই থাকে। আগরপাড়ায়। বাবা তাকে এক মুহূর্তের জন্যে কাছ-ছাড়া করেন না।

ঃ আপনার ওকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

: করে। মাঝে মাঝে যাই। দেখে আসি—

হঠাৎ অমিতের মুখটা শুকিয়ে যায়। বলে : তবে কি জানেন ?

সুরঞ্জন তাকায়।

অমিত বলে : আমার একটা কিছু না হলে শান্তি পাচ্ছি না।

: কেন ?

: রিণার রোজগারে আর কতোদিন বসে খাবো বলুন তো ? আর ভালো লাগছেনা। অনেক তো ঘুরলাম। কিন্তু কিছুই তো হলো না।

মিঠুয়া এসে অমিতকে বললো : আপনাকে ডাকছেন ?

দরজার বাইরে থেকে রিণার গলা শোনা গেল : তুমি এখানে আছো ?

অমিত বলে : হ্যাঁ। কেন ?

: চাবিটা রাখো। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

: কোথায় ?

: তোমার সব কথা জানার দরকার কি ? ঘণ্টাখানেক পরে আসছি। কেমন ?

: আচ্ছা।

ভারি মুশ্‌কিল হয়েছে মিঠুয়াকে নিয়ে।

দোকান-পাট মিঠুয়াই সারে। সুরঞ্জন সে-ভার তার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছে। আর দোকান-পাট করবার সময়ই বা কোথায় সুরঞ্জনের ?

কিন্তু মিঠুয়াকে দিয়ে আর যেন তা চলছে না।

তাকে দোকানদারেরা ইচ্ছেমতো ঠকিয়ে নিচ্ছে। ছয় পয়সার দেশলাই সাত পয়সা নিয়েছে। মাত্র কদিন আগে ঘটনাটা ঘটেছে।

সুরঞ্জন মিঠুয়াকে সেদিন বলেছিল : কেন নেবে ? ছ পয়সার দেশলাই সাত পয়সা চাইলো আর তুই অমনি দিয়ে এলি ? কেন দিলি ?

ঃ নইলে দেশলাই দেবে না যে !

ঃ দেবে না বললেই হলো।

দেশলাইটার পিঠে আঙুল দিয়ে সুরঞ্জন বললোঃ ছাখ্, কি লেখা আছে পড়ে ছাখ্।

মিঠুয়া পড়তে জানে না। সুরঞ্জনের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো।

ঃ লেখাপড়া না শিখলে এমনি তোকে সবাই ঠকিয়ে নেবে। ছয় পয়সার দেশলাই সাত পয়সা কেন, দশ পয়সা নেবে।

পরের দিনই সুরঞ্জন মিঠুয়ার জন্য শেলেট, পেন্সিল, একখানা বর্ণপরিচয়, একখানা ধারাপাত আর একখানা ওয়ার্ড বুক কিনে নিয়ে ফিরলো। বললোঃ রাখ্ এগুলো। কাল থেকে পড়বি।

বই-শেলেট হাতে নিয়ে মিঠুয়া সুরঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বাস্তবিকই সুরঞ্জন বেরিয়ে গেলে মিঠুয়ার আর কোন কাজ থাকে না। পড়ে পড়ে ঘুমোয়। না হয়, এ-ফ্ল্যাটের ও-ফ্ল্যাটের লোকেদের ফরমায়েশ খাটে।

ঃ এই বইগুলো পড়লে মানুষ হয়ে যাবি, বুঝলি ?

একটু থেমে সুরঞ্জন বলেছিলঃ আর ঘুমটা কমাতে হবে।

পরের দিন থেকে মিঠুয়ার লেখাপড়া শুরু হয়ে গেল।

মিঠুয়া বাংলাদেশের ছেলে নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাভাষা তার নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে গেছে। এখন তাকে দেখে কে বলবে যে বিহারের ছাপ্‌রা জেলায় তার জন্ম ?

মুলুকে সে বছর আকাল দেখা দিয়েছিল। না খেতে পেয়ে কতো লোক মরেছে। সুরঞ্জনের অফিসের দারোয়ান রামদেও তার দশবছরের ভাইপোকে মুলুক থেকে কলকাতায় নিয়ে এলো। মিঠুয়াকে সে কলকাতা দেখাতে নিয়ে আসে নি। তাকে বাঁচাবার জন্যে নিয়ে এসেছিল সে। তার বাপ-মা অনেক আগেই মারা গিয়েছিল। ছিল সামান্য বাস্তু-ভিটেটুকু আর বিঘে-কয় জমিন।

রামদেওর ভয় ছিল, জ্ঞাতিদের কেউ যদি ছেলেমানুষ পেয়ে তার ভাইপোকে ভুলিয়ে তার সম্পত্তিটুকু কিছু করে নেয়। বিশ্বাস নেই। কাউকে কিছু বলা যায় না। রামদেও নিজেও সাধু প্রকৃতির লোক ছিল না। ভাইপোর সম্পত্তিটুকুর ওপর তাঁরও দৃষ্টি ছিল লোলুপ।

সে তার ভাইপোকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে এলো। মিঠুয়াও কলকাতা শহরের নামে নেচে উঠলো। মিঠুয়া এখন রামদেওর হাতের মধ্যে। এখন আর মিঠুয়ার সম্পত্তি হাত-ছাড়া হয়ে যাবার কোন ভয় রামদেওর নেই।

তার আশা ছিল, মিঠুয়াকে কোথাও একটা কাজে ভিড়িয়ে দিয়ে তার মাইনের টাকাগুলোও সে হাতাবে। রামদেওকে দেখে কিন্তু এত সব বোঝা যেত না। এমনি সে রোজ ভোরে গঙ্গাস্নান করতো কপালে চন্দনের ছাপ এঁকে জোরে জোরে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে বাসায় ফিরে আসতো। রাতে রামদেও ভক্তিভরে তুলসীদাসী রামায়ণও পড়তো। বেশ শান্ত, নিশ্চিন্ত ভাব।

মিঠুয়া হুবেলা উন্নুন ধরাতো, রুটি বানাতো। আর রাস্তায় রাস্তায় দেখতো কলকাতা শহরকে!

রামদেও ভেবেছিল, সে মিঠুয়াকে হাতের মুঠোয় রেখেছে, তার আর ভা 'না কি! মিঠুয়ার সম্পত্তিও তার হাতের মুঠোয়। কিন্তু সে নিজে যে কার হাতের মুঠোয়, তা সে জানতো না। এবং জানতো না বলেই সে অত সহজে ধরা পড়ে গেল।

সেবার কলকাতায় প্রচণ্ড বসন্ত হলো। রামদেও ধরা পড়ে গেল। হাসপাতালে তাকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে আর ফিরলো না। হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে যখন তাকে অ্যাম্বুল্যান্স গাড়িতে তোলা হচ্ছিল, তখনই তার জ্ঞান ছিল না। মিঠুয়াও ছাড়া পেয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় থাকবে সে? কে খাওয়াবে তাকে? কি করে বাঁচবে সে? সে কলকাতা শহরকে চিনতো না। এখানে কেউ কারো জন্যে ভাবে না। কেউ কারো মুখের দিকে তাকায় না। সে ভেবেছিল, কলকাতা শহর তাকে ডেকে খাওয়াবে, সস্নেহে টেনে নেবে

তার বিপুল পক্ষপুটে। কিন্তু অল্প কয়েকদিন পরেই তার সে ভুল ভাঙলো।

অফিসের এক বাবুর কাছে সে জানালো তার দুদিন না খেয়ে থাকার কথা। বাবু কান দেন নি তার কথায়। অফিসের দরজায় এক পাশে বসে বসে সে কাঁদছিল। কয়েকটা বেয়ারার চোখ পড়লো তার ওপর। তারা চাঁদা তুলে তাকে খাওয়ালো। বাবুদের কাছে নিয়ে এলো তাকে। বাবুরা সব শুনে চাঁদা তুলে তাকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। মিঠুয়া কেঁদে বলেছিল, সেখানে গেলে না খেয়ে মরতে হবে তাকে।

তবে কে নেবে মিঠুয়ার দায়িত্ব ?

সবাই দুটাকা চাঁদা দিতে চায়। কিন্তু কাঁধে কোন দায়িত্ব নিতে চায় না। সুরঞ্জন বললো : ঠিক আছে। আমার কাছে ও থাকবে।

জগতে সুরঞ্জনের কেউ নেই, মিঠুয়ারও কেউ নেই।

সেই থেকে মিঠুয়া সুরঞ্জনের কাছে আছে।

এবার তাকে সুরঞ্জন লেখাপড়া ধরিয়েছে। একেবারে বর্ণপরিচয় থেকে।

মিঠুয়া ভারি চালাক ছেলে। এরই মধ্যে সে বেশ এগিয়েছে।

আকাশে মেঘ জমে সন্ধের দিকে বৃষ্টি নামলো। তেমন জোরে নয়, কিন্তু শীতকালের বৃষ্টি—বড়ো বিশ্রী। কন্‌কনে হাওয়া বইছিল। সুরঞ্জন উঠে জানলাটা বন্ধ করে দিল। জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে বাইরে অন্ধকার গলিটাকে একটা পিচ্ছিল সাপের মতো মনে হলো তার। এই অন্ধকার সাপটাই তো গিলছে এই গলির অসহায় মানুষগুলোকে। কি জানি, তাকেও গিলছে নাকি এই মানুষ-খেকো সাপটা। দিনে দিনে সেও যেন ক্রমাগত অসহায়ভাবে অন্য সব মানুষদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। মিশে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে সে।

সত্যি, গলিটা বড়ো অন্ধকার!

আজ সারারাত যদি বৃষ্টি হয় আর সকালে যদি না থামে, তাহলে ভারি কষ্ট হবে তার। ভোর চারটের সময় তাকে একবার দমদম এয়ারপোর্টে যেতে হবে। রাতের প্লেনেই একজন রাজনীতিবিদ্ কলকাতায় আসছেন। সেই উপলক্ষে সুরঞ্জনকে দমদম এয়ার পোর্টে উপস্থিত থাকতে হবে। ক্যামেরায় ছবি তুলতে হবে। কতকগুলি জরুরী প্রশ্নও আছে তাঁকে জিজ্ঞেস করবার। সেই ছবি সমেত রিপোর্ট কাগজের সামনের পাতায় বড়ো বড়ো হরপে ছাপা হবে! কম্পিটিশানের মার্কেট! যে কাগজ যতো ফলাও করে খরবটা দিতে পারবে, তারই জিত। সেই কাগজ তত বেশি 'সেল' হবে। হয়তো বাড়তি ইম্প্রেশানও দিতে হতে পারে।

সবই নির্ভর করছে তার ওপর। কিন্তু বৃষ্টি যদি না থামে, বড়ো কষ্ট হবে তার। বৃষ্টি যে থামবে, তার সম্ভাবনাই নেই। তবু যেতে হবে। মনে মনে প্রশ্নগুলো গুছিয়ে ঠিক করে নেয় সে। প্রশ্নগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মিঠুয়া খাবার আনতে এখনো যায় নি। ঘুমের মধ্যে সে শুনতে পায়, দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। কড়া-নাড়ার শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু সে শীতে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। তবু কড়া নড়ছে। সে মনে মনে বিরক্ত হয়। এ অসময়ে আবার কে এলো?

দরজা খুলে দিয়ে সুরঞ্জন বলে উঠলো : আসুন, আসুন—

যোগমায়া দেবী কোন কিছু না বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সুরঞ্জন হাসিমুখেই তাঁকে ঘরে এনে বসালো। কিন্তু মনে মনে সে ক্ষুণ্ণ হলো। এই অসময়ে তাঁর এইভাবে আসাটা কি ঠিক? যোগমায়া দেবী এই ক'মাসে একবারও তো আসেন নি তার ঘরে। আজ এই বৃষ্টি-ভেজা শীতের রাতে হঠাৎ কি মনে করে তিনি এসেছেন, কে জানে?

হাসি মুখে তিনি বললেন : কিছু মনে করো না বাবা, বৃষ্টি হচ্ছে দেখে একটু খিচুড়ি করেছি, খাবে একটু?

তখনি সুরঞ্জনের মুখে কোন কথা এলো না। সে কেমন শিশুর মতো যোগমায়া দেবীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

যোগমায়া দেবী বললেন : খিচুড়ি ভালো লাগে না, বোধ হয় ?

সুরঞ্জনের মুখে এবার কথা এলো। সে বললো : খুব ভালো লাগে। অনেকদিন আমি খিচুড়ি খাইনি।

এ বাড়িতে আসার পর থেকে একাধিকবার যোগমায়া দেবী খাবার পাঠিয়েছেন। অনিচ্ছায় হলেও সুরঞ্জনকে তা খেতে হয়েছে। কয়েক-বার ফেরৎ পাঠাতেও চেয়েছে। কিন্তু পাছে যোগমায়া দেবী কিছু মনে করেন, তাই সে ফেরৎ পাঠাতে পারে নি।

যোগমায়া দেবীর সংসার সচ্ছল তো নয়ই ; বলতে গেলে অসচ্ছলই। তা সে সেদিন হেরম্ববাবুর কথা থেকে বুঝে নিতে পেরেছে। তাঁর সংসারে কোন রকম চাপ পড়ুক, সুরঞ্জন তা চায় না।

: এই বৃষ্টিতে আর হোটেল থেকে খাবার আনাতে হবে না তোমাদের। তুমি আর মিঠুয়া এখানেই খেও। আমি ওদের দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

: আপনাদের ভারি কষ্ট দিচ্ছি আমি—

: ছেলেদের খাওয়াতে মায়েদের কষ্ট হয় কখনো ?

মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন যোগমায়া দেবী। মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন। পান খেয়েছেন তিনি। ঠোঁটে পানের দাগ লেগে আছে। পান-খাওয়া মুখটি তাঁর বড়ো করুণ, বড়ো বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ঘরের মধ্যে যোগমায়া দেবীর চোখের পাতা ভিজে উঠলো।

: আমার বড়ো ছেলে থাকলে তোমার মতোই বড়ো হয়ে উঠতো। তাহলে আমার কি আর ভাবনা থাকতো ? তাহলে কি এই বাড়িতে পড়ে থাকতাম এতদিন ?

কথাগুলো যেন সুরঞ্জন যোগমায়া দেবীর মুখ থেকে শুনলো না। যেন বৃষ্টির মুখে শুনলো, যেন হাওয়ার মুখে শুনলো।

চম্‌কে উঠলো সুরঞ্জন।

: আপনার বড়ো ছেলে নেই ?

ইতিমধ্যে সুরঞ্জনের মনে কথাটা কয়েকবার জেগেছিল। এতদিন সে এবাড়িতে এসেছে, কিন্তু তাকে তো কখনো দেখেনি সে। স্নেহাংশু না কি যেন তার নাম। উনিশ শ তিরিশ সালে যখন আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হয়েছিল সারা দেশে, তখন সেও আইন না মেনে এই পরাধীন দেশে জন্মেছিল। তার অন্নপ্রাশন বন্ধ করে দিয়েছিলেন যোগমায়া দেবী। বলেছিলেনঃ দেশের ছেলেরা রয়েছে জেলে। আর তুমি তোমার ছেলের অন্নপ্রাশন করবে, ঘটা করে লোক খাওয়াবে? মনে একটুও কষ্ট হচ্ছে না তোমার? ছি ছি। আমার ছেলে যেমন ছেলে ওরাও তো তেমনি ছেলে। ওদেরও তো বাপ-মা আছে। ওদের জন্যে ওদের বাপ-মায়ের কি বুক ফেটে যাচ্ছে না?

তারপর তাঁর সেই ছেলের কি হলো, কোথায় রয়েছে সে?—এ সমস্ত খবর সুরঞ্জনের জানা হয় নি। কয়েকবার মনে ও সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন উঁকি মেরেছে। কিন্তু অফিসের কাজে আর অমিত রায়-রিণা রায়ের কাহিনীর মধ্যে সে ডুবেছিল এতদিন। স্নেহাংশুর খবর আর নেওয়া হয় নি। সুরঞ্জন মনে মনে লজ্জিত হলো।

সে সমবেদনার সুরে বললোঃ সেইতো উনিশ শ তিরিশ সালে মানে আইন অমান্য আন্দোলনের বছরে সে হয়েছিল।

তখন যোগমায়া দেবীর দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল। গলাটা একেবারে বুজে গিয়েছিল তাঁর। সুরঞ্জনের কথায় তিনি শুধু মাথা নাড়লেন করুণ ভাবে।

তারপর ধীরে ধীরে তিনি বলে চললেন এক মর্মান্তিক কাহিনী।

সুরঞ্জন শুনলো।

ষোল বছরের হয়েছিল স্নেহাংশু। শহরের স্বদেশী সভায় ভর্তি হয়েছিল সে। সেখানে শিখতো নানা রকমের শরীর-চর্চা। অল্প দিনের মধ্যেই সে এক সুদর্শন শরীরের অধিকারী হয়ে উঠলো। সেই বছরই সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে রেজাল্ট্ আউট্ হয়েছে তার। এবার সে কলকাতায় আসবে। হিন্দু হোস্টেলে থাকবে আর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বে। সব ঠিকঠাক।

কদিন বাদেই সে কলকাতায় রওনা দেবে। তখন হেরম্ববাবু খুবই ব্যস্ত। কয়েক মাস আগে তিনি সবে জেল থেকে বেরিয়েছেন। গাঁয়ে গাঁয়ে তখন মিটিং করছেন। নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই তাঁর।

একদিন ফিরে এসে বললেন: স্নেহাংশুর কলকাতা যাওয়া এখন বন্ধ থাক।

সবাই আকাশ থেকে পড়লো। সব থেকে বেশি বিস্মিত হলো স্নেহাংশু। জিজ্ঞেস করলো: কেন বাবা?

: শিগ্‌গির কলকাতায় গোলমাল বাধতে পারে। এখন তোমার কলকাতা যাওয়া কিছুতেই ঠিক হবে না। কটা দিন যাক।

স্নেহাংশু বলেছিল: তাহলে প্রেসিডেন্সি কলেজে যে সিট্ পাবো না, বাবা।

হেরম্ববাবু বলেছিলেন: প্রেসিডেন্সিতে সিট্ না পাও, সিটি-বিদ্যাসাগর আছে। সিটের কথা ভাবতে হবে না তোমাকে।

স্নেহাংশুর কলকাতা যাওয়া আপাতত বন্ধ রইলো।

হেরম্ববাবুর অনুমানই ঠিক হলো। কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। উনিশ শো ছেচল্লিশের কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পূর্ব-বঙ্গের শহরগুলোও থম্ থম্ করছে কি জানি এক আশঙ্কায়। হেরম্ব-বাবুদের শহরের অবস্থাও সঙ্গীন্। হেরম্ববাবু আর শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শহরের রাস্তায় একটা শান্তি মিছিল বের করলেন। বহু লোক তাতে যোগ দিয়েছিল। এত বড়ো মিছিল শহরের কেউ কখনো দেখেনি। কিন্তু সেই মিছিল শেষে আক্রান্ত হলো। শহরের পথে দাঙ্গা বেধে গেল।

বাড়িতে সবাই হেরম্ববাবু সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন। কি হয়, কি হয়। এদিকে স্নেহাংশুকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কে নাকি তাকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে বিকেলে।

বাবার বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সে বাবাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু বাবার দেখা সে আর পায় নি।

এদিকে হেরম্ববাবু অতিকষ্টে বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়িতে ঢুকেই তিনি চাকর-বাকরকে ভালো করে গেট্ বন্ধ করে দিতে বললেন।

ততক্ষণে সারা বাড়িতে হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। স্নেহাংশু কাউকে কিছু না বলে কখন বেরিয়ে গেছে।

আর দেরি না করে হেরম্ববাবু আবার বেরিয়ে পড়লেন। শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল, হেরম্ববাবুর ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

না, স্নেহাংশুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

শহরে রাত্রি নামলো। সে এক ভয়ানক রাত্রি। সারারাত ধরে শহরের পথে-পথে উন্মত্ত পশুর উল্লাস-ধ্বনি শোনা গেল।

যোগমায়া দেবী বারে-বারে মূর্চ্ছা যাচ্ছেন। হেরম্ববাবু সারারাত ঘর-উঠোন আর দরজা করছেন। সে কাল রাত্রি যেন আর ভোর হয় না।

সকাল হলো। শহরে আবার কারফিউ। পুলিশ অফিসারকে অনেক বলা-কওয়া করে হেরম্ববাবু স্নেহাংশুকে খোঁজার ব্যবস্থা করলেন। নিজেই গেলেন পুলিশের গাড়িতে।

স্নেহাংশুকে পাওয়া গেল। শহরের বাইরে তার মৃতদেহ পড়েছিল একটা রাস্তার ধারে। সমস্ত শরীরে তার অনেকগুলি জখমের চিহ্ন।

হেরম্ববাবু মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশেরা ধরাধরি করে তাঁকে গাড়িতে নিয়ে বসালো। তারপর তারা স্নেহাংশুকে গাড়িতে তুলে আনলো।

স্নেহাংশু বাড়ি ফিরলো।

সে না ফিরে কি পারে? তার যে আর দু'দিন পরেই জন্মদিন। নতুন জামা-কাপড় কিনে আনিয়েছেন যোগমায়া দেবী। পরীক্ষায় পাশ করেছে বলে হেরম্ববাবু তাকে ঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন। যোগমায়া দেবী তাকে পরতে দেন নি। বলেছিলেন: জন্মদিনে পরবি, ছবি তুলবি। কেমন?

ছেলে মার কথা বড়ো শোনে। সেদিনও সে শুনেছিল।

জন্মদিনের যে আরো তু্দিন বাকি!

আজ একী হলো!

ঃ কেন আমি তাকে সেদিন পরতে দিই নি ও সব! সে যে পরতে চেয়েছিল।

বলতে বলতে যোগমায়া দেবী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। জ্ঞান ফিরলো যখন, তখন দেখতে পেলেন, স্নেহাংশুকে তার জন্মদিনের নতুন কাপড়, নতুন জামা পরানো হয়েছে।

যোগমায়া দেবী চিৎকার করে বললেনঃ ওরে তোরা ওর ঘড়ি আংটি সব পরিয়ে দে। কিছুই রাখিস্ না—

এবার আর জ্ঞান হারান নি তিনি। এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন ছেলের মুখের দিকে। তারপর ছেলের পাশে বসে তার মুখে চুমো খেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সেদিন রাতের দিকে যখন তাঁর জ্ঞান ফিরলো, তখন স্নেহাংশু চলে গেছে। তার আর কোন চিহ্ন নেই।

তারপর পূর্ববঙ্গ ছেড়ে তাঁরা চলে এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন স্নেহাংশুর ছ বছর বয়সের একখানা ছবি। তাই তাঁর শোবার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছেন। সে ষোল বছর আগেকার কথা। এই ষোল বছরে আর যোগমায়া দেবীর তু চোখে জল শুকোয় নি।

সুরঞ্জনের কাছে এ কাহিনী বলার মাঝে তিনি বারে বারেই চোখের জল মুছ্ছিলেন। গলা বুজে যাচ্ছিল বারে বারে।

মিঠুয়া কারো চোখের জল সহ্য করতে পারে না। সে কথার ফাঁকে কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

যোগমায়া দেবী বললেনঃ আমি তো কোন পাপ করি নি। দেশের ছেলেদের মুখের দিকে চেয়ে ওর অন্নপ্রাশন পর্যন্ত করতে দিই নি। তবে আমার এ শাস্তি হলো কেন?

সুরঞ্জন কি বলবে বুঝতে পারে না। সমস্ত কাহিনী তাকে একেবারে বিমূঢ় করে দিয়েছে। সে একটু চিন্তা করে বলেঃ এ

আপনার পাপ নয়। এ আমাদের সকলের পাপ। আমরা কেন এই যুগে জন্মেছি? এই যুগে জন্মে আমরা যে পাপ করেছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে আমাদের সবাইকে।

যোগমায়া দেবী কথাটা বুঝলেন কিনা বোঝা গেল না। তিনি সুরঞ্জনের মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইলেন।

ঃ থাকলে তোমার মতো হতো। বাপ-ব্যাটায় রোজগার করতো। তাহলে আমার কি এ দুর্দশা হতো?

একটু থামলেন তিনি। তারপর বললেনঃ মেয়েরা বড়ো হয়ে উঠলো। তাদের বিয়ে দিতে হবে। একটি পয়সার সঞ্চয় নেই। ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে। আজ যদি ওঁর কিছু হয়; ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কাল আমাকে পথে বসতে হবে।

ঃ এমন কথা মুখে আনাও আপনার উচিত নয়। তাই না?

ঃ বুঝি বাবা, কিন্তু ভাবতে গেলে সত্যি ভয় পেয়ে যাই।

বলে যোগমায়া দেবী হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো তাঁর।

বাইরে সমানে বৃষ্টি কেঁদে চলেছে, উত্তুরে বাতাস কেঁদে চলেছে।

যোগমায়া দেবী বললেনঃ তোমাকে যে দিন দেখেছি, সেদিন থেকেই ছেলেটার কথা আমার ভীষণ মনে পড়ছে।

সুরঞ্জন হেসে বলেঃ বেশ। আমাকেই তাহলে আপনার ছেলে বলে মনে করুন।

ঃ ছেলে বলে মনে করলেই কি তুমি আমার ছেলে হবে? অত সহজে যদি হতো—

মায়ের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে কেতকী ওপরে উঠে এলো। কিছু না বলেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

ঃ মা, খাওয়ার কথা বলতে এসে বসে গেলে। কতো রাত হলো, খেয়াল আছে? ওদিকে খিচুড়ি ঠাণ্ডা হয়ে জল হয়ে গেল।

লজ্জা পেয়ে যোগমায়া দেবী উঠে দাঁড়ালেন।

ঃ গ্যাখো, কথায় কথায় কতো রাত হয়ে গেছে।

কেতকীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বাচ্চুর খাওয়া হয়ে গেছে ?

কেতকী বলল ঃ হ্যাঁ। ওকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েই তো এলাম।

ঃ আমি যাবো, না তোরা ওপরে নিয়ে আসবি ?

কেতকী বললো ঃ তুমি বরং ওপরে আসন পাত, আমরা নিয়ে আসছি।

কেতকী বেরিয়ে যায়। একটু পরেই সে হাসতে হাসতে ঘরের ভেতর ফিরে আসে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে ঃ কি হলো ?

ঃ মা, দেখবে এসো—

যোগমায়া দেবীর একটা হাত ধরে টানতে টানতে তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল সে।

যোগমায়া দেবীও ফিরে এলেন। মুখে হাসি।

ঃ রঞ্জন, দেখবে চলো—

সুরঞ্জনকে তিনি 'রঞ্জন' বলে ডাকেন।

সুরঞ্জনও বেরিয়ে গেল।

দেখলো, একটা কোণে গায়ে কম্বল জড়িয়ে শ্রীমান্ মিঠুয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমুচ্ছে। ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে দেয়ালে মাথাটা ঠোক্কর খেল। অমনি ঘুম ছুটে গেল তার। চোখ মেলে তাকাতেই সে সুরঞ্জন যোগমায়া দেবী আর কেতকীকে দেখতে পায়। লজ্জা পেয়ে সে ঘুম-চোখে এখানে ওখানে ঠোক্কর খেতে খেতে ঘরের ভেতর ছুটে আসে।

ঃ তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করে ঘুমোস্ রে, মিঠুয়া ?

সুরঞ্জনের কথায় সবাই হেসে উঠলো।

তারপর মিঠুয়া আসন পাতলো। কেতকী আর করবী নিচ থেকে খিচুড়ির থালা নিয়ে এলো। যোগমায়া দেবী বসে বসে সুরঞ্জন আর মিঠুয়ার খাওয়া দেখতে লাগলেন।

ঃ খিচুড়ি খেতে ও আমার খুব ভালোবাসতো।

ওদের খাওয়ার মাঝখানে যোগমায়া দেবী কথাটা বলে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

সুরঞ্জনের কেবলই মনে হয়, সে যেন অন্যের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ করছে। যে সম্পত্তি তার নয়, সেই সম্পত্তিতেই সে খুঁজছে তার এক বহু-বিস্মৃত পরিচয়।

মাঝরাতে সেদিন আবার দরজায় মৃদু টোকা শোনা গেল।

যোগমায়া দেবীর মুখে তাঁর এক মর্মান্তিক ক্ষতির কাহিনী শুনতে শুনতে রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল সেদিন। এত রাতে খেয়ে ঘুমুতে যাবার সময় ঘড়িতে সুরঞ্জনকে ঠিক এলার্ম দিয়ে রাখতে হয়েছে। ভোর সাড়ে তিনটেয় তাকে উঠতে হবে। যেতে হবে দমদম এয়ার-পোর্টে।

চোখে সবে ঘুম এসেছে। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস আর একঘেয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এখন শুধু লেপমুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমোনো।

কে এলো এখন? এখন কি কাকেও বিরক্ত করা উচিত?

মনে মনে সুরঞ্জন ভীষণ বিরক্ত হলো।

ক্ষুণ্ণ মনে সে তার বিছানার স্বরচিত উত্তাপ থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিয়ে দরজার দিকে এগুলো।

আবার দরজায় টোকা। যদিও মৃদু, কিন্তু দ্রুত।

একটু ভয় পেল সুরঞ্জন। এতরাতে এই কানাগলির অন্ধকার বাড়িতে কে এভাবে তার কাছে আসতে পারে? আর কেনই বা আসবে? কি প্রয়োজন তার সঙ্গে?

তবে কি যোগমায়া দেবীর মেজো মেয়ে যূথিকা? যার মাথার ঠিক নেই? সারা দেহে যার এক বন্য উচ্ছৃঙ্খলতা? সে কি তাহলে তার সেই উচ্ছৃঙ্খল শরীরের বন্যতা নিয়ে এই রাতে ঘুমুতে পারছে না? কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে সে এতরাতে দরজায় টোকা মেরে চলেছে? কিংবা এ গলির অন্ধকার বাইরে ভয় পেয়ে ভেতরে আসবার জন্যে পথ খুঁজছে এই রাতে?

আঁধারে সুরঞ্জন নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো। কান দুটোর শ্রবণশক্তি যেন বহুগুণ বেড়ে গেছে। এরপর সে শুনতে পাবে একটা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হাসি। কিন্তু এখন সেই হাসি কেন? দরজার বাইরে একটা ছুঁচ্ পড়লেও সে তার শব্দ অনায়াসে শুনতে পাবে।

আবার দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ!

ধীরে ধীরে সুইচ্‌টা টিপলো সে। তারপর ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগুলো। দরজা খুলে সে যাকে দেখতে পেল, তাকে সে এখানে এসময়ে জীবনেও কল্পনা করতে পারে নি।

মিসেস্ অঞ্জলি মজুমদারের সঙ্গে তার মাত্র এক দিনের আলাপ। সেদিন মিঃ মজুমদার মানে অবিনাশবাবু ওপরে এসেছিলেন ঘড়ির সময় জিজ্ঞেস করতে।

ঃ আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে বলতে পারেন? আমার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। কাল দম দেবার দিন ছিল। একেবারে ভুলে গেছি।

সুরঞ্জন ঘড়ি দেখে বলেছিল ঃ এখন ন'টা চল্লিশ—

ঃ এ্যাঁ? কি বললেন?

ঃ ন'টা চল্লিশ।

তাঁর পেছনে পেছনে মিসেস্ অঞ্জলি মজুমদারও ওপরে উঠে এসেছিলেন। তিনি হেসে বলেছিলেন ঃ একটু জোরে বলুন। উনি কানে একটু কম শোনেন।

এর আগে কয়েকবার সুরঞ্জনের দেখা হয়েছে অবিনাশবাবুর সঙ্গে। কথাবার্তাও হয়েছে। কিন্তু কথাবার্তায় ও চোখের চাহনিতে অবিনাশবাবুকে যেন একটু অস্বাভাবিক মনে হয়েছে সুরঞ্জনের। তিনি যে কানে কম শোনেন, সে কথা বুঝতে না পারলেও তাঁর আচার-আচরণ যেন একটু অন্য রকমের, তা সুরঞ্জনের বুঝতে ভুল হয় নি।

সুরঞ্জন চেঁচিয়ে বলেছিল ঃ ন'টা একচল্লিশ এখন।

ঠোঁট ওলটালেন অবিনাশবাবু। তিনি কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না।

হেসে কুটিকুটি হলেন অঞ্জলি দেবী। হাসলে তাঁকে এখনো, এই বয়সেও ভারি সুন্দর দেখায়। নিটোল গালে দুটি চমৎকার টোল পড়ে। লাল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সাদা ও নিখুঁত দাঁতগুলি উঁকি মারে। চোখের কোণে বুঝি বিদ্যুতের স্পর্শ। 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল'। না না, রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত পংক্তিটি কি এঁর প্রাপ্য। নিশ্চয়ই নয়। তবে উর্বশীর বয়েস কতো ছিল? তার তো কোন বয়েস ছিল না। তবে মিসেস্ অঞ্জলি মজুমদারেরও বয়েস নেই।

কেউ বলবে তিরিশ, কেউ বলবে চব্বিশ। কিন্তু সুরঞ্জনের মনে হয় আরও কম। কুড়ি কি বাইশ!

সকাল দশটায়ও তাঁর ঠোঁটে লিপ্‌স্টিক্, চোখে কাজল। পরনে শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ্-করা স্লিভ্-লেস্ ব্লাউস্। নিটোল বাহুবল্লরী যেন ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

সমস্ত শরীরেই যৌবনের সুডৌল আয়োজন। সেই অঞ্জলি দেবী আজ এত রাতে একা নিঃশব্দে তার ঘরে টোকা দেবে, সুরঞ্জন কখনো কি তা ভাবতে পেরেছিল?

সেদিন অঞ্জলি দেবী বলেছিলেন: কিছু মনে করবেন না। আপনার কি এখন কোন তাড়া আছে?

সুরঞ্জন জানিয়েছিল, আপাতত তার কোন তাড়া নেই।

ঃ তাহলে আসুন না আমাদের ফ্ল্যাটে একটিবার। আপনি তো আমাদের সাম্‌নের ফ্ল্যাটে প্রায়ই আড্ডা মারেন।

কথাটা বলেই অঞ্জলি দেবী সুরঞ্জনের মুখের দিকে একটু আড়-চোখে তাকালেন। যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হলো সুরঞ্জন।

কথাটা শুধ্‌রে নিয়ে অঞ্জলি দেবী বললেন: মানে গল্প করে থাকেন আর কি? আপত্তি আছে দরিদ্রের পর্ণ-কুটিরে পদার্পণ করতে?

এর পর কোন ভদ্রলোকই না গিয়ে পারেন না। সুরঞ্জনও পারলো না।

বললো : চলুন, আপনাদের ফ্ল্যাটে আজ তবে যাই—

সামনে অঞ্জলি দেবী, পেছনে অবিনাশবাবু, এবং তাঁর পেছনে সুরঞ্জন ঢুক্‌লো তাঁদের নিচের অন্ধকার ভ্যাপ্‌সা-গন্ধভরা ফ্ল্যাট্‌টাতে।

সমস্ত ঘরময় নানা জিনিসপত্র ছড়ানো। দামী দামী জিনিসপত্র যত্নের অভাবে একেবারে নষ্ট হতে চলেছে। স্টীলের আল্‌মারি, খাঁটি বেল্‌জিয়াম গ্লাসের ড্রেসিং টেবিল, নক্সাকরা বার্মিস্ উডের ভারি খাট, হাতির দাঁতের ওপর কারুকাজ করা ফ্লাওয়ার বাস্কেট্।

সবই মূল্যবান, কিন্তু সবখানেই একটা অযত্ন, একটা হতশ্রী ভাব! তুপাশে তুটো বাঘ-মুখ হাতল-দেওয়া একটা প্রকাণ্ড চেয়ার। বার্নিশ উঠে গেছে। কিন্তু বাঘ তুটো এখনো ঠিক হাঁ করে আছে।

চেয়ারটা দেখিয়ে অঞ্জলি দেবী বললেন : বসুন মহারাজ, আমি বরং হিটারে এইটু চায়ের জল চাপাই।

সুরঞ্জনের ঐ চেয়ারে বসতে লজ্জা করছিল। কিন্তু না বসে উপায় ছিল না। কারণ ঘরের মধ্যে বসবার দ্বিতীয় কোন চেয়ার ছিল না।

সুরঞ্জন বসলো। বসে অস্বস্তি বোধ করছিল সে। এতবড় চেয়ারের একটা কোণই যেন তার পক্ষে যথেষ্ট।

: কিন্তু আপনাকে একবার উঠে ঘড়িটায় দম দিয়ে টাইম্‌টা ঠিক করে দিতে হবে। বাই দি বাই, আপনার কারেক্ট টাইম তো? অঞ্জলি দেবী কথাটা বলে একটু হাসলেন। সুরঞ্জন কিন্তু হাসতে পারলো না। সে একমুহূর্ত কি ভাবলো। বলল কারেক্ট!

সুরঞ্জন উঠে দাঁড়ালো। চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে ঘড়িটার সামনে রাখলো। চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল।

এ কী!

হাত দিতে তার হাত সরছিল না!

ঘড়িতে মিনিটের কাঁটা নেই। ঘণ্টার কাঁটারও অর্ধেকটা নেই। নিচের পেণ্ডুলামের কেস্‌টার কাচও নেই এক টুক্‌রো। ফোক্‌লা মুখে মানুষের জিভের মতো পেণ্ডুলামটা নিষ্প্রাণভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

ভয়ে ভয়ে ঘড়িতে দম দিল সুরঞ্জন। কিন্তু সে টাইম্ ঠিক করবে কি করে? তবু অতিকষ্টে হাতের ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে সে ভাঙা ভোঁতা ঘণ্টার কাঁটাটাকে সরিয়ে দিয়ে নেমে এলো। জিজ্ঞেস করলো: এর এ দুরবস্থা কেন?

হেসে উঠলেন অঞ্জলি দেবী। হাসি নয়, সেই তড়িৎ-স্পর্শ।

: এই ঘড়িতেই আমাদের আসল পরিচয়।

: তার মানে?

: ভাঙা শরীর। আর চলছে না।

অবিনাশবাবু বিছানায় শুয়ে একটা পায়ের ওপর আরেকটা পা তুলে দিয়ে ওপরের কড়ি-কাঠগুলোর সংখ্যা নির্ণয় করছেন। অঞ্জলি দেবী বললেন: তাই বলে ওটা যা-তা ঘড়ি মনে করবেন না। খোদ সুইজারল্যাণ্ড থেকে আমার শ্বশুর মশাই এটা কিনে এনেছিলেন।

: তাই নাকি?

: কেন বিশ্বাস হয় না?

একটু থেমে অঞ্জলি দেবী বললেন: অবিশ্যি, বিশ্বাস হওয়ার কথাও নয়। রংপুর জেলার এক বিখ্যাত জমিদারের ছেলে আর তার বউ যে এখানে থাকে, তা কে বিশ্বাস করবে? এই দেখুন, আমার শ্বশুর মশায়ের ছবি—

দেয়ালে একটি রঙীন তৈলচিত্র। তাতে এক সুপুরুষ বলিষ্ঠ-দেহী প্রৌঢ়ের পূর্ণ প্রতিকৃতি। মাথায় উষ্ণীষ, কোমরে তরবারি, গায়ে মূল্যবান আচ্‌কান।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে: ইনি আপনার শ্বশুর মশাই?

: হ্যাঁ।

হিটারের প্লাক্‌টা অফ্ করে দিয়ে অঞ্জলি দেবী চা-তৈরীতে মন দিলেন। কি ভেবে হঠাৎ বললেন: বহুদিন আগে নাকি রাজা রামমোহন রায় আমার শ্বশুর বাড়িতে এসেছিলেন। আমার শ্বশুর মশায়ের বাবা ছোটবেলায় তাঁকে দেখেছিলেন।

: সত্যি?

ঃ বিশ্বাস হচ্ছেনা তো ? আমার শ্বশুর মশায় যখন বেঁচেছিলেন, তখন তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমাদের বাড়ি গবর্ণর যেতেন। বিরাট্ হল ঘরে খানাপিনা, নাচগান চলতো।

অঞ্জলি দেবী চা তৈরী করছিলেন। সুরঞ্জন তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়েছিল। সে যে শুধু অঞ্জলি দেবীর অপূর্ব দেহ-লাবণ্যই দেখছিল, তাই নয়। সে শুনছিল তাঁদের অতীত গৌরবের কীর্ত্তি-কাহিনী।

চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে অঞ্জলি দেবী অবিনাশবাবুকে দেখিয়ে বললেন ঃ এঁরা তো দু ভাই। আমার ভাশুর সাদার্ণ এভিন্যুতে বিরাট্ বাড়ি তৈরী করে আছেন। আর ইনি হালদার বাগান লেনের এই ড্যাম্প-লাগা স্যাত্‌সেঁতে বাড়ির কড়ি কাঠ গুন্‌ছেন।

বলে হাসলেন অঞ্জলি দেবী।

ঃ কিন্তু আপনারা রয়েছেন কেন এখানে ?

সুরঞ্জন প্রশ্ন করে।

ঃ তাহলে কোথায় যাবো বলুন ?

ঃ কেন ? বাড়ি বানিয়ে সেখানে চলে যান। আপনাদের তো অভাব কিছু নেই !

হতাশভাবে অঞ্জলি দেবী বললেন ঃ সে কথা এঁকে কে বোঝাবে বলুন ! ব্যাঙ্কে ছ অঙ্কের টাকা আছে। বাড়ি করে দিব্যি সুখে থাকা যায়। কিন্তু উনি করবেন না। এখানে থেকে ওঁর স্বাস্থ্য কি হয়েছে, দেখছেন ? কে বলবেন, ওঁর বয়েস আটত্রিশ বছর ?

ঃ আটত্রিশ বছর ?

চামড়ার ঢাক্‌না-দেওয়া কিছু সংখ্যক হাড়, কোটরাগত চোখ, বধির কান, মাথায় পাকা চুল। এঁর বয়স আটত্রিশ বছর ?

অঞ্জলি দেবী বললেন ঃ সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল এঁর। দিনরাত শুধু বই পড়তেন। দেশী-বিদেশী কতো বই যে ওঁকে পড়তে দেখেছি, তার হিসেব নেই। বছর দশেক আগে এখানে ওঁর একবার টাইফয়েড্ হলো। তখন তিনি বছর পাঁচেক এখানে এসেছেন। তাতে শরীরটা

ওঁর সেই যে ভেঙে গেল আর সারলো না। আমি কতো করে বললাম, ডাক্তার ডাকি। উনি ডাক্তার ডাকতে দিলেন না। যখন জ্ঞান নেই তখন ডাকলাম। উনি সেরে উঠলেন। কিন্তু দেখা গেল, চোখ আর কানের শক্তি কমে গেছে। মাথার চুল হুড়মুড় করে পেকে উঠলো। যেন আটাত্তর বছরের বুড়ো। এখন আর বই পড়তে পারেন না।

বলে অঞ্জলি দেবী ঘরের কোণে স্ট্যাক্-করা একরাশ বই দেখালেন। বললেন ঃ ও বইগুলো হলো ওঁর প্রাণ।

সুরঞ্জন দেখলো, সে বইএর গাদায় অ্যারিস্টট্ল্ থেকে টলস্টয় পর্যন্ত—কেউ বাদ পড়েন নি। সবাই রয়েছেন।

সুরঞ্জন চায়ের কাপটা খালি করে বললো ঃ এখনো সময় আছে। ট্রিট্মেন্ট্ করান। ভালো হয়ে যেতে পারেন। এখন তো মেডিক্যাল্ সায়েন্সের খুব উন্নতি হয়েছে।

হাত থেকে চায়ের কাপটা ধরে নিতে নিতে অঞ্জলি দেবী বললেন ঃ একবার বুঝিয়ে বলুন না ওঁকে। যদি রাজি করাতে পারেন—

সুরঞ্জন বললো ঃ আপনার কথায় উনি রাজি হন নি, আমার কথায় রাজি হবেন ?

ঃ আমাকে যে উনি দুচোখে দেখতে পারেন না।

ঃ সে কি ?

ঃ সে কথা পরে বলবো আপনাকে।

অঞ্জলি দেবী অবিনাশবাবুর কানের কাছে মুখ এনে জোরে বললেন ঃ তোমাকে উনি কি বলছেন, শোন—

অবিনাশবাবু উঠে বসলেন।

ঃ বলছেন ? আমাকে ?

সত্যি, অবিনাশবাবুর জন্যে সুরঞ্জনের ভারি কষ্ট হলো। আটত্রিশ বছর বয়েসে যাঁর অটুট যৌবন থাকার কথা, তিনি বার্ধক্যের ভারে জরাগ্রস্ত! এও কি সম্ভব!

সুরঞ্জনের দিকে অবিনাশবাবু তাঁর কানটা এগিয়ে ধরেন।

সুরঞ্জন জোরে জোরে বলে : আপনি এখানে আছেন কেন?

অবিনাশবাবু বললেন : তাহলে যাবো কোথায়?

: কেন? বাড়ি বানান্। সেখানে ভালোভাবে থাকুন গিয়ে—

অবিনাশবাবু হাসলেন।

: এই তো বেশ আছি—

: বেশ আর কোথায়?

একটু থেমে অবিনাশবাবু বললেন : কে ও সব করবে বলুন তো? ও সব করে দেবার জন্যে কাকেই বা বিশ্বাস করে টাকা পয়সা দেব? যাকে দেব, সে টাকা মেরে দিয়ে দুদিনে হাওয়া হয়ে যাবে। তখন রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে আমাকে। তার চেয়ে এই ভালো আছি। আমি কারো খবর রাখি না, কেউ আমার খবর রাখে না।

সুরঞ্জন বুঝলো, অবিনাশবাবু বর্তমান সমাজের বিশ্বাসহীনতার দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন। সমাজে আজ বিশ্বাসের স্থান নেই। কাকেও বিশ্বাস করা যায় না। মানুষ মানুষকে প্রতারণা করবার জন্যে সব সময়ে সুযোগের সন্ধান করছে। অনেক দেখে শুনে সুরঞ্জনও এ বিষয়ে একমত। মাঝে মাঝে সেও সমাজের প্রতি বিশ্বাসহীন হয়ে ওঠে। হয়তো সমাজের সবাই মন্দ নয়, সবাই প্রতারক নেই। আঁধারের পাশাপাশি আলোও আছে। কিন্তু সেই আলো এত ক্ষীণ, এত দুর্বল যে, আঁধারের কাছে সে অতি সহজেই পরাজিত হয়। আজ অন্ধকার তার ঘন কালো ডানা মেলে সমাজের সবটুকু আলো গ্রাস করে ফেলেছে। কোথাও আজ আলো নেই।

কিন্তু তাহলে মানুষ বাঁচবে কি নিয়ে? কিসের আশায় বুক বেঁধে আবার আগামী কালের জন্যে মানুষ বেঁচে থাকবে?

এ বিষয়ে সুরঞ্জন অবিনাশবাবুকে আর প্রশ্ন করতে চাইলো না। সে এবার প্রশ্ন করলো : বেশ, তা না হয় মানলাম। কিন্তু ডাক্তার দেখাতে আপনার আপত্তি কেন?

: ডাক্তার? কেন? কি করবে?

ঃ আপনার একটু ট্রিট্‌মেন্ট্‌ করতো। আপনাকে সারিয়ে তুলতো। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে সুস্থভাবে বাঁচা চাই তো?

একটু হাসলেন অবিনাশবাবু। অঞ্জলি দেবীকে দেখিয়ে বললেন

ঃ উনি বলেছেন বুঝি?

সুরঞ্জন একবার অঞ্জলি দেবীর দিকে তাকালো।

অবিনাশবাবু বলে চললেন ঃ দেখুন, আমাদের পূর্বপুরুষ জমিদার ছিলেন। জমিদারদের দাপটের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। কতো নিরপরাধের শাস্তি দিয়েছেন তাঁরা। কতো প্রজা তাঁদের অত্যাচারে চোখের জল ফেলেছে। সে সব কোথায় যাবে? তাঁরা যে পাপ করেছেন, আমাদের তার ফল ভোগ করতেই হবে। জমিদারী গেছে। কিন্তু আপনাকে আমি বলে রাখছি, আমরা কেউ বাঁচবো না। আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপের জন্যে আমাদের সবাইকে একে একে মরতে হবে। কেউ থাকবে না এ পরিবারের। এ রক্ত বড়ো খারাপ। কেউ থাকলে সে আবার অত্যাচারী হয়ে উঠবে।

কথা বলতে বলতে অবিনাশবাবু হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এবার গলার স্বরটা খাটো করে বললেন ঃ কেউ বাঁচাতে পারবে না আমাদের। ডাক্তারের সাধ্য নেই আমাদের বাঁচায়—

অবিনাশবাবু বিছানায় শুয়ে পড়লেন। একটা পায়ের ওপর আরেকটা পা তুলে দিয়ে চোখ বুজে রইলেন।

ঘরের মধ্যে কারো কোন কথা নেই। শুধু সেই বীভৎস ঘড়িটা ঠক্‌ ঠক্‌ করে একটা ভয়ানক নিষ্ঠুর শব্দ তুলে চলেছে।

ঘড়ির সেই নির্মম শব্দে তখন বেজে চলেছে ঃ ডাক্তারের সাধ্য নেই আমাদের বাঁচায়।

তখন অঞ্জলি দেবী বলেছিলেন ঃ শুনলেন তো?

করুণ চোখে সুরঞ্জন অঞ্জলি দেবীর মুখের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস রেখে ঘর থেকে সেদিন বেরিয়ে এসেছিল।

রংপুর জেলার সেই বিখ্যাত জমিদার-পত্নী, যাঁর রূপের কোন তুলনা নেই, তিনি যে এই বর্ষণ-মুখর শীতের রাতে সুরঞ্জনের ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে টোকা দেবেন, একথা সুরঞ্জন কেন, কেউ কি আগে কখনো ভাবতে পেরেছিল ?

সুরঞ্জনের চোখে তখনো ঘুমের নেশা লেগে আছে। সে তার চোখ দুটোকে কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। এ কোনো একটা অবাস্তব স্বপ্নের মায়া নয় তো ?

বিহ্বলের মতো চোখ দুটো কচ্‌লে নেয় সুরঞ্জন।

অঞ্জলি দেবীর সারা গায়ে বর্ষাতি জড়ানো।

ঃ এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। কিন্তু তাছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

ঃ কেন ? কি হয়েছে বলুন তো ?

সুরঞ্জন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

অঞ্জলি দেবী বলেন ঃ সে কথা পরে শুনবেন। এখন আপনাকে একবার আমার সঙ্গে বেরুতে হবে।

ঃ এত রাতে ? এই বৃষ্টির মধ্যে ?

ঃ তা নইলে তো আমি একাই চলে যেতে পারতাম।

ঃ কিন্তু কোথায় যেতে হবে, বলুন তো ?

ঃ প্লীজ্‌। এখন আর কোন প্রশ্ন নয়। যেতে যেতে ট্যাক্সিতে সব শুনবেন। আর দেরি করবেন না।

হালদার বাগান লেনের এই বাড়ির কাহিনীর এ কোন্‌ পাতায় সে এসে পড়লো ? কিছুই বুঝতে পারছিল না সে। অঞ্জলি দেবীও তাঁকে বুঝে ওঠার সময় দিলেন না। এক আশ্চর্য রহস্যময় কাহিনীর পাতায় তিনি তাকে জোর করে টেনে নিয়ে চলেছেন। এর পরিণাম কি, তা তার জানা নেই। তবু এক গৃহস্থ ঘরের সুন্দরী বধূকে এই দুর্যোগময় রাতে তার ফ্ল্যাট্‌ থেকে কোন এক অজানা স্থানের উদ্দেশে

নিয়ে যাবার প্রস্তাবে তার সমস্ত বিবেক যেন একসঙ্গে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যাদু ছিল অঞ্জলি দেবীর রূপে এবং তাঁর কথায়। মুহূর্তের মধ্যে সুরঞ্জনের সমস্ত বিবেক-বুদ্ধি যেন অসাড় হয়ে গেল।

সে মিঠুয়াকে জাগিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে বলে ক্যামেরা, নোটবুক সঙ্গে নিয়ে গায়ে বর্ষাতি জড়িয়ে অঞ্জলি দেবীর সঙ্গে নিচে নেমে গেল।

তখন নিচে দুপাশের দুটো ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ ছিল। কেবল অন্ধকার জেগে বসে অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দিচ্ছিল সারা বাড়িটাতে। বাইরে পিনের ছুঁচোলো ডগার মতো ঠাণ্ডা উত্তুরে বাতাস। ছুরির ফলার মতো ধারালো বৃষ্টি!

বড়ো রাস্তায় পড়ে অঞ্জলি দেবী বললেনঃ আপাতত শ্যাম-বাজারের মোড়। ওখানে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।

দুজনে শ্যামবাজারের মোড়ের দিকে এগুতে থাকে। রাস্তায় একটিও মানুষ নেই। দেশবন্ধু পার্কের সামনে গোটা দুই রিকৃশা ঘেরা-টোপ ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে একনিষ্ঠ ভাবে ভিজছে। খাঁ খাঁ করছে দেশবন্ধু পার্ক। আকাশের রং ঘোলাটে লাল।

অঞ্জলি দেবী বললেনঃ অত দূরে-দূরে হাঁটছেন কেন? কাছে সরে আসুন না—

সুরঞ্জন পরিচয় ও সম্পর্কের দূরত্বকে যথারীতি সম্মান করে দূরে দূরে হাঁটতে থাকে। অঞ্জলি দেবী তার কাছে সরে এসে পাশাপাশি হেঁটে চলেন।

কিছুক্ষণ সেইভাবে হাঁটার পর সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেঃ কই, বললেন না তো, কোথায় চলেছেন?

হাসলেন অঞ্জলি দেবী।

ঃ ধরুন, আপনার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছি কোথাও—

সুরঞ্জনও হাসলো। প্রশ্ন করলোঃ কারণ?

ঃ এখানে সুখ পেলাম না। যদি কোথাও সুখ পাই—

ঃ সুখ কি দোকানে কিনতে পাওয়া যায়?

ঃ তা পাওয়া যায় না। কিন্তু কোথাও তো পাওয়া যায়?

সুরঞ্জন চুপ করলো।

অঞ্জলি দেবী হাসলেন। বললেনঃ থামলেন কেন? আরো কিছু প্রশ্ন করার থাকে, প্রশ্ন করুন।

ঃ এখন দয়া করে বলুন তো, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

ঃ জাহান্নামে—

বড়ো হেঁয়ালি হচ্ছে। ঠিক করে বলুন—

ঃ বললাম তো। আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না?

একটু থামলেন অঞ্জলি দেবী। তারপর গলা চড়িয়ে বললেনঃ কেন পড়ে থাকবো এখানে? এতদিন তো পড়েছিলাম। কি পেয়েছি?

সত্যিই তো। রুগ্ন, অবাধ্য স্বামী। বিরুদ্ধ পরিবেশ। ওখানে অঞ্জলি দেবী কিছুই পাবেন না। শুধু মৃত্যুর প্রতিশ্রুতি ছাড়া। কিন্তু যে পথে আজ তিনি চলেছেন, সেখানেও তো মৃত্যু। এক জায়গায় মরার জন্যে মৃত্যু, আর এক জায়গায় বাঁচার জন্যে মৃত্যু। তফাৎ আছে বৈকি!

তবু কাজটা কি ভালো করলো সে? সুরঞ্জনের সারা মন এক-সঙ্গে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।

সে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। শপথ করলো, আর একপা-ও সে এগুবে না।

অঞ্জলি দেবী জিজ্ঞেস করলেনঃ কি হলো? দাঁড়িয়ে রইলেন যে? আসুন—

সুরঞ্জন কিছু বললো না। তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।

অঞ্জলি দেবী প্রশ্ন করলেনঃ দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আসুন?

সুরঞ্জন বললোঃ আমি যাবো না।

ঃ কেন?

ঃ আপনার কথা যদি বিশ্বাস করতে বলেন, তাহলে আমি যাবো না। তবে যেতেও পারি, যদি আপনি আপনার কথা অবিশ্বাস করতে বলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলি দেবীর মুখের চেহারা বদলে গেল।

ঃ আসুন—

সুরঞ্জনের হাত ধরে অঞ্জলি দেবী টান দিলেন। সুরঞ্জন আর প্রতিবাদ করতে পারলো না। কেমন আচ্ছন্নের মতো সে চলতে লাগলো।

কিছুদূর গিয়ে অঞ্জলি দেবী হেসে উঠলেন। বললেনঃ এসে ভালোই করলেন। না এলে কি করতাম জানেন?

ঃ কি করতেন?

ঃ রাস্তার মাঝখানে চেঁচিয়ে উঠতাম। আপনাকে বিপদে ফেলতাম।

ঃ সে কি?

ঃ রংপুরের এক জমিদারবাড়ির বউকে আপনি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন, পাব্‌লিক আপনাকে ক্ষমা করতো না।

সুরঞ্জন হাসলো। বললোঃ বিশেষ করে, তিনি যখন কম-বয়েসী এবং অপূর্ব সুন্দরী।

ঃ দেখুন, সাম্‌না-সাম্‌নি প্রশস্তিটা নিন্দের মতো শোনায়।

ঃ বেশ। তবে চুপ করলাম। কিন্তু আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরি?

ঃ আপাতত শ্যামবাজার মোড়।

দুজনে হেসে উঠলেন। অকাল বৃষ্টিতে সেই হাসি কেমন কান্নার মতো মিশে গেল।

কথায় কথায় তারা শ্যামবাজার মোড়ে এসে পড়লো। ট্যাক্সিতে উঠে অঞ্জলি দেবী বললেনঃ বালিগঞ্জ—

কিছু সময় নিঃশব্দে কাটলো। বিশাল অজগরের মতো বর্ষণ-পিচ্ছিল পথের কিছুটা পেছনে ফেলে ট্যাক্সি বেশ কিছুদূর চলে এসেছে। আর শ্যামবাজার দেখা যায় না।

অঞ্জলি দেবী সুরঞ্জনের একখানা হাত তাঁর হাতে তুলে নিয়ে বললেনঃ খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, না? বুঝেছি, জীবনে কোন

মেয়েমানুষের স্পর্শ পান নি। এই ভালো। আপনি সত্যিই ভালো। এই ভেজালের দিনে এ রকম একটি খাঁটি সোনা পাওয়া সত্যি ভাগ্য। যে মেয়েমানুষ আপনাকে পাবে, তার ভাগ্যকে আমি ঈর্ষা করি।

স্বরঞ্জন বুকে ভরসা পেল।

ঃ এবার বলুন তো, বালিগঞ্জের কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?

ঃ আমার বাবা বালিগঞ্জের লেক গার্ডেন্‌সে বাড়ি করেছেন। ঝগড়া করে সেখানে যাবো বলে বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু সেখানে যাবো না।

ঃ তবে কোথায় ?

হাতটাকে জোরে চেপে ধরে অঞ্জলি দেবী বললেন ঃ কথা দিন, কাকেও বলবেন না।

ঃ বলবো না। আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।

ঃ বলবেন না তো ?

ঃ না।

ঃ ডোভার লেনে।

স্বরঞ্জনের কাছে লেক গার্ডেন্‌স্ যা, ডোভার লেনও তাই। কিছু পার্থক্য নেই।

ট্যাক্সি সি. আই. টি. রোড ধরে দক্ষিণ মুখে ছুটে চলেছে। শেষ প্রহরের নিস্তব্ধ পথ বারে বারে চম্‌কে উঠছে ট্যাক্সির চাকার ঘর্ষণে।

স্বরঞ্জন ভাবে, এই কলকাতা শহর, তার এই পথ, পথের দু'ধারে অসংখ্য বাড়ির গোপন অন্তঃপুরে নিত্য কতো কাহিনীই রচিত হয়ে চলেছে। উপন্যাসের কতো নায়ক নায়িকা সেখানে রোজ নতুন নতুন কাহিনী রচনা করে চলেছে। স্বরঞ্জন তাদের সম্বন্ধে কতোটুকুই বা জানে ? নিত্যকারের সেই জীবন্ত উপাখ্যানের পাতায় কতোটুকু সে প্রবেশ করতে পেরেছে ?

এই অন্ধকারে, এই পিচ্ছিল অন্ধকারে সবাই ঘুরে ঘুরে মরছে। কেউ বা সেই আঁধারের সঙ্গী পেয়েছে, কেউ বা পায় নি। সবাই সেই

আঁধারে মাথা কুট্‌ছে বাইরে যাবার জন্যে। এই মৃত্যু থেকে কি কেউ বাঁচবে না ?

সুরঞ্জন মনে মনে বলে : এ ভাবে কেউ ভাবছে না, বাঁচার জন্যে কেউ চেষ্টা করছে না, আলোয় যাবার জন্যে কেউ কাঁদছে না। সে-ই শুধু একা-একা কেঁদে মরছে। সবাই চলেছে এক অন্ধকার থেকে সূচীভেদ্য আরেক অন্ধকারে। সবাই রচনা করে চলেছে এক আঁধারের পদাবলী। এই আধার থেকে কি মুক্তি নেই ?

ডোভার লেনে ট্যাক্সিটা ঢুকলো। সিংহী পার্কের শ্বেত পাথরে-তৈরী নগ্ন মূর্তিগুলোও অন্ধকারে আজ বুঝি ডুবে গেছে। অন্ধকারে তারাও বুঝি জীবন্ত হয়ে উঠেছে! হয়তো এই শহর কলকাতার পথে পথে তারাও অঞ্জলি দেবীর মতো উত্তম বেশবাসে কি জানি কিসের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে।

অঞ্জলি দেবী হাতে চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন যে! কি ভাবছেন, বলুন তো ?

: কিছুই না!

সুরঞ্জনের ভাবনার কোন কূলকিনারা কি পাবেন অঞ্জলি দেবী ? পাবেন না। বরং উল্‌টে পাগল বলে তাকে উপহাস করবেন।

অঞ্জলি দেবী বললেন : আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব খুঁজে পাচ্ছি না। আজকের দিনটার জন্যে চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। এখানে আজ রাতে আসতেই হবে আমাকে। বাবার বাড়িতে সন্ধের দিকে চলে এলে কোন অসুবিধেই হতো না। সন্ধে থেকে এমন বৃষ্টি সুরু হলো উনি বেরুতেই দিলেন না। রাতে ঝগড়া বাধিয়ে দিলাম। কিছুই না। আমি বললাম ওর পি. জি.-তে ট্রিট্‌মেণ্ট করানো চাই। উনি করবেন না। আমি বললাম, তাহলে আমি বাপের বাড়ি চললাম। উনি ভাবলেন, ওঁর জন্যে আমার ভালোবাসার অন্ত নেই। কিন্তু আমি তো জানি, আমার মন কোথায় পড়ে আছে।

সুরঞ্জন হেসে বললো : সে কি এই ডোভার লেনে ?

: থামো, থামো—

বলে চেঁচিয়ে উঠলেন অঞ্জলি দেবী।

ট্যাক্সিটা একটু এগিয়ে গিয়েছিল। অঞ্জলি দেবী একটু ব্যাক্ করে নেবার জন্যে ড্রাইভারকে বললেন। ড্রাইভার ট্যাক্সিটাকে পিছিয়ে এনে একটা বিশাল বাড়ির সাম্‌নে দাঁড় করালো। অঞ্জলি দেবী তাঁর ব্যাগ থেকে দশ টাকার একখানা নোট বের করে ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বললেন ঃ ওঁকে শ্যামবাজারে ফেরৎ নিয়ে যাবে, কেমন? বোধ হয়, ওতেই হবে।

সুরঞ্জনের হাতে একটু চাপ দিয়ে বললেন ঃ কিছু মনে করবেন না, আপনাকে একা ফিরিয়ে দিচ্ছি বলে। আর যা বললাম, তা কিন্তু আপনার আর আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। থাকবে তো?

ঃ থাকবে।

অঞ্জলি দেবী নেমে গেলেন।

কিন্তু এ বাড়িটা যে সুরঞ্জন চেনে। এটা যে নিশিকান্ত হাজরার বাড়ি। বহুবার তাকে এখানে আসতে হয়েছে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে। দেশের বিখ্যাত রাজনীতিক নিশিকান্ত হাজরাকে কে না চেনে? বেকার সমস্যা, খাদ্য সমস্যা থেকে আরম্ভ করে দেশের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে এখানে সারাদিন কতো আলোচনা চলে। দেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে সুরঞ্জনকে এখানে কতোবার আসতে হয়েছে। সে সব বিষয়ে নিশিকান্তবাবুর মূল্যবান মতামত খবরের কাগজের পাতায় যথাযথ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে।

সুরঞ্জন চেয়ে দেখলো, ওপরে আলো জ্বলছে। দোতলার বারান্দার সাম্‌নে একটা দরজাও খোলা।

অঞ্জলি দেবীকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে দুটি ভারি চটির শব্দ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। ট্যাক্সিটাকে একটু এগিয়ে নিয়ে ফিরিয়ে আনতে হলো। সেই বাড়ির সাম্‌নে দিয়ে ফিরে যাবার সময় সুরঞ্জন দেখলো, খোলা দরজায় আলো এসে পড়েছে। অঞ্জলি দেবী বর্ষাতি খুলে ভেতরে ঢুকছেন। তাঁর পেছনে নিশিকান্ত বাবু।

ট্যাক্সি ফিরে চললো।

মনে পড়লো, আজ সন্ধে ছটার সময় নিশিকান্তবাবুর ওখানেই তো একটা 'প্রেস কন্‌ফারেন্স'। ওখানেই তো আজ দিল্লীর রাজনীতিক মহোদয় সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হবেন।

সুরঞ্জনকে আবার বিকেলে ডোভার লেনে আসতে হবে।

ট্যাক্সিতে ফেরার পথে সে চেয়ে দেখলো, পুব আকাশে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। ড্রাইভারকে সে বললো : একেবারে দমদম এয়ার পোর্ট—

বেলার দিকে রোদ্দুর উঠলো।

সেদিন সন্ধেয় সুরঞ্জন ডোভার লেনে নিশিকান্ত হাজরার বাড়িতে দিল্লীর রাজনীতিক মহাশয়ের প্রেস কন্‌ফারেন্সে গেল। তার প্রশ্ন-গুলো সে যথারীতি রাজনীতিক মহোদয়ের সাম্‌নে রেখেছিল। উত্তর গুলোও নোটবুকে টুকে এনেছিল। সেগুলো পরের দিনের কাগজে বড়ো বড়ো হরপে ছাপা হয়েছিল।

প্রেস কন্‌ফারেন্সের পর সাংবাদিকদের একটু চায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন নিশিকান্তবাবু। সুরঞ্জন দেখলো, চা পরিবেশন করছেন অঞ্জলি দেবী। সুরঞ্জনের টেবিলেও তিনি চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়ে গেল্লেন। আশ্চর্য, তখন অঞ্জলি দেবী সুরঞ্জনকে যেন চিনতেই পারলেন না।

সুরঞ্জন ভালো করে তাকালো অঞ্জলি দেবীর চোখে। না, সে চোখ থেকে একটু হাসির কণাও ঝরে পড়লো না। ইনি যেন অঞ্জলি দেবী নন। যেন অন্য কেউ।

সেদিন রাতে গায়ে জ্বর নিয়ে সুরঞ্জন বাড়ি ফিরলো। জ্বর যে খুব বেশি ছিল, তা নয়। তবে সারা গায়ে ভীষণ ব্যথা। ব্যথায় প্রতিটি হাড় যেন টন্‌ টন্‌ করছিল তার।

মিঠুয়া হোটেল থেকে খাবার এনে তার অপেক্ষায় বসে রয়েছিল। ঘুম-চোখে সে তার পড়া তৈরী করছিল। সুরঞ্জন চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

মিঠুয়া জিজ্ঞেস করলো : দাদাবাবু, আজ পড়া ধরবে না ?

: না রে। আজ থাক, কাল ধরবো।

লেপটা গায়ের ওপর টানতে টানতে সুরঞ্জন বললো।

একটু থেমে মিঠুয়া বললো : খাবে না আজ ?

: না। শরীরটা ভালো নেই রে। তুই খেয়ে নে—

মিঠুয়া কোনদিন একা খায় নি। দাদাবাবু যতক্ষণ না ফেরে সে ততক্ষণ দাদাবাবুর পথ চেয়ে বসে থাকে। খিদে পেলেও, ঘুম পেলেও সে না খেয়ে বসে থাকে। আজ তার একা খেতে মন চাইলো না।

মিঠুয়ার মনে আবার একটা ভয় উঁকি মারতে আরম্ভ করেছে। তার কাকা রাম দেও-ও এমনি একদিন জ্বর-গায়ে বাসায় ফিরে এসেছিল। তারপর সেই-যে জ্বরে পড়লো, আর উঠলো না। দুদিন বাদেই তার গায়ে গুটি দেখা দিয়েছিল। ঘর-পোড়া গোরুর মতো সে সুরঞ্জনের জ্বর দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে আজকাল পাকা সংসারী লোকের মতো ভালোর চেয়ে মন্দের কথাটাই আগে ভেবে বসে।

বই-পত্র তুলে রাখলো সে। তারপর কাছে এসে সে সুরঞ্জনের মাথায় হাত দেয়।

: একি দাদাবাবু, তোমার কপাল যে পুড়ে যাচ্ছে !

মিঠুয়ার মনে পড়ে, প্রথম দিনে তার কাকার মাথাও এমনি জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল।

: কপালটা একটু টিপে দেব, দাদাবাবু ?

: না। থাক্—

মিঠুয়া সুরঞ্জনের কথা শুনলো না। সে কিছুক্ষণ তার মাথা টিপে দিয়ে তবে ছাড়লো। তারপর জিজ্ঞেস করলো : কিছু খাবে না, দাদাবাবু ?

: না।

রাত অনেক হয়ে গেছে। বাইরে ঠাণ্ডা পড়েছে খুব। দোকান-পাট আজ একটু সকাল-সকাল বন্ধ হয়ে গেছে।

তবু মিঠুয়া পয়সা নিয়ে বেরুলো। তার দাদাবাবু তাকে কিছু বলে নি। দাদাবাবুকেও সে আর কিছু বলে নি। অনেক ঘুরে খানিকটা দুধ সংগ্রহ করলো সে। বাসায় ফিরে সে সুরঞ্জনকে দুধটুকু খাওয়ালো। সুরঞ্জন জ্বর এবং ঘুমের ঘোরে দুধটুকু খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

সকাল হলো।

রাতে জ্বর বেড়েছিল, এখন সুরঞ্জনের মনে পড়লো। মিঠুয়া কখন খেয়েছে, কি করেছে, সে জানে না। জ্বর এখনও আছে। মনে হচ্ছে, আবার বাড়বে। আজ এ অবস্থায় অফিস যাওয়া হয়ে উঠবে না।

খবর পেয়ে যোগমায়া দেবী এলেন, কেতকী এলো। করবী পরীক্ষার পড়া তৈরী করছে, সে এলো না। যূথিকাও আসে নি। বোধহয় তাকে ওরা আসতে দেয় নি।

যোগমায়া দেবী বললেন ঃ আমাকে একবার বলবে তো বাবা। রাতে খেলে কি খেলে না, আমি কিছুই জানলাম না।

সুরঞ্জন হেসে বললো ঃ মিঠুয়া তো দুধ খাইয়েছে।

ঃ কিন্তু জ্বর যদি বাড়তো কাল রাতে ?

সুরঞ্জন বললো ঃ কাল রাতে বেড়েছিল তো—

যোগমায়া দেবী একটু রাগ করলেন যেন। নিচ থেকে দুধ-সাগু তৈরী করে এনে খাইয়ে গেলেন। বলে গেলেন ঃ দুপুরেও দুধ-সাগু খাবে। আমি পাঠিয়ে দেব। আর যদি কিছু দরকার হয়, মিঠুয়া গিয়ে নিয়ে আসবে। কেমন ?

একটু বাদে অঞ্জলি দেবী এলেন। তিনি এই মাত্র ফিরেছেন। মিঠুয়ার মুখে সুরঞ্জনের অসুখের কথা শুনে ওপরে উঠে এলেন।

ঃ একি ! একদিনেই জ্বরে পড়ে গেলেন ? না, আপনাকে দিয়ে কোন কাজই চলে না।

সুরঞ্জন বাধা দিয়ে বললো ঃ না না, একদিনেই নয়। অনেকদিন থেকেই শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না।

মিঠুয়া কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে সে অঞ্জলি দেবীর দিকে একবার তাকিয়ে নেয়। সে মনে মনে ভাবে, এঁর জন্যেই তো তার দাদাবাবুর অসুখ করেছে। কাল রাতে এত ঝড়-জলের মধ্যে দাদাবাবুকে ইনিই নিয়ে গেলেন। কি এমন জরুরী কাজ ছিল? সকালে গেলেও কি চলতো না?

মিঠুয়া অঞ্জলি দেবীর ওপর যে মোটেই সুপ্রসন্ন নয়, তা তার মুখ দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

মিঠুয়া বেরিয়ে গেলে অঞ্জলি দেবী বললেন ঃ কাল আপনাকে আমারই জন্যে ভিজতে হয়েছে। হয়তো অসুখটা সেই জন্যেই। আমার যে কী খারাপ লাগছে!

সুরঞ্জনের দু কানের ভেতর দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। ভীষণ জ্বলছে চোখ দুটো। তাকাতে পারছে না সে।

ঃ অঞ্জলি দেবী, কিছু ভাববেন না সেজন্যে। আমার সেজন্যে অসুখ করে নি। কয়েক দিন থেকেই ভালো ছিলাম না। এমনি একটু জ্বর করেছে। কালই সেরে উঠবো।

কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলেন অঞ্জলি দেবী। তিনি আর কিছুই বলতে পারলেন না।

সুরঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে রইলো। অঞ্জলি দেবীর মুখেও কোন কথা নেই।

সুরঞ্জন অনেকক্ষণ ধরে একটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছিল। শেষে কথাটা বলেই ফেললো।

ঃ অঞ্জলি দেবী, কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি—

অঞ্জলি দেবী একটু নড়ে বসলেন।

ঃ বলুন, কি কথা—

ঃ প্রেস কন্‌ফারেন্সে আমিও ছিলাম।

ঃ জানি।

ঃ আমাকে আপনি দেখেছিলেন ?

ঃ দেখেছিলাম।

ঃ চিনতে পেরেছিলেন ?

ঃ পেরেছিলাম।

ঃ তবু কথা বললেন না কেন ?

উত্তরে অঞ্জলি দেবী এমন কাহিনী শোনালেন, যা সত্যিই অবিশ্বাস্য। যা কখনো কেউ বিশ্বাস করতে পারেন না, এমন কথাই সুরঞ্জন শুনেছিল অঞ্জলি দেবীর মুখ থেকে।

বালিগঞ্জ প্লেসেই অঞ্জলি দেবীর বাপের বাড়ি। আগে ছিল মৈমন সিং জেলায়। তবে দেশ-বিভাগের অনেক আগেই তাঁরা কলকাতায় বাড়ি তৈরী করেছিলেন। কলকাতায় বাড়ি তৈরী করানোর উদ্দেশ্য ছিল, কখনো কোন উপলক্ষে কলকাতায় বেড়াতে এসে ইচ্ছে-মতো থাকা। জমিদারীর কর্মচারীরাও কলকাতায় এসে থাকার ব্যাপারে বড়ো অসুবিধেয় পড়তো। অঞ্জলি দেবীর বাবা তাই বালিগঞ্জ প্লেসে জায়গা কিনে বাড়ি বানালেন।

দেশ-বিভাগের পর অঞ্জলি দেবীর বাপের বাড়ির সবাই স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্যে ওখানে চলে আসেন। আগে ছিল জমিদারী। চলতেন সবাই আমিরী চালে। এখন চলবে কি করে ?

অঞ্জলি দেবী বললেন ঃ

বাবা খুব চালাক লোক। ব্যবসায় নেমে পড়লেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, লোহার ব্যবসা করবেন। কিন্তু পরে নিশিকান্ত-বাবুর পরামর্শে তিনি 'মাইকা'র ব্যবসা সুরু করলেন।

বহুদিন থেকেই বাবার বাড়িতে নিশিকান্তবাবুর যাতায়াত। বাবা তো প্রথমে কথাটা শুনে বললেন ঃ লোহার ব্যবসার যদিও বা কিছু জানি, মাইকার ব্যবসার কিছুই তো জানি না।

নিশিকান্তবাবু বললেন ঃ কিছুই জানতে হবে না। সব ছেড়ে দিন আমার হাতে। ছ মাসের মধ্যেই দেখবেন, আপনাকে কি করে

দিয়েছি। এখন আমাদের 'ফরেন্ এক্স্‌চেঞ্জ' বাড়াতে হবে, বুঝলেন? সে যে-কোন প্রকারেই হোক। ব্যবসার ভেতর দিয়ে দেশের কাজ করা যায়, তার একটা আদর্শ নজির আমি রেখে দেব।

বাবা মাইকার ব্যবসাই সুরু করলেন। ব্যবসায় প্রচুর লাভ হলো। ক বছরে লাভের টাকায় বাবা দু দুটো ফ্যাক্টরী কিনেছেন আর হয়েছেন তিনটে ফার্মের ম্যানেজিং এজেণ্ট। এখন ব্যবসায়ী মহলে বাবার খুব নাম।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো: আপনার বাবার নাম কি বলুন তো?

অঞ্জলি দেবী তাঁর বাবার নাম বললেন।

: তাই নাকি?

: কেন? আপনি বাবাকে চেনেন নাকি?

: না। তাঁর নামকে চিনি। কিছুদিন আগে তাঁর বরানগরের ফ্যাক্টরীতে স্ট্রাইক্ হয়েছিল, না? কি একটা গোলমালও হয়েছিল। আমি সেই রিপোর্ট ছেপেছিলাম।

: ও, আচ্ছা—

তারপর অঞ্জলি দেবী বলে চললেন: বাবার বাড়িতে নিশিকান্ত-বাবুর যাওয়া-আসা আরো ঘন ঘন হতে লাগলো। এখন সেখানে নিশিকান্তবাবুর অন্য রকম কদর।

ইতিমধ্যে আমরাও এসে এই এঁদো গলিতে উঠেছিলাম। এখানে তো আমি একনাগাড়ে বেশি দিন থাকতে পারি না। আমার একেবারে দম বন্ধ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে বাবার বাড়িতে গিয়ে থাকতাম। সেইখানে নিশিকান্তবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি আমার মধ্যে যে কি দেখলেন, জানি না। বাবার বাড়িতে এলেই আমার কথা আগে জিজ্ঞেস করতেন। দেশের এতবড় একজন গণ্যমান্য লোক। নিজের বলতে কেউ নেই। দিনের পর দিন আমার খোঁজ নিচ্ছেন, প্রশংসা করছেন প্রতিটি কাজের। কেমন লাগে, বলুন তো? আগে আগে আমি এড়িয়ে চলতাম। কিন্তু বাপের বাড়ির যিনি সম্মানিত অতিথি, আর আমারও যখন মাঝে

মাঝে বাপের বাড়ি না গিয়ে উপায় নেই, তখন কতোদিন আর তাঁকে এভাবে এড়িয়ে চলা যায় ?

আমাকে দেখলেই নিশিকান্তবাবু বলতেন : আমার দেশের মেয়েরা যদি সবাই তোমার মতো হয়, তাহলে দেশের চেহারা অন্য রকম হয়ে যাবে।

আচ্ছা বলুন তো, এমন কথা শুনলে কার না লজ্জা হয় ? আমি লজ্জায় মরে যেতাম। কিছুদিন বাদে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আচ্ছা, তুমি কি কর ?

আমি বললাম : কিছুই করি না। শুধু শ্যামবাজার আর বালিগঞ্জ করি। শুনে তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন : দেখো, আমার কেউ নেই। কিন্তু আমার দেশ আছে, দেশের কাজ আছে। তুমি আমাকে দেশের কাজে কিছুটা সাহায্য করতে পারো ?

প্রথমে আমি কিছুই ভাবি নি। বলেছিলাম : কি সাহায্য করতে পারি, বলুন ? আমি আপনাকে কতোটুকুই বা সাহায্য করতে পারবো ? তিনি বললেন : যতটুকু করবে, তাই দেশ মাথা পেতে গ্রহণ করবে। ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে।

অঞ্জলি দেবী একটু থামলেন।

বললেন : আমাকে নিশিকান্তবাবুর সব সময় দরকার হয় না। যখন প্রেস কন্‌ফারেন্স হয় বা কোন গেস্ট্‌ আসেন, তখন আমাকে ডাকেন।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে : মিঃ মজুমদার মানে অবিনাশবাবু জানেন এ সব ?

: না। আমি এখনো ওঁকে এ সব কথা জানতে দিই নি। উনি জানেন, আমি বাপের বাড়ি যাচ্ছি। তবে ভেবেছি, একদিন ওঁকে জানিয়ে দেব।

ত্বজনেই নীরব।

সুরঞ্জন দেখলো, অঞ্জলি দেবী তার প্রশ্নের জবাব এক নিপুণ ভঙ্গিতে এড়িয়ে গেছেন। সে তাই বললো : আমি কিন্তু আমার

কথার জবাব পাই নি। আপনি আমাকে প্রেস কন্‌ফারেন্সে চিনতে পারলেন, তবু কথা বললেন না। কি ব্যাপার, বলুন তো?

অঞ্জলি দেবী হয়তো ভেবেছিলেন, সুরঞ্জন প্রশ্নটা আর তুলবে না, হয় তো ভুলে গেছে। ঘুরে ফিরে সে যে প্রশ্নটা আবার তুলবে, তা তিনি বোধ হয় ভাবেন নি। তাই তিনি কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন। তারপর সলজ্জভাবে বললেনঃ আমি কারো সঙ্গে বেশি মেলামেশা করি, তা নিশিকান্তবাবু চান না। বলেন, এটা ট্রেড্‌ সিক্রেট্‌। কাল রাতে যে আমি আপনার সঙ্গে গেছি, ওটাও উনি পছন্দ করতে পারেন নি, তা তাঁর কথা শুনে বুঝতে পারলাম।

সুরঞ্জনের আর কথা বলতে ভালো লাগছিল না। এবার কিছুক্ষণ বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকতে পারলে যেন তার মাথাটা অনেক-খানি হাল্‌কা হবে।

সুরঞ্জন চোখ বুজে শুয়েছিল। অঞ্জলি দেবীও নিঃশব্দে অনেকক্ষণ বসেছিলেন। তারি ফাঁকে কখন সুরঞ্জন ঘুমিয়ে পড়ে, অঞ্জলি দেবীও উঠে চলে যান।

ঘুম যখন তার ভাঙলো, তখন সে দেখে, কেতকী তাকে ডাকছেঃ দাদা, উঠুন, মাথাটা ধুইয়ে দিয়ে যাই—

সুরঞ্জন চোখ মেলে তাকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে। কেতকী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। কি ভেবে সে একটু নিচু হলো। একটা হাত বাড়ালো সুরঞ্জনের কপালের দিকে। তারপর হাতটা ফিরিয়ে নিল। যেন চুরি করছে সে। সাহসে ভর করে এবার সে হাতটা রাখলো তার কপালে।

ঃ ইস্‌। খুব জ্বর এসেছে দেখ্‌ছি—

কেতকী এবার আর হাতটা টেনে নিল না। কপালের দু পাশের রগ্‌-দুটো চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো সেঃ থার্মোমিটার দিয়ে জ্বরটা একটু দেখবো?

এমন দরদ-ঢালা মিষ্টি গলা সুরঞ্জন জীবনেও শোনে নি। কথাটা বলতে কেতকীর গলাটা একটু কেঁপে উঠেছিল যেন। তাতে কথাটা আরো যেন গানের মতো বেজে উঠেছিল। সুরঞ্জনের চোখের কোণ-দুটোয় জ্বালা ধরে গেল। আরো জোরে দপ্ দপ্ করে উঠলো তার কপালের রগ্-দুটো। কেতকীর হাতের আঙুলগুলো তার কপালে কেমন একটু যেন শিথিল হয়ে এলো। সুরঞ্জন হাত দিয়ে তার কপালের ওপর কেতকীর হাতটা আরো জোরে চেপে ধরলো।

কেতকীর হাতে সুরঞ্জনের কপালের শিরা-দুটো জ্বরের প্রদাহ রেখে চলেছে। সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

সুরঞ্জন আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কেতকী ডাকলো ঃ দাদা—

এই ডাক কতোদিন সুরঞ্জন শোনে নি। গলার এই স্বর কতো-দিন আগে হারিয়ে গেছে। সুরঞ্জনের আজ আর সে সব কথা মনেও পড়ে না।

সংবাদ-সংগ্রহ তার পেশা। সকলের কথা সে মন দিয়ে শোনে। সকলের কথায় সে সংবাদ খোঁজে। গ্রহণীয় সংবাদ কিছু থাকলে সে তা গ্রহণ করে, আর কাগজের পাতায় তা সযত্নে প্রকাশ করে। কিন্তু রিপোর্টারের খবর কেউ রাখে না, কেউ শোনে না, কেউ শুনতে চায় না। তা হয়তো খবর নয়। তাতে কারোর তাই কোন উৎসাহ থাকে না। সেও কাউকে শোনায় না তার জীবনের সেই দুঃখ-ম্লান, যন্ত্রণা-বিদ্ধ দিনগুলির কথা। সে এতদিন তার জীবনের গোপন খবর এক কঠিন দরজার শাসনে আড়াল করে রেখেছিল। কখনো সেই দরজায় কেউ ঘা দেয় নি। তা এতকাল তাই খোলেও নি। দিনের পর দিন তাতে মরচে জমেছে, আরো কঠিন হয়ে গেছে তার শাসন।

আজ জ্বরের দাপটে সেই দরজাটা যেন হঠাৎ কেঁপে উঠলো। কেতকীর ডাকে ঘা পড়লো সেই দুয়ারে। দরজাটা ঈষৎ খুলে গেল।

ঃ কেতকী, শোনো—

কেতকীর হাতটা ধরে সুরঞ্জন টান দিল। কেতকী বুঝি বা একটু ভয় পেয়ে গেল। বুকের ভেতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠলো তার।

বিছানার পাশে ছোট্ট টুলটায় কেতকী বসলো।

ঃ কেতকী—

ঃ উঁ—

ঃ রূপনারাণ নামটি কেমন বলো তো?

ঃ সুন্দর।

ঃ সে একটা নদীর নাম।

ঃ জানি।

ঃ তার তীরেই আমাদের গ্রাম—বিরামপুর। সেইখানেই আমি জন্মেছিলাম। বাবার কথা মনে পড়ে না। ইস্কুল মাস্টারী করতেন তিনি। গ্রাম থেকে অনেক দূরে ছিল তাঁর ইস্কুল। মাঝে মাঝে বাড়ি আসতেন, আমাদের দেখে যেতেন। বাড়িতে থাকতাম আমি, মা আর আমার একটি বোন। কণিকা—কণা তার নাম। আমি আর কণা গাঁয়ের ইস্কুলে পড়তাম। সে বছর আমি উঠলাম থার্ড ক্লাসে, কণা ফেল্ করলো। সালটা মনে আছে—বিয়াল্লিশ সাল। আগষ্ট আন্দোলন হয়েছিল ঐ বছরেই। ঐ বছরেই বাবা মারা গেলেন। বাবা কিছুই রেখে যান নি। ছোট্ট একখানা ভাঙা বাড়ি আর সততা ছাড়া তিনি আমাদের কিছুই দিয়ে যান নি।

যুদ্ধ চলছিল তখন ইতিহাসে। বিরামপুরে কোন যুদ্ধ ছিল না। তেতাল্লিশ সালে বিরামপুরে যুদ্ধ এলো।

কেতকী জিজ্ঞস করলোঃ আপনার এত কথা মনে আছে?

ঃ কেন থাকবে না?

ঃ না; এত সাল তারিখ—

চোখ মেলে তাকালো সুরঞ্জন।

ঃ মনে হচ্ছে ইতিহাসের কথা। তাই না? হ্যাঁ, এ এক দুঃখের ইতিহাসের কথা।

তারপর সে চোখ বুজে বলে চলে : জানো কেতকী, সে বছর সারা দেশে দুর্ভিক্ষ এলো। খেতে পাচ্ছে না মানুষ। দেশে যত খাবার ছিল, সব কোথায় উবে গেল। আমরাও খেতে পাচ্ছি না। মা রোজ রোজ কোথায় পাবে অত খাবার? মার গয়না বেশি কিছু ছিল না। যা ছিল, তা পেটে গেল। দিন আর চলে না।

সেদিন সকালে মা যেটুকু খাবার আমাকে দিয়েছিল, তাতে একটা পাখিরও পেট ভরে না। তার বেশি মা পাবেই বা কোথায়? আমি জোর করে কণার খাবারটাও কেড়ে খেলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম—

: কোথায়?

কেতকী জিজ্ঞেস করলো।

: কোথায় আবার? রাস্তায়—

একটু থেমে সে আবার বলে চলে : ইস্টিশানে একদিন ঘুরলাম। কিছুই হলো না। তারপর ট্রেণে চড়ে বসলাম। হ্যাঁ, বিনা-টিকিটেই—

কেতকীর দিকে তাকালো সুরঞ্জন।

: একটু জল দেবে, কেতকী?

কেতকী কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে সুরঞ্জনকে দিল। জল খেয়ে সুরঞ্জন বলে : হাওড়া স্টেশনে গার্ড্ সাহেব ধরলো। হাতে পায়ে ধরলাম, কান্নাকাটি করলাম। কিছুই হলো না। কিছুতেই গার্ড্ সাহেবের মন ভিজলো না। তখন সবারই কেমন একটা মরীয়া ভাব! যে যা পায়! আমার কাছে চার আনা পয়সা ছিল, গার্ড সাহেব তাই নিয়ে পকেটে পুরে আমার সাম্‌নে গেট্ খুলে দিল।

একটু থামলো সুরঞ্জন।

: গেট্ খুলে দিল। কলকাতায় আসার গেট্ খুলে গেল। আর আমার সাম্‌নে না খেয়ে মরবার গেট্ও খুলে গেল। চার আনা পয়সা যা ছিল, তাও গেল গার্ডের পকেটে। আমি পেটে খিদে নিয়ে হাওড়ার ব্রীজ পেরিয়ে হ্যারিসান রোড ধরে হাঁটতে লাগলাম। শুনেছিলাম,

কলকাতার বাতাসে টাকা ওড়ে, খাবার পাওয়া যায়। আমি ঐ তেরো-চৌদ্দ বছর বয়েসে টাকা ধরতে কলকাতায় আসি নি, খাবার কুড়োতে এসেছিলাম।

কেতকী সুরঞ্জনের কপালে হাত রাখলো। বললোঃ দাদা, আজ থাক্। অন্য দিন শুনবো ও সব কথা। চলুন, মাথাটা ধুইয়ে দিই আপনার। জ্বর একটু বেড়েছে মনে হচ্ছে।

সুরঞ্জন কেতকীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। অতিকষ্টে মাথা সোজা করে উঠে বসলো। বললোঃ মিঠুয়া কোথায় ?

ঃ মা ওকে একটু কোথায় পাঠিয়েছে।

ঃ ও—

সুরঞ্জন উঠবার চেষ্টা করলো। কেতকী তার একটা হাত ধরেছে। পাছে সুরঞ্জন মাথা ঘুরে পড়ে যায়।

ঃ না না ; তুমি ছেড়ে দাও। আমি একাই যেতে পারবো।

কেতকী বাথরুমে সুরঞ্জনের মাথা ধুইয়ে চুলগুলো বড়ো যত্নে মুছিয়ে দিল। সুরঞ্জন আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো ! কেতকী নিচ থেকে দুধ-সাগুর বাটিটা নিয়ে ফিরে এলো।

সুরঞ্জন বললোঃ জ্বরটা কি বাড়ছে, কেতকী ? থার্মোমিটারটা দাও তো—

কেতকী পারা ঝেড়ে থার্মোমিটার দিল। টেম্পারেচার দেখে রেখে দিল।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলাঃ কতো দেখলে ?

ঃ একশো চার।

ঃ ও কিছু নয়। এম্‌নি সেরে যাবে।

একটু থেমে সে বললোঃ দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বসো কেতকী—

ঃ অতো জ্বর ! এম্‌নি সেরে যাবে ?

ঃ সারবে, সারবে। তুমি বসো—

কেতকী আবার টুলের ওপর বসলো।

সুরঞ্জন বলেঃ অনেকদিন না খেয়ে ছিলাম। ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারে শুয়ে সাইরেন্ শুনেছি। লোকজনকে ভয়ে যে-যার ঘরে ছুটে পালাতে দেখেছি। আমি কোথায় যাবো? আমার কোথাও স্থান নেই। আমি ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের একটা বেঞ্চি দখল করে শুয়ে রইলাম।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো সুরঞ্জনের। সে বললোঃ মাতালের পাল্লায় পড়েছি। তোমরা মাতালকে ঘৃণা কর। আমিও ঘৃণা আর ভয় দুই করতাম। কিন্তু সেই মাতালকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করি। সে আমাকে সেদিন বাঁচিয়েছিল। আর এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান। তার কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো। আর কৃতজ্ঞ থাকবো বৌবাজারের মোকাদ্দেশ মিঞার কাছে। মোকাদ্দেশ মিঞা শেষে আমাকে একটা কারখানায় চাকরি জুটিয়ে দিল। কারখানার 'মাইনর লেবার'।

হাসলো সুরঞ্জন। কেতকী বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে।

ঃ টাকা জমিয়ে বাড়ি ফিরলাম। রূপনারাণের তীরে—বিরামপুর গ্রাম। পোড়ো বাড়ির চারদিকে আগাছা গজিয়ে উঠেছে। মাকে, কণাকে এঘর-ওঘর খুঁজলাম। কতো ডাকলাম। একটা পেঁচা ডেকে উঠলো। গোটা দুই চাম্চিকে উড়ে গেল। মায়ের জন্য কাপড় আর বোনের জন্যে জামা নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি যে কণার খাবার কেড়ে খেয়েছিলাম। সে কথা আজো ভুলতে পারি নি। আজ কণা যা খেতে চাইবে, তাকে তাই খাওয়াবো। গাঁয়ের সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি। কেউ বলতে পারে না। বছর-খানেক আগে তাদের নাকি গাঁয়ের পথে কে দেখেছিল। আর কেউ তাদের দেখে নি। কোথায় গেছে, কেউ জানে না। বেঁচে আছে কিনা কেউ বলতে পারে না।

ঃ সে কতোদিন আগের কথা?

কেতকী জিজ্ঞেস করলো।

সুরঞ্জন হিসেব করে বলেঃ তা আঠারো বছর হবে।

ঃ আঠারো বছর! আপনি আর তাদের খোঁজ করেন নি?

ঃ করেছি। আজও করছি। গাঁয়ে মাঝে মাঝে গিয়ে পোড়ো বাড়িটাকেই শুধু দেখে আসি। দরজা-জানালাগুলো ছিল, ওগুলোও কারা খুলে নিয়ে গেছে।

একটু থামলো সুরঞ্জন।

ঃ কাগজে কয়েকবার বিজ্ঞাপনও দিয়েছি। কোন সাড়া পাইনি। হয়তো তারা পৃথিবীতে নেই। থাকলে এই আঠারো বছরেও কি তাদের কোন খোঁজ পেতাম না?

কান্না গিললো সুরঞ্জন। চোখের কোণ-তুটো ভিজে উঠলো।

মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, রোগশয্যায় শুয়ে তখন তার ফেলে-আসা আত্মীয়দের কথা বুঝি বেশি করে মনে পড়ে। তখন সে দেখতে চায় একটি স্নেহ-বিগলিত করুণ মুখ, চায় স্নেহ-মেতুর একটি স্পর্শ এবং পরম আশ্বাস-ভরা তুটি সান্ত্বনার কথা। কিন্তু যুদ্ধ আমাদের সমাজটাকেই শুধু ভাঙে নি, আমাদের ঘর ভেঙেছে, আমাদের পরিবারকেও ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। তুর্ভিক্ষ,খাদ্যা-ভাব, জীবন-সংকট—সবই তো মহাযুদ্ধের অনুগত অনুচর। তাদের আঘাতে আমরা আমাদের আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে দূরে দূরে ছিট্‌কে পড়েছি। এই সব সমস্যার সঙ্গে সাধারণ মানুষ এখন এ ঘর করছে। সব কিছুই তাদের আজ গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর কোন সমস্যাই তাদের কাছে সমস্যা নয়। কিন্তু কাগজের অফিসে কাজ করতে হয় সুরঞ্জনকে। এই সব সমস্যা নিয়েই তো তার কারবার। তাকে বেশি করে ভাবতে হয়। মানুষের তুঃখ-কষ্টের যতগুলো দিক আছে—সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সবদিকেই তার চিন্তাকে ছড়িয়ে দিতে হয়। সে ভেবে দেখেছে, এত অনিশ্চিত এবং এত অসহায় মানুষ কোনদিন হয় নি।

রোগশয্যায় মানুষ যেমন অসহায় ও অনিশ্চিত, তেমনি আজকের পৃথিবীর মানুষ। সুরঞ্জন ভাবলো। যুদ্ধ সব চেয়ে বেশি করে যা ভেঙেছে, তা হলো মানুষের মন। মানুষের মন এভাবে কোনদিন ভাঙে নি। যে নীতি-বোধ ছিল মানুষের মনের সব চেয়ে বড়ো সম্পদ,

তাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এ্যাটম্ বোমা হিরোশিমা-নাগাসাকিই শুধু ধ্বংস করে নি, মানুষের সব চেয়ে বড়ো আশা-ভরসা যে তার নীতি-বোধ, তাকেও ধ্বংস করেছে।

চারদিকে তাই এতো দুর্নীতি, উচ্ছৃঙ্খলতা আর সমাজবিরোধী কার্যকলাপ! সুরঞ্জন ভাবলো, সেরে উঠলে সে এর ওপরে একটা প্রবন্ধ লিখবে।

নিচে যূথিকা আজ ক্ষেপেছে। তার তীব্র হাসি আর চিৎকার এক সঙ্গে ভেসে আসছে।

সুরঞ্জন শুয়ে শুয়ে সবই শুনছে।

খস্ খস্ শব্দ করতে করতে বাচ্চু এসে হাজির। সুরঞ্জন তার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

ঃ কি বাচ্চু, আজকাল তুই যে আমাকে একেবারেই ভুলে গেছিস্।

বাচ্চু বলে ঃ দাদা, তোমার জ্বর হয়েছে?

ঃ হ্যাঁরে, একটু। তা তুই যে বড় ভুলে গেলি আমাকে? এ্যাঁ?

উত্তর দিল কেতকী। হেসে বললো ঃ আপনি তো সব সময় থাকেন না। ও এসে খুঁজে যায়, আপনাকে পায় না। ওর ডিউটি ও কিন্তু ঠিক করে যাচ্ছে। আপনাকে না পেয়ে মিঠুয়ার সঙ্গে এখন বেশ জমিয়ে নিয়েছে।

ঃ তাই নাকি? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া তো ভালো নয় বাচ্চু!

সুরঞ্জন হাসে।

কেতকী বাচ্চুকে জিজ্ঞেস করে ঃ তুই এলি কেন রে?

ঃ মা জিজ্ঞেস করছে—

বলে বাচ্চু ঢোঁক গিললো। সে ভুলে গেছে, মা কি জিজ্ঞেস করেছে।

ঃ এই যা, ভুলে গেছি। মাকে জিজ্ঞেস করে আসবো?

ঃ যা, জিজ্ঞেস করে আয়।

দরজার কাছে গিয়েই বাচ্চু ফিরে আসে।

ঃ মনে পড়েছে বড়দি। মা জিজ্ঞেস করলো, দাদার খাওয়া হয়েছে?

আর—

ঃ আর কি?

ঃ ভুলে গেছি।

ঃ তুই একটা ভোলানাথ।

সে প্রতিবাদ করে, সে ভোলানাথ নয়। সে বাচ্চু।

ঃ আমি তো বাচ্চু। ভোলানাথ তো ওই বাড়ি থাকে।

ঃ না। তুই খালি খালি ভুলে যাস কি না!

হঠাৎ বাচ্চু গম্ভীর হয়ে গেল। বললোঃ মনে পড়েছে, বড়দি—

ঃ কি?

ঃ তুমি নিচে যাও।

ঃ কেন?

ঃ মা বলেছে।

এমন সময় দরজায় কে যেন জোরে জোরে ধাক্কা দিল। ধাক্কা নয়, কে যেন প্রচণ্ড আক্রোশে দরজায় ঘুসি মারছে কিংবা এই ভর-দুপুর বেলা বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।

ঃ আসতে পারি?

ততক্ষণে আগন্তুক ঘরের মধ্যে এসে পড়েছেন।

সেই চোঙা প্যাণ্ট আর সেই ছুঁচোলো জুতো।

কেতকী বলে উঠলোঃ নিশীথদা! তুমি এখানে?

টুলটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বলেঃ বসো—

ঃ না থাক। কখন থেকে এসে বসে আছি—

লজ্জা পেয়ে কেতকী সুরঞ্জনের মুখের দিকে তাকায়। একী করলো নিশীথ! ছি ছি! সে না হয় কেতকীর জন্যে দু দণ্ড বসেছিল নিচে। তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে? এখানে

এসে সুরঞ্জনের সাম্‌নে সে কথা উঁচু গলায় বিরক্তির সঙ্গে ঘোষণা করে কি লাভ হলো তার?

বড়ো অপ্রস্তুত হয়ে গেল কেতকী। তাকে এ ভাবে অপ্রস্তুত করার কি প্রয়োজন ছিল নিশীথের? না হয় দুদণ্ড বসেছিল তার জন্যে। তার জন্যে নায়িকাকে অপরের সাম্‌নে এ ভাবে ধমক্ দেওয়া কি ঠিক হলো তার?

ঠিক যে হয় নি, তা নিশীথও বুঝতে পেয়েছে। তাই সে বলে: মানে, এঁর অসুখের একটা খবর নিয়ে যাবো। তাই শুনবো বলে বসে আছি। মাসিমা বললেন কিনা ওঁর অসুখের কথা। শুনে ভাবলাম, হয়তো ডাক্তার ডাকতে হবে। তোমার এত দেরি হবে জানলে—

গলা তো নয়, যেন ঢাকের বাজনা। সব সময় যেন একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ!

কেতকী কথার আড়ালে আত্মগোপন করতে চাইলো। সে সুরঞ্জনকে বলে: আপনি একে চেনেন না?

সুরঞ্জন বললো: চিনি বৈ কি। বিলক্ষণ চিনি। উনি হেরম্ববাবুর কবিতার একজন বিশেষ ভক্ত। তা ছাড়া এ গলিতে তো প্রায়ই দেখা হয়।

কেতকী সুরঞ্জনের মুখ থেকে হয়তো এ উত্তর আশা করে নি। এই উত্তর তার নিজের যেমন মনঃপূত হয়নি, তেমনি হয়তো নিশীথেরও পছন্দ হয়নি। নিশীথের দিকে সে একটু করুণ চোখে তাকায়।

নিশীথের মুখটা শক্ত হয়ে উঠলো।

কেতকী আবার নিশীথের জন্যে কথার আবরণ খোঁজে। বলে: আপনি জানেন না, ও বড়ো পরোপকারী ছেলে। মানুষের দুঃখ ও দেখতে একদম পারে না। মানুষের বিপদ দেখলে ও যে কি করবে, ভেবে পায়না। সত্যি, এমন ছেলে হয় না।

কেন জানি না, এ সব কথা শুনতে মোটেই ভালো লাগছিল না সুরঞ্জনের।

সে হাসতে হাসতে বলে: সাম্‌না-সাম্‌নি এত প্রশংসা করো না কেতকী। দেখছো না বেচারা একেবারে প্রশংসায় গলে পড়েছে—

কেতকীও তার সঙ্গে হাসতে থাকে।

নিশীথ সে হাসিতে যোগ দিতে পারে না। তার চোয়াল দুটো আরো শক্ত হয়ে ওঠে।

কেতকী তার প্রতি সহানুভূতির সুরে বলে: না দাদা, ও বড়ো উপকারী ছেলে। বাবা-মা দুজনেই ওকে খুব ভালোবাসেন। এই ঘরের গিরিজাবাবুর অসুখ করেছিল। কেউ হন না ওর। তবু ও যে ভাবে সেবা শুশ্রূষা করেছে, তাতে সবাই অবাক হয়ে গেছে। তারপর গিরিজাবাবু যখন মারা গেলেন, তখন তার সৎকারের ব্যবস্থাও তো ওই করেছিল।

হাসলো সুরঞ্জন। বললো: আমি গিরিজাবাবুর অবস্থায় এখনো আসিনি, কেতকী। সৎকারের ব্যবস্থাটা এখন না হয় তোলাই থাক। আপাতত তোমরা আসতে পারো। আর পারো তো, মিঠুয়াকে একবার ডেকে দিও।

মেঝেতে সজোরে লাথি মারলো নিশীথ। চিৎকার করে বললো: আমি ভেবেছিলাম, ডাক্তার ডাকতে হবে। বোধ হয় তা দরকার হবে না। পরের উপকার করতে আসা যে অন্যায়, তা এত দিন জানা ছিল না। আচ্ছা চলি। ওঁর কথা আমার মনে থাকবে।

নিশীথ বেরিয়ে গেল। সিঁড়িতে তার পদাঘাতের শব্দ শোনা যেতে লাগলো।

কেতকী সুরঞ্জনের কথায় খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছে, মনে হলো। কালি হয়ে গেছে তার সারা মুখটা। সে আর এখানে এক মুহূর্তও থাকতে চায় না। চলে যেতে পারলে যেন সে বাঁচে। দুধ-সাগুর বাটিটা হাতে নিয়ে সে বলে: নিন, খেয়ে নিন।

সুরঞ্জনের খেতে ইচ্ছে নেই। সে বলে: থাক্ কেতকী, ওসব গিল্‌তে আমার ভালো লাগে না।

কেতকী আর কোন কথা না বলে টুলের ওপর বাটিটা চাপা দিয়ে রেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। এমন করুণ বিষণ্ণ ভাবে কাউকে কোনদিন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সুরঞ্জন দেখেনি। আজ যে কি হলো সুরঞ্জনের, তা সে নিজেই জানে না। হঠাৎ সে যেন আজ বড়ো কঠিন হয়ে উঠেছিল।

জানে, তার এমন কথায় কেতকী দুঃখ পাবে। তবু ইচ্ছে করেই সে কেতকীকে দুঃখ দিল।

কি দরকার ছিল তার এভাবে নিশীথকে খোঁচা দেবার? সে তো কাউকে কোনদিন খোঁচা দিয়ে কথা বলে না। যেখানে সে গেছে সেখানে সে অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলের প্রীতি লাভ করেছে। কিন্তু আজ সে নিশীথকে এভাবে খোঁচা দিল কেন? নিশীথ তো তার কাছে কোন অপরাধ করেনি। বরং সে তার উপকার করতেই এসেছিল। অসুস্থ সে। তাকে যে-কোন প্রকার সাহায্য করতেই সে এসেছিল। তার এই অযাচিত সাহায্যের জন্যে কোথায় সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তা নয়। সে উল্‌টে তার মনে ঘা দিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিল নিতান্ত নিষ্প্রভ ভাবে। শুধু নিশীথকেই নয়, কেতকীকেও সেইভাবে বিদায় দিয়েছে সে। কি ভাবলো কেতকী তার সম্পর্কে, কে জানে?

সুরঞ্জন ভাবে, কেন সে নিশীথকে সহ্য করতে পারে না?

সত্যকথা, নিশীথের পোষাক পরিচ্ছদ সে পছন্দ করতে পারে না, সে তার কথা বলার ভঙ্গিটাকেও পছন্দ করতে পারে না। নিশীথ কথা বলে না তো, যেন ক্রুদ্ধ আক্রোশে ঝগড়া করে। কেন তা হবে? পোষাকে চোঙা প্যাণ্ট, রং বেরঙের ছাপমারা জামা, ছুঁচোলো জুতো, সাম্‌নের দিকে চূড়ো-করা চুল—এ সব সুরঞ্জন সইতেই পারে না। কেন এমন পোশাক পরবে আজকালকার ছেলেরা? পৃথিবীর সকল দেশের উঠ্‌তি যুবকেরা তো এই পোশাকই পছন্দ করছে বেশি। আমেরিকার কোন এক য়ুনিভার্সিটির ছাত্ররা সেদিন তাদের কাগজের অফিস ভিজিট্‌ করতে এসেছিল। তাদেরও তো ঐ

পোষাক। অবশ্যি চুলটা ও রকম ওল্টানো নয়। তাদের দেখে আমাদের দেশের ছেলেরা যদি ও পোশাক নকল করে সে আপত্তি করবে কেন? আর সে-ই বা আপত্তি করবার কে? দেশের সবাই তো ওদের সহ্য করতে পারছে। তবে সে সহ্য করতে পারবে না কেন?

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজি সভ্যতা যখন এদেশে এসেছিল, তখন তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, চলন-বলন আমাদের দেশের যুবকেরা নকল করেছিল। তদের নিয়ে ডি. এল. রায় ব্যঙ্গ-গীতি রচনা করেছিলেন। তখনকার অনেকেই তো সে পোষাক পছন্দ করেন নি। কিন্তু তাতে কি হলো? সে পোষাককে কি শেষ পর্যন্ত ঠেকানো গেল? এখন তো একশোর মধ্যে নিরানব্বুই জনের সেই পোষাক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা আজ প্রবল। কাজেই তার পোষাক দুর্বল জাতিরা নকল করবে, তাতে আশ্চর্যের কি আছে? তাই বলে স্বদেশের কি কিছুই নেই? আমরা কি একেবারে দেউলে হয়ে গেছি?

তাছাড়া পোশাক বা কথাবার্তা তো বাইরের জিনিস। আসল মানুষ তো ভেতরের। তাকে সুরঞ্জন কতোটুকু দেখেছে? শুধু কি সুরঞ্জন পোশাক আর ব্যবহারের জন্যে নিশীথকে পছন্দ করতে পারে না? কিংবা সে হেরম্ববাবু আর যোগমায়া দেবীকে প্রতারণা করছে বলে তাকে সহ্য করতে পারছে না? কিংবা অন্য কিছু? সুরঞ্জন হাসে।

নিশীথ নাকি কবিতা শোনে, কবিতা বোঝে। হেরম্ববাবু তাকে মনের আনন্দে কবিতা শোনান। নিশীথও বাহবা দিয়ে প্রশংসা করে। সেদিন তো সে তার নমুনা নিজের কানে শুনেছে। এতে কি সে সেই সরল-হৃদয় বৃদ্ধকে প্রতারণা করছে না?....যোগমায়া দেবীকে প্রতারণা করছে না?....প্রতারণা করছে না আর এক কুমারী হৃদয়কে? তা যদি সে করেও, তা যাচাই করে দেখার দায়িত্ব তাকে কে দিয়েছে? তারা নিজেরাই যাচাই করে নেবে। কে ভালো, কে মন্দ—তারা নিজেরাই একদিন চিনে নেবে। তার এত মাথা ব্যথা

কিসের ? নিজের ভাবনা তার অসীম, সে পরের ভাবনায় এত মাথা ঘামায় কেন ?

তবে কি নিশীথ কেতকীকে ভালোবাসে বলে তাকে সে সহ্য করতে পারে না ?

সুরঞ্জনের আবার শীত করছে। জ্বরটা বাড়ছে মনে হয়। জানালার বাইরে দুপুরের গলিতে একটা নিঃসঙ্গ কাক একমনে ডেকে চলেছে। মিঠুয়া কোথায় গেল ? এখনও তার দেখা নেই। কখন মিঠুয়া আসবে ?

এদিকে বাচ্চু মেঝের ওপর বসে দেশবন্ধু পার্কের ছেলেমেয়েদের মতো সুর করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে গাইছে—

কাওয়ায় ধান খাইলো রে খেদানের মানুষ নাই,
খাওয়ার বেলায় আছে মানুষ কাজের বেলায় নাই।

অমিত সুরঞ্জনকে বলেছিল : বলুন তো, আমার এই পরিণামের জন্যে দায়ী কে ?

সুরঞ্জন মাত্র কয়েকদিন আগে অসুখ থেকে সেরে উঠেছে। শরীরটা ভীষণ দুর্বল। এখনও সে অফিসে যায় নি। সারাদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ে। বিকেলের দিকে দেশবন্ধু পার্কের দিকে একটু বেড়াতে যায়। নরম ঘাসের ওপর বসে সে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নাচগান দেখে, মনে বড়ো আনন্দ পায়। গায়ে মনে একটু খোলা বাতাস লাগে।

এক একদিন বাচ্চু এসে তার হাত ধরে।

আজ বাচ্চু আসে নি।

সুরঞ্জন একা-একা বসেছিল দেশবন্ধু পার্কের নরম ঘাসে।

দীঘির জলে মস্ত বড়ো আকাশটা একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ওপাশের গাছগুলো পাতা ঝরিয়ে নিঃস্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিম

আকাশের ম্লান আলোর ভেতর দিয়ে একটা দীর্ঘ রুগ্ন ছায়া তার দিকে এগিয়ে আসে।

সুরঞ্জন চেয়ে দেখলো—অমিত রায়।

ক্লান্ত উদাস কর্মহীন ভঙ্গিতে অমিত হাঁটছিল। সুরঞ্জনকে দেখতে পেয়ে সে বলেঃ সুরঞ্জন বাবু যে! একা-একা বসে কি ভাবছেন?

সুরঞ্জন হেসে বলেঃ কিছুই ভাবছি না। এখানে চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগে।

অমিত নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে রইলো। বিকেলের নিবে-আসা ম্লান আলোয় তাকে বড়ো করুণ দেখাচ্ছিল। সুরঞ্জন যদি তার এক-খানা ফটো ছাপার অনুমতি পায়, তবে তার শীর্ষলিপি দেবে—'যুগ-যন্ত্রণার বিষণ্ণ প্রতীক।'

অমিত বলেঃ বলুন তো, আমার এই পরিণামের জন্যে দায়ী কে? কেন আমি আজ এই যন্ত্রণায় পুড়ে মরছি?

'যন্ত্রণা' কথাটায় একটু চমকে উঠলো সুরঞ্জন।

হ্যাঁ, যন্ত্রণা বৈকি! প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ অমিত রায়ের জীবনে আজ আর কিছুই নেই—কেবল যন্ত্রণা ছাড়া। স্ত্রী রোজগার করে আনছে আর সে স্বামী হয়ে, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে হালদার বাগান লেনের একটা অন্ধকার ফ্ল্যাটে পড়ে পড়ে তার কর্মহীন দীর্ঘ দিনগুলো একে একে কাটিয়ে দেয়। সকালে বাজারটুকু সে করে। রিণা রান্না করে দুটো ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়ে যায়। অমিত কিছুই করে না। সে বেলার দিকে স্নান করে একা-একা ভাত বেড়ে খায়। বিনাকাজে বিছানায় পড়ে পড়ে গড়ায়। ঘুম আসে না চোখে। বেলা যেন তার কাটতেই চায় না। নিঃসঙ্গ প্রহর ভারি হয়ে যেন পড়ে থাকে মেঝের ওপর।

সন্ধের দিকে চেয়ে অতি ধীরে ধীরে মন্থর লয়ে তার দিন কাটে।

এই অফুরন্ত সময়, এই অঢেল অবকাশ তার জন্যে নিয়ে আসে মর্মান্তিক আত্মগ্লানি, যন্ত্রণার দহন-জ্বালা। মাঝে মাঝে নিজেকে তার বড়ো অসহায়, অকর্মণ্য মনে হয়। মনে হয়, তার এই পৃথিবীতে

করণীয় কিছু নেই, শুধু নৈষ্কর্ম্যের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর দিন গুণে যাওয়া ছাড়া। অথচ একদিন সে আর্ট কলেজের সেরা ছাত্র ছিল। তার ব্যক্তিত্ব, তার পৌরুষ সেদিন কলেজের দেয়াল ছাপিয়ে যেত। মেয়েরা তাকিয়ে থাকতো তার দিকে। পুরুষেরা ঈর্ষা করতো তার ব্যক্তিত্বকে। আজ কোথায় গেল তার ব্যক্তিত্ব?···কোথায় তার সেই পৌরুষ? আজ সে রিণার রোজগারের ভাত খেয়ে বাঁচে। আজ সে স্ত্রীর অন্নপুষ্ট।

নিজেকে ধিক্কার দেয় সে। ছি ছি, এভাবে মানুষের বাঁচা উচিত নয়। কিন্তু কেনই বা সে মরবে? কি তার অপরাধ? সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ঠিক ঐ মুহূর্তে তার সমস্ত চিন্তা করবার শক্তি পঙ্গু হয়ে যায়। আর বেশি কিছু সে চিন্তা করতে পারে না।

দেয়ালে ফুলশয্যার রাতে তোলা ছবিটার ওপর চোখ পড়ে তার। রিণার দু চোখে ঘনীভূত এক স্বপ্নমায়া, সারামুখে ভালোবাসার অহংকার। আর তার চোখে কি ছিল? তার চোখেও ছিল স্বপ্ন, ছিল এক আদর্শের গৌরব। আর আজ? রিণা দিনান্তে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে এই অন্ধকার ফ্ল্যাটে আর সে এক ধূসর পেঁচার মতো এক অন্ধকার কোটরে বসে আত্মধিক্কারের মধ্য দিয়ে সময় গোনে।

এক এক সময় তার ঐ ছবিটাকে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে হয়।

সে রিণার একটি ইচ্ছাও সফল করে তুলতে পারে নি। একখানা গয়না তো দূরের কথা, একটা কাপড়ও তার গায়ে তুলে দিয়ে তাকে খুশি করতে পারে নি। অথচ তার জামা কাপড় রিণাই কিনে এনে দেয়। যে পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে সে বেরোয়, ওটা রিণাই বানিয়ে এনে দিয়েছিল। তাও অনেক দিন হয়ে গেছে। রিণা সেদিন বলছিল ঃ তোমার একটা পাঞ্জাবী তৈরী করতে হবে।

অমিত বলেছিল ঃ এখন তো চলে যাচ্ছে। পরে কিনলে চলবে।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবীটার কাঁধের কাছে ফেটে গেছে। ওটাতে আর চলছে না। রিণারও তো শাড়ি নেই। অমিতের পাঞ্জাবী পরে হবে। রিণাকে বেরুতে হয়। তার শাড়িটাই আগে কেনা দরকার।

একদিন রিণা শাড়ি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরলো।

অমিতকে জিজ্ঞেস করলো ঃ ছ্যাখো তো, কেমন হয়েছে ?

অমিত বলেছিল ঃ ভালোই তো—

ঃ তোমার পাঞ্জাবীর কাপড় কিনি নি বলে রাগ করোনি তো ? সত্যি বল্‌ছি টাকা ছিল না। মাইনে পেলেই কিনে আনবো।

অমিতের মনে হয়, রিণা তাকে যেন কৃপা করছে। সে আর রিণার কৃপায় বাঁচতে চায় না। রিণা তার ব্যক্তিত্বকে দিনে দিনে এইভাবে খর্ব করে দিচ্ছে। তার সেই পৌরুষ আজ কেঁচোর মতো মাটি কামড়ে পড়ে আছে।

রিণা বলে ঃ তুমি প্যাণ্ট্ পরোনা কেন ? প্যাণ্ট্ আর হাওয়াই শার্টে খরচা কম, টেকেও অনেক দিন। প্যাণ্ট্ পরবে এবার থেকে ? এবার তোমাকে আমি প্যাণ্ট্ কিনে দেব।

অমিত রাজি হলো প্যাণ্ট্ পরতে।

রোজ রোজ দাড়ি কামাবার ব্লেড্ কেনবার জন্য রিণার কাছে পয়সা চাইতেও অমিতের লজ্জা করে। না, আর দাড়ি কামাবে না সে। স্ত্রীর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সে আর দাড়ি কামাবে না।

রিণা জিজ্ঞেস করলো ঃ দাড়ি কামাও না কেন ?

অমিত বলেছিল ঃ এবার দাড়ি রাখবো ঠিক করেছি।

রিণা আর কিছু বলে নি।

না, রিণার কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয় নি তাকে নিয়ে।

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, কতো লোক স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখে ঘর করছে। বেশি দূরে যাওয়ার দরকার কি ? সাম্‌নের ফ্ল্যাটের নবেন্দু-বাবু আর তাঁর স্ত্রীকে দেখুন। ছুজনে কেমন সুখে আছেন। হেসে-খেলে, মনের আনন্দে তাঁরা দিন কাটান।

রোজ নবেন্দুবাবু তাঁর স্ত্রীকে স্কুটারের পেছনে নিয়ে বেড়াতে যান। সুপুরুষ, সুখদর্শন নবেন্দুবাবুর পেছনে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী চড়া-রঙের হাল্‌কা সিল্কের শাড়ি পরে, সারা মুখে পেণ্ট করে, চোখে গগ্‌ল্‌স্ লাগিয়ে যখন বেড়াতে যান, তখন এ বাড়ির সবাই না তাকিয়ে পারেন

না। পাড়ার লোকেরা দেখে হাসাহাসি করে, চোখ চাওয়া-চাউই করে। রাস্তার লোকেরা কেমন ঈর্ষাতুর, লোলুপ দৃষ্টিতে ছুটন্ত স্কুটারটার দিকে তাকিয়ে থাকে ?

তাতে নবেন্দুবাবুর কি যায়, আসে ? তাঁরা যে সুখী, তাঁরা সবার সাম্‌নে তার সচল দৃষ্টান্ত রেখে চলে যান।

কেবল পথের লোকেদের চোখে ধুলো উড়ে পড়ে, তারা গাড়ি চাপা খেতে খেতে কোনমতে বেঁচে যায়।

এ সব কি রিণা দেখতে পায় না ? দেখে বৈকি ! সেই সঙ্গেই সে হয়তো নিজেদেরও অবস্থাটা একবার তুলনা করে দেখে। নবেন্দুবাবু আর তাঁর স্ত্রীর সৌভাগ্যকে সে কি ঈর্ষা করে না ? তখন কি তার মনে হতাশার বেদনা ঘনিয়ে আসে না ? ঘরে বেকার স্বামীর দরিদ্র মূর্তিটা কি চোখের সাম্‌নে তার ভেসে ওঠে না ? কেন তার কিছুই হলো না ? না হবার তো কথা নয়। স্বাস্থ্যবান, লেখাপড়া-জানা স্বামী—তবু তার কিছুই হলো না কেন ?

রিণা নিশ্চয়ই এসব কথা ভাবে। এসব কথা ভাবতে গেলে নিশ্চয়ই তার বেকার দরিদ্র স্বামীর প্রতি আর শ্রদ্ধা থাকে না। কে জানে, হয়তো রিণা আজকাল তার গলগ্রহ স্বামীর জন্যে মনে ঘৃণা পোষণ করে কিনা।

সন্ধের দিকে চেয়ে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে অতি ধীর মন্থর লয়ে অমিতের দিন কাটে।

সন্ধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিণা ফিরে আসে।

শাড়ি, ব্লাউস্, ব্রেসিয়ার, পেটি-কোট্ খুলে পাট করে সে সস্তা-কাঠের আল্‌নায় গুছিয়ে রাখে। কাল আবার ওগুলো পরে যেতে হবে তো ! তারপর সাবান-দানি আর তোয়ালে হাতে নিয়ে সে বাথ-রুমে ঢোকে। ঠাণ্ডা জল চোখে মুখে দেয়। তারপর হুড়মুড় করে সারা গায়ে জল ঢালে। গা রগ্‌ড়ে সারা দেহে সাবানের ফেনা তোলে। গায়ে সাবানের ফেনা না উঠলে স্নান ! গায়ে সাবানের অফুরন্ত ফেনা তুলে রিণা স্নান করে। দিনান্তের সকল গ্লানি

সে সাবানের ফেনা দিয়ে ধুয়ে ফেলে সম্পূর্ণ অন্য রূপে ঘরে ঢুকতে চায়।

স্নান সেরে সে পাশের ঘরে যায়। কেবল ব্রেসিয়ার, পেটিকোট্ আর একটা হাল্কা শাড়ি পরে রান্না ঘরে ঢোকে। উনুনে আগুন দিয়ে সে দরজা বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসে। তুজনে সাম্‌নাসান্‌নি বসে তেল দিয়ে মুড়ি মেখে কাঁচালঙ্কা দিয়ে খায় আর সারাদিনের জমে- ওঠা কথা বলে মনটাকে হাল্কা করে।

রিণা বলে ঃ বিকেলে তোমার খিদে পায়, অথচ ইচ্ছে করেই কিছু খাও না।

অমিত বলে ঃ আমি দেরি করে খাই তো। বিকেলে তাই খিদে পায় না। কিন্তু অফিসে তোমার কিছু খাওয়া উচিত। তুমি কতো সকালে খেয়ে যাও। তাও কি ঠিকমতো খাওয়া হয়? তুমি বরং অফিসে কিছু খেও, রিণা।

ঃ অফিসে আবার খাবো কি? এতেই নাকি আমার হেল্‌থ্ খুব ভালো হয়ে উঠ্‌ছে। হ্যাঁ, তুমি কি দেখ্‌ছো বলো তো?

ঃ কে বলে?

ঃ অফিসের সবাই।

ঃ বলে নাকি?

ঃ আরো কি সব বলে—আমি নাকি আরো সুন্দরী হয়ে উঠ্‌ছি। শুনে আমার ভারি লজ্জা করে।

অমিত আর মুখে কিছু বলে না। কিন্তু মনে মনে সে খুশি হতে পারে না কথাটা শুনে।

রিণা চট্‌পট্ রান্না সেরে নেয়। তুজনের রান্না আর কতটুকু? কত সময়ই বা তাতে লাগে? কোন অতিথি অভ্যাগত নেই। তারাও কোথাও যায় না। কেউ আসেও না। রিণার বাপের বাড়িরও কেউ কোনদিন এ বাসায় আসে নি। অমিতের বাবা তো আসেনই না। যা হয়, চিঠিতে জানান। কাজেই খেতে ওদের বেশি রাত হয় না।

সন্ধে হতে না হতেই এ ফ্ল্যাটের রাত যেন গভীর হয়ে ওঠে। খাওয়া হয়ে গেলে অমিত চুপচাপ বিছানায় উঠে বসে। রিণার কি এত্ত তাড়াতাড়ি শেষ হয়? সে বাসন তুলবে, ঘর পরিষ্কার করবে, বাসন মাজবে, কাপড় ছাড়বে, তবে তো তার সময় হবে।

তার কাপড়-ছাড়া হতে না হতেই অমিত উঠে আলো নিবিয়ে দেয়। তারপর তাকে বুকে চেপে ধরে বিছানায় উঠে আসে। রিণা বাধা দেয় না। তবু কি যেন সে বলতে চায়। অমিতের ঠোঁটের প্রহারে তার কথা চাপা পড়ে যায়।

সারাদিনের নিরুত্তপ্ত দিন রাতে হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সারা-দিন অমিত নিঃসঙ্গতায় নির্বাসিত থেকে রাতের সঙ্গ-সুখ পুরোপুরি আদায় করে নিতে চায়। অমিতের বাহুর মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে রিণা অসাড় হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে।

তারপর হঠাৎ অমিত রিণাকে বুকের ওপর তুলে নেয়। আরো জোরে জড়িয়ে ধরে তাকে। তারপর পাগলের মতো গড়াগড়ি খায় সারা বিছানাময়। একটা পশুর আক্রোশে সে রিণাকে পিষে ফেলতে চায়। রিণার যে প্রাণ অছে, তা তার গরম নিশ্বাসটুকু ছাড়া আর বোঝার কোন উপায় থাকে না। তাকে দলিত, পিষ্ট, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে যখন অমিত মুক্তি দেয়, তখন শীতের রাতেও দুজনেই ঘর্মাক্ত।

অমিত উঠে বাথরুমে যায়। রিণার এখন আর ওঠার শক্তি নেই। তার ওপরে যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেছে। বিছানার একপাশে পড়ে সে হাঁপাতে থাকে।

এরপর সে বাথরুমে যাবে। গায়ে জল ঢালবে। তারপর নিঃসাড়ে শুয়ে রাত ভোর করে দেবে।

এ তার নিত্যকার কাহিনী। কিছুই পুরাতন নয়, নতুনত্বও কিছুই নেই। তবে যতদিন যাচ্ছে, রিণার ওপরে অমিতের অত্যাচারও যেন বেড়ে চলেছে। সারাদিনের ব্যর্থতার শোধ এইভাবে সে তুলতে চেষ্টা করে না কি? সারাদিন সে যে-বেদনাকে দম বন্ধ করে বুকের মধ্যে

লালন করে, তাকেই রাতের আঁধারে সে মুক্তি দেয়। তা ছাড়া তার মুক্তির পথই বা কোথায়?

ঃ আমাদের বাড়ি ছিল, আমি কিছু লেখাপড়াও তো শিখেছিলাম। তবু আমার কিছু হলো না কেন? আপনি কাগজের অফিসে কাজ করেন। বলুন তো, আমার এই পরিণামের জন্যে দায়ী কে?

প্রশ্নটা হয়তো সুরঞ্জন এড়িয়ে যেত। কিন্তু কাগজের দোহাই দিয়ে অমিত তাকে একটু মুশ্‌কিলে ফেললো। সে ধীরে ধীরে বললোঃ অমিতবাবু, বাড়িটা আপনাদের হাতছাড়া হয়ে গেল কেন, তা আমি জানি না। হয় তো আপনার বাবার রোজগার যা ছিল, তিনি খরচ করতেন তার চেয়ে ঢের বেশি। আপনার বাবা বিলেত গিয়েছিলেন, তা আপনার মুখ থেকেই শুনেছি। কেন গিয়েছিলেন, জানি না। এবং তাতে তাঁর লাভ কি হয়েছিল, তাও জানি না।

অমিত বলে বসেঃ লাভের মধ্যে বাড়িটা বাঁধা পড়েছিল।

ঃ হ্যাঁ। সে বাড়ি আর তিনি ছাড়িয়ে নিতে পারেন নি। আর ব্যাঙ্কে টাকার কথা যে বললেন, তা গেছে ব্যাঙ্ক ফেল্ মারার জন্যে। ব্যাড্ ম্যানেজ্‌মেণ্ট, ব্যাড্ ইন্‌ভেস্ট্‌মেণ্ট আর মিস্‌অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান্—এই সমস্ত কারণে ব্যাঙ্কগুলো ফেল্ মেরেছিল। তবে কতকগুলি স্বার্থপর ধনীলোকের যে তাতে হাত ছিল, এমন সন্দেহও করা হয়ে থাকে।

ঃ আপনি কি বলতে চান, আমরা প্রতারিত হই নি?

ঃ প্রতারিত বৈকি! ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছিলেন সরল বিশ্বাসে। বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা বৈকি!

ঃ কই, তার তো বিচার হলো না?

ঃ বিচার?

সুরঞ্জন হাসলো।

ঃ কার কাছে বিচার? আপনি কি জানেন, সব চেয়ে বড়ো বিচারক যিনি ছিলেন, তাঁকে আমরা খুন করেছি?

অমিত ঠিক বুঝতে পারলো না যেন কথাটা।

ঃ হিরোশিমা নাগাসাকিতে আমরা অসংখ্য নিষ্পাপ মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরকেও খুন করেছি। অসংখ্য মৃতদেহের সঙ্গে ঈশ্বরের মৃতদেহ-টাকেও সরিয়ে ফেলেছি। ঈশ্বর যাতে আর না জন্মান, তার জন্যে ঘরে ঘরে এ্যাটম্ বোমা মজুত করে রেখেছি। ন্যায় বিচারের আশা আপনি কার কাছে করছেন? যিনি বিচারক তাঁর নীতি-বোধও যে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। কোথায় গিয়ে আর দাঁড়াবেন?

অমিত নিঃশব্দে বসেছিল।

একটা চিনেবাদামওয়ালা তাদের পাশ দিয়ে ডেকে গেল।

অমিত সেই দিকে তাকায়। সুরঞ্জন চিনেবাদামওয়ালাকে ডেকে চিনেবাদাম কেনে। দুজনে বসে চিনেবাদাম খেতে থাকে।

সুরঞ্জন হাসে। বলেঃ কোন এক আধুনিক কবি আমাদের জীবনকে চিনেবাদামের খোসার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এত নিখুঁত উপমা কদাচিৎ দেখা যায়। মাঝে মাঝে সেই কবিকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়।

আবার দুজনে নীরবে চিনেবাদাম চিবোতে থাকে।

ঃ আর একটা কথা কি জানেন?

অমিত সুরঞ্জনের মুখের দিকে তাকায়।

ঃ এখনকার শিক্ষার সঙ্গে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কোন যোগ নেই। আর্ট, পোয়েট্রি, লিটারেচারের এখন আর কোন মূল্যই নেই।

অমিত প্রশ্ন করেঃ তাহলে মানুষ কি নিয়ে বাঁচবে?

ঃ কেন? লোহা-লক্কড় আর সিনেমা-বায়োস্কোপ নিয়ে।

এত দুঃখের মধ্যেও অমিতের হাসি পেল। মর্মান্তিক সেই হাসি।

সুরঞ্জন বলেঃ শুধু আপনি কেন? দেশের বহুলোক এখন বেকার কিংবা অর্ধ-বেকার।

সুরঞ্জনের একটা বড়ো দোষ। সে সব কথাই একটু সিরিয়াস্‌লি ভাবে। কাগজের অফিসে কাজ করে তার এই বিশ্রী অভ্যেসটা হয়ে গেছে। কিছুতেই সে কোন সাধারণ ব্যাপারকে অতি সাধারণভাবে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে না। সে প্রত্যেক ঘটনারই একটা সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা খোঁজে। এতে অনেকে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। কিন্তু সে তবু তার সেই অভ্যেসটাকে শোধ্‌রাতে পারে না।

অমিত ভাবছিল অন্যকথা।

কার্বন পেপারের উল্‌টো পিঠের মতো ফিকে ধূসর রঙের অন্ধকার রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের ওপরে নামছিল। পার্কের কোণে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা কখন ভেঙে গেছে। তারা যে-যার বাড়ি ফিরে গেছে। দীঘির জলে একটা গাঢ় বিষণ্ণতা। পার্কের দাদুরা বেঞ্চি খালি করে বাড়ি ফিরে চলেছেন। তাঁদের বোধহয় চ্যবনপ্রাশ সেবনের সময় হয়ে গেছে। ওঁদের দেখে আজ সুরঞ্জনের গুরুদাসবাবুর কথা মনে পড়ে গেল।

গুরুদাসবাবু একবার সুরঞ্জনকে বলেছিলেনঃ এই সব বুড়োদের রিটায়ার্ড্‌ লাইফ কেমন করে কাটে জানেন?

সুরঞ্জন সকৌতুকে জিজ্ঞেস করেঃ কেমন করে?

ঃ জগতের যতো অশ্লীল বই পড়ে।

ঃ তাই নাকি?

বিশ্বাস করতে পারে না সুরঞ্জন। যারা জীবনের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দিয়ে মৃত্যুর পথ চেয়ে বসে আছে, সেই বৃদ্ধদের মানসিক খাদ্য অশ্লীল বই কি করে হতে পারে, সুরঞ্জন ভেবে উঠতে পারে না। গুরুদাসবাবু বলেছিলেনঃ ওঁরা সকালে বিকেলে দল বেঁধে পার্কের বেঞ্চিগুলো দখল করে বসেন। ওগুলোকে এক একটা ক্লাব বলতে পারেন। বাইরের কেউ ওদের মেম্বার হতে পারে না। মেম্বারশিপের ব্যাপারে ভীষণ কড়াকড়ি। এদেশে যে সব বইয়ের ওপর 'ব্যান্‌' আছে, গোপন এজেন্টদের দিয়ে এঁরা বিদেশ থেকে সেই সব বই

আনিয়ে পড়েন। নিজেদের মধ্যে খবরের কাগজের আড়াল দিয়ে সেই সব বই হাত বদল হয়। আর সকালে-বিকেলে আলোচনা চলে ওসব বইয়ের ওপর।

বিস্মিত হয়ে সুরঞ্জন তাকিয়ে থাকে। গুরুদাসবাবু হাসেন দার্শনিকের হাসি। মেয়েলি গলাটাকে আরো ছোট করে তিনি চুপি চুপি বলেনঃ আমার হাতে একখানা বই এসে পড়েছিল। সে বইখানার নাম শুনে থাকতে পারেন। বইটাকে নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়েছে পৃথিবীতে।

ঃ বইটার নাম কি বলুন তো?

ফিস্ ফিস্ করে তিনি বললেনঃ কর্কট ক্রান্তি মানে 'ট্রপিক্ অব্ ক্যান্সার'।

ঃ ও বই আপনি পেলেন কি করে?

দার্শনিকের মতো মাথা দোলাতে দোলাতে গুরুদাসবাবু বললেনঃ বইটা পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।

তাহলে গুরুদাসবাবুও সেই ক্লাবের একজন প্রকাশ্য না হলেও গোপন সদস্য। সুরঞ্জন চুপ করে থাকে।

গুরুদাসবাবু গলাটাকে অস্বাভাবিকভাবে খাটো করে বলেনঃ পড়বেন বইটা? আমি আপনাকে সংগ্রহ করে এনে দিতে পারি। ভারি চমৎকার বই। একবার পড়লে--

সুরঞ্জন গুরুদাসবাবুর মুখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইলো। তারপর হেসে উঠলো নিজের মনে। বললোঃ

ঃ এখন না। আপনাদের মতো বয়েস হোক, তারপর—

হি হি করে হেসে উঠলেন গুরুদাসবাবু। হাসি দিয়ে তাঁর গোপনীয়তাটুকু ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে তিনি ওপরে উঠে গেলেন।

কথাটা ভেবে সুরঞ্জন নিজের মনে হাসলো।

অমিত বললোঃ রিণার বোধহয় ফিরবার সময় হলো।

সুরঞ্জন বলেঃ তাহলে আপনি আসুন, আমি একটু পরে যাবো।

ঃ তার দরকার নেই। রিণার কাছে আর একটা চাবি আছে।

একটু থামলো অমিত। বললো ঃ আজকাল রিণা একটু দেরি করেই ফেরে। কোনদিন বলে বাসে ভিড়, কোনদিন বলে অফিসে কাজের চাপ। আমি আর কিছুই জিজ্ঞেস করি না।

ঃ কিন্তু তাতে জ্বালা কমেনা, বাড়ে—

অমিত একটা পুরনো কবিতার লাইন আওড়ালো ঃ সাগরে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়?

সুরঞ্জন একটু অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ এখন রিণা দেবী কি বলেন?

অমিত মুখ শুকিয়ে বললো ঃ রিণার সঙ্গে এখন ঝগড়া। কথা বন্ধ—

অমিত তারপরে কি যেন বলতে চাইলো। কিছুক্ষণ ইতস্তত করলো।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো ঃ মনে হচ্ছে, আপনি যেন কিছু বলবেন—

ঃ না, থাক।

ঃ কেন?

ঃ ওসব আমাদের ব্যক্তিগত কথা। ঘরোয়া ব্যাপার—

ঃ তবে থাক—

কিছুক্ষণ অমিত চুপ করে বসে রইলো। বোধহয় মনের যুদ্ধে সে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। তারপর সন্ধের পাত্‌লা অন্ধকারে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস রেখে সে বললো ঃ কি হবে আপনার শুনে, বলুন? তবে কি জানেন? একজন কাউকে না বললে বুকটা হাল্‌কা হবে না। আপনি সবই যখন শুনেছেন, আপনাকে বলতে আমার লজ্জা নেই।

তারপর অমিত তার দুঃখের কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করে। সুরঞ্জন খোঁজে তার বিবৃতির কোন সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা।

অমিত বলে চলে।

কিছুদিন হলো অমিত রিণার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে।

সে দেখছে, রিণার সাজসজ্জার ঘটা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। ইদানীং তার বাড়াবাড়ি চোখে না পড়ে পারে না।

প্রতি মাসের মাইনে পেলেই রিণার প্রথম কাজ নিউ মার্কেটের কাপড়ের দোকানগুলোতে যাওয়া এবং সেখান থেকে পছন্দ মতো শাড়ি কেনা। গোড়ার দিকে অমিত কিছু বলে নি। রিণাই নিজে থেকে বলেছেঃ মাইনে বেড়েছে। মাইনের বাড়তি টাকা দিয়ে একখানা শাড়ি কিনে নিয়ে এলাম। কেমন হয়েছে বলো তো?

অমিত বলেছেঃ সুন্দর। পরলে তোমাকে চমৎকার মানাবে।

দু গালে আশ্চর্য ভঙ্গিতে টোল পড়ে রিণার। তার সেই টোল পড়া মুখের মায়া অমিতকে তাদের বিয়ের আগের দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেন এখনও তাদের সেই সলজ্জ পূর্বরাগের পালা শেষ হয়নি!

রিণা বললোঃ দোকানে আরো কতো রকমের কাপড় দেখলাম। মনে হলো, টাকা যদি থাকতো—

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে অমিত বলেঃ তাহলে দোকানগুলোই কিনে নিয়ে আসতে।

রিণার টোল-খাওয়া গাল দুটো হাসির শ্বেতপদ্ম ফুটিয়ে তুলে ধরে। দিনান্তে পদ্মের ঝরে-পড়া পাপড়ির মতো তার হাসিও ম্লান হয়ে আসে।

অমিতের বড়ো দুঃখ হয়। জীবনে সে রিণাকে একখানাও শাড়ি কিনে দিতে পারে নি। তার জন্যে রিণা তাকে কোনদিন কোন অভিযোগ করে নি। যদি সে চাকরি করতো, তাহলে রিণাকে তো সে মাঝে মাঝে শাড়ি কিনে দিত! আজ যদি রিণা তার হয়ে তার নিজের জন্যে শাড়ি কেনে, তাতে মনে মনে তার এত আপত্তি কেন?

না, রিণা যত শাড়িই কিনুক, অমিত তাতে আপত্তি করবে না।

পরের মাসেই রিণা আবার শাড়ি কিনে নিয়ে এলো।

জিজ্ঞেস করলো ঃ কেমন হয়েছে বলো তো।

ঃ সুন্দর।

প্রতি মাসেই রিণা কাপড় কেনে। প্রথম প্রথম দেখাতো, মতামত জিজ্ঞেস করতো। আজকাল তাও করে না। কাপড় আনে, লুকিয়ে তুলে রাখে। ভেঙে যেদিন পরে যায়, অমিত অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে।

শুধু কাপড় নয়। কাপড়ের সঙ্গে ব্লাউস্। সঙ্গে সাজসজ্জা।

অফিসে বেরুবার আগে পুরো আধঘণ্টা সময় তার জন্যে তার বাঁধা। সারা মুখ পেণ্ট করে, ভুরু এঁকে, চোখে সুর্মা টেনে, ঠোঁটে লিপ্স্টিক্ দিয়ে, স্লিভ্লেস্ ব্লাউস্ পরে সে যখন সেজেগুজে দাঁড়ায়, তখন অমিত তার দিকে আড়চোখে একটু তাকিয়ে নেয়।

অমিত লক্ষ্য করেছে, রিণা আর আজকাল কপালে সিঁদুর পরে না। তার জায়গায় কপালে লিপ্স্টিকের একটা টিপ আঁকে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় সে একটু থম্কে দাঁড়ায়। মুখ না ফিরিয়েই বলে যায় ঃ আস্ছি—

অমিত মুখ না ঘুরিয়েই বলে ঃ এসো।

তারপর ঘরময় শূন্যতার মধ্যে অমিত নির্বাসিত হয়। বরং বলা চলে, ওটা তার একটা নিজস্ব জগৎ। সেখানে সে শুধু একা। একা বসে বসে সে রিণার এই হঠাৎ পরিবর্তনের কোন বাস্তব কারণ অনু-সন্ধান করে। সুপ্রিয়র সঙ্গে রিণা তার পুরাতন সম্পর্কের পুনরুদ্ধার করছে না তো? যদি করে, কি করতে পারে সে? রিণা তাকে খেতে দিচ্ছে, পরতে দিচ্ছে, এটাই কি যথেষ্ট নয়? তার বিনিময়ে রিণা যদি সুপ্রিয়র সঙ্গে ঘোরে, কোথাও বেড়াতে যায়, তাহলে তার কিছুই বলার নেই।

নিজের অসহায়তায় সে নিজের মনে হাসে। নিজেকেই সে আজ করুণা করে। রিণা নিজেকে আজ আরো সুন্দর, আরো লোভনীয় করে তোলার চেষ্টা করছে। অমিতকে সে আর বাঁধবে কি? সে তো

বাঁধা পড়েই আছে। তবে কি সুপ্রিয়কে ধরবার জন্যে এই আয়োজন ?

তাছাড়া আর কি হতে পারে ?

মনে পড়ে সেই কলেজে-পড়া দিনগুলোর কথা। সেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, সেই আউট্রাম ঘাট, সেই স্টীমারে করে বেড়াতে যাওয়া, গঙ্গার ঢেউতে জ্যোৎস্নার হীরে-ঝরানো দেখা। আরো মনে পড়ে, রিণাদের সেই বরানগরের বাড়ির ছাত, সেই মধুমালতীর গন্ধ।

সেই রিণা আজ রোজ রাতে যদিও তার বাহুবন্ধনে ধরা দেয়, মনোবন্ধনে হয়তো ধরা দেয় না। দিনের পর দিন তার আক্রোশ তাই বেড়ে চলেছে। একটা পশুর মতো সে আজকাল হিংস্র হয়ে উঠেছে। তার এই পাশবিকতার সে একটা অর্থ খুঁজে পায়।

কিন্তু মানুষের মনের ধর্মই হলো, সে তার স্ব-বাঁধন ছিঁড়ে যত দূরেই যাক্ না কেন, পরিধি-বিহার শেষ করে ক্লান্ত হয়ে তাকে তার কেন্দ্রের স্থিতি-বিন্দুতে ফিরে আসতেই হবে। হাউইর মতো একটা প্রেরক-শক্তির দাপটে সে শূন্যে উঠে যায়, কিন্তু ছাই হয়ে যাবার পর তার আর কোন অবলম্বনই থাকে না। তখন শিথিলতার ভারে সে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে। অমিত কিছুক্ষণ বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে। ঠিক ছিলাহীন ধনুকের মতো।

করলোই বা রিণা একটু সাজগোজ ? কি যায় আসে ? তার নিজের রোজগারের টাকায় সে যদি দুখানা শাড়ি বেশি করেই কিনে থাকে, তাতে ক্ষতি কি ? সে চাকরি করলেও তো রিণাকে শাড়ি কিনে দিত, সাজতে বলতো নিত্য নতুন করে। পুরাতন প্রেমকে দিন-দিন নতুন করে আস্বাদ করতো সে।

কেন সে নতুন নতুন কাপড়ে, নতুন নতুন সাজগোজে রিণাকে সহ্য করতে পারে না ?

অথচ সামনের ফ্ল্যাটের নবেন্দুবাবুর স্ত্রী যখন মুখ পেণ্ট করে, ঠোঁটে লিপ্‌স্টিক্ লাগিয়ে, চোখে গগ্‌ল্‌স্ পরে, স্লিভ্‌লেস্ ব্লাউস আর হাল্‌কা সিল্কের শাড়ি পরে নবেন্দুবাবুর পেছনে স্কুটারে বসে যায়,

তখন তো সে তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে। তখন তো তার খারাপ লাগে না? তাদের সুখ-শান্তিকে সে বরং মনে মনে ঈর্ষা করে।

আর ঘরের স্ত্রী পরলে যতো দোষ? না, রিণাকে সে আর ওভাবে দেখবে না। ওভাবে আর তাকে সে ভাববে না। সত্যিই তো, কতোই বা রিণার বয়েস। এই বয়েসে তার সব কিছুই ফুরিয়ে গেলে সে কি নিয়েই বা থাকবে? দামী গয়নাপত্র বলতে গায়ে তো কিছুই নেই। সেজেই যদি সে আনন্দ পায়, তা পাক না। অমিতের এত আপত্তি কেন? অমিত মনে মনে ঠিক করলো, সে আর রিণার সাজ-গোজে কোন আপত্তি করবে না।

তা না হয় হলো। কিন্তু রিণা বাড়ি ফিরতে আজকাল এতো দেরি করে কেন? বাইরে চাকরি করতে যায়, তা যাক। কিন্তু তাই বলে ছুটির পরেও সে বাইরে বাইরে ঘুরবে, তা তো সহ্য করা যায় না। বাইরে কি সে একা-একা ঘোরে? না, কেউ সঙ্গে থাকে? সঙ্গে যে যায়, কে সে? সুপ্রিয় নিশ্চয়ই।

সুপ্রিয়র কথা মনে আসতেই তার মাথার ভেতরটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে। উঃ! সুপ্রিয়! সুপ্রিয়! এই সুপ্রিয়র কাছ থেকে রিণাকে ছিনিয়ে আনবার জন্যেই তো সে তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা পাকা-পাকি করে ফেলেছিল। সে ভেবেছিল, রিণাকে নিয়ে সে সুপ্রিয়র কাছ থেকে দূরে দূরে পালিয়ে থাকবে। কিন্তু এমনি অদৃষ্টের পরিহাস যে, রিণাকে চাকরি করতে যেতে হলো। না, আর কোথাও নয়। সেই সুপ্রিয়র অফিসে।

অমিতের বুকের ভেতরে একটা জ্বালা ধরে। এই জ্বালাটাই তার লাভ। এই জ্বালাই তার নিয়তি।

যে ধূমায়িত আগুন অমিতের বুকের ভেতর একটা অন্ধ জ্বালা ধরিয়েছিল, তাই একদিন প্রচণ্ড বিক্ষোভের আকারে আত্মপ্রকাশ করলো।

সেদিন ছিল কি একটা ছুটির দিন।

আজ রিণা বেরুবে না। ভাবতেও ভালো লাগছিল অমিতের। কেবল রাতটুকুর জন্যে রিণাকে পাওয়াতে যেন মন ভরে না তার। আজ কেবল রাতটুকুই নয়, সারাটা দিনই সে রিণাকে কাছে পাবে। কেবল ব্রেসিয়ার আর হাল্‌কা শাড়িতে সে সারা দিনরাত রিণাকে দেখবে। কাল রাতে রিণার ভালো মতো ঘুম হয় নি। তাই বলে রিণা আজ দুপুরে পড়ে পড়ে ঘুমুবে, তা সে হতে দেবে না।

সকালটা ভালোই কাটলো।

ছুটির দিন। তাই খাওয়া হলো একটু দেরিতে। খাওয়া-দাওয়ার পর রিণা একটু জিরিয়েই সাজতে বসে গেল। অবাক্ হলো অমিত। জিজ্ঞেস করলো ঃ

ঃ আজ হঠাৎ সাজতে বসলে যে? কোথাও বেরুবে নাকি?

রিণা গম্ভীরভাবে বললো ঃ একটু বেরুতে হবে।

ঃ কোথায়?

ঃ অভিসারে।

বলে রিণা হেসে উঠলো।

অমিত তার হাসিতে যোগ দিতে পারলো না। সারা মুখটা তার শক্ত হয়ে উঠলো।

ঃ তাই নাকি? আবার নতুন করে সুরু হয়েছে বুঝি? কবে থেকে?

রিণা ধমক্ দিয়ে ওঠে ঃ আঃ। কি সব বাজে বক্‌ছো?

ঃ বাজে নয়, বাজে নয়। রোজ তোমার ফিরতে কেন দেরি হয়, আমি জানি না?

রিণা বিছানায় উঠে আসে। অমিতের পাশে বসে তার কপালের ওপর মুখটা রেখে বলে ঃ অমন করে বলো না, লক্ষ্মীটি। আমি—আমি তাহলে মরে যাবো।

রিণার মুখটা অমিত জোর করে সরিয়ে দেয়।

ঃ যাও, যাও। ধার-করা ভালোবাসা আমাকে দিতে এসো না।

রিণা উঠে যায়। বাথরুমে গিয়ে সে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে ফিরে এলো। মুখের সব রং মুছে এসেছে সে।

অমিত দেয়ালের দিকে মুখ ফিরে শুয়েছিল। ঘরের মধ্যে রিণার পায়ের শব্দ শুনে মুখ না ফিরিয়েই বলেঃ মাসে মাসে এত শাড়ি কোথেকে কিন্‌ছো, তা কি আমি জানি না?

রিণার মুখটা অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। সে বলেছিলঃ ও কথা বলো না। আমি শাড়ি কিনেছি আমার বাড়্‌তি মাইনের টাকায়।

ঃ মিথ্যা কথা বলো না। প্রত্যেক মাসে তোমার মাইনে বাড়ছে, না?

ঃ প্রত্যেক মাসে বাড়ে না। বাড়্‌তি মাইনের টাকা মাসে মাসে পাই।

কিছুক্ষণের জন্যে অমিত চুপ করে থাকে। কোন কথা খুঁজে পায় না।

এবার রিণাই কথা বলে। তার গলায় ক্রুদ্ধ সর্পিনীর নিশ্বাস।

ঃ আমি কিনেছি আমার কষ্টের রোজগারের টাকায়। এতো দিন বিয়ে হয়েছে। কখানা শাড়ি তুমি কিনে দিয়েছো? যার কিনে দেবার সামর্থ্য নেই, তার এভাবে বলাও মানায় না। বুঝলে?

ঃ রিণা—

অমিত যেন আর্তনাদ করে উঠলো। বুকের ভেতরের একটা পুরাতন ক্ষতে আজ খোঁচা দিয়ে ফেলেছে রিণা।

রিণার মুখের আজ আগল সরে গেছে। তার বহুদিনের রুদ্ধ আবেগ আজ তরল লাভার মতো তার গলা বেয়ে ওপরে উঠে আসছে।

ঃ কেন বলবো না? তুমি যখন বলো, তখন আমার মনের দিকে তাকাও? কিছু বলি না তাই। এতোদিন আমার আয়ের ওপর বসে বসে খাচ্ছো। লজ্জা করে না কথা বলতে? বিয়ে করতে হয়,

করেছ। কি দিয়েছ আমাকে? ছুটো খেতে দিতে পারো নি। উল্টে আমিই খাওয়াচ্ছি তোমাকে। তার আবার বেশি-বেশি কথা!

ঃ তাই বলে তুমি এখানে ওখানে বেলেল্লেপনা করবে?

রিণা প্রায় চিৎকার করে ওঠেঃ কি বেলেল্লেপনা করেছি?

দরজায় খিল তুলে দিয়ে কাছে এগিয়ে আসে রিণা।

ঃ তোমাকে আজ বলতে হবে, কি বেলেল্লেপনা করেছি। কোথায় দেখেছো আমার বেলেল্লেপনা?

অমিতের রাগ পড়ে এসেছিল। রিণা যা বলেছে, তার মধ্যে মিথ্যে কিছুই নেই। সবই সত্যি। কাজেই তার কথায় তার মন যদি ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়, তবু তা তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। অথচ কিছু না বলেও সে পারলো না। ছুর্বল গলায় সে বলে

ঃ অফিসে যাও। তা এতো রং মেখে যাবার কি দরকার? স্লিভ্‌লেস্‌ ব্লাউস্‌ পরে যাবার কি দরকার? তুমি তো আর সেখানে থিয়েটার করতে যাচ্ছো না?

ঃ অফিসের সব মেয়েরাই ঐভাবে সেজে আসে। তুমি জানবে কি? তুমি কি কোনদিন অফিসে গেছ?

এখানেও সে খোঁচা দিল তার পুরাতন বেদনার ক্ষতটায়।

রিণা আবার বলেঃ বিয়ের আগে কতো কথাই তো বলেছিলে? কিছুই দিতে পারো নি, কোনো কথাই রাখতে পারো নি। তুমি আমাকে ঠকিয়েছ—

ঃ রিণা—

ঃ কেন তুমি আমাকে বিয়ে করলে? আমি তো তখন বিয়ে করতে চাই নি। কেন তুমি আমার সর্বনাশ করলে? কেন, কেন?……

রিণা এবার কেঁদে ফেল্‌লো ঝর ঝর করে। বোধ হয়, ব্যর্থতার কথা এতো গভীর ভাবে সে কোনদিন ভাবে নি। বোধ হয়, এতো সাফল্যের সঙ্গে সেই ব্যর্থতার কথা সে কোনদিনই বলতে পারে নি।

রিণা কাঁদছিল। অমিত গায়ে জামাটা গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় বলে যায়ঃ আজ থেকে তোমার রোজগারে আর আমি খাবো না।

বলে অমিত একটা শক্ত দিব্যি দিল।

রিণা বলেঃ বেশ। তাহলে থাকার ব্যবস্থাটাও অন্যখানে করো। আর কখনো যেন এ মুখো হয়োনা।

দরজা খুলে অমিত সত্যিই বেরিয়ে গেল।

রিণা ভেবেছিল, অমিত হয়তো চলে যাবে না। এ ভাবে রাগের মুখে কারো কি কোথাও যাওয়া ঠিক? কিন্তু অমিত যখন সত্যিই বেরিয়ে গেল, সে অসহায়ের মতো বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

যদি সে সত্যিই না ফেরে?

মনে মনে বললোঃ কেন আমি তাকে ও কথা বলতে গেলাম?

রিণা হয় তো ভেবেছিল, সন্ধে হলে অমিত যথারীতি ফিরে আসবে।

না ফিরেই বা সে যাবে কোথায়? যাবারই বা তার স্থান আছে কোথায়? রিণার এখন কোন কাজ নেই। বিনা কাজে তার সেই নিঃসঙ্গ বেলা কাটতে চায় না কিছুতেই। বিছানায় গড়িয়ে ছট্ফট্ করতে লাগলো সে। একটু উঠে যে দরজায় খিল্টা তুলে দেবে, সে সাধ্যও তার নেই। যদি সে ফিরে আসে! দরজা বন্ধ দেখে যদি সে ফিরে চলে যায়!

সারাক্ষণ দরজা খোলাই পড়ে রইলো।

বিকেল ফুরোলো। সন্ধে হলো। সে এক বিষণ্ন সন্ধে। রিণা গভীর আলস্যে বিছানায় পড়ে রইলো। ঘরে আলোও জ্বাল্লো না। দরজায় খিলও তুলে দিল না। ঘরে ঠাকুর দেবতার কোন ছবিও নেই, পিদিম জ্বালবার বালাইও নেই।

বিছানায় শুয়ে সে নিজের মনে ভাবতে লাগলো।

কেন সে আজ বেরুতে চাইলো ? আজ না বেরুলেই কি চলতো না ? সব দিনই তো সে বেরোয়। একা-একা ঘরে পড়ে থাকে অমিত। বিনা কাজে একা ঘরে পড়ে থাকতে নিশ্চয়ই ভালো লাগে না তার। সে অফিস থেকে ফিরে আসে। আর অমিত সারাদিনের একা থাকার শোধ তোলে রাতের অন্ধকারে।

আজ ছুটির দিন বলে অমিত রিণাকে কাছ-ছাড়া করতে চায় নি। সারাদিন তাকে একা থাকতে হয়, আজ সে রিণার সঙ্গ-সুখ সারাদিন সারারাত পুরোপুরি ভোগ করবে। এই আশাই হয় তো তার ছিল। এই আশা করা কি অমিতের অন্যায় হয়েছিল ?

তার এই বেরুনো নিয়েই তো আজকের অশান্তির সূত্রপাত। তার জন্যে অমিত যে বেকার, সে খেতে দিতে পারে না, পরতে দিতে পারেনা, গয়না দিতে পারে না, উল্‌টে তাকেই খাওয়াতে হয়, পরতে হয়—এই সব মর্মঘাতী বাক্যবাণে সে তার মনটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। একে অমিত তার বেকারত্বের গ্লানিতে নিজেই জর্জরিত, তার ওপরে তার এ অতিরিক্ত গঞ্জনার বোঝাটা না চাপালেই কি চলছিল না ?

দুজনের মধ্যে একজন তো চাকরি করছে। তাতেই দুজনের চলে যাবে। পুরুষেরা তো চিরকাল মেয়েদের খাইয়ে পরিয়ে এসেছে। এই আধুনিক যুগে মেয়েরা যদি পুরুষদের খাওয়ায়, পরায়, তাতে তার আধুনিক মনের ক্ষুব্ধ হওয়ার কি আছে ?

আর তাছাড়া অমিতের তো আজ বেকার থাকবার কথা নয়।

সে আর্ট কলেজের সেরা ছাত্র। আদর্শবাদী। সে আজ বেকার জীবন যাপন করছে কেন ?

এতো বড়ো একটা দেশ। একজন শিল্পীর ভাত-কাপড়ের সংস্থান করে তার শিল্পচর্চার ব্যবস্থা করে দিতে পারে না ?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, অমিত ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে চৌরঙ্গীতে একটা স্টুডিও খুলতে চেয়েছিল। তখনও ব্যাঙ্ক ফেল্‌ মারে নি। সে-ই তো অমিতকে বারণ করেছিল।

তাকে স্টুডিও খুলতে দিল না। আর, কমাসের মধ্যেই ব্যাঙ্ক ফেল্ মারলো। তারপর থেকেই তো তাদের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এলো।

সেদিন যদি অমিত তার কথা না শুনতো! কেন শুনলো সে রিণার কথা? না শুনলেও তো সে পারতো? সে তার একান্ত প্রিয়পাত্রীর কথার মর্যাদা রেখেছে। এবং আজ সেই রিণা তাকে যা মুখে আসে, তাই বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সে কি অমিতকে তাড়িয়ে দিয়েছে? অমিতই তো রাগ করে বেরিয়ে গেল! তবু সে তাকে অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করতে বললো কেন? কেন সে তাকে এ-মুখো হতে নিষেধ করলো?

কেন? কেন?

সেদিন রাতে অমিত সত্যিই ফিরলো না।

হালদার বাগান লেনে রাত যখন নিশুতি, তখন রিণা বিছানা থেকে উঠে দরজায় খিল তুলে দিল।

সে রাতে খাওয়া হলো না তার। বিছানায় যেন বহু কালের পুরোনো শীত শুয়ে আছে। হাড়ের ভেতরেও কাঁপুনি লাগছে তার। অমিত থাকলে কতো শিগ্‌গির বিছানাটা গরম হয়ে উঠতো।

অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকলো রিণা। তারপর অমিতের বালিশটাকে কাছে টেনে আনে। বালিশে অমিতের মাথার চুলের গন্ধ লেগে আছে। রিণা বালিশটার ঘ্রাণ নিল। মনে হলো, যেন অমিত কাছেই আছে। তার গায়ের ঘ্রাণ ঘিরে ধরলো তার সকল অনুভূতিকে।

বিছানার অর্ধেকটা খালি পড়ে আছে। আজ খোকনকে তার বড় বেশি মনে পড়ছে। অনেকদিন সে তাকে দেখেনি।

বাইরে রাত নিঝুম। রিণা মনে মনে বললো: রাগের মাথায় কি বলেছি কি বলিনি, অমনি রাগ করে চলে যাওয়া হলো। তাও

আবার রাতেও ফেরা হলো না। কি এমন বলেছি। তুমিও তো কিছু কম বলো নি আমাকে। না হয় দুখানা শাড়ি বেশি কিনেছি, না হয় একটু বেশি করে সাজি। তাতে তুমি আমার চরিত্রের নিন্দে করলে?

দিনে অফিসে বন্দী, রাতে ঘরে বন্দী। ছুটির দিনে বেরুতে চেয়ে কি এমন অপরাধ করেছিলাম? তুমি তার জন্যে আমাকে যা নয় তাই বলে অপমান করলে? সুপ্রিয়র সঙ্গে আমার আগে ভাব ছিল, যদি জানতেই তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন? কে তোমার মাথার দিব্যি দিয়ে বিয়ে করতে বলেছিল? সুপ্রিয় তোমার চেয়ে ঢের ভালো। সে চাকরি করে দিয়েছিল বলে দুটি ভাত জুটছে, নইলে তাও জুটতো না।

কখন রিণার ক্লান্ত চোখে ঘুম এসেছিল রিণা জানে না।

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, তখন বেলা হয়ে গেছে। ঘুম ভাঙতেই আবার তার কালকের কথা মনে পড়লো। অমিতের ওপর রাগ হলো তার। রাগ করে অমিত কাল রাতে ঘরে ফেরে নি তাহলে? কিংবা এসে সে ডেকে ডেকে ফিরে গেছে? যদি তাই হয়? যদি সে কাল রাতে এসে ডেকে ডেকে ফিরে গিয়ে থাকে?

সে কেন ঘুমিয়ে পড়লো? কেন সে অমিতের পথ চেয়ে জেগে রইলো না?

না। অমিত আসে নি। এলে তাকে ডাকতো। তা হলে কি আর তার ঘুম ভাঙতো না?

অমিত তাহলে কাল রাতটা বাইরে কোথাও কাটিয়েছে। রিণার আবার রাগ হয়। বাইরে রাত কাটিয়ে আসাটা কি চরিত্রবানের লক্ষণ? আমি যদি একটা রাত বাইরে কাটিয়ে আসি, তখন? তখন কি হবে?

রিণা নিজের মনে হাসলো।

দিনের বেলা বেরুতে চেয়ে এতো কাণ্ড! বাইরে রাত কাটালে তো আর কথাই ছিল না।

রিণা সেদিন রান্না করলো না। স্নান করলো, না খেয়েই সময় মতো অফিসে গেল। সেদিন কোনো সাজগোজের বালাই নেই। অতি সাদাসিদে বেশে সে অফিসে গেল। মাথায় কাপড়ের কোণটুকু দিতেও ভুল হলো না তার। টিফিনের সময় রেস্তোরাঁয় গিয়ে একা-একা একটু খাবার আর চা খেল। তারপর অফিসে ফিরে এসে টেবিলে বসলো। কাজ করবার আজ বিশেষ ইচ্ছে নেই। ভালো লাগছে না কিছুই।

বাড়ি গিয়ে যে সে দেখবে, অমিত ফিরেছে, সে আশাও নেই। অমিত কাল রাগের মাথায় চাবিও নিয়ে যায় নি। ফিরবে না বলেই তো সে গেছে। চাবি নিয়ে যাবে কেন?

আজ যদি অমিত না ফেরে?

তাহলে কতোদিন সে এভাবে একা-একা থাকবে? যেখানেই থাকুক সে, একটিবারও কি সে ভাবছে না, রিণা কি ভাবে আছে, কি ভাবে তার দিন কাটছে? আজ যদি অমিত না আসে, তবে রিণা কালই তার বাপের বাড়ি চলে যাবে। দেখি, অমিত তাতে ঠিক টিট্ হয় কি না। অমিত ফিরে এসে তাকে ফ্ল্যাটে দেখতে পাবে না। কতোদিন ওভাবে থাকবে সে? শেষে একদিন বরানগরে গিয়ে তার কাছে দাঁড়াতে হবে।

রিণা ঠিক করলো, আজ যদি অমিত না আসে, তবে সে কালই বরানগরে চলে যাবে।

মুখ শুকিয়ে বাড়ি ফিরলো রিণা।

আজ বাজার হয় নি। ঘরে শুধু আলু ছিল। রিণা আলুভাতে ভাত চাপিয়ে দিল। কতোদিন সে না খেয়ে থাকবে?

হঠাৎ দরজায় কড়া নড়ে উঠলো।

রিণার বুকের ভেতরটা ধড়াস্ করে উঠলো। কিন্তু সে একটুও নড়লো না। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে যায়।

আবার কড়া নড়ে ওঠে।

রিণা তবুও অনড়।

কিন্তু একী করছে রিণা? কোথায় সে দরজা খুলে দেবার জন্যে ছুটে যাবে। তা নয়। তার নড়তেই যেন শক্তি নেই। কি হলো রিণার? কাল রাতে সে নিজের মনে তো কতো কথাই বলেছে। নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে মনে মনে। কিন্তু আজ সে দরজা খুলতে এ ভাবে দেরি করছে কেন?

রিণা দরজা খুলে দিল।

অমিত।

রিণা অমিতকে দেখলো, অমিত রিণাকেও দেখলো। কিন্তু কেউ কোন কথা বললো না। রিণা রান্নাঘরে ঢুকে গেল, অমিত বিছানার ওপরে বসে রইলো চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে রিণা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বললো: বলে গেলে এ-মুখো হবে না। আবার এ-মুখো হলে যে!

অমিত কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো: আসবো না ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, না এসে আমার উপায় নাই।

দেশবন্ধু পার্কের নরম ঘাসের ওপর বসে সুরঞ্জন একটা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যেতে দেখলো। কিন্তু কেন? এমন একটা সম্ভাবনাপূর্ণ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে এ ভাবে ম্লান হয়ে গেল কেন? কার দোষে?

অমিত বলেছিল: বাবার দোষে?

সুরঞ্জন প্রশ্ন করেছিল: কি করে?

: বাবার দোষেই তো বাড়িটা গেল?

: তিনি আবার বাড়ি বানিয়েছেন। কিন্তু ব্যাঙ্কের টাকা গেল কেন? আপনার চাকরি হলো না কেন?

অমিত চুপ করে থাকে।

সুরঞ্জন বলে: আপনার স্ত্রীকে চাকরি করতে যেতে হলো কেন? আপনাদের মন ভাঙাভাঙি হয়ে গেল? আসল কথা কি জানেন?

আমরা ডালপালাকেই আসল গাছ মনে করি। এখন যা দেখছি, সব ডালপালা; মূল রয়েছে যুদ্ধে। যুদ্ধের ধাক্কা এখনও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

অমিত একটা কথা বলবার জন্যে অনেকক্ষণ উস্‌খুস্‌ করছিল। এবার সে বলেই ফেললো ঃ যুদ্ধ যুদ্ধ করছেন। আমি কিন্তু কোথাও যুদ্ধ দেখছি না।

হাসলো সুরঞ্জন।

ঃ তার মানে নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না। আপনিও তো আদর্শ আদর্শ করে থাকেন। আপনার আদর্শ কি?

অমিত হঠাৎ চম্‌কে ওঠে।

ঃ একজন শিল্পীর যা আদর্শ হওয়া উচিত। ধরুন শিল্পীর স্বাধীনতা।

হেসে উঠলো সুরঞ্জন।

ঃ সেই স্বাধীনতাকেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ খুন করেছে।

ঃ এই একটা আপনি বাজে কথা বললেন। যুদ্ধই তো আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে।

ঃ হ্যাঁ, সেটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু আমি বলছি, সব রকমের স্বাধীনতার কথা। বলুন, আমরা পেয়েছি সেই সব স্বাধীনতা?

একটু থেমে সুরঞ্জন বললো ঃ যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর কালের নানা ঘটনা আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতাগুলিকে খুন করেছে।

অমিত আর কিছু বললো না। মনে হলো, সে সুরঞ্জনের কথাটার মর্ম গ্রহণ করেছে এবং তাকে সমর্থন করেছে।

সুরঞ্জন বললো ঃ আজ শুধু আমাদেরই ঘর ভাঙে নি, মন ভাঙে নি, জগতের অনেকেরই আজ এই অবস্থা। আর আপনি যে আদর্শের কথা বলছেন, এ যুগে তার কোন মূল্যই নেই। এটা আদর্শের যুগ নয়, চালাকির যুগ। বাঁচবার জন্যে শুধু চালাকি, কেবল চালাকি। কে কতো চালাকি করে নিজের আখের কতখানি

গুছিয়ে নিতে পারে, তারই কম্পিটিশান চলেছে, বুঝলেন? আপনি আদর্শবাদী হোন, ভালো মানুষ হোন, আপনাকে দেখে সবাই হাসবে। আর যদি আপনি চালাক লোক হোন, সবাই আপনার বুদ্ধির তারিফ করবে, আপনাকে শ্রদ্ধা করবে।

অমিত হাসলো। বললো : আপনি বলেন বেশ।

সুরঞ্জন এবার নিজের কথায় বিস্মিত হলো। সে কি দিনের পর দিন নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়ছে? চারদিকের ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত গ্লানি কি তাকেও ধীরে ধীরে গ্রাস করছে?

মনে পড়লো, উনিশ শো তেতাল্লিশের কথা। গ্রাম বিরামপুর, হাওড়া স্টেশন, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, বৌবাজারের একটি কারখানা— সব একে একে মনে পড়ে। এত সব দেখে শুনে মানুষ কখনো আশাবাদী থাকতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবে, সত্যের বিশ্লেষণ বা মিথ্যের সমালোচনা কখনোই নৈরাশ্যবাদ নয়। অমিত তাকে যা ভাবে, ভাবুক। সে তার নীতিতে অবিচল থাকবে।

অমিত বললো : আমি তাহলে চলি, সুরঞ্জনবাবু। আপনার কি ফিরতে দেরি হবে?

: আর একটু বসি। আপনি যান—

: অসুখ থেকে সবে উঠেছেন। বেশি ঠাণ্ডা লাগাবেন না।

ক্লান্ত, ব্যর্থ অমিতের মুখ থেকে এই কথা শুনে সুরঞ্জনের হাসি পাচ্ছিল। তাহলে অমিত এখনো নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এখনো সে ভালোবাসতে ভোলে নি, এখনো পরের ভালোর জন্যে তার মনের মধ্যে আলো আছে।

অমিত চলে গেছে।

তার চলে যাবার পরেও তার কথা সুরঞ্জনের মনে অনেকক্ষণ ধরে বাজতে থাকে। অন্ধকারের মধ্যেও তার ম্লান মুখ বহুক্ষণ ধরে ভাসতে থাকে।

মনটাকে অন্য কথায় সরিয়ে নেবার জন্যে সে আকাশের দিকে তাকায়। আকাশের মতো এমন সান্ত্বনা আর কোথায়? রাত বেশি

হয় নি। কিন্তু এরই মধ্যে কালপুরুষ উঠে এসেছে একেবারে মাথার ওপরে। এটা কি মাস? সুরঞ্জন হিসাব করে দেখলো, মাঘ মাসের আরও কটা দিন বাকি। বছরের এই সময়টায় কালপুরুষ সন্ধের পর মাথার ওপরেই থাকে।

মনে পড়ে, বাবা তাকে ছোট বেলায় রূপনারাণের ধারে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে আকাশের নক্ষত্রগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। সুরঞ্জন সব চেয়ে ভালো করে চিনে রেখেছে কালপুরুষকে। সেই কালপুরুষ আজো আকাশে ওঠে। আকাশের বুক থেকে চেয়ে দেখে পৃথিবীকে। না, সেদিনের পৃথিবী আজ নেই। তবু তার দিকে সে অপলক চোখে চেয়ে থাকে। তার সেদিনের আর আজকের চেহারার মধ্যে পার্থক্য কতো সুদূর, হয়তো তাই দেখে সে আজ মনে মনে হাসে।

আবার ঘুরে ফিরে অমিতের কথা, রিণা রায়ের কথা তার মনে পড়ে।

আজকেই অমিতকে সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেছিল: সেদিন রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?

অমিত বলেছিল: ভেবেছিলাম কোথাও যাবো না। রাস্তাতেই রাতটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। তাই আগর-পাড়া চলে গেলাম। ছেলেটাকেও অনেকদিন দেখি নি। তার কথা সেদিন বড়ো মনে পড়ছিল।

সুরঞ্জন বললো: কিন্তু অমিতবাবু, কিছু মনে করবেন না। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো।

: বলুন।

: আপনি বা রিণা দেবী দুজনের কেউ তো ছেলের কথা কখনো বলেন না। তার সম্বন্ধে বড়ো একটা ভাবেন না বোধহয়?

: সত্যকথা বলবো সুরঞ্জনবাবু? ও থাকে তার দাদুর কাছে। আমাদের কাছে থাকলে বোধ হয় তত আদর, তত যত্ন পেতো না। ওখানে ও ভালোই আছে। আমাদের কাছে অত ভালো থাকতে

পারতো না। তা ছাড়া, ছেলের কাছে আমার ব্যর্থতা যতদিন লুকোনো থাকে, ততই ভালো। আমাদের এই ঝগড়া-ঝাটির মধ্যে সে থাকলে কী বিশ্রীই লাগতো বলুন তো!

পার্ক থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সুরঞ্জন ভাবছিল, এমন দুঃসময় বোধহয় মানুষের ভাগ্যে কখনো আসে নি, যখন ছেলে বাপ-মার কথা ভাবে না, বাপ-মা ছেলের কথা ভাবে না, যখন স্বামী ভাবে না স্ত্রীর কথা, স্ত্রী ভাবে না স্বামীর কথা। মানুষের সমাজের মর্মে আজ ঘুণ ধরেছে। সে ঘুণ যে কিসে সারবে, তা কেউ জানে না। তবু মানুষ বাঁচতে চাইছে। অসহায় মুমূর্ষু মানুষ তবু বাঁচতে চায়।

সুরঞ্জনের মনে পড়ে, মিঠুয়া একদিন রান্নাঘরে আধ-বালতি জল রেখেছিল। মিঠুয়া ঘরে ছিল না। সুরঞ্জন কি একটা দরকারে রান্নাঘরে ঢুকেছিল। তার পায়ের শব্দ পেয়ে একটা নেংটি ইঁদুর লাফ মেরে পালিয়ে বাঁচতে গিয়ে একেবারে বালতিটার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে সে ওঠবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। প্রতিবারেই পা-গুলো তার পিছ্‌লে যায়। আর প্রতিবারেই সে ডুবে যায় জলের নিচে। অনেকক্ষণ ধরে চলে তার বাঁচবার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম। পা-গুলো ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে আসছে তার। তার ছোট্ট দেহের ভারটুকু ওগুলো আর বইতে পারছে না। ইঁদুরটা একবার ডুবে যায়, বুদ্‌বুদ্‌ তোলে গোটা-দুই। তারপর ক্ষণিকের জন্যে একটু ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠার ক্ষমতাও তার ফুরিয়ে এলো। শেষে শক্ত, টান হয়ে এলো তার সমস্ত শরীরটা। কয়েকটা শেষ বুদ্‌বুদ রেখে হাত-পা ছড়িয়ে সে বাল্‌তির তলায় পড়ে রইলো মুখ থুব্‌ড়ে। আর সে নড়লো না।

বর্তমান কালের মানুষ ঠিক তেমনি করে বাঁচবার জন্যে অসহায়ের মতো চেষ্টা করছে। কোন অবলম্বন নেই তার আজ। যাকে অবলম্বন ভেবে সে হাত বাড়াতে যায়, তাই তাকে প্রতারণা করে। তাই তাকে কয়েক পা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেয়। কেউ তাকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে আসে না।

সেও সেদিন ইঁদুরটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেনি। ইঁদুরটাকে ধীরে ধীরে মরে যেতে দেখেও সে তাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই করলো না। সে দাঁড়িয়ে দেখলো, ইঁদুরটা তার চোখের সাম্‌নে দম বন্ধ হয়ে মরে গেল।

হালদার বাগান লেনের সেই অন্ধকার বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সুরঞ্জন ভাবছিল, আমরাও এই বাতাসে সবাই ধীরে ধীরে দম বন্ধ হয়ে মরছি।

ঘরের সাম্‌নে এসে পড়েছে সুরঞ্জন। পেছনে কার যেন সে পায়ের শব্দ শুনতে পায়। পেছন ফিরে তাকায় সে। সিঁড়ির ক্ষীণ আলোর অন্ধকারে তার রিণা রায়কে চিনতে এতটুকু কষ্ট হয় না।

সে হেসে জিজ্ঞেস করেঃ রিণা দেবী যে! আজ এত দেরি কেন?

কিন্তু পরক্ষণেই সুরঞ্জনের মনে হলো, এ ভাবে রিণা রায়কে প্রশ্ন করা বোধ হয় তার ঠিক হয় নি। বড়ো অতর্কিতে তার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেছে। সুরঞ্জন লক্ষ্য করলো, রিণা রায় তার প্রশ্নের উত্তরটা সাবধানে এড়িয়ে গেল। সে বললোঃ আপনি সাম্‌নে আসছিলেন বুঝি? আমি ঠিক ধরেছিলাম যে উনি আমাদের সুরঞ্জন বাবু ছাড়া আর কেউ নন।

সুরঞ্জন আর তার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে রিণা রায়কে উত্যক্ত করলো না।

শুধু নিঃশব্দে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কিছু একটা সে রিণা রায়কে বলতে চায়। কিন্তু কি যে সেই কথাটা সে মনে মনে ঠিক করে উঠতে পারে না।

সুরঞ্জন কিছু বলবে, এই ভেবে রিণা রায়ও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ চলে যাওয়াও যায় না। দুজনের মুখেই কোন কথা নেই।

কিছুক্ষণ পরে রিণা এমনভাবে হেসে উঠলো, যার কোন অর্থই হয় না। তারপর বললোঃ আমি এখন আসি, কেমন?

সুরঞ্জন তার হাসিতে যোগ দিতে পারে নি। সে:বললো: রিণা দেবী, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। কিছু যদি মনে না করেন—

সঙ্গে সঙ্গেই রিণা বলে ওঠে: কিছু যদি মনে না করেন, সুরঞ্জনবাবু, আমি একটু পরে আসবো। এই মাত্র ফিরছি কিনা—

: নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি আজই আপনাকে আসতে বলছি না। আপনার সুবিধে মতো—

: না না, আমি আজই আসছি! আধ ঘণ্টার মধ্যে। কেমন?

রিণা বারান্দায় ঢেউ তুলে অতি দ্রুত চলে যায়।

সুরঞ্জন ঘরে এসে মিঠুয়ার পড়া ধরলো। বিছানায় বসে ভাবলো, রিণা রায়ের সঙ্গে তার প্রথম আলাপের কথা। হ্যাঁ রিণাই সেদিন প্রথম কথা বলেছিল। সিঁড়িতে রিণা কোন কথা বলে নি। গলিতে বেরিয়ে সে সুরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করেছিল: কিছু মনে করবেন না, আপনি বুঝি অমুক কাগজে কাজ করেন?

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেছিল: কেন বলুন তো?

: না, এম্‌নি আর কি! গুরুদাসবাবু বলছিলেন কি না।

: ও। কিন্তু আপনাকে তো চিনলাম না। আপনি—

: আমি অমুক কোম্পানীর ডিজাইনার—রিণা রায়।

: তার মানে আর্টিষ্ট। মিঃ রায় কোথায় কাজ করছেন?

: না। তিনি কোথাও কাজ করেন না। নিজের স্টুডিও আছে।

: কোথায়?

: চৌরঙ্গী পাড়ায়।

তুজনে চলেছিল শ্যামবাজারের মোড়ের দিকে। অনেকক্ষণ তুজনের মুখে কথা ছিল না। অথচ কেউ কাউকে পেছনে ফেলে চলে যেতে পারছিল না। যেতে যেতে রিণা বলেছিল: আপনার তো অনেক জায়গায় জানাশোনা আছে। ওঁকে কতকগুলো অর্ডার জুটিয়ে দিন না।

সুরঞ্জন কি একটু চিন্তা করে বলেছিল: আপনি যে জানাশোনার কথা বলছেন, ঠিক সে ধরনের জানাশোনা আমার নেই।

রিণা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল সুরঞ্জনের উত্তরে। তার সেই অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় লাগে নি। মুখে হাসির চক্‌মকি জ্বালিয়ে ধরে সে বলেছিল: তবে কি জানেন? আর্ট স্টুডিও ঠিক আমাদের দেশে চলে না। উনি অনেক রকম করে স্টুডিওটাকে 'রান' করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু হয়ে উঠছে না। কিছুদিন পরে হয়তো ওটা তুলে দিতে হবে। আপনি দেখুন না একটু দয়া করে, ওঁর একটা কাজ কোথাও জুটিয়ে দিতে পারেন নাকি। আপনাদের অফিসে তো প্রায়ই আর্টিস্ট দরকার হয়।

: তা হয়। কিন্তু কি জানেন? লোক-নেওয়ার ব্যাপারটা অন্যের কাজ। তবু আমি বলে দেখবো।

: কৃতজ্ঞ থাকবো তাহলে।

কথায় কথায় তারা শ্যামবাজারের মোড়ে এসে গিয়েছিল।

রিণা এবার সুরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করে: আপনি কোন্ দিকে যাবেন?

: এস্‌প্লানেড্। আপনি?

: আমিও।

রিণা একটু থেমে বলেছিল: তাহলে আসুন না, এক নম্বর ট্রামে ওঠা যাক।

: চলুন—

তারপরেও রিণার সঙ্গে সুরঞ্জনের কয়েকবার দেখা হয়েছে। সামান্য হাসি-বিনিময় কিংবা অল্প কথা-বিনিময়ও হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারেই রিণা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে: আমার কথাটা মনে আছে তো?

: আছে বৈ-কি!

সুরঞ্জন মাথা নেড়ে জানিয়েছে।

তার ক্ষমতার বাইরে হলেও সে চেষ্টা করছে রিণা রায়ের অনুরোধটা রাখতে। সে ডিরেক্টারদের কাউকে বলতে পারে নি।

তবু একজন ডিরেক্টারের পি. এ.-কে সে বলেছে। পি. এ. জানিয়েছেন, এখন আর্টিস্ট অনেক জমে আছে হাতে। কেউ না সরলে নতুন কাউকে বসানো যাবে না। পি. এ. হিসেব করে বলেছেন: একটু অপেক্ষা করুন। অমুক হয়ে এসেছেন। আর বেশি দেরি নেই।

কিন্তু পরে সুরঞ্জন অমিতের মুখ থেকে সমস্তই শুনেছে। শুনেছে, অমিত আর্ট কলেজের নাম-করা ছাত্র হয়েও সে আজও বেকার, স্ত্রীর অন্নপুষ্ট। বাড়ি তাদের হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কের সঞ্চয় যা ছিল, সব ভরাডুবি হয়ে গেছে। এবং চৌরঙ্গী পাড়ায় স্টুডিও— সম্পূর্ণভাবে রিণার মন-গড়া একটা কাল্পনিক ব্যাপার।

ওটা ঠিক মিথ্যে নয়। রিণার মনের বহুদিনের অতৃপ্ত সাধেরই একটা অসতর্ক প্রকাশ মাত্র। তাছাড়া বোধহয়, স্বল্প-পরিচিত একজন প্রতিবেশীর কাছে সে তার স্বামীর বেকারত্বের কথা প্রকাশ করে নিজেকে খাটো করতে চায় নি। এবং প্রায় একই নিশ্বাসে নিপুণ কৌশলে অমিতের জন্যে একটা কাজ জোগাড় করে দেবার জন্যে সুরঞ্জনকে অনুরোধ করতেও সে ছাড়ে নি।

কিন্তু চৌরঙ্গী পাড়ায় স্টুডিও খোলা যদি রিণার সাধ ছিল, তবে সে অমিতকে বাধা দিয়েছিল কেন? সুরঞ্জন মনে মনে তার কোন জবাব খুঁজে পায় না।

যে কারণেই সে বাধা দিক, সে যে বড়ো ভুল করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুজনে মিলে আজ পাঁচ বছর ধরে সেই ভুলের মাশুল দিয়ে আসছে। আরও কতোদিন যে তা দিয়ে যেতে হবে, তা কে জানে? কিন্তু স্টুডিও খুললেই অমিত সাফল্য লাভ করতো, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? যেখানে আর্টের কোন মূল্যই নেই, সূক্ষ্মতার কোন আবেদন নেই, সেখানে স্টুডিও খুলে অমিত যে সফলতা লাভ করতে পারতো, তা তো মনে হয় না। তবু একটা মনের সান্ত্বনা তো সে পেতো।

অমিত যে জীবনে নিজেকে, নিজের শক্তিকে পরীক্ষা করবার কোন সুযোগই পেল না, সুরঞ্জনের কাছে সেই দুঃখটাই বড়ো হয়ে ওঠে। সে

অমিতকে তার আন্তরিক সমবেদনা জানায়। তা ছাড়া তাকে দেবারই বা কি আছে তার?

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত সুরঞ্জন রিণার পথ চেয়ে বসেছিল। রিণা এলো না। রিণা আসবেই বা কেন? রিণাকে সে ডাকবেই বা কেন? তাকে ডাকার তার কি অধিকার আছে? যত আলাপ পরিচয়ই হোক, নিঃসম্পর্কীয়া এক ভদ্রমহিলাকে এভাবে রাতে তার ঘরে ডাকা কি তার ঠিক হয়েছে? রিণা তাকে ভুল বুঝলো না তো? রিণা তো ভুল বুঝবেই, অমিতও ভুল বুঝতে পারে।

সুরঞ্জনের নিশিকান্ত হাজরার কথা মনে পড়লো।

নিশিকান্তবাবু দেশের কাজ করেন। সবাই তাই জানে। দেশের কাজ ছাড়া তিনি কিছু জানেন না। বড়ো ভালো মানুষ তিনি। অকৃতদার, আদর্শবান লোক। সবাই জানে, দেশের কাজ মানে নিশিকান্ত হাজরা।

সে ও তাই জানতো। কিন্তু সেদিন অঞ্জলি দেবীর নিজের মুখ থেকে কথাগুলি শুনে তার ধারণা বদ্‌লে গেছে। অঞ্জলি দেবী আজ তাঁর সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন, সে অবশ্য তা জানে না। কিন্তু একদিন নিশিকান্তবাবুকে যে শ্রদ্ধা তিনি করতেন, আজ নিশ্চয়ই তা করবেন না। প্রথমে তিনি কি জানতেন, নিশিকান্তবাবুর আসল রূপ কোন্‌টা? জানেন নি। এবং জানেন নি বলেই সরল বিশ্বাসে তিনি নিশিকান্ত-বাবুর হাতে ধরা পড়েছেন।

হঠাৎ কি একটা শব্দে সুরঞ্জন দেয়ালের কোণের দিকে তাকালো। দেখে অবাক হয়ে গেল সে। একটা টিক্‌টিকি একটা আরশুলাকে মুখে ধরে দেয়ালে আছ্‌ড়ে মারছে।

হঠাৎ দৃশ্যটা তার চোখে কেমন যেন বীভৎস লাগলো। গা-টা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠলো তার। সুরঞ্জন ভাবে, যেখানে পদে পদে প্রতারণা, প্রতি নিশ্বাসে জান্তব ক্ষুধার আহ্বান, সেখানে ভালোমন্দের বাছ-বিচার কখনোই নিশ্চিত নয়। রিণা রায় হয়তো সুরঞ্জনকে অবিশ্বাস করলো। আজকের দিনে সেই অবিশ্বাস বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

রিণা তাহলে আজ আসবে না। না আসুক। কিন্তু সে যদি সুরঞ্জন সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা মনে নিয়ে থাকে, তবে তা ভেঙে দিতে হবে।

রাত হয়েছে। হালদার বাগান লেনের এই একমুখো গলিতে রাত মৃত্যুর মতো গভীর এবং শীতল হয়ে পড়ে আছে। তাকে খুন করে এগিয়ে এলো ওপাশের নবেন্দুবাবুর স্কুটারের আলো আর তার যান্ত্রিক চিৎকার।

সুরঞ্জন মনে মনে বলে, স্কুটার নয় তো, যেন একটা চলমান কারখানা। হয়তো দুজনে নাইট্ শোর ছবি দেখে ফিরছেন কিংবা গ্র্যাণ্ড্ বা ফিরপোর নৈশ পার্টি থেকে স্ফূর্তি করে বাড়ি ফিরলেন। তারপর তাঁরা সিঁড়ির নিচে চলমান কারখানাটিকে ত্রিপল চাপা দিয়ে রেখে ওপরে উঠে এলেন।

তাঁদের পায়ের শব্দ সুরঞ্জন শুনলো। নবেন্দুবাবুর স্ত্রীর গলায় একটা হাল্‌কা গানের কলি বাজছিল। তাও ঘরের ভেতর থেকে বেশ শোনা গেল।

রাত ঢের হয়েছে। রিণা রায় আজ এলো না।

সুরঞ্জন মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলো। রিণা দেবী আজ তাকে কি সত্যি অবিশ্বাস করলো?

পরের দিন সুরঞ্জন সকাল-সকাল অফিস যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। শরীরটা এখনও বেশ দুর্বল। ট্রাম-বাসের ভিড় এখনও তার সইবে না। এমন সময় দরজায় নক্ করলেন রিণা রায়।

দরজা খুলতেই রিণা রায় সুরঞ্জনকে বললো: কিছু মনে করবেন না সুরঞ্জনবাবু, কাল আর আসতে পারলাম না। রান্না করে উঠতে রাত হয়ে গেল। তখন ভাবলাম, এত রাতে ভদ্রলোককে উত্যক্ত করা ঠিক হবে না।

সুরঞ্জন বললো: তাতে কি হয়েছে? এমন একটা কিছু জরুরী ব্যাপার নয়।

রিণা দেখলো, সুরঞ্জন বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ এরই মধ্যে আপনার শরীর সেরে উঠলো ?

ঃ হ্যাঁ ; অনেক দিন হয়ে গেল তো। আর 'জয়েন' না করলে ভালো লাগছে না।

ঃ তাহলে কবে জয়েন করছেন ?

ঃ আজই।

ঃ কখন বেরুবেন ?

ঃ এখনই।

ঃ বেশ। আমি পার্কের সাম্‌নে অপেক্ষা করছি। আপনি বেরিয়ে আসুন। একসঙ্গে যাওয়া যাবে 'খন।

একটু থেমে রিণা বললো ঃ আপনাকে বরং অফিসে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমি চলে যাবো।

সুরঞ্জন হাসলো। বললো ঃ তা দরকার হবে না। আমি একাই যেতে পারবো।

রিণা যেন একটু ফিকে হয়ে গেল।

সুরঞ্জন বললো ঃ আপনি পার্কের সামুনে বরং একটু দাঁড়ান। আমি আসছি।

হাসিমুখে রিণা নেমে যায়। তার গমনভঙ্গি দেখে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের একটি উপমা সুরঞ্জনের বিশেষ করে মনে পড়ে—মরালগমনা। সত্যি, রিণার গতিভঙ্গি ঠিক হাঁসের মতোই—সুন্দর।

সুরঞ্জন তৈরী হয়ে নিচে আসতেই যোগমায়া দেবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাকে আজই অফিস বেরুতে দেখে তিনি একটু বিস্মিত হলেন।

ঃ সে কি ? তুমি আজ অফিসে যাচ্ছো নাকি ?

হেসে সুরঞ্জন বললো ঃ যাচ্ছি—

যোগমায়া দেবী পেছন থেকে বললেন ঃ দেখো বাবা, সাবধানে যেও। শরীরটা তো এখনো ঠিকমতো সেরে ওঠে নি।

মাথাটাকে ঈষৎ দুলিয়ে দিয়ে সুরঞ্জন বেরিয়ে আসে।

যোগমায়া দেবী চেয়ে থাকেন তার দিকে।

পরের সম্পত্তি অনধিকার ভোগ করছে সুরঞ্জন।

যেতে যেতে সে মনে মনে বলেঃ না, ফুরিয়ে যায়নি পৃথিবীটা। যোগমায়া দেবীরা যতদিন পৃথিবীতে আছেন, ততদিন পৃথিবী একেবারে দেউলে হয়ে যাবে না। কিন্তু এঁরা যখন পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে যাবেন, তখন আর ক্লান্ত, অসহায় মানুষের মাথা গুঁজবার স্থান কোথাও থাকবে না।

সুরঞ্জন ভাবে, সে একটা মরুভূমি। যেখানে একটা গাছের ছায়া নেই। সেখানে মানুষ বাঁচবে কি করে?

পার্কের সাম্‌নে রিণা রায় দাঁড়িয়েছিল।

সুরঞ্জন আসতেই সে বললোঃ আপনার অসুখের কথা শুনেছিলাম। কিন্তু আমার মনের অবস্থা বড়ো খারাপ ছিল, তাই আর আপনার খবর নিতে পারি নি। সত্যি, আপনি কি ভেবেছেন, জানি না।

ঃ কিছুই ভাবি নি।

সুরঞ্জনের মনের সাম্‌নে দুটি মূর্তি পাশাপাশি ভেসে ওঠে। একটি যোগমায়া দেবীর, আরেকটি রিণা রায়ের। দুটির মধ্যে কতো তফাৎ। অবশ্যি, তার কাছে রিণা রায়, অঞ্জলি দেবী, কেতকী, যূথিকা, করবী সব সমান। একটা মরুভূমিরই বিভিন্ন নাম।

শ্যামবাজারের মোড়।

সুরঞ্জন একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে দুজনে উঠে বসলো। ভূপেন বোস এভিন্যু, সেন্ট্রাল এভিন্যু ধরে ট্যাক্সি ছুটে চললো।

সুরঞ্জন ধীরে ধীরে বলেঃ রিণা দেবী, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করবো।

রিণা বললোঃ বলুন—

ঃ আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু—

রিণা চুপ করলো।

ঃ অনুমতি দিলেন তো ?

রিণা একেবারে যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ঃ সপ্তাহ দুয়েক হলো, অমিতবাবুকে বড়ো ম্লান দেখছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন—

রিণার ঠোঁটে একটা বিষণ্ণ, পাণ্ডুর হাসি ফুটে উঠলো। মাঝরাতে অস্তমুখী চাঁদের বিষণ্ণতার মতো।

ঃ তাহলে শুনুন—

সে সুরু করলো ঃ বিয়ের আগে ওকে উজ্জ্বল দেখেছিলাম। তার উজ্জ্বলতায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আপনার কাছে স্বীকার করতে আমার বাধা নেই। আমি ওকে ভীষণ ভালোবেসেছিলাম। এতো গভীর ভাবে কেউ কখনো ভালোবাসে নি। আমি বলেছিলাম, একটা চাকরি জুটিয়ে তারপর বিয়ে করলেই চলবে। কিন্তু ও শুনলো না। ফলে যা হবার তাই হলো। বিয়ের পরই সে একেবারে ম্লান হয়ে গেল। এই পাঁচ-ছ' বছরে সে একবারও জ্বলে উঠলো না। আর কোনদিনও যে সে জ্বলে উঠবে, তার সম্ভাবনাও নেই।

আবার রিণা রায় হাসলো।

ঃ কিন্তু কথায় কথায় আপনার অফিস ছাড়িয়ে চলে এসেছি, সুরঞ্জনবাবু। ড্রাইভারকে থামতে বলুন।

ঃ না ; চলছে, চলুক।

সুরঞ্জন হাতের ঘড়ি দেখলো ঃ এখন সবে ন'টা। কোথাও একটু বসা যেতে পারে। কিন্তু কোথায় বসা যায়, বলুন তো ?

সুরঞ্জন ড্রাইভারকে বলে ঃ কার্জন পার্ক—

মনুমেণ্টকে বাঁদিকে রেখে ট্যাক্সি গিয়ে কার্জন পার্কের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ওরা পায়ে-পায়ে হেঁটে গিয়ে পার্কের ঘাসের ওপর বসলো। রাতের শিশির শুকিয়ে গিয়েছিল। শীতের সকালের রোদ্দুর ভারি মিষ্টি লাগছিল গায়ে।

রিণা রায় নিজের মনে বললো ঃ এই পাঁচ-ছ' বছর শুধু আমিই জ্বলে পুড়ে মরছি।

সুরঞ্জন বললো : চল্‌ছিল তো ভালোই। কিন্তু সপ্তাহ দু'এক—

: আপনি একে ভালো চলা বলেন? ও তো শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছে। একা আমি কতো আর পারি বলুন তো? ঘর আর বাহির—একসঙ্গে আমি আর ঠেলতে পারছি না। উনি কাজ করবেন না। কাজের জন্যে চেষ্টা করবেন না। অবশ্যি গোড়ার দিকে একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আজকালকার দিনে ওইটুকু চেষ্টাই কি যথেষ্ট? আমি মেয়েমানুষ হয়ে যদি একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারি, তবে উনি পারেন না? ওঁর চাকরি আমি জুটিয়ে দেব?

: আপনি একটা ভুল করছেন, রিণা দেবী। আজকালকার দিনে একটা চাকরি জোটানো যে কী অসাধ্য ব্যাপার, তা তো জানেন? জেনেও ওঁকে মিছিমিছি—

: মিছিমিছি বলবেন না, সুরঞ্জনবাবু। আপনি আমার দিকটা দেখছেন না।

: দেখছি রিণা দেবী। আপনার কথা যখনই ভাবি, তখনই মনটা শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। আপনি কিভাবে সংসারটাকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন, তা কি আমি জানি না? কিন্তু দুজনের মধ্যে শান্তিটুকু তো চাই—

: শান্তি?

হাসলো রিণা। বললো : শান্তি কখনই আসবে না আর। আমি ভেবে দেখেছি, শান্তি আর আমাদের জীবনে আসবে না।

: এমন কথা কেন বলছেন?

: বড়ো দুঃখে বল্‌ছি, জানেন সুরঞ্জনবাবু?

রিণা থাম্‌লো একটু। তারপর বলে : এই পাঁচ-বছরে যখন ও কিছুই করতে পারলো না, তখন আর জীবনে কি ও কিছু করতে পারবে? আমার বিশ্বাস হয় না। আমার বাপের বাড়ির কাছেই একটা তালগাছ ছিল। বাজ পড়ো তার মাথাটা একেবারে পুড়ে গিয়েছিল। সেই বাজ-পড়া তালগাছটা অনেকদিন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল। ওকে আজকাল আমার সেই তালগাছটার মতো মনে হয়।

সুরঞ্জন অবাক হয়ে রিণার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। তার কথার ইঙ্গিতে সে চমকে উঠেছিল। সুরঞ্জন লক্ষ্য করলো, রিণার মুখটা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছে।

ঃ আপনি জানেন? উনি রোজগার পত্র কিছুই করবেন না। ওঁকে খাওয়াবার জন্যে আমাকে বাইরে বেরিয়ে রোজগার করে আনতে হবে। আর উনি ঘরে বসে বসে আমাকে শুধু সন্দেহ করবেন।

স্নো-ক্রীম-পাউডারের আবরণ ভেদ করে রিণা রায়ের নাকের ডগাটা ভিজে উঠলো। ব্যাগের ভেতর থেকে রুমাল বের করে নাক মুছলো সে। বললোঃ এতই তোমার যদি অবিশ্বাস, তবে নিজে চাকরি করো গে। আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকি। ঘরের বউ হয়ে আমি কি মনের আনন্দে চাকরি করতে যাচ্ছি?

ঃ তা নয়। তবে সব কিছুই তো সুখশান্তির জন্যে? সুখ-শান্তিই যদি না হলো, তবে এত সবের অর্থ কি?

ঃ এ কথাও আমি ভেবে দেখেছি, সুরঞ্জনবাবু। এ সবের কোন অর্থই নেই। আমার কাজ হলো, রোজ পশুর মতো খেটে যাওয়া; আর ওর কাজ হলো, মনের মধ্যে অবিশ্বাসের পাহাড় বানিয়ে তোলা। কেমন? এতে কখনো শান্তি আসে? মন যখন একবার ভেঙে গেছে, আর জোড়া লাগবে না।

রিণা কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়েছিল। একটু থেমে ময়দানের বাতাসে সে দম নেয়। বলেঃ ও কোথাও চলে যাক, আমারটা আমি ঠিক চালিয়ে নেব। কিন্তু ও চালিয়ে নিতে পারবে না। একদিন ও চলেও গিয়েছিল, জানেন?

সুরঞ্জন বলেঃ জানি।

ঃ ও। আপনাকে সব বলা হয়েছে বুঝি?

সুরঞ্জন হাসলো।

রিণা বলেঃ কিন্তু পরের দিনই সে আবার ফিরে এলো।

সুরঞ্জন চেয়ে দেখলো, অদূরে দুটি পাথরের-তৈরী সৈনিক মূর্তি বন্দুক নামিয়ে অবনত মস্তকে যুগযুগান্তরের পরাজয়ের প্রতীকরূপে

দাঁড়িয়ে আছে। তারা যে কতোকাল এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, কে জানে? হয়তো চিরকালের পরাজয়ের শিলাময় বেদনারূপে তারা বহুদিন বেঁচে থাকবে। ডালহৌসী স্কোয়ার থেকে প্রত্যাখ্যাত, ব্যর্থ, বিষণ্ণ ভবিষ্যৎ যখন রাজভবনের সিংহতোরণ ডানদিকে রেখে এই সৈনিক মূর্তি দুটির সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন তার নিজের প্রতিরূপকেই হয়তো দেখতে পেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাবে মনুমেণ্টের দিকে। আশা জাগবে, আলো ফুটবে মনে।

কিন্তু অমিতের মনে কি আর আলো ফুটবে? আজ রিণা সুরঞ্জনকে কি সব শোনালো? সে কি এই সব শুনবে বলে রিণা রায়কে ডেকেছিল?

সুরঞ্জন ঘড়ি দেখলো। দশটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি।

ঃ এবার ওঠা যাক। অফিসের সময় হয়ে এসেছে।

রিণা কাপড় ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো। একবার সে সুরঞ্জনের মুখের দিকে তাকায়। ভীষণ ভারি হয়ে উঠেছে তার মুখটা।

কার্জন পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে রিণা বললোঃ জানেন সুরঞ্জনবাবু? যে মন ভেঙে যায়, তা আর জোড়া লাগে না।

তার কথার কোন জবাব না দিয়ে সুরঞ্জন মুখ নিচু করে হাঁটতে থাকে। সে আবার তার চিন্তার জগতে ফিরে যায়। ভাবে, ভাঙতে আর সমাজের কিছুই বাকি নেই। সব কিছুই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে আজ।

দুজনে যে যার অফিসে চলে গেল। যাবার সময় ভদ্রতাবিনিময়টুকু হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে আন্তরিকতা ছিল না কোনো।

সন্ধের সময় সুরঞ্জন বাড়ি ফিরবার সময় দেখলো, অমিত আর রিণা রায় দুজনে একসঙ্গে হালদার বাগান লেনের কানাগলি থেকে বেরিয়ে আসছে। সুরঞ্জন দুজনকে একসঙ্গে দেখে ভারি খুশি হলো। হেসে জিজ্ঞেস করলোঃ কোথায় যাওয়া হচ্ছে দুজনের?

অমিত বললোঃ আগরপাড়া—

রিণা বললো ঃ বাবা চিঠি দিয়েছেন, খোকনের বড়ো অসুখ—

এক আবেগ-বিহ্বল মুহূর্তে সুরঞ্জন যে মর্মস্পর্শী কাহিনী শুনেছিল, বহুদিন পরে তাই আজ তার বড়ো বেশি মনে পড়ছে।

বড়ো বেশি মনে পড়ছে কেতকীকে।

কেতকী এই কাহিনীর নায়িকা।

শরৎকালের নদীর মতো সে কানায় কানায় পূর্ণ—ধীর, মন্থর। বর্ষার কেতকী শরতের আলোয় স্নান করে যৌবন-রাগে সুস্থির। গায়ের রং একটু ময়লা। কিন্তু যৌবনের দীপ্তিতে সেই রং ছাপিয়ে দ্বিতীয় একটি রং চোখে পড়ে। সেই রঙের কোন ভাষা নেই।

মাঝারি চেহারা। একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে হয়।

সুরঞ্জন তাকে প্রথম যেদিন দেখেছিল, সেদিন সে কেতকীর চেহারার একটা তুলনা খুঁজেছিল। দুঃখের বিষয়, সে কবি নয়। সে ঘটনার ব্যবসায়ী, উপমার ব্যবসায়ী নয়। তবু তাকে সাহায্য করেছিলেন এক স্বর্গীয় আধুনিক কবি। সুরঞ্জনকে তিনি কেতকীর উপমার জন্যে তার কবিতার দেড়খানি লাইন এগিয়ে দিয়েছিলেন—'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।' সত্যি, কেতকীকে দেখলেই মনে হয়, কোথায় যেন দেখেছি তাকে। আর চোখ? তাও 'পাখির নীড়ের মতো'।

স্নেহাংশু মারা যাবার পর অতি স্বাভাবিকভাবেই কেতকীর ওপর হেরম্ববাবু আর যোগমায়া দেবীর স্নেহের একটু আতিশয্য ঘটেছিল। তাতে তার পড়াশুনা যত ভালো হতে পারতো, তত ভালো নাকি হতে পারে নি। ফলে কলকাতায় আসার পর তাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে দু'বারে পাশ করতে হয়। আই. এ. পরীক্ষার সিঁড়িতে সে দু'বার হোঁচট খেয়ে ঘরে মাকে সাহায্য করার কাজে মন দিয়েছে।

কিন্তু দেহে মনে একটা গাঢ় বিষণ্ণতা—ঠিক আধুনিক কবিতারই মতো।

আধুনিক কবিতার পাঠকের মতো তারও একটি ভক্ত এসে জুটেছিল। তাকে আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার দেখেছি। সে নিশীথ। প্রথম দর্শনেই সুরঞ্জন তাকে সইতেই পারে নি। সুরঞ্জন ভাবে, কেন সে নিশীথকে সইতে পারে না? সে কি একটা জৈবিক ঈর্ষা? অথবা অন্য কিছু?

নিশীথ চড়া রং পছন্দ করে, চড়া গলায় কথা বলে।

অথচ আশ্চর্য, তাতেই কেতকী তার মনটাকে তার কাছে অনায়াসে বাঁধা দিয়ে ফেলেছে। হয়তো সে নিশীথের সেই আতিশয্যের অন্তরালে কোন সুন্দর পুরুষকে আবিষ্কার করেছে। সে হয়তো স্নেহে, ভালোবাসায়, দয়ায়, ক্ষমায় সত্যিই উজ্জ্বল। কিন্তু নিশীথ হেরম্ববাবুর কবিতার এমন নির্লজ্জ প্রশংসা করে কেন? সে কি সত্যিই কবিতা বোঝে? হেরম্ববাবুর কবিতা তার কি সত্যিই ভালো লাগে? নাকি তা শুধু হেরম্ববাবুর মনটাকে খাস দখল করবার একটা ছলনামাত্র? হয়তো সে কবিতা বোঝে, হয়তো হেরম্ববাবু আর যোগমায়া দেবীর প্রতি তার একটা অন্তরের আকর্ষণ আছে।

গিরিজাবাবু অনাত্মীয়, পরোপকারী নিশীথেরই শুশ্রূষা নিয়ে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁকে তো আর কেউ দেখে নি। তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা যখন কেউ কাছে ছিলনা, তখনই তো সে-ই তাঁর চিরকালের আত্মীয়ের মতো এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। হালদার বাগান লেনের বাড়িতে সুরঞ্জনের একবার খুব জ্বর হয়েছিল। শুশ্রূষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিশীথ তার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুরঞ্জন প্রথমে তার অযাচিত শুশ্রূষার মূল্য দেয়নি। তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। মনে পড়ে, কেতকী সেদিন ভীষণ মর্মাহত হয়েছিল। সেদিন সুরঞ্জন তার চোখে মুখে একটা বেদনার গোধূলি দেখেছিল। তারপর সুরঞ্জনের জ্বর আরো বেড়েছিল। জ্বরের ঘোরে ভুল

বকছিল সে। মিঠুয়া ডাক্তার ডাকতে গিয়ে পায় নি। শেষে নিশীথই তো জোর করে ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এসেছিল।

ঃ আসবেন না মানে ? রুগী ভুল বকছে। আর আপনি পড়ে পড়ে ঘুমোবেন। তা হবে না। চলুন—

ডাক্তার পৌঁছিয়ে দিয়ে সে হেরম্ববাবুদের ফ্ল্যাটে বসেছিল। রাগে অভিমানে সে আর ওপরে আসে নি।

কেতকী সেই নিশীথের মধ্যেই তার ভালবাসাকে খুঁজে পেয়েছিল।

একদিন দুপুরবেলা নিশীথ কেতকীকে বাইরের ঘরে একা পেয়ে বলেছিল ঃ চলো কেতকী, আজ একটা সিনেমা দেখে আসি ? দুখানা 'পাশ' পেয়েছি—

কেতকী চমকে উঠেছিল। বুঝি বা একটু ভয়ও পেয়ে গিয়েছিল।

ঃ সিনেমা ? কার সঙ্গে ?

ঃ কারো সঙ্গে নয়। শুধু তুমি আর আমি একা।

ঃ আমি যেতে পারবো না। মা আমাকে যেতে দেবে না।

ঃ মার কথা মা বলবে। তুমি যাবে কিনা বলো ?

কেতকী ভয়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল তার।

ঃ কি হলো ? কথা বলছো না কেন ? আমার সঙ্গে যাবে, এত ভাববার কি আছে ?

ঃ তুমি মাকে বলবে নাকি ?

ঃ মাকে বলবো কি বলবো না, সেটা আমার কথা। তুমি যাবে কিনা বলো।

কেতকী কি ভাবলো কিছুক্ষণ। মুখের ওপর আলো-আঁধারের কতকগুলি রেখা কেঁপে ভেসে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' দুটি মেঝে কামড়ে পড়ে রইলো। তারপর যেন বহু দূর থেকে ভেসে এলো একটি ভয়ার্ত পাখির কণ্ঠস্বর ঃ আমি যাবো না, নিশীথদা।

ঃ বেশ তো। এই কথাটুকু বলতে তোমার এত দ্বিধা কেন?

দুজনেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। কারো কোন কথা নেই। দুটি নিষ্প্রাণ শিলাহত বেদনা যেন মেঝের পাতায় খুঁজছে তাদের একালের হৃদয়-লিপি।

ঃ আমি এতদিন তোমাকে ভুল জানতাম।

কথাটা বলে নিশীথ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কেতকী চাপা-গলায় ডাক দিল ঃ চলে যেওনা নিশীথদা। শোন—

নিশীথের চলায় যেন থামার ছেদ নেই। কেতকী দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

ঃ নিশীথদা—

নিশীথ দাঁড়ালো। কিন্তু ফিরে তাকালো না।

ঃ শুনে যাও। আমি যাবো।

নিশীথ ফিরে এলো। কেতকীর মুখের দিকে তাকাতে তার একেবারেই ইচ্ছে নেই।

ঃ মা কি ভাববে, বলো তো?

নিশীথ কেতকীর দুচোখে চোখ রাখলো।

ঃ সে ভার আমার।

ঃ তুমি যে কি ছেলেমানুষী করো না! আমার ভীষণ লজ্জা করে। সবাই—

ঃ সবাই যায়। তোমারই শুধু লজ্জা।

একটু থেমে নিশীথ জিজ্ঞেস করে ঃ কি? বলবো মাকে?

কেতকী আর কিছু বললো না। সে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। নিশীথ ভেতরের দিকে চলে গেল। নিশ্চয়ই মার কাছে বলবার জন্যে।

সত্যি, কেতকী ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। এতদিন যা ছিল আড়ালে আব্ডালে, তা আজ মার কাছে প্রকাশ পেয়ে যাবে। হয়তো সব জানাজানি হয়ে যাবে। মার কাছে সে এর পর মুখ দেখাবে কি করে? ভয়ে তার বুক টিপ্‌টিপ্ করছিল, গলাটা শুকিয়ে আসছিল। কয়েক-

বার থুথু গিলে সে গলাটা ভিজিয়ে রাখতে চেষ্টা করলো। আর পেছন দিকের দেওয়ালটাকে তুহাত দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। হয়তো এতক্ষণে নিশীথ কথাটা বলে ফেলেছে।

তারপর ?

তারপর কি হবে ? মা মনে মনে কি ভাব্‌লো তাকে ? তার ওপরে যে তার মায়ের অগাধ আস্থা। আজ নিশীথ তাঁর বিশ্বাসের তুর্গকে ভেঙে একেবারে চৌচির করে দিল।

পাশের ঘর থেকে যূথিকা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো।

ঃ না—না—না।

কি ভেবে চিৎকার করে উঠলো যূথিকা ? কেন-যে সে এভাবে চেঁচায় ? উঃ !

কেতকীর প্রতিটি রক্তকণা রি রি করে জ্বলে ওঠে। হাসির একটা সময় পেলোনা সে ? যখন তখন একটা হাসলেই হলো। পাগ্‌লামির একটা মাত্রাও তো থাকে।

দেয়ালটাকে আরো জোরে আঁকড়িয়ে ধরে কেতকী।

মা কি বলে, শোনার জন্য কেতকী কান পেতে থাকে। কিন্তু তা কি শোনার উপায় আছে যূথিকার জন্যে ? নিজের মনে হেসেই চলেছে। হাসি যদি থামে, চিৎকার থামে না। চিৎকার থামলেই হাসি স্থুরু হয়। উঃ, ঘরটাকে একটা পাগলা-গারদ বানিয়ে দিয়েছে।

নিশীথের জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। এবার সে তাহলে ফিরে আসছে। মা কি বললো তাকে ? তাকে যেতে দেবে তো ? না কি নিশীথের কথাটাকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে ? মুখে মা যা-ই বলুক, মনে মনে কি ভাবলো কেতকীকে ?

নিশীথ ফিরে এলো।

ঃ কি হলো ? মা কি বললো ?

এইটুকু জিজ্ঞেস করতে কেতকীর গলাটা কয়েকবার কেঁপে উঠলো।

হেসে উঠলো নিশীথ। বললো ঃ তুমি এমন করছো যেন একটা খুন কিংবা ডাকাতি করতে যাচ্ছ। আরে, তুমি যাচ্ছ আমার সঙ্গে,

আর কারো সঙ্গে নয়। এতে মা আপত্তি করবে কেন? আর তুমিই বা আপত্তি করবে কেন?

ঃ থামো—

কেতকীর মুখ থেকে যেন কথাটা ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল।

নিশীথ অবাক হয়ে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে। কিন্তু কেতকীর দৃষ্টি অন্য দিকে। সে গম্ভীরভাবে বললোঃ তুমি ঠিক করে বলো তো। তুমি আমাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে—

হেসে উঠলো নিশীথ। বললোঃ তুমি কি পাগল হলে কেতকী? এতদিন আমাকে দেখছো। তবু চিনতে পারলে না? তোমাকে সিনেমা যেতে হবে না। আমার সঙ্গে যেতে যদি তোমার এত দ্বিধা, তুমি যেও না আমার সঙ্গে। ছি ছি, তুমি আমাকে এমনি ভাবো—

কেতকী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেঃ দোহাই তোমার নিশীথদা, তোমাকে আর লেক্‌চার আরম্ভ করতে হবে না। এই অসময়ে আরম্ভ করলে আজ আর থামবে না। সিনেমায় যাওয়া তাহলে আর হয়ে উঠবে না। বসে বসে তোমার সিনেমা দেখতে হবে।

কেতকী হাসতে থাকে।

নিশীথ তার হাসিতে যোগ দিতে পারে না। এত বলেও কেতকী তার মন গলাতে পারলো না। নিশীথ কিছু না বলে বাইরের দিকে এগিয়ে যায়। কেতকীর মুখের হাসি ধীরে ধীরে নিবে আসে।

একটু থমকে দাঁড়ায় নিশীথ।

ঃ মনে থাকে যেন পাঁচটার শো—

তারপর মাটিতে লাথি মারতে মারতে সে গিয়ে গলিতে দাঁড়ায়। তার পায়ের শব্দে দুপুরের গলিটা কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে।

কেতকী হাসি সাম্‌লাতে পারে না। নিশীথের ছেলেমানুষীতে সে নিজের মনে হেসে কুটি কুটি হয়।

ঃ কি যে ছেলেমানুষ না—

নিজের মনে সে হাসতে থাকে।

চারটে বাজতে না বাজতেই গলির মোড়ে ছায়া পড়ে আসে।

কেতকী বার বার মার মুখের দিকে তাকায়। মা হয়তো এবার তাকে কাপড়-চোপড় পরে তৈরী হতে বলবে। কিন্তু মার মুখ থেকে সে তেমন কোন কথার আভাস পেল না। সে যে নিশীথের সঙ্গে সিনেমায় যাবে, এ কথাটাও মা জানে বলে মনে হলো না। সে দুপুর থেকে এ পর্যন্ত বহুবার মার মনের দিকে তাকিয়েছে কিন্তু কোন ইঙ্গিতই সে পায় নি।

চারটে বেজে গেছে।

করবী কলেজ থেকে ফিরে এলো। বাচ্চু এখনো ঘুমুচ্ছে। আর একটু পরে সেও হয়তো উঠে পড়বে।

কেতকী বার দুই গলির দিকে তাকিয়ে ফিরে এলো।

এখনো নিশীথ এলো না।

এরপর তার পক্ষে যাওয়া ভারি মুশ্‌কিল হবে।

মা এখনো তাকে কিছু বলছে না।

অথচ কেতকীর চোখে-মুখে যে একটা প্রতীক্ষার চঞ্চলতা, তা কারো চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয়। করবী ঠিক ধরতে পেরেছিল। সে জিজ্ঞেস করলো : কি রে দিদি, তুই এমন করছিস্ কেন? •

একটু অন্যমনস্কভাবে কেতকী বলেছিল : কেমন?

করবী বলে : কেমন যেন—

: কেমন রে?

এমন সময় গলিতে নিশীথের জুতোর শব্দ শোনা গেল।

কেতকীর চোখে-মুখে তার এতটুকু প্রতীক্ষার ভগ্নাবশেষ নেই।

: একি? তুমি এখনো তৈরী হও নি? যাবে না?

করবী জিজ্ঞেস করলো : কোথায় যাবি রে দিদি?

কেতকী কিছুই বললো না। শুধু নিশীথের মুখের দিকে তাকালো।

: ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। শিগ্‌গির নাও—

কেতকী অতি ধীরে উঠে যায়। যেন তার কোন তাড়া নেই। কিছুক্ষণ আগে সে যে এক অধীর প্রতীক্ষায় সময় কাটিয়েছে, এখন দেখে তা মনে হয় না।

করবী তার পেছনে পেছনে উঠে যায়।

যোগমায়া দেবী হেরম্ববাবুর জন্যে খাবার তৈরী করছিলেন। কেতকী গিয়ে কাছে দাঁড়ালো।

ঃ মা—

ঃ কি?

ঃ যাবো?

ঃ যাও—

কেতকী কাপড়-জামা বের করে পরতে লাগলো। করবী জিজ্ঞেস করেঃ কোথায় রে দিদি?

কেতকী তার গালটা টিপে দিয়ে হেসে বলেঃ সিনেমায়—

ঃ কার সঙ্গে? নিশীথ-দার সঙ্গে?

এমন সময় কিছু না বলে অস্থির ভাবে নিশীথ ঘরে ঢুকে পড়ে। আর কতো দেরি তোমার?

করবী তখন কেতকীর ব্রেসিয়ারের হুক্‌টা আট্‌কিয়ে দিচ্ছিল। নিশীথকে দেখে কেতকী কোথায় লুকোবে খুঁজে পায় না। মেঝের ওপর লুটিয়ে-পড়ে-থাকা শাড়িটা কোনমতে গায়ে টেনে নিয়ে এক কোণে লুকিয়ে পড়ে।

নিশীথ বেরিয়ে যায়।

কিন্তু করবী মনে মনে বড়ো লজ্জা পায়। একটু রাগ হলো তার। দিদি কাপড় ছাড়ছে। নিশীথদা তা জেনেও কেন ঘরে ঢুকে এলো? ছি ছি, নিশীথদা যেন কেমন—

নিশীথের সঙ্গে কেতকী সিনেমায় গেল।

এর আগে অনেকবার সে সিনেমায় গেছে। কিন্তু সে মার সঙ্গে বা করবীর সঙ্গে। নিশীথের সঙ্গে তার এই প্রথম সিনেমায় যাওয়া। আজ যেন হালদার বাগান লেনের গলিটাও তার কাছে নতুন মনে

হচ্ছে। সবাই যেন আজ তার দিকে অবাক্ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার নিজেরও কি কম অবাক্ লাগছে আজ?

ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসলো দুজনে। নিশীথ বসলো একেবারে তার গা ঘেঁষে। তারপর সিগারেট ধরালো সে।

কেতকীর ভারি অদ্ভুত লাগে। নিশীথকে এভাবে নিবিড় নিঃসঙ্গে পাওয়া, তার পাশে বসে নিশীথের এই পরম তৃপ্তিতে সিগারেট খাওয়া। সবই তার আজ ভারি অদ্ভুত লাগে। সমস্ত দেহমন এক আশ্চর্য অনুভূতিতে তার ভরে গেছে। এই তো ভালো। সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে আজ নিশীথ তাকে ঘিরে থাকুক। ট্যাক্সি যেমন করে ছুটে চলেছে, ছুটে চলুক। এ পথ যেন না ফুরোয়।

ট্যাক্সি এসে সিনেমা হলের সাম্‌নে দাঁড়ালো।

কেতকীর মুগ্ধতার সুর কেটে গেল।

কিন্তু তার কাছে আজ সবই সুন্দর। হালদার বাগান লেনের সেই কানাগলিটা এখন আর মনে পড়ে না। যূথিকার পাগ্‌লামিও মনে পড়ে না। মার মুখ, বাচ্চুর মুখ কিংবা করবীর কৌতুকভরা চোখ দুটি—কিছুই আর এখন মনে পড়ছে না। বাবার মুখটা? না, তাও না।

এখন সে শুধু নিশীথকে দেখছে। তার দুচোখ ভরে আছে নিশীথ, তার পৃথিবী জুড়ে আছে নিশীথ।

হল অন্ধকার হয়ে বই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। নিশীথের হাত ধরে অন্ধের মতো অন্ধকার হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে কেতকী অজানা আসনের দিকে এগিয়ে যায়। তার সামনে নিশীথ। নিশীথকেই সে শুধু দেখতে পাচ্ছে।

দুজনে পাশাপাশি বসলো। কিছুক্ষণ সেইভাবে বসে থাকার পর তার মনে হলো, তারা যেন কতোকাল এইভাবে পাশাপাশি হেঁটেছে, পাশাপাশি বসেছে। তাদের যেন বিচ্ছেদ নেই, বিরাম নেই।

কৈশোরের ফ্রক সে কবে ছেড়েছে, তা আজ তার মনেও পড়ে না। যৌবনের শাড়ি গায়ে জড়িয়ে কতগুলো বছর তার কেটে গেল, তাও

আজ তার মনে পড়ে না। কিন্তু এই অনুভূতি তার একেবারে নতুন। সে ভেবেছিল, সে ভেতরে ভেতরে বুঝি মরে গেছে। হয়তো মরেই গিয়েছিল। নিশীথ তাকে বাঁচিয়েছে।

তার ভেতরকার নিস্তরঙ্গ দীঘিটায় সে ঢেউ তুলেছে আজ।

সে রাস্তায় কম-বয়েসী ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি হাঁটতে দেখেছে, তাদের দুচোখে কিসের মায়াও দেখেছে সে। তাদের দুজনের স্বপ্ন-রচনার কথা সে কতো ভেবেছে।

কলেজের কতো মেয়েকেই তো সে দেখতো, এক একটি ছেলের সঙ্গে আসতে। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে কতো মেয়ে। যে যার ভালোবাসার লোকের সঙ্গে। কেউ বা গেছে সিনেমায়, কেউ বা গেছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। তাদের দেখে সে কখনো মনে মনে হেসেছে, কখনো ঈর্ষা করেছে। না, সে কোনদিন ও ভাবে যাবে না। কোনদিন সে পাবে না তার ভালোবাসার মানুষ।

বেশি দূরে নয়, তাদের বাড়িতেই সে দেখেছে ছবি বৌদি আর রিণা বৌদিকে। ছবি বৌদি যখন নবেন্দুদার স্কুটারের পেছনে বসে যায়, তখন তাকিয়ে দেখতে তার বড়ো ভালো লাগে। কী সুখী জীবন ওদের? রিণা বৌদিকে নিয়ে অবশ্যি অমিতদা স্কুটার চেপে যান না। কিন্তু নতুন নতুন শাড়ি পরে রিণা বৌদি যখন অফিস যায়, তখন তার ভারি ঈর্ষা হয়।

সেও তো লেখাপড়া শিখেছে, সে কি কখনো ও রকম যেতে পারবে না? কিন্তু সিনেমা দেখতে এসে সে এ সব কি ভাবছে?

বই তো অনেকখানি হয়ে গেল, সে তো কিছুই মন দিয়ে দেখে নি। কিছুই বুঝতে পারছে না।

আসলে সে সিনেমা দেখছে না। সে শুধু নিশীথকেই দেখছে।

নিশীথও সিনেমা দেখছে না। সিনেমা দেখায় তার মনে নেই। সে কিছুক্ষণ চুপ করে সাম্‌নের পর্দার বুকে নায়ক-নায়িকার প্রণয়-লীলা দেখলো। তারপর বিচ্ছেদের পালা। নায়ক উচ্চ শিক্ষার জন্যে আমেরিকায় চলে যাচ্ছে। নায়িকা দম্‌দম্‌ এয়ার পোর্টে

সকলের সাম্‌নে নায়ককে ধরে হু হু করে কাঁদলো। তারপর ঘরে ফিরে এসে চলেছে বৈরাগ্য-সাধনা। সে কী কান্না!

এইসব কান্নার দৃশ্য নিশীথের ভালো লাগে না। সে কিছুক্ষণ কেতকীর একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে রইলো। তারপর সে কি ভেবে উস্‌খুস্‌ করতে লাগলো। কেতকীকে কানে কানে জিজ্ঞেস করলো:

: কেমন লাগছে?

: ভালো।

বলে কেতকী হেসে উঠলো।

: না। আমি বলছি ছবির কথা।

: ছবি? একদম ভালো লাগছে না।

: তবে চলো, বেরিয়ে যাই।

: চলো। আমিও সেই কথা তোমাকে বলবো, ভাবছিলাম।

দুজনে আবার অন্ধকারের ভেতর দিয়ে পথ চিনে চিনে বেরিয়ে এলো। কেতকীর হাত ছিল নিশীথের হাতের মুঠোয়।

হল থেকে বেরিয়ে এসে তারা একটা ট্র্যামে উঠলো। একটা সিটে দুজনে পাশাপাশি বসলো।

নিশীথ বললো: বাবা! বাঁচা গেল। মেয়েটা কাঁদছে না তো, যেন ইঞ্জিনে স্টীম ছাড়ছে। উঃ—

কেতকী তার রকম-সকম দেখে হেসে ফেললো খিল্‌ খিল্‌ করে। পাশের লোকেরা কি ভাববে, ভেবে সে চট্‌ করে তার হাসিটা সাম্‌লিয়ে নেয়। এসপ্লানেডে দুজনে নেমে পড়লো। ময়দানের ঘাসের ওপর দিয়ে দুজনে হেঁটে চললো দক্ষিণ দিকে।

: কোথায় যাচ্ছি, নিশীথদা?

: থামো! একটু দম নিতে দাও। ভাগ্যিস্‌ বেরিয়ে এসেছিলাম। নইলে এতক্ষণে কান্নার স্টীমে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতাম আর কি!

এবার কেতকী প্রাণ খুলে হাসলো।

ঃ জানো কেতকী, আমার এই কান্নাকাটি একদম ভালো লাগে না। কাঁদবো কেন? লড়ে যাও। কাঁদতে কাঁদতে জীবনটা যদি শেষ হয়ে গেল, তাহলে হাসবো কবে? ঘরে কান্না, রাস্তায় কান্না। আর স্লা, সিনেমা দেখতে যাবো, সেখানেও কান্না?

কেতকী বললো ঃ সত্যি, এত কান্নাকাটি আমারও ভালো লাগে না।

তখন ময়দানের বুকে গোধূলির পত্রলেখার শেষ পালা চলেছিল। কুয়াশা-ভেজা মিহি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে তারা কিছুদূর এগিয়ে কি ভেবে হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো।

কেতকী জিজ্ঞেস করলো ঃ

ঃ দাঁড়ালে কেন? চলো—

নিশীথ বললো ঃ ভেবেছিলাম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে গিয়ে ছু' মিনিট নিরিবিলিতে বসবো। কিন্তু এখানেই আসতে না আসতে সন্ধে উত্‌রে রাত হয়ে গেল। ছাখো তো, এখানটাও তো বেশ নিরিবিলি। অন্ধকারে ভিক্টোরিয়া যা, এলিজাবেথও তা।

বলে নিশীথ হেসে উঠলো।

কেতকী হাসতে পারলো না। সে কি ভেবে নিশীথের দিকে একবার শুধু তাকালো। কিন্তু অন্ধকারে সে নিশীথের মুখ দেখতে পেল না।

কেতকীর দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে নিশীথ জিজ্ঞেস করলো ঃ

ঃ কথা বলছো না যে?

নিশীথ কেতকীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

ঃ কথা বলো কেতকী, চুপ করে থেকো না।

নিশীথ আর কেতকীকে কথা বলার সুযোগ দিল না। তাকে ছুহাতে বুকের ওপর চেপে ধরলো। ঠোঁটের ওপর ছুঠোঁট রেখে সে ক্ষণকালের জন্যে নীরব হয়ে গেল।

নিশীথের গলায় কেতকীর গরম নিশ্বাস পাক্ খেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। বুকের মধ্যে তার চলেছিল এক অসহ প্রলয়-উৎসব। একালে ভালোবাসা যার নাম।

মাতালের মতো কেতকীর পা টল্‌ছিলো। দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না তার। নিশীথের বাহুর আশ্রয়ে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে সে প্রায় নিরবলম্ব হয়ে ভাবছিল, এর নাম বুঝি মৃত্যু, এর নাম বুঝি ভালোবাসা।

আর দাঁড়াতে পারছিল না কেতকী। আবেগ-কম্প্র কণ্ঠে সে বলেছিল: এসো, একটু বসা যাক।

নিশীথ তার কথাকে সম্মান দিল। দুজনে নিবিড় ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশাপাশি বসলো ঘাসের ওপর। নিশীথের গায়ে একটা গরম কোট ছিল। তবু সে কেতকীর স্কার্ফটার খানিকটা নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল। এবার সে এক হাতে কেতকীর কোমরটাকে জড়িয়ে ধরে তাকে আরো কাছে টেনে আনে।

: কেতকী—

: উঁ—

: এর পর কি হবে?

অন্ধকারে কেতকীর চোখ দুটো বড়ো হয়ে ওঠে। কেমন যেন ভয়-ভয় করছে তার।

নিশীথ কি বাকি কিছুই রাখবে না?

: কেতকী—

: উঁ—

: কি করবে তাহলে?

: কি?

: তোমার বাবা-মা কি রাজি হবেন?

বুক খালি করে একটা নিশ্বাস পড়লো কেতকীর। সে যা ভেবেছিল, নিশীথ তা নয়। নিশীথের প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করে: তোমার বাবা-মা?

: আমার বাবা-মার কথা আমাকে ছেড়ে দাও না।

একটু থামলো নিশীথ। তারপর বলে: মা তো জানোই, চিররুগ্ন। বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি তার নেই। বাবার কথাও আমি বিশেষ ভাবি না। বাবা আমাকে ভালোবাসেন।

ঃ তাহলে আমার বাবা-মার কথাও ভাবতে হবে না। প্রথমে হয়তো অমত করবে। কিন্তু মত না করেও উপায় থাকবে না।

ঃ কিন্তু—

ঃ কিন্তু কি ?

ঃ তোমার মা যেন গোঁড়া, তাতে কি তিনি—

ঃ তুমি কিছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাবা-মার অবস্থার কথা কেতকী ভালো ভাবেই জানে। পাকিস্তান থেকে তাঁরা নিঃস্ব হয়ে এসেছেন। এখানে এই ক বছরে বাবা রোজগার যা করেছেন, তাতে এত বড় একটা সংসার চলতে পারে না। কি কষ্টে সংসার চলছে, তাকি সে জানে না ? কবে সে ফ্রক্ ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। সে কি আজকের কথা ? তাহলে বয়েস কতো হলো তার ? বোধ হয় তিরিশ ছুঁই-ছুঁই।

কেতকী হাসলো নিজের মনে।

এরই মধ্যে বয়েস এতো হয়ে গেল ? কিন্তু বাবা-মা তো একবারও তার কথা বলেন না। তার মনে পড়ে, একবার মা পাশের ঘরে বাবাকে বল্‌ছিল ঃ কেতকীর জন্যে এবার একটু ভাবো। একটি ছেলে তো এবার দেখতেই হয়। বাবা মার কথায় কিছু বলেন নি। সেও বাবার মুখ দেখতে পায় নি। নিশ্চয়ই বাবা পোড়া চুরুটে টান দিয়ে অসহায়ের মতো মার মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

মা আর কিছু বলে নি। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাও চার-পাঁচ বছর আগের কথা। তারপর বাবা-মা আর ও বিষয়ে কখনো কোন কথা বলে নি। অন্তত সে তা শোনে নি।

কেতকী কতোদিন ভেবেছে, কোনদিন সে হয়তো সেই হালদার বাগান লেনের আঁধার গলি থেকে মুক্তি পাবে না। চিরকাল তাকে হয়তো সেই ঘুপ্‌সী গলির অন্ধকারে কাটিয়ে দিতে হবে। এই অন্ধকার থেকে মুক্তি নেই তার।

দেশবন্ধু পার্কের গাছগুলোতে সে দেখেছে, বোশেখ মাস এলেই হা-ঘরে কাকগুলোও ঘর বাঁধে। ডাল-পাতা-খড়-কুটো দিয়ে তারা

বাসা বানায়। কতোবার সে ও দৃশ্য দেখেছে। মনে মনে সেও বাসা বেঁধেছে। ঘর সাজিয়েছে। আলো আছে, বাতাস আছে, আকাশ আছে মাথার ওপর। ছোট্ট একটু বাগান। জানলায় আকাশী রঙের পর্দা। ঘরে রবীন্দ্রনাথের ছবি ,ফুল দানিতে কিছু রজনীগন্ধার স্টিক্। আর কি চাই? এই তো বেশ।

না, আর বেশি কিছু নয়।

একটু সচ্ছলতা আর একটি একনিষ্ঠ হৃদয়।

অসম্ভব এবং অবাস্তব।

যা কখনো তার জীবনে আসবে না, তার কথা ভেবে কেন মনটাকে সে মিছিমিছি বেদনায় ভরে তোলে? না, সে আর ও সব কথা ভাববে না। মন থেকে তার অবাস্তব কল্পনার ক্ষীণ রেশটুকু সে ঝেড়ে মুছে ফেলে দেয়। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার।

পরমুহূর্তেই তার বাবা-মার জন্যে বড়ো দুঃখ হয়। কি করবে তার বাবা-মা! তারা যে অসহায়। তাদের করারই বা আর কি আছে? আজ যদি তার বাবার কিছু হয়, কাল কি দশা হবে তাদের?

নিশীথ ডাকে ঃ কেতকী—

ঃ উঁ—

ঃ চুপ করে আছো যে। কথা বলো—

নিশীথের কাঁধের ওপর মাথা রেখে কেতকী ভাবছিল নিঃশব্দে। তার গরম নিশ্বাস ঝরে পড়ছে নিশীথের গলার ওপর। নিশীথ আবার তার মুখে চুম্বন রাখলো।

নিশীথকে আজ কেতকীর বড়ো ভালো লাগছে। সে আজ তার দুচোখে এক সুনিশ্চিত আলোর ঠিকানা দেখতে পেয়েছে। সে তাকে এই অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আলোতে নিয়ে যাবে। তার তিরিশ বছরের যৌবনকে সার্থক করে দেবে সে।

নিশীথের কাছে তার অনেক প্রত্যাশা, অসীম আস্থা।

ঃ চলো, কেতকী আজ ওঠা যাক।

: চলো—

উঠে দাঁড়াল দুজনে।

কেতকীর কিন্তু উঠতে ইচ্ছে ছিল না। আবার তো তাকে সেই অন্ধকার গলিতে ফিরে যেতে হবে। গলিটাকে তার বড়ো ভয় করে। কে যেন সেখানে হাঁ করে বসে আছে তাকে গিল্‌বার জন্যে।

: আর একটু বসলে হতো না, নিশীথদা?

: না; চলো, একটু চা খাওয়া যাক্—

খানিকটা হেঁটে ময়দান মার্কেটের পাশের রেস্তোরাঁয় তারা ঢুকলো। খিদেও পেয়েছিল। একটু খাবার আর চা খেয়ে তারা বেরিয়ে এলো।

খানিকটা হেঁটে ময়দান মার্কেটের সাম্‌নে দিয়ে হাঁটতে গিয়ে নিশীথ কি ভেবে মার্কেটের ভেতরে ঢুকে পড়লো। ভেতরে কাপড়ের দোকানের সারি। কতো রকমের শাড়ি ঝুলছে দোকানগুলোতে।

কেতকী অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখে। ও রকম শাড়ি সে জীবনে একখানাও পরে নি। যে শাড়িটা সে পরেছে, তার চেয়ে কতো ভালো শাড়ি দোকানে আছে। বাবা একটা শাড়িও কিনে দিতে পারে না।

: এখানে আবার ঢুকলে কেন?

কেতকী প্রশ্ন করে।

নিশীথ গম্ভীরভাবে বলে: কোন্ শাড়িটা তোমার পছন্দ, আমাকে বলো দেখি।

শাড়ির কথায় চম্‌কে উঠলো কেতকী।

: কোন্ শাড়িটা? কেন, তুমি কিনে দেবে নাকি?

: সে কথায় তোমার কাজ কি? কোন্‌টা পছন্দ তোমার, তাই বলো।

শাড়িগুলোর ওপর কেতকী একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

বলে: না নিশীথদা, শাড়ি তুমি কিনে দিও না। আমি নিতে পারবো না। বাড়িতে তাহলে মুখ দেখাতে পারবো না।

নিশীথ মনে মনে কি ভাবলো। বললো : বেশ, চলো।

যেতে যেতে সে আবার বললো : শাড়ি না হয় না-ই নিলে। অন্য কিছু নাও। কি নেবে বলো ?

কেতকী একটু ভাবলো। বললো : না। কিছুই নেবো না।

: কিছুই নেবে না ?

: নেবো। শুধু একটি কথা। বলো, একটি কথা দেবে ?

: কি ?

: তুমি আর কাউকে কোনোদিন ভালোবাসবে না ?

হাসলো নিশীথ। মুখটা তার পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে উঠলো।

: কেতকী, তুমি দেখ্‌ছি, এখনও আমাকে চিনতে পারো নি।

কেতকী নিশীথকে কি করবে ভেবে উঠতে পারে না। তার হাতে একটা টান দিয়ে সে বলে : রাগ করোনা নিশীথদা, আমি কি বলতে, কি বলে ফেলেছি।

: রাগ করিনি। এত সহজে আমি রাগ করি না। কিন্তু বড়ো দুঃখ হলো, তোমার কথাটা শুনে। এতদিন এত দেখেও আজও তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছো। আমি কিন্তু—

: আঃ—

কেতকী প্রায় ককিয়ে উঠলো। নইলে নিশীথ থামতো না। আরো অনেক কথাই সে শোনাতো তাহলে। কেতকী নিশীথকে দুঃখ দিয়ে ফেলেছে। সে জানতো না, নিশীথ এত সামান্য কথায় আহত হবে। নিশীথ চড়া রং পছন্দ করে, চড়া গলায় কথা বলে। কিন্তু তার ভেতরটা বড়ো নরম। সামান্য কথায় তার অন্তর বিদ্ধ হয়ে যায়। নিশীথ বড়ো অভিমানী।

দুজনে ট্র্যামের স্টপেজের দিকে হাঁটছিল।

কেতকী হঠাৎ থেমে যায়। নিশীথও ঘুরে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে : একি, থামলে কেন ?

: শোন—

: কি ?

ঃ আমি তোমাকে একটা জিনিস দেব।

কেতকীর কথায় নিশীথ হাসলো। জিজ্ঞেস করলো ঃ আমাকে আবার তুমি কি দেবে ?

ঃ কেন ? আমি বুঝি তোমাকে কিছু দিতে পারি না ?

নিশীথ হাসে।

ঃ আচ্ছা দাও, কি দেবে ?

কেতকী পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে হাঁটতে থাকে। কয়েক পা গিয়েই সে ধীর গলায় বলে ঃ আমাকে দিলাম।

ছুজনেই হেসে উঠলো।

নিশীথ দেখলো, ওদের ট্র্যাম এসে গেছে। আর দেরি না করে তারা তাড়াতাড়ি ট্র্যামে উঠে পড়লো।

এসব কথা স্থরঞ্জনের অনেক পরে শোনা। যার কাছ থেকে সে এই কাহিনী শুনেছিল, তার কাছ থেকে তা সে কোনদিন আশা করে নি। কেন সে তাকে এই কাহিনী শোনালো ? না-শোনাই তার বরং ভালো ছিল।

পরের কথা পরে হবে।

সেদিন কেতকীকে নিয়ে নিশীথ যখন ফিরে এলো, তখন রাত সাড়ে ন টা বেজে গেছে। হালদার বাগান লেনের সেই গলিতে স্থঁচ-ফোটানো অন্ধকার যেন ভেঙে পড়েছে।

বাইরের ঘরে বসে হেরম্ববাবু দলিল পত্র ঘেঁটে 'আরগুমেণ্ট' লিখছিলেন। ওদের তিনি দেখলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। যোগমায়া দেবী পাশের ঘরে শুয়ে পড়েছেন। তাঁর কোমরে বাতের ব্যথাটা আজ ভীষণ বেড়েছে। সন্ধে থেকেই শুয়ে আছেন তিনি। করবী পড়ছিল বসে। ওদের দিকে তাকিয়ে সে আবার বইয়ের পাতায় মন দিল।

বাড়িময় কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা অবজ্ঞা। কেমন যেন গুমোট্-করা আব্‌হাওয়া। যেন একটা ভীষণ অপরাধ করে ফেলেছে কেতকী। সবাই নিঃশব্দে তার অপরাধের দিকে আঙুল উঁচিয়ে রেখেছে। কেউ তাদের দুজনের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে নেই। কিন্তু সবাই যেন তাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

যূথিকা বোধহয় রান্নাঘরে। রান্নাঘর থেকে বাসন কোসনের শব্দ আস্‌ছে।

কেতকী জিজ্ঞেস করে: বাচ্চু কোথায় রে করবী?

: ওপরে। দাদার ঘরে—

করবী মুখ না তুলেই বলেছিল।

: খেয়েছে ও?

: না।

নিশীথ নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল। কেউ তাকে বসতেও বলে নি। সেও বসে নি। অন্ধকারে কেতকী তার কাছে এগিয়ে এসে বলেছিল: তুমি আজ যাও, নিশীথদা।

নিশীথ মেঝের ওপর জুতোর শব্দ রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হেরম্ববাবু বললেন: নিশীথ, চলে যাচ্ছো নাকি?

নিশীথ থেমে যায়। বলে: কেন?

: একটা কথা ছিল।

নিশীথ ফিরে আসে।

: বলুন—

: না থাক্। পরে বলবো।

নিশীথ চলে যায়।

এ ঘরে কেতকী কান পেতে দাঁড়িয়েছিল। সবই শুনলো সে। বাবা নিশীথদাকে কি বলবেন?

কেন? কি করেছে নিশীথদা?

আল্‌না থেকে একটা কাপড় নিয়ে সে বাথরুমে চলে যায়।

পরের দিন নিশীথ এলো না।

তারপরের দিনও না।

ছটো দিন যেন নিঃসাড়ে কেটে গেল। কেউ কারো সঙ্গে কথা বললো না।

কেতকী করবীকে এক পাশে ডেকে নিয়ে এক সময় জিজ্ঞেস করলো ঃ সেদিন মা কিছু বলেছিল রে করবী ?

করবী বললো ঃ বাবা জিজ্ঞেস করলো তোর কথা। মা বললো যে তুই নিশীথদার সঙ্গে সিনেমা গেছিস্।

ঃ আর কিছু ?

ঃ না।

ঃ বাবা কিছু বললো না ?

ঃ না।

বাবা নিশীথকে তবে কি কথা বলবে ? কেন তাকে সে সিনেমায় নিয়ে গেল, তাই জিজ্ঞেস করবে ? কিংবা অন্য কিছু ?

ছটো দিন বড়ো উদ্বেগে কাটলো কেতকীর।

তারপরের ঘটনা অবশ্য সুরঞ্জনের জানা।

সেদিন সকালে নিচে কিসের চেঁচামেচিতে সুরঞ্জনের ঘুম ভেঙে গেল। কান পেতে সে শোনবার চেষ্টা করলো। ছজন মেয়েমানুষের গলা। যোগমায়া দেবীর গলাটা চিনে নিতে তার অসুবিধে হয় নি। কিন্তু আর একজন কে ? নিচের অঞ্জলি দেবী নন তো ? অঞ্জলি দেবীর সঙ্গে যোগমায়া দেবীর ঝগড়া হবার কারণ কি হতে পারে ?

ছহাতে চোখ কচ্‌লে ঘুম মুছে সুরঞ্জন বাইরে এলো।

দোতলার বারান্দায় সবাই বেরিয়ে এসেছে। এপাশে নবেন্দুবাবু আর ছবি বৌদি। ওপাশে অমিত আর রিণা দেবী। নিচে অঞ্জলি দেবীও বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি কি ভেবে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু যোগমায়া দেবীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছেন কে? যোগমায়া দেবীর পাশে কেতকী আর করবী দাঁড়িয়ে আছে। অন্য কোন মহিলাকে তো দেখা যাচ্ছে না। ও পাশের বারান্দার আড়ালে চেহারাটা ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু তাঁর গলার স্বর স্বাভাবিকতাকেও ছাপিয়ে গেছে।

এবার গলাটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

না, অন্য কেউ নন; ইনি আমাদের গুরুদাসবাবু।

গুরুদাসবাবুর গলাটা তাঁর চেহারার ঠিক বিপরীত। একটু মেয়েলি। একটু বেশি চিৎকার করলেই মেয়েদের গলাও তাঁর কাছে লজ্জা পায়। প্রথম সুরঞ্জন তাঁকে আজ মহিলা বলে ভুল করেছিলেন। এখন তার হাসি পেল। কিন্তু ঝগড়ার বিষয়বস্তু তার মুখ থেকে হাসির সর্বশেষ রেশটুকুও নিঃশেষে মুছে নিল।

গুরুদাসবাবু বলছেন: আমি তখনই বলেছিলাম, ভাড়া ঠিকমতো দিতে পারবেন তো? আপনিই—হ্যাঁ আপনিই তো বলেছিলেন, তাতে কোন গোলমালই হবে না। দু একদিন এদিক-ওদিক হয়তো হবে। কিন্তু মাসে-মাসে ভাড়াটা ঠিক দিয়ে যাবো। ভালো মানুষের মতো তো এসে বাড়িতে ঢুকলেন। এখন যে ছ'মাসের ভাড়া বাকি পড়ে গেল।

যোগমায়া দেবী বললেন: ছ মাস কোথায়, গুরুদাসবাবু? এই মাসটা নিয়ে তো চার মাস।

: হ্যাঁ, চারমাস। রেণ্ট কণ্ট্রোলে তিন মাসের ভাড়া বাকি পড়লে কেস হয়, তা জানেন? আপনারা কি আমাকে দিয়ে কেস্ করাতে চান?

: কেস্ করবেন কেন? আপনার কাছে দু'মাসের ভাড়া তো ডিপোজিট্ আছে। কেস্ আপনি এখনও করতে পারেন না।

: ও—আরগুমেণ্ট দেখাচ্ছেন। ওকালতি করতে এলেন উনি। ভদ্র লোক হোন তো—

যোগমায়া দেবী বলেন ঃ দেখুন, আপনি ভদ্রলোকের মতো কথা বলছেন না। ভদ্রলোকের মতো কথা বলুন।

ঃ আপনারা আবার ভদ্রলোক যে আপনাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের মতো কথা বলতে হবে? ভদ্রলোক কখনো ভাড়া বাকি ফেলে না।

ঃ বেশ, আমরা না হয় অভদ্রলোক। আমরা ভাড়া ফেলেছি। আপনি তো ভদ্রলোক। আপনি আমাদের গয়নাগুলো মেরে খেলেন কেন?

তীক্ষ্ণ সুরে চিৎকার করে উঠলেন গুরুদাসবাবু ঃ কক্‌খনই না। আপনাদের গয়না ব্যাঙ্কে ছিল। ব্যাঙ্ক ফেল্ মেরেছে। তার জন্যে আমি দায়ী?

যোগমায়া দেবী বললেন ঃ মিথ্যে কথা! নিচে চুরি হয়ে যেতে পারে বলে ভয় দেখিয়ে আপনি গয়নার বাক্সটা নিয়ে গেলেন। বলেছিলেন, সাবধানে রাখবেন। দরকার হলেই ফেরৎ দেবেন। আমার পঞ্চাশ-ষাট ভরি গয়না। এই আপনার ভদ্রতা! বিশ্বাসঘাতক আপনি। আপনি গয়নাগুলোর লোভ সাম্‌লাতে পারলেন না? আমার এত টাকার গয়না মেরে দিলেন। তবু আমরা কাউকে জানাই নি। আর ক মাসের ভাড়া বাকি পড়ে গেছে বলে আপনি যা নয় তাই বলে আমাকে অপমান করলেন। ছি ছি, পাঁকে পড়েছি বলে আমাকে লাথি মারছেন, মারুন। মাথার ওপরে ভগবান আছেন, আমার গয়না চুরি করে আপনার ভালো হবে না। এই বলে রাখ্‌ছি—

ঃ হ্যাঁ; আপনি অভিশাপ দিন। তাতে আমার কিছু হবে না। আপনার গয়না ব্যাঙ্কের 'লকারে' রেখেছিলাম। ব্যাঙ্ক ফেল্ মেরেছে তো আমি কি করবো?

ঃ মিথ্যে কথা! ব্যাঙ্কে রাখলে তার রসিদ থাকতো।

গুরুদাসবাবু এবার ওপরে উঠছেন মনে হলো।

যোগমায়া দেবী বললেন ঃ রসিদ থাকবে কি করে? গয়না যে আমি আপনার মেয়ের গায়ে দেখেছি।

গুরুদাসবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেনঃ আমার মেয়ের গায়ে আর গয়না থাকতে পারে না?

একটু থেমে তিনি আবার বললেনঃ বেশ, পাকিস্তান থেকে গয়না নিয়ে এসেছিলেন, তেমন কোন রসিদ দেখাতে পারবেন আপনি?

যোগমায়া দেবীর কাছে তেমন কোন রসিদ ছিল না। তিনি বললেনঃ এখন আপনি ঐ সব ছল-চাতুরীর কথা বলবেন। ঠিক আছে, ভগবান বিচার করবেন।

গুরুদাসবাবু ওপরে উঠে আসতেই সুরঞ্জনের মুখোমুখি হলেন।

নিজের মনে সুরঞ্জনকে বললেনঃ দেখুন তো, ভাড়া বাকি ফেলেছে। চাইতে গেলেই গয়নার কথা বলে। কি ফ্যাসাদেই পড়েছি রে বাবা।

সুরঞ্জন গুরুদাসবাবুকে তার ঘরে ডাকলোঃ শুনুন—

ঃ শুনেছেন ভদ্রমহিলার কথা?

ঃ শুনেছি।

গুরুদাসবাবু ঘরে ঢুকলেন। সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলোঃ যা উনি বললেন, তা কি সত্যি?

ঃ পাগল হয়েছেন আপনি? আমি যাবো ওঁর গয়না চুরি করতে? আমি ক্যাল্‌কাটা য়ুনিভার্সিটির ফিলসফির একজন এম. এ.। আমার একটা আত্মসম্মান মানে সেল্‌ফ্‌-রেস্‌পেক্ট—

ঃ কিন্তু এ বড়ো কাঁচা যুক্তি আপনার, গুরুদাসবাবু।

ঃ কাঁচা যুক্তি? কাকে বলছেন কাঁচা যুক্তি? আমি আপনাদের মতো নোটবই মুখস্ত করে পাশ করি নি। হ্যাঁ—

গুরুদাসবাবু গলাটাকে একটু নিচু পর্দায় নামিয়ে আনলেন। বললেনঃ আপনার কি মনে হয়, আমি ওঁদের গয়না মেরে দিয়েছি? হোয়াট্‌ ইজ্‌ ইওর ওপিনিয়ন?

এমন সময় অবিনাশবাবু কিছু না বলে-কয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

নিজের মনে বললেনঃ ঠিক ঠিক, ওঁর কথাই ঠিক—

গুরুদাসবাবু ওঁর কথায় কান দিলেন না। বললেন: ভদ্রমহিলার মাথা খারাপ। দেখছেন না, ওঁর হাজ্ ব্যাণ্ড উকিল হয়েও কিছু বলছেন না। উনি কি কিছু জানেন না, মনে করেন?

সুরঞ্জন বললো: তা হয়তো জানেন। কিন্তু ভদ্রলোককে বড়ো শান্তিপ্রিয় মানুষ বলে মনে হয়। তিনি হয়তো এসব অশান্তি পছন্দ করেন না।

এবার গুরুদাসবাবুর রাগ এবং গলার স্বর দুইই হঠাৎ বেড়ে গেল। চড়া গলায় তিনি বললেন: আপনাকে আমি ভালো মানুষ বলে জানতাম।

অবিনাশবাবু বলে উঠলেন: ঠিক, ঠিক—

আগুনে যেন পেট্রোল পড়লো। ভীষণ রেগে গেলেন তিনি।

: কি ঠিক? আপনি তো ভারি বোঝেন কিনা? কালার ডিম কোথাকার—

গুরুদাসবাবুর চিৎকার সিঁড়ি বেয়ে ঊর্ধ্বমুখী হলো।

অবিনাশবাবু সুরঞ্জনের মুখের কাছে কান এনে জিজ্ঞেস করলেন: উনি কি বলে গেলেন?

সুরঞ্জন হেসে বললো: আপনার খুব প্রশংসা করে গেলেন।

: তাই নাকি? তা তো করবেনই।

অবিনাশবাবু হাসলেন আত্মতৃপ্তির হাসি।

সুরঞ্জন তাঁর কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করলো। সকালবেলা কি মনে করে?

: ঘড়িটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে।

: আপনি যান, আমি মুখ ধুয়ে যাচ্ছি।

সুরঞ্জন মুখ ধুয়ে যখন অবিনাশবাবুর ফ্ল্যাটে গেল, তখন অঞ্জলি দেবী তাঁর সাজগোজ শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। সুরঞ্জন ভদ্রতা বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলো: কোথায়?

হেসে অঞ্জলি দেবী বললেন: বাপের বাড়ি।

: বেশ। আজও কি ঝগড়া করে?

ঃ না। আজ মিষ্টি কথায়—

ঃ তাহলে আসুন। আর দেরি করছেন কেন?

অঞ্জলি দেবী বেরিয়ে গেলেন।

সুরঞ্জন সেই ভয়ানক ঘড়িটাতে দম্ দিল। ঘড়িটা দম্ খেয়ে চলতে সুরু করলো। মৃত্যুর বুকের স্পন্দন বুঝি এই রকম। নিজের হাতের ঘড়ি দেখে ভাঙা কাঁটাটাকে সাতটার ঘরে রেখে সুরঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

কেতকী ওপরের ঘরে চা রেখে নিচে নেমে আসছিল। সুরঞ্জনকে দেখে বলে ঃ চা দিয়ে এসেছি। আর—

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে ঃ কি?

কেতকী কিছু বললো না। সুরঞ্জনের পেছনে পেছনে ওপরে উঠে এলো। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো ঃ কি যেন বলছিলে তুমি?

ঃ সকালে কি বিশ্রী ব্যাপারটা হলো বলুন তো।

ঃ হুঁ—

একটু গম্ভীর হয়ে এলো সুরঞ্জনের মুখটা। চায়ের কাপটা কেতকীর হাতে দিয়ে সুরঞ্জন বলে ঃ একটা কথা বলবো, রাখবে কেতকী?

ঃ কি?

ঃ এবার থেকে সকালে আমাকে চা দেওয়া বন্ধ করো—

ঃ এমন কথা বলবেন না। মা শুনলে ভীষণ দুঃখ পাবে। একে তো আজ সকালে বকাবকি করে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। তার ওপর একথা শুনলে তো—

ঃ তবে থাক্। কিছু বলো না।

সুরঞ্জনের নিজেকে বড়ো বিপন্ন বোধ হয়। আজ সকালের ঘটনার পর তার মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেছে। কিছুতেই মনটাকে সে ভালো করতে পারছে না।

কেতকী বলে ঃ আজ আপনি কখন বেরুবেন?

ঃ বিকেলে। কেন?

ঃ মিঠুয়াকে একটু দরকার।

ঃ ওকে আমিও দেখ্‌ছি না। দেখ্‌তে পেলে ডেকে নিও—

কেতকী বেরিয়ে গেল।

সুরঞ্জনের আবার একটা ফীচার লিখতে হবে। কলম, প্যাড্‌ নিয়ে বসলো সে। কিন্তু লিখতে পারলো না। ঘুরে ফিরে সকালের ঘটনাই বারে বারে মনে পড়তে লাগলো।

যোগমায়া দেবী তাঁর সেকালের বিশ্বাস নিয়ে গুরুদাসবাবুর কাছে তাঁর গয়নার বাক্স রেখে নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি জানেন না, একালের পৃথিবী বিশ্বাস কাকে বলে জানে না। কিন্তু যোগমায়া দেবী কেন এতখানি বিশ্বাস করলেন গুরুদাসবাবুকে? কেন হেরম্ববাবু বাধা দিলেন না?

হয়তো হেরম্ববাবু বাধা দিয়েছিলেন। কিংবা তিনিও বিশ্বাস করেছিলেন একালের এই বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীকে। সুরঞ্জন ভাবে, সাধে কি হেরম্ববাবু এতো নৈরাশ্যবাদী হয়ে উঠেছেন? জীবনে অনেক আঘাত পেয়েছেন তিনি। পায়ের তলার মাটি যেন এক বিপুল ভূমিকম্পে কোথায় উড়ে গেছে।

সুরঞ্জন অনেক চেষ্টা করলো। লিখতে পারলো না কিছুতেই।

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ হলো। শব্দটা নিচে নেমে গেল। রিণা রায় বোধহয় অফিস যাচ্ছে। ওরা এখন ভালো আছে। আগরপাড়ায় ওদের ছেলেও সেরে উঠেছে। অমিত দু'এক জায়গায় কাজের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিছুই হয় নি। শেষে এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্স্‌চেঞ্জে নাম রেজেস্ট্রি করে এসেছে।

আবার কাদের পায়ের শব্দ নিচে গেল। বোধহয় নবেন্দুবাবু অফিস যাচ্ছেন। সঙ্গে গেলেন ছবি বৌদি। তিনি কথা বলতে বলতে গলির মোড় পর্যন্ত নবেন্দুবাবুকে এগিয়ে দিয়ে এলেন। নবেন্দুবাবু স্কুটারে স্টার্ট দিলেন। এখান থেকে সুরঞ্জন তা শুনতে পেল। তার কিছুক্ষণ পরে ছবি বৌদির চটুল চটির শব্দ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল।

এ বাড়িতে ঐ একটি সুখী পরিবার। জগতের সমুদ্রমন্থনের বিষ ওই ফ্ল্যাট্‌টাকে যেন স্পর্শই করেনি। ওদের কথা ভাবতে সুরঞ্জনের ভালো লাগে।

কিছুক্ষণ পরে মিঠুয়া ফিরে এলো।

তার মুখ থেকে সুরঞ্জন জানতে পারলো, তাকে কেতকী নিশীথকে ডাকতে পাঠিয়েছিল।

নিশীথ আজ কয়েকদিন পরে নিচের ফ্ল্যাটে এলো।

সত্যি, নিশীথের মতো ছেলে হয় না।

বিপদের সময় সে ছাড়া পাশে এসে দাঁড়াবার আর কে আছে?

খবর পাওয়ামাত্র নিশীথ এলো। যোগমায়া দেবীকে বিছানা থেকে টেনে তুললো সে। হেরম্ববাবুকে ভরসা দিল। সবার মুখে হাসি ফোটালো।

সত্যি, আজকালকার দিনে নিশীথের মতো ছেলে পাওয়া যায় না।

তবু কেন সুরঞ্জন তাকে সইতে পারে না? তার বেশবাস, তার কথাবার্তা—কিছুই সুরঞ্জনের ভালো লাগে না। কিন্তু কেন? কেতকী ভেবেছে অনেক। নিশীথকে কেন উনি সইতে পারেন না? কী উপকারী ছেলে। অথচ সেদিন তাকে উনি অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। কেতকীর যে কী খারাপ লাগছিল সেদিন। সে আর বেশিক্ষণ সুরঞ্জনের বিছানার পাশে বসে থাকতে পারে নি! এমন ছেলেকে এমন অপমান! ছি ছি! সেদিন কেতকী মনে মনে বড়ো দুঃখ পেয়েছিল। নিশীথকে সেদিন থেকে তার আরো ভালো লাগলো।

সুরঞ্জনও ঠিক বুঝতে পারে না, কেন নিশীথকে তার ভালো লাগে না। সুরঞ্জন কি তবে মনে মনে কেতকীকে ভালোবাসতে সুরু করেছে?

সে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

নিশীথ এসে সকলের মুখে হাসি ফোটালো।

কদিন নিচের ফ্ল্যাটে যেন বরফ জমে রয়েছিল। কারো মুখে কোন কথা ছিল না, কোন গতি ছিল না নিচের ফ্ল্যাটের জীবনে। আজ

সেই বরফ যেন গলতে সুরু করলো। সকলের কথা শোনা যেতে লাগলো। নিচের ফ্ল্যাটে যেন আবার গতির ছন্দ ফিরে এলো।

কেতকীও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

সেদিন সিনেমা দেখে ফেরার পর বাড়িতে যে একটা গুমোট্ করা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে এসেছে। ওদের ঘরগুলোর দরজা-জানলাগুলো যেন অনেক দিন খোলা হয় নি। নিশীথ এসে যেন সবগুলি দরজা-জানলা টান মেরে খুলে দিল। ঘরগুলোর গুমোট্-ধরা হাওয়া সব বেরিয়ে গেল, বাইরের ফুড়ুৎ চড়াই ঘরের মধ্যে খেলে বেড়াতে লাগলো মনের আনন্দে।

ঘরের কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলতে লাগলো।

হেরম্ববাবু যথারীতি কোর্টে যাচ্ছেন, করবী কলেজে যায়, নিশীথ আসে, যোগমায়া দেবী তাঁর বিগত বেদনার কথা শোনান।

তারই মধ্যে যোগমায়া দেবী একদিন নিশীথকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আচ্ছা নিশীথ, তুমি আর লেখাপড়া করলে না কেন ?

নিশীথ ঠোঁট বেঁকালো।

ঃ না মাসিমা, লেখাপড়া আর আমাকে দিয়ে হবে না।

ঃ কেন বাছা ?

নিশীথ একটু থামে। বলে ঃ ও বড়ো পরিশ্রম। আমাকে দিয়ে আর হবে না। যা হবার হয়ে গেছে।

যোগমায়া দেবী একটু হাসেন।

নিশীথ বলে ঃ লেখাপড়া শিখে কি হবে বলুন তো, মাসিমা !

যোগমায়া দেবী বলেন ঃ কেন ? লেখাপড়ার কি কোন দাম নেই ?

ঃ কেন দাম নেই, মাসিমা। এম-এ পাশ কিংবা বি-এ অনার্স— দুশো টাকা মাইনে। কিংবা বড় জোর ইস্কুল মাস্টারী। এত রাত জেগে, এত পড়া মুখস্ত করে শেষে কিনা এই। আজকালকার দিনে দুশো টাকার দাম কি বলুন তো ? ওতে একটা মানুষেরও ঠিক মতো চলে না। এই সব ভেবে-চিন্তে আমি আর ওই মিনিংলেস্ লেখা-পড়ার মধ্যে নেই।

কাছেই করবী বইতে মুখ গুঁজে বসেছিল। সে বললেঃ নিশীথদা, আপনার কথাগুলো কেমন 'আঙুর ফল টকে'র মতো শোনাচ্ছে।

নিশীথ বলেঃ না ভাই, কোনদিনই লেখাপড়া আমার ভালো লাগে নি, এখনও লাগে না।

যোগমায়া দেবী বলেনঃ তাহলেও কিছু একটা তো তুমি করবে।

ঃ করবো বইকি, নিশ্চয়ই করবো।

ঃ কি?

ঃ কণ্ট্রাক্‌টারি। এখন ইণ্ডিয়ায় পয়সা আছে কণ্ট্রাক্‌টারিতে। একটা অর্ডিনারী কণ্ট্রাক্‌টার মাসে কত রোজগার করে জানেন?

ঃ কতো?

ঃ পাঁচহাজার থেকে দশহাজার।

ঃ বলো কি নিশীথ!

ঃ হ্যাঁ মাসিমা। ইণ্ডিয়া তো এখন কণ্ট্রাক্‌টারদের প্যারাডাইস্। বাবাকে বলেছি দু'লাখ টাকা দিতে। বাবা টাকাটা দিলেই নেমে পড়বো। তার আগে নিশিকান্ত হাজরার সঙ্গে একটু খাতির জমিয়ে নিতে হবে। লোকটা নাকি পূজো পেলে সবই করে দিতে পারে।

ঃ তাই নাকি?

যোগমায়া দেবী হাসলেন।

ঃ তাহলে তুমি কণ্ট্রাক্‌টারিই করবে ঠিক করেছ?

ঃ হ্যাঁ, বাবার ইচ্ছেও তাই।

সেদিন তারপর ও প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়।

কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে যায়। সন্ধে হয়। হালদার বাগান লেনের সেই কানাগলিতে অন্ধকার গড়িয়ে পড়ে। হেরম্ববাবু কোর্ট থেকে ফিরে আসেন। নিশীথ বসে তাঁর মুখ থেকে গল্প শোনে, খাতা থেকে শোনে কবেকার-লেখা কবিতা। কবে কোন্ সালে একটি কবিতা পূর্ব বাংলার মফঃস্বলের একটি কাগজে ছাপা হয়েছিল। নানা হাতে ঘোরার ফলে কাগজটার আসল চেহারা আজ চেনাই যায়

না। উইতে খেয়েছে কয়েকটা পাতা। কয়েকটা পাতা নোনা ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। তবু কাগজটা হেরম্ববাবুর অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর লেখা কবিতা ওতে ছাপা হয়েছিল যে? ওটা তাঁর প্রাণের চেয়েও বেশি দামী। পূর্ব বঙ্গে অনেক কিছুই তিনি ফেলে এসেছেন। কিন্তু ঐ পোকায়-কাটা, নোনাধরা জীর্ণ কাগজটা নিয়ে আসতে তিনি ভোলেন নি।

নিশীথ তাঁর কবিতা হয়তো শোনে, হয়তো শোনে না। কিন্তু তাতে তাঁর কি যায় আসে? তিনি নিজে পড়ে তো আনন্দ পান।

নিশীথ যখন না থাকে, তখন কেতকীকে শোনান তাঁর কবিতা। জিজ্ঞেস করেন: বল্ তো মা কেমন হয়েছে?

বাবার কবিতা কেতকীর ভীষণ ভালো লাগে। বলে: চমৎকার হয়েছে, বাবা।

আত্ম-তৃপ্তির হাসি হাসেন হেরম্ববাবু। বলেন: দেশ দেশ করে চেঁচায়। দেশকে নিয়ে পারবে এমন কবিতা লিখতে?

কেতকী জানায়, তারা তা পারবে না। পারবে কি করে? তারা কি তার বাবার মতো দেশকে ভালোবেসেছে?

হেরম্ববাবু পরম যত্নে খাতাটি তুলে রাখেন।

একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে তাঁর।

এগুলি আর কোনদিন ছাপা হবে না। কেই বা ছাপবে? নিজেও যে ছাপাবেন, তাঁর তেমন টাকা কই? যা রোজগার করেন, তাতে যে তাঁর এম্‌নিতেই চলে না। দোকানপাট বাকি পড়ে, বাড়িভাড়া বাকি পড়ে। সেদিন তো ভাড়া বাকি পড়ার জন্যে গুরুদাসবাবু যা মুখে আসে, তাই বলে সবার সাম্‌নে অপমান করে গেলেন। তিনি কি কিছু শোনেন নি? সব শুনেছেন। কিন্তু বলার কিছু নেই। আর কী-ই বা বলবেন?

কেন? গয়নাগুলোর কথা তো তিনি বলতে পারতেন? কিন্তু বলে আর কি হবে? অনেকবার তো তিনি বলেছেন। কি ফল হয়েছে? গুরুদাসবাবু চিলের মতো চেঁচিয়ে তাঁর কথা উড়িয়ে দিয়েছেন।

ঃ ব্যাঙ্ক ফেল্ মেরেছে, আমি কি করবো ?

সবাই তাঁর কথা শুনেছে। তাঁর গলার এমন একটা মেয়েলি ভাব আছে, যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সবার সহানুভূতি আকর্ষণ করে। হেরম্ববাবুর কথা কেউ শোনে না।

হেরম্ববাবু দেশের উজ্জ্বল কল্পনার জগৎ থেকে হালদার বাগান লেনের অন্ধকার এঁদো গলিতে নেমে আসেন।

আর কোন আশা নেই।

এ অন্ধকার গলি থেকে তাঁরা কোনদিনই মুক্তি পাবেন না।

তাঁর জেলখানার অন্ধকারের কথা মনে পড়ে। সেই অন্ধকারে তাঁর জীবনের কটা বছর তিনি ফেলে রেখে এসেছেন। তাঁর কতকগুলি কবিতা তো সেই জেলখানায় বসে লেখা।

হেরম্ববাবু ভাবেন, এ-ও এক জেলখানা। হালদার বাগান লেনের এই অন্ধকার বাড়িটাও আর একটা জেলখানা। ইংরেজদের জেলখানা থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু হালদার বাগান লেনের এই জেলখানা থেকে তাঁর মুক্তি নেই।

দোতলার ফ্ল্যাট্ থেকে সুরঞ্জন সবই শোনে, সবই দেখে। কিন্তু কিছুই বলে না। সে একালের সব চেয়ে [illegible] শিক্ষা তাই পেয়েছে। শিক্ষাটি হলো, শুনবে সবই, দেখবে সবই ; কিন্তু কিছুই বলবে না।

আর লেখার বেলায় ?

লেখার বেলায়ও তেমনি কঠোর সংযম। কর্মদোষে তাকে বহু জায়গা ঘুরে বহু সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়, বহু লোকের রিপোর্ট নোট্ করে নিতে হয়। কিন্তু ছাপতে দেবার আগে কয়েকবার সেগুলি পড়ে নিতে হয়। যদি বড়ো বেশি সত্যিকথা থাকে, তা একটু ঘুরিয়ে লিখে দিতে হয়। একবার কার একটা রিপোর্ট হুবহু ছেপেছিল বলে তাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টার ডেকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। রিপোর্টটা ছিল এক খ্যাতনামা রাজনীতি বিশারদের। তিনি নাকি রিপোর্টটা পড়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাছে তার প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি

লিখেছিলেন। ডিরেক্টার সুরঞ্জনকে ডেকে তাই বলে দিয়েছেন যে, ওভাবে রিপোর্ট ছাপলে কাগজও উঠে যাবে, চাকরিও যাবে। মনে পড়ে তিনি বলেছিলেনঃ নতুন লোক তুমি। কলমে তাই এখনো ধার আছে। এবার থেকে একটু সাম্‌লিয়ে লিখো। যাতে সাপও না মরে, লাঠিও না ভাঙে। কেমন?

সেই ঘটনার পর থেকে সুরঞ্জন ঠিক করে নিয়েছে যে সে আর কখনো হুবহু রিপোর্ট ছাপতে দেবে না। যা দেখবে, যা শুনবে, তার সব ছাপা উচিত নয়। সে সবই দেখবে, সবই শুনবে; কিন্তু কিছুই বলবে না। বলতে গেলেই বিপদ।

সেদিন হেরম্ববাবুদের ব্যাপার নিয়ে সে গুরুদাসবাবুকে কী-বা বলেছে। তাতেই তিনি তার সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা নিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

আর একদিনের কথা তার মনে পড়ে।

সেদিন সারারাত ধরে অফিসে কাজ করে সকালের দিকে একটু দেরি করেই সে বাড়ি ফিরছিল। বাসটা একটা সরকারী হাসপাতালের সাম্‌নে থামতেই একটা বারো-তেরো বছরের ছেলে ভিড় ঠেলে উঠে পড়লো। হাতে তার একটা ওষুধের শিশি। বোধহয় কোন হাসপাতালের আউট-ডোর থেকে আনা। রোগা চেহারায়, ময়লা জামা-প্যান্টে তাকে বড়ো করুণ দেখাচ্ছিল।

বড়ো গরীব ঘরের ছেলে মনে হলো তাকে। পায়ে জুতো নেই, মাথায় কতোদিন যে তেল পড়ে নি, কেউ বলতে পারবে না।

বাসের ভিড়ের মধ্যে কোনমতে স্থান করে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

হঠাৎ একজন ভদ্রলোক দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেনঃ ঘাড়ে এসে পড়িস কেন? এ্যাঁ? সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারিস না?

পাশের একজন বললেনঃ পকেটমার নয় তো?

ঃ পকেটমার?

পেছনের আরেক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেনঃ পকেটমার? কোথায়?

সামনের সেই প্রথম ভদ্রলোক ছেলেটাকে দেখিয়ে দিলেন। বললেনঃ পকেটে হাত ঢোকাবার তালে ছিল, সুবিধে করতে পারে নি।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে 'পকেটমার' শব্দটা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়লো। সবাই বলে উঠলোঃ ওকে নামিয়ে দিন বাস থেকে। এই ড্রাইভার, থামো—

পেছন থেকে হুড়মুড় করে এক বিপুলাকার ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। বললেনঃ কোন্‌টা বলুন তো ?

ভদ্রলোকের একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

ঃ এই তো দাঁড়িয়ে। যেন ভিজে বেরালটি। একেবারে কিচ্ছুটি জানেন না।

ভদ্রলোক পেছন থেকে যেন ছোঁ মেরে ছেলেটাকে তুলে নিলেন। হিড়্‌ হিড়্‌ করে টানতে টানতে তাকে বাসের জনবহুল সিঁড়িটাতে নিয়ে গেলেন। চিঁ চিঁ করে একটা পাখির ছানার মতো ছেলেটা কি যেন বল্‌ছিল। চেঁচামেচিতে কিছুই শোনা গেল না। বাস থেকে নেমে যাবার সময় একজনের কনুইয়ের ধাক্কায় তার হাতের ওষুধের শিশিটা মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। ছেলেটা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

বাস ততক্ষণে চলতে সুরু করেছে। বাসের শব্দে তার কান্না আর শোনা গেল না।

সুরঞ্জন এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। সে ছেলেটাকে উঠতেও দেখেছিল, নেমে যেতেও দেখলো। বাসের মধ্যে ছেলেটাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটে গেল, সে ছিল তার নীরব দর্শক।

এক ভদ্রলোক বললেনঃ আজকাল মশাই, রাস্তাঘাটে চলা মুশ কিল। কখন যে কি বেশে ঘুরছে—

আর এক ভদ্রলোক বললেনঃ দেখলে চিনতে পারবেন না, মশাই। ছোঁড়াটাকে দেখে কি চেনা গিয়েছিল ?

সুরঞ্জন আর চুপ করে থাকতে পারলো না। সে বললোঃ কাজটা

মোটেই ভালো হলো না। একটা গরীব ছেলেকে মেরে নামিয়ে দেওয়া হলো। তার ওষুধের শিশিটাও—

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন ভদ্রলোক বলে উঠলেন ঃ ওর দলের লোক এখনো আছে, মশাই। যে যার পকেট সাম্‌লান।

সুরঞ্জন চুপ করে বসে খোঁচাটা হজম করলো। শ্যামবাজারের মোড় আসতে তখনো অনেক দেরি। সে তার আগেই নেমে পড়লো। ফুটপাত ধরে নিজের মনে হাঁটতে থাকে। এ কোন্ পৃথিরীতে আমরা বাস করছি। কাদের মধ্যে বাস করছি? বাড়িতে হয়তো ছেলেটার কোন আত্মীয় রোগশয্যায় শুয়ে তার পথ চেয়ে থাকবে। অনেক বেলায় ছেলেটা হয়তো হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তভাবে মুখ শুকিয়ে খালি-হাতে ঘরে ফিরে যাবে।

তারপর? তারপর কি হবে?

না, তারপর থেকে সুরঞ্জন সবই দেখে, সবই শোনে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলে না।

সেদিন বিকেলে কানাগলির চোখ থেকে আলো নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল। গলিতে আলো ছিল না। কিন্তু ঘরে আলো ছিল। যোগমায়া দেবীর মনে হলো, ঘরের আলোগুলোও যেন সব একসঙ্গে নিবে গেল।

অন্ধকার গলিতে ভারি বুটের শব্দ রেখে পুলিশ এসে দরজায় দাঁড়ালো।

ঃ এটা কি হেরম্ব গাঙ্গুলির বাড়ি?

কেতকী বেরিয়ে এসেছিল। জিজ্ঞেস করলো ঃ কেন বলুন তো?

সার্জেণ্ট জিজ্ঞেস করলেন ঃ যোগমায়া দেবী আপনার কে?

ঃ মা—

ঃ ওঁকে ডাকুন তো—

যোগমায়া দেবী খাবার তৈরী করছিলেন। পুলিশের নাম শুনে চমকে উঠলেন। পুলিশ? পুলিশ কেন? তবে কি গুরুদাসবাবু

সত্যিই 'কেস্' করলেন তাঁদের নামে? কেস্ করলেন যদি, বিচার হলো না, অথচ পুলিশ এলো, তা-ই বা কেমন করে হয়? ব্যাপারটা যোগমায়া দেবী ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। তবে মনে হলো, ঘরের সবগুলো আলো যেন এক সঙ্গে কে নিবিয়ে দিল। কেতকী সাম্‌নে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তিনি আর তাকে দেখতে পেলেন না। আঁধারের একটা কালো পাহাড় যেন ধীরে ধীরে তাঁর চোখের সাম্‌নে মাথা তুলে দাঁড়ালো। তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না এখন। অতি কষ্টে উনুন থেকে কড়াইটা নামিয়ে রেখে প্রায় অন্ধের মতো হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে কলে গেলেন, হাত ধুলেন এবং আঁচলে হাত দুটো মুছতে মুছতে বাইরের ঘরে এলেন।

সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করলেন: আপনিই বুঝি যোগমায়া দেবী?

যোগমায়া দেবী সার্জেন্টকে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

সার্জেন্ট বললেন: হেরম্ববাবু আজ কোর্টে গিয়েছিলেন—

: হ্যাঁ; কেন?

: কোর্টে যাবার সময় তাঁর শরীর কেমন ছিল?

যোগমায়া দেবী ককিয়ে উঠলেন: কেন? তাঁর কি হয়েছে বলুন? শরীর কি হঠাৎ খারাপ হয়েছে?

: না না। শরীর তাঁর ভালোই আছে।

: তবে?

সার্জেন্ট তারপর কি বলবেন, ভাবছিলেন।

যোগমায়া দেবী অস্থির হয়ে উঠলেন।

: বলুন। চুপ করে আছেন কেন? কি হয়েছে তাঁর?

: কোর্ট থেকে ফিরছিলেন। ফিরবার পথে—

: ফিরবার পথে?

: সামান্য একটু—খুব সামান্য আর কি!

: কি হয়েছে, ঠিক করে বলুন।

: বাস থেকে পড়ে যান। পায়ে সামান্য একটু আঘাত লেগেছে। তেমন কিছু নয়।

হাত বাড়িয়ে সার্জেন্ট 'মেসেজ্'টা এগিয়ে দিলেন। তা ধরে নেবার ক্ষমতা যোগমায়া দেবীর ছিল না।

কেতকী মেসেজ্টা নিয়ে খুলে দেখলো।

সার্জেন্ট বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন যে, ইচ্ছে করলে তাঁরা হাসপাতালে গিয়ে দেখা করতে পারেন। মেসেজে হাসপাতালের নাম উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।

যোগমায়া দেবীর পা টল্ছিল। তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না। দেয়াল ধরে মাটিতে বসে পড়লেন।

যা অবশিষ্ট ছিল, তা এবার সম্পূর্ণ হলো।

যোগমায়া দেবীর মুখে কোন কথা নেই। তাঁর দু চোখে অন্ধকার। নিঃশব্দে চোখ বুজলেন তিনি।

কেতকী ডাকলোঃ মা—

মার কোন সাড়া নেই। সে ছুটে গিয়ে এক গেলাস জল নিয়ে এলো। মার চোখে মুখে দিল। যোগমায়া দেবী একটু নড়ে বসলেন।

ঃ মা, এখন কি হবে আমাদের? বলো, চুপ করে আছো কেন? বলো, কি করবো আমি।

কেতকীর গলায় যেন ভয়ার্ত পাখির কণ্ঠস্বর। যোগমায়া দেবীর ঠোঁট নড়ে উঠলো। মনে হলো, তিনি কিছু বলবেন। কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না। কেতকী এ-ঘর ও-ঘর ছুটোছুটি করলো। কি করবে, বুঝে উঠতে পারলো না।

করবীও বাড়িতে নেই। কলেজে তার থিয়েটার হবে। তার রিহার্সেল দিতে গেছে। যূথিকাকে দিয়ে তো কোন কাজই হবে না। হয়তো সে এক্খুনি মার এই অবস্থায় চিৎকার করে উঠবে। তাতে আরো খারাপ হবে।

বাচ্চু ওপরে আড্ডা মারছে—মিঠুয়ার সঙ্গে, নয় তো দাদার সঙ্গে। এমন সময় নিশীথ যদি থাকতো! নিশীথকে যে তাদের কতো প্রয়োজন, এই বিপদের মুহূর্তে তা সে বুঝতে পারে। না, নিশীথকে ছাড়া তাদের এক মুহূর্তও চলে না।

নিশীথ অন্য দিন আসে। কতো সময় তার এখানে বসে কেটে যায়। আজই সে আসে নি। কেন সে আজ এলো না?

নিশীথের ওপর তার বড়ো রাগ হয়।

আজই যে এ্যাক্সিডেণ্ট হবে, তা কি সে জানে? খবরটা পেলে সে হয়তো এখনই ছুটে আসবে। কিন্তু তাকে খবর দেবে কে? খবর দেবারই বা কে আছে? নিশীথের বাড়ির ঠিকানা তো এ বাড়ির কেউ জানে না। একমাত্র মিঠুয়াই বাড়িটা চেনে।

কেতকী আর সময় নষ্ট না করে তর্‌তর্ করে ওপরে উঠে গেল। ওপরের ঘরে মিঠুয়াও নেই। সুরঞ্জন বাচ্চুকে নিয়ে গল্প করছিল।

কেতকী বলেঃ আপনি একটু নিচে আসুন, না—

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেঃ কেন?

ঃ মা কেমন করছে?

ঃ কেন? কি হয়েছে?

ঃ বাবার এ্যাক্সিডেণ্ট্ হয়েছে। কোর্ট থেকে ফেরবার সময় বাস থেকে নাকি পড়ে গেছেন। পায়ে খুব লেগেছে। হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ খবর দিয়ে গেল।

ঃ তাই নাকি!

সুরঞ্জন ঘরে তালা দিয়ে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে এলো:

ঃ মিঠুয়াটা সন্ধে থেকে কোথায় যে বেরিয়ে গেছে—

নিচে গিয়ে সে দেখলো, যোগমায়া দেবী পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। মুখটা তাঁর অস্বাভাবিকভাবে শক্ত হয়ে উঠেছে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলোঃ কোন্ হাসপাতালে?

কেতকী টেবিলের ওপর থেকে মেসেজ্‌টা তার হাতে দিল। সুরঞ্জন ওটা খুলে পড়লো।

তারপর যোগমায়া দেবীকে জিজ্ঞেস করলোঃ আপনি যাবেন হাসপাতালে? যাবেন যদি, চলুন আমার সঙ্গে। আমি যাবো—

যোগমায়া দেবী উঠে দাঁড়ালেন। সুরঞ্জনের দুটো হাত ধরে কেঁদে উঠলেনঃ বাবা, বলো তো, আমার কেন এমন হলো? আমি তো

কারো কোনো অন্যায় করি নি। তবু আমার ওপর ভগবানের এই অবিচার কেন?

সুরঞ্জন বলেঃ বিপদে কাঁদতে নেই। কাঁদলে বিপদ আরো ঘিরে ধরে! আমি অনেক বিপদে পড়েছি। কিন্তু কখনো কাঁদি নি। বিপদকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। তার জন্যে চেষ্টা করতে হয়।

যোগমায়া দেবী জিজ্ঞেস করলেনঃ এখন আমার কি হবে? কি আছে কপালে বলতে পারো, বাবা?

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেঃ আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?

ঃ যাবো।

কেতকী বললোঃ আমিও যাবো।

সুরঞ্জন বলেছিলঃ তাহলে বাড়িতে থাকবে কে?

করবী তখনও ফেরে নি। ফিরতে দেরি হবে কিনা কে জানে? কলেজের বাসের ব্যাপার তো! কখন সময় হয়, কে জানে? যূথিকার ওপর তো আর ঘর ফেলে যাওয়া যায় না।

সুরঞ্জন একবার ওপরে গিয়েছিল। জামাকাপড় ছেড়ে তৈরী হয়ে নিচে নেমে এলো। যোগমায়া দেবীও তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সুরঞ্জন আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

তাঁরা অন্ধকার গলিতে পা দিয়েছেন, পেছনে শুনতে পেলেন যূথিকা খিল্‌খিল্‌ করে হাস্‌ছে। বলছেঃ না—না—না। ছেড়ে দাও—

যূথিকা আর হাসবার সময় পেল না। এই অসময়ে?

সুরঞ্জন সেদিন রাতে যোগমায়া দেবীকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে হেরম্ববাবুকে দেখে এলো। বাসে ওঠার সময় পা ফস্‌কে পড়ে গিয়ে ডান পায়ের হাঁটুর জয়েন্টটা ভেঙে ফেলেছেন তিনি। একটা সাধারণ ব্যাণ্ডেজ্‌ করে দেওয়া হয়েছে। কাল প্লেট্‌ তোলা হবে। ডাক্তার বললোঃ দেখা যাক্‌, কি হয়েছে। তারপর সেইমতো ব্যবস্থা হবে।

হাসপাতালে সেই অবস্থায় তাঁর এতদিনের দুঃখ-সুখের সঙ্গীকে ফেলে আসতে যোগমায়া দেবীর মন উঠছিল না। ফেলে না এসেও উপায় কি ছিল? চোখে জল নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

পরের দিন সকালে নিশীথ এলো। সঙ্গে তার বন্ধু তুষার।

সমস্ত শুনে সে বললোঃ ভয় কি মাসিমা। আমি তো আছি। আমি সব ব্যবস্থা পাকা করে দিচ্ছি।

সেদিন নিশীথ, যোগমায়া দেবী আর তুষার হাসপাতালে গেল। সকালে প্লেট্ নেওয়া হয়েছে। কাল জানা যাবে কতখানি কি হয়েছে। এখন শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা।

সুরঞ্জন এই বিপন্ন পরিবারের জন্যে আর কি করতে পারে? সাহস বা আশ্বাস ছাড়া এই পরিবারের এখন বেশি দরকার হলো টাকা। কোথা থেকে টাকা আসবে? সে-ই বা কতো টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারে? কিন্তু টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করার কতকগুলি অসুবিধাও তার আছে। সে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করলে হয়তো যোগমায়া দেবী তা নাও গ্রহণ করতে পারেন। গ্রহণ করলেও অনেকে আবার তার নানারকম ব্যাখ্যা করতে পারে।

অথচ যোগমায়া দেবীর টাকারও বিশেষ প্রয়োজন। সে শুনেছে, ব্যাঙ্কে বা পোস্টাফিসে হেরম্ববাবুর কোন সঞ্চয় নেই, কোন ইন্সিওরেন্সও নেই। আবার একবার সে যোগমায়া দেবীকে জিজ্ঞেস করলো। না, কোন সঞ্চয়ই নেই।

সুরঞ্জন অনেক ভেবে চিন্তে পুলিশের মেসেজ্ নিয়ে কোর্টে গেল। বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করলো। সেখান থেকে কিছু টাকার ব্যবস্থা হলো। যোগমায়া দেবী তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

কিন্তু সেই টাকায় কদিন চলবে? সুরঞ্জন যোগমায়া দেবীকে বলে তাঁদের সঙ্গে তার ও মিঠুয়ার খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিল। হোটেলে দুজনের যা পড়তো, তার চেয়ে কিছু বেশি দিয়ে সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বার এসোসিয়েশনের টাকায় তিনমাসের বাড়িভাড়া মেটানো হলো। গুরুদাসবাবু এখন খুব খুশি! এখন হেরম্ববাবুর কথা তিনি এক-আধবার জিজ্ঞেসও করেন।

যোগমায়া দেবী একদিন সুরঞ্জনকে বলেছিলেন: আমরা তো তোমারই খাচ্ছি।

সুরঞ্জন বলেছিল: এমন কথা যদি বলেন, কাল থেকে আমরা হোটেলে খাবো।

যোগমায়া দেবী কেঁদে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন: যে যা-ই বলুক, আমি আমার ছেলেকেই ফিরে পেয়েছি।

সুরঞ্জনের নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয়। সে যেন অন্যের সম্পত্তি বেনামীতে ভোগ করছে। তবু আসল মালিক যে, সে আর কোনদিন ফিরবে না। এইমাত্র ভরসা।

হেরম্ববাবুর হাঁটুর বল্‌টা ভেঙে কয়েক টুক্‌রো হয়ে গেছে। অপারেশন্ করে টুক্‌রোগুলো সেট করে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়েছে। এখন শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে যাওয়া।

কিন্তু সে কতো দিন? ডাক্তার বলেছে, দু মাস। কিন্তু দু মাসে যদি জোড়া না লাগে? বয়েস হয়েছে এখন। হাড় জোড়া লাগতে একটু সময় নেবে। ততদিন কি এইভাবে চলবে? নিশীথ আর তুষার এখন নিচে প্রায়ই আস্‌ছে। তারা হাসপাতালে যায়। সঙ্গে যোগমায়া দেবীও যান। তাদের সঙ্গে কোনদিন কেতকী যায়, কোনদিন করবী যায়।

সুরঞ্জনও সময়মত হেরম্ববাবুর সঙ্গে দেখা করে নানা আশা-ভরা আশ্বাস দিয়ে আসে।

তিনিও একদিন সুরঞ্জনকে বলেছিলেন: তোমার ঋণ জীবনেও শোধ করতে পারবো না। সুরঞ্জন বলেছিল: আগে সেরে উঠুন, ঋণশোধের কথা পরে।

সুরঞ্জন সেদিন অনেক বেলায় অফিস থেকে ফিরেছে। নিশিকান্ত হাজরার বাড়িতে আজ আবার প্রেস কন্‌ফারেন্স ছিল। সেখান থেকে অফিস গিয়ে রিপোর্টটা তৈরী করে ছাপতে দিয়ে ফিরতে দেরি হয়ে গেল।

মিঠুয়া নিচ থেকে খাবার এনে ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। মিঠুয়াকে সে তাই করতে বলে রেখেছে। যোগমায়া দেবী প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে, সুরঞ্জন তাঁর সামনে বসে খাবে। কিন্তু নিচে বসে খেতে সুরঞ্জনের ভালো লাগে না। তাতে তার সাহায্য করার কথাটা নাকি একটু বেশি প্রচারিত হয়।

অবেলায় খাবার খেয়ে সে একটু বিছানায় গড়াচ্ছিল।

যোগমায়া দেবী বোধহয় হাসপাতালে গেলেন। গলি থেকে তাঁদের কথাবার্তার ছিটে-ফোঁটা উড়ে আসে।

তারপর সিঁড়িতে চটির শব্দ শোনা গেল।

দরজা খোলাই ছিল।

খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অমিত জিজ্ঞেস করলো ঃ সুরঞ্জনবাবু আছেন ?

ঃ এ কি, অমিত বাবু যে ! অনেকদিন আপনাদের দেখা নেই। কেমন আছেন বলুন ?

সুরঞ্জন বিছানায় উঠে বসলো।

কোন জবাব না দিয়ে অমিত ঘরে ঢুকে এলো। সুরঞ্জন উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে বসলো।

বললো ঃ বসুন।

অমিত বসলো। তার মুখে কোন কথা নেই।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেঃ আপনার শরীরটা কি ভালো নেই, অমিতবাবু ?

ঃ শরীর ভালোই। মনের অবস্থাটা ভালো নয়।

ঃ কেন ? কি হলো আবার ?

ঃ যা হবার, তাই হয়েছে।

সুরঞ্জন বললো ঃ সেদিন তো দুজনকে আগরপাড়া যেতে দেখলাম। বেশ ভালো লাগছিল। ভেবেছিলাম—

অমিত বললো ঃ আমিও ভেবেছিলাম, পুরোনো দিনগুলো বুঝি আবার ফিরে এলো। কটা দিন বেশ ভালোভাবেই কাটলো। মনে হলো, রিণা আগেকার মতো হয়ে গেছে। কিন্তু ভুল করেছিলাম। রিণা একেবারে বদ্‌লে গেছে।

সুরঞ্জনের মনে পড়ে, রিণা রায় বলেছিল ঃ যে মন ভেঙে গেছে, তা আর জোড়া লাগে না।

তাহলে অমিত আর রিণা রায়ের ভাঙাটাই কি পাকাপাকি হয়ে গেল ?

মাঝে খোকনের অসুখের ব্যাপারে অমিত আর রিণার মন থেকে সকল তিক্ততা মুছে গিয়েছিল। সেদিন সুরঞ্জনের বড়ো ভালো লেগেছিল ওদের দুজনকে একসঙ্গে আগরপাড়া যেতে দেখে। তাহলে মানুষ এখনো নিঃস্ব হয়ে যায় নি। এখনো বাপ-মা ছেলের জন্যে ভাবে, ছেলে বাপ-মার জন্যে ভাবে। অসুস্থ ছেলের কল্যাণ-কামনায় নিজেদের বিশ্রামের কথা না ভেবে অমিত আর রিণা আগরপাড়া ছুটে গেছে।

সুরঞ্জন ভারি খুশি হয়েছিল সেদিন। ভেবেছিল, এর পর বাপ-মার স্নেহের স্পর্শ পেয়ে ওদের ছেলে সেরে উঠবে। তারপর অমিত আর রিণা তাদের ছেলের ভেতর দিয়ে নিজেদের কাছে পাবে। মাঝে যে সামান্য তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছেলের কচি হাতের স্পর্শে একেবারে মুছে যাবে।

তাই ভেবে সুরঞ্জন এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল।

কয়েকদিন অবশ্যি ভালোই চলেছিল। ভালোবাসায়, উত্তাপে কয়েকটা দিন সত্যিই ওদের সুন্দর হয়ে উঠেছিল।

সকালে উঠে অমিত বাজারে যায়, রিণা রান্না সারে, অফিসে যায়। অফিস থেকে সে সকাল-সকাল ফেরে, চা করে অমিতকে

খাওয়ায়, গল্প করে। রাতের রান্না সেরে খেতে বসে দুজনে। খাওয়ার পর অমিত রিণাকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে সারা দিনের নিঃসঙ্গতার ক্লান্তিভার লাঘব করে। পুরাতন লয়ে আবার তাদের জীবনছন্দ বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অল্পদিন পরেই সেই লয়ে পরিবর্তন দেখা দিল। দ্রুত থেকে ধীর, ধীর থেকে বিলম্বিত।

আবার রিণার সাজসজ্জার ঘটা বাড়তে লাগলো, দেরি হতে লাগলো তার অফিস থেকে ফিরতে। রিণাকে নিয়ে অমিতের মনে আবার সন্দেহের মেঘ জম্‌তে থাকে। আবার উত্তাপ ধীরে ধীরে কমে আসে। কিন্তু অমিত মনে মনে মরীয়া হয়ে ওঠে।

রিণার সাজের ঘটা যত বাড়ে, অফিস থেকে ফিরতে তার যত দেরি হয়, অমিতের প্রতি অনিচ্ছা ও ঔদাসীন্য যত বাড়ে, অমিত ততই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। দিনের ক্ষোভ, বেদনা প্রকাশ পায় রাতের অন্ধকারে।

একদিন মনের মেঘ ঝড়ের আকারে ফেটে পড়লো।

সেদিন রিণা অনেক রাত করে বাড়ি ফিরছিল।

অমিত অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছিল। রাত ন টার সময় বারান্দায় রিণার পায়ের শব্দ শোনা গেল। মনে মনে অমিত সেদিন প্রস্তুত হয়েই ছিল। আজ রিণাকে কিছু অন্তত না বল্‌লে আর চল্‌ছে না। ঝগড়ার কথা তার মনে আছে। সেদিন সামান্য কথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। অল্প কথায় হঠাৎ সে রেগে যায়। তার এ স্বভাবটা আগে অবশ্যি ছিল না। তবে বিয়ের আগে তাকে সবাই একটু মেজাজী মেয়ে বলেই জানতো। ইদানীং তার সেই স্বভাবটা যেন ফিরে এসেছে। বরং তা আরো একটু বেড়েছে।

দরজা খোলাই ছিল। রিণা ঘরে ঢুকে কাপড়-জামা ছাড়লো। অমিত কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে শেষে বললো ঃ রিণা—

রিণা কাপড়-জামাগুলো গুছিয়ে আল্‌নায় তুলে রাখছিল। সে শুধু ঘাড় ফিরে তাকালো। কোন কথা বললো না।

ঃ একটা কথা কিছুদিন হলো বলবো, ভাবছি।

হাতের কাজ সারতে সারতে রিণা বলে ঃ কি কথা বলে ফেল।

অমিত রিণার কথা বলার ভঙ্গিতে বিশেষ খুশি হলো না। সে বললো ঃ তোমার ফিরতে আবার দেরি হচ্ছে, রিণা।

মুখ না ফিরিয়েই রিণা বলে ঃ তাতে তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে ?

এ আবার কেমন ধরনের কথা ?

ঃ না, আমার হয়তো কোন অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু তোমার ?

ঃ দয়া করে আমার সুবিধে-অসুবিধের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।

রিণা বাথরুমে চলে গেল।

অমিত আর কিছুই বলতে পারলো না। সে আহত, অপমানিতের মতো নিঃশব্দে বসে রইলো।

সেদিন রাতে আর কেউ কোন কথা বললো না। রান্না, খাওয়া—সবই যান্ত্রিকভাবে হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে অমিত সেদিন রিণাকে অন্যান্য দিনের মতো আর বুকে তুলে নিতে পারলো না।

সকাল হয়। হালদার বাগান লেনের এই আঁধার গলিতে কাক ডাকে। আবার গতানুগতিক চালে দিন সুরু হয়। রিণা অফিসে যায়, অমিত ঘরে শুয়ে থাকে। আবার দিনের শেষে ডাক দিয়ে কাকগুলো উড়ে যায়। অমিত রিণার পথ চেয়ে বসে থাকে। রিণা কখন আসবে ?

কদিন হলো, রিণা বেশ সকাল-সকাল ফিরে আসছে।

সেদিনের পর অমিত তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না।

একদিন রিণা সন্ধের আগেই ফিরে এল। কদিন থেকে রিণাকে অমিতের বড়ো ভালো লাগছে। অমিত তো তাই চায়, রিণা সকাল-সকাল ঘরে ফিরে আসুক।

কাপড় জামা ছেড়ে রিণা বাথরুমে যায়। বাথরুমে ঢুকলে রিণার বেরোতে একটু দেরি হয়। বাথরুমে ঢোকার আগে রিণা কি ভেবে তার ব্যাগ্‌টা বিছানার নিচে লুকিয়ে রেখে গেল। কোনদিন তো সে

এমন করে না। তার ব্যাগ্ বিছানার ওপর তো প্রায়ই পড়ে থাকে। আজ হঠাৎ সে ব্যাগ্‌টা লুকিয়ে রাখলো কেন?

অমিতের কেমন ইচ্ছে হলো, রিণার ব্যাগ্‌টা একবার সে আজ খুলে দেখবে।

অমিত কোনদিন রিণার ব্যাগে হাত দেয় না। আজ যে তার কি খেয়াল হলো, কে জানে? বিছানার তলা থেকে সে ব্যাগ্‌টা টেনে বের করে আনলো। কান পেতে শুনলো, রিণা বাথরুমে গুন্ গুন্ করে গান করছে। এখনো তাহলে গায়ে জল ঢালে নি।

অমিত ব্যাগ্‌টা খোলে।

কয়েকটা খুচরো টাকা, একখানা রুমাল, একটা ছোট্ট চিরুণি, একটা লিপ্‌স্টিক্, সব শেষে একখানা নীল রঙের খাম।

রিণার ব্যাগে খাম কেন? তাও আবার নীল রঙের। তবে খামের ওপরে স্ট্যাম্প নেই, পোস্টাফিসের সীলও নেই। রিণা কি তবে কাকেও চিঠি দেবে লিখে রেখেছে? কিংবা রিণাকে কেউ চিঠি দিয়েছে?

অমিত প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। চিঠি হাতে নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করতে থাকে। কান পেতে শোনে, রিণা তখন গায়ে জল ঢালতে সুরু করেছে। খামটা খোলাই ছিল। সে তার ভেতর থেকে একখানা চিঠি বের করে আনে। হাতটা কাঁপছিল তার।

চিঠিখানা খুলে সে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললো।

রিণা, লছমনের হাতে তোমার চিঠি পেয়েছি। সেদিন তোমাকে কথাটা বলে ফেলে বড়ো চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এতদিন পরে যাকে কাছে পেলাম, তাকে বোধ হয় আবার হারাতে হবে। কিন্তু তুমি এখনও আমার আগেকার সেই রিণা আছো জেনে খুব আনন্দ হলো। জীবনে অনেক দুঃখ তুমি পেয়েছ বলে লিখেছো। কিন্তু আর কেন তুমি সেই দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ। বোঝা ফেলে দিয়ে সুখের উপকূলে তোমার তরণী ভিড়িয়ে দাও। এতদিন তোমাকে হারিয়ে আমি একটা শুষ্ক মরুভূমি হয়ে পড়ে আছি। তুমি

মেঘ হয়ে এসো, বৃষ্টি দাও। আমি আবার শ্যামল হয়ে উঠি। একটু কাব্য বেশি হয়ে গেল। কিন্তু এ ছাড়া আমার মনের অবস্থা তোমাকে কি করে বোঝাই? তোমার পুরাতন নেম্‌প্লেট্‌টাকে সরিয়ে কবে নতুন নেম্‌প্লেট্‌ লাগাচ্ছ, জানাবে। আমার বুক-ভরা ভালোবাসা নিও। ইতি-—

তোমারই সুপ্রিয়।

চিঠিখানা পড়ে অমিত স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার হঠাৎ চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছিল। এখনি সমস্ত ভেঙে চুরে ফেলে দিয়ে তার কোথাও ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছিল। তার আর কি বাকি রইলো। ব্যাঙ্কের টাকা গেছে, বাড়ি গেছে, খোকনকে তার দাদু কেড়ে নিয়েছে। ছিল শুধু রিণা। আজ থেকে সেও চলে গেল। তাহলে তার আর কি রইলো? কিছুই যখন রইলো না, তখন তারই বা থাকার আর কি দরকার?

বুকের ভেতরটা তার এক অসহ্য জ্বালায় যেন পুড়ে যাচ্ছে। এক বিশাল শূন্যতার মাঝখানে সে নিঃশব্দে জ্বলতে লাগলো।

বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল।

চিঠিখানা সে তাড়াতাড়ি ভাঁজ করে ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেললো। টাকা, রুমাল, চিরুণি, লিপ্‌স্টিক ঢুকিয়ে রেখে ব্যাগ্‌টা বন্ধ করে বিছানার তলায় ছুঁড়ে দিল সে। যেন সে এই মাত্র একটা কিছু চুরি করতে যাচ্ছিল। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে আগে থেকে সে সাবধান হয়ে গেছে। এখন তার মনে পড়লো, তাড়াতাড়িতে খামের মধ্যে চিঠিটা পুরে দেওয়া হয়নি, যদিও খাম আর চিঠি দুটোই সে ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু ভুলটা শোধ্‌রাবার আর সময় ছিল না। রিণা ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে।

রিণা শুক্‌নো কাপড় জামা পরে রান্না ঘরে ঢুকলো। উনুনে আঁচ দিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো।

অমিত তার সাম্‌নে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু রিণা কিছুই বললো না। কিছুক্ষণ রাস্তায় অস্থির ভাবে ঘুরলো। হালদার বাগান লেন থেকে শ্যামবাজার, শ্যামবাজার থেকে বিডন

স্ট্রীট, আপার সারকুলার রোড—তারপর আবার শ্যামবাজার। এতখানি পথ সে প্রায় পাগলের মতো হাঁটলো। সে ভাববার চেষ্টা করলো, তার কিছু নেই, আর কেউ নেই। সে নিঃস্ব, একা। কিন্তু ভাবতে পারে না। তার কেউ না থাকুক, কিছু না থাকুক। তার রিণা আছে। রিণা কখনই তাকে ছেড়ে যেতে পারে না। রিণাকে তো সে চেনে। আজ আট বছর ধরে সে রিণাকে দেখে আসছে। রিণা কি তাকে ছেড়ে যেতে পারে? না, পারে না। দেশবন্ধু পার্কের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলো সে। এতক্ষণে পা দুটো তার বেশ টন্ টন্ করছে। এত পথ সে একসঙ্গে কখনো হাঁটে নি। আজ কেমন যেন একটা নেশায় তাকে পেয়েছিল। একটা পালিয়ে যাবার নেশা। তার নিজের কাছ থেকে সে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। নিজের কাছ থেকে পালাবার নেশাই তাকে আজ পেয়েছিল।

কিন্তু সে নিজের কাছ থেকে পালাতে পারলো কই? সব সময় তার মনে হচ্ছিল, সে নিজেই বুঝি নিজের পিছু নিয়েছে। কোথায় পালাবে সে? শেষে সে দেশবন্ধু পার্কে এসে ধরা দিল।

বেঞ্চিতে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি বেঞ্চি খালি করে চলে গেলেন।

অমিত এবার পুরোপুরি ধরা পড়ে গেল।

আবার চিঠিখানার চেহারা তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠলো।

চিঠির কথাগুলো তার মনে বাজতে লাগলো:

তোমার পুরাতন নেম্‌প্লেট্‌টাকে সরিয়ে কবে নতুন নেম্‌প্লেট্‌ লাগাচ্ছ, জানাবে।

আবার তার সারা মনোময় আগুন জ্বলে গেল।

রিণা কি তাহলে সত্যি তাকে চায় না? তাকে চাইবেই বা কেন? কি আছে তার? রিণার অনেক আকাঙ্ক্ষার একটিও সে পূর্ণ করতে পারে নি। পূর্ণ করবার সামর্থ্যই বা তার কোথায়? অনেক চেষ্টা করেছে সে। অনেক ঘুরেছে। কোথাও তার একটা চাকরি হলো

না। বিয়ের পর ছুটো পয়সা রোজগার করে এনে সে তার স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে পারে নি। তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে পারে নি। তবে সে কিসের টানে তার মনটাকে আর ধরে রাখবে? কিছু নেই তার। যা ছিল, সব গেছে। এখন সে বুঝতে শিখেছে, সে জগতের কোন কাজেরই যোগ্য নয়। কোন কাজই সে আজ করতে পারবে না।

তাই বলে রিণার ভালোবাসা ফুরিয়ে গেল? না, ফুরিয়ে যায় নি। তার ভালোবাসা আজ বাসা বদল করেছে। সুপ্রিয়র শক্তি সামর্থ্যের আকর্ষণে সে আবার নতুন করে সুপ্রিয়কে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে। ইতিমধ্যে চিঠিতে সে তার পুরাতন ভালোবাসার পুনর্জন্মের কথা সুপ্রিয়কে জানিয়ে দিয়েছে।

এই সুপ্রিয়র কাছ থেকে সে রিণাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু পালাতে পারলো না। ঘুরে ফিরে রিণাকে আবার সুপ্রিয়র কাছে ফিরে যেতে হলো। রিণাও হয়তো এতদিন সুপ্রিয়কে ভুলতে পারে নি। অমিতের মুখের দিকে চেয়ে সে তার মনের গভীরে সুপ্রিয়র মুখটাকেই লালন করে এসেছে। এতদিন রিণা তাকে যে ভালোবাসা দিয়েছে, তা হয়তো তার প্রাপ্য ছিল না। সুপ্রিয়র ভালোবাসা সে বোধহয় এতদিন বেদখল করেছিল। আর রিণা এতদিন তার বুকে মুখ লুকিয়ে সুপ্রিয়র মুখটাকেই কল্পনা করে এসেছে।

না, সে আর অন্যের বেদখলী সম্পত্তি ভোগ করবে না।

সে এবার রিণাকে মুক্তি দিয়ে যাবে। তার নিজের জন্যে কষ্ট হয় না। কষ্ট হয় শুধু খোকনের জন্যে। তবে খোকনের কোন কষ্টই হবে না। সে অমিত বা রিণা—কারো অভাবই বুঝতে পারবে না।

তবে আর দেরি কেন? সে উঠে পড়ে। হালদার বাগান লেনের অন্ধকারে সে ঢুকলো না। বাইরে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে অনেক আলো। আলোর দিকেই সে চললো। আলোকিত পথ ধরে সে হেঁটে চলে উল্টোডাঙার দিকে। হঠাৎ উল্টোডাঙার দিকে চলেছে

কেন সে ? সাম্‌নের দিকে এগোবার পথ যখন আর নেই, সাম্‌নে যেখানে অন্ধকার, তখন তাকে উল্টো পথে উল্টোডাঙার দিকে যেতে হবে বৈকি !

দেরি করবার সময় নেই তার। পাছে দেরি হয়ে যায়, সে তাই কোথাও থামলো না। যেতে যেতে সে হঠাৎ হেসে উঠলো। একদিন সব হারিয়ে সে ভেবেছিল, সব যাক্‌, তার রিণা তো আছে। কিন্তু রিণাও যে তার নয়, তখন তা জানার ক্ষমতা তার ছিল না। আসলে কোনদিন তার কিছুই ছিল না। যা তার নিজের নয়, তাকেই সে তার নিজের বলে ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে।

বড়ো ভুল করেছে সে। ভুলটা বড়ো দেরিতে ধরা পড়েছে।

রেল লাইনের ওপর উঠে দাঁড়ালো সে।

সাম্‌নে লাল সিগ্‌ন্যাল। লাইনের ওপর তার লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে রক্তের মতো।

এই পথ দিয়ে কতো মানুষ তাদের প্রিয়-মিলনের উদ্দেশ্যে আসে, যায়। আজ অমিত রিণা আর সুপ্রিয়র কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চলেছে।

সে একবার পেছন ফিরে তাকায়।

হঠাৎ তার রিণার কথা মনে পড়ে। রিণা এখন কি করছে ? হয়তো সে রান্না সেরে ব্যাগ্‌ খুলে সুপ্রিয়র চিঠিটা বের করে বার বার পড়ছে। একবার পড়ে তার বহুদিনের নিরুদ্ধ আশা হয়তো মিট্‌ছে না। আর হয়তো সে সুপ্রিয়র বহু-আকাঙ্ক্ষিত মুখটা মনে মনে আঁকছে। আচ্ছা, অমিত যদি আজ না ফেরে, রিণা কি করবে ? কি আর করবে সে ? না খেয়ে যথারীতি ঘুমিয়ে পড়বে একটা জড় মাংসস্তূপের মতো। আর কোনদিন যদি সে না ফেরে ? রিণা হয়তো তার খোঁজই করবে না। তাতে তো রিণার ভালোই হবে। সুপ্রিয়র সঙ্গে মিলিত হবার পথে যে বাধাটা এতদিন ছিল, তা সরে গেলে রিণার চেয়ে বেশি আনন্দিত আর কে হবে ? পুরাতন নেম-

প্লেটের জায়গায় নতুন নেমপ্লেট্ লাগাতে আর দেরি হবে না। রিণা আর সুপ্রিয়র ইচ্ছাই তাহলে পূর্ণ হবে।

সাম্‌নের দিকে তাকালো সে।

সাম্‌নের সিগ্‌ন্যালটা তাকে চোখ টিপে কি যেন ইশারা করলো। সঙ্গে সঙ্গে লাল আলোটা নীল হয়ে গেল।

এবার তাহলে ট্রেন আসবে। আর হয়তো বেশি দেরি নেই।

সে আবার পেছন ফিরে তাকালো।

ঐ তো ট্রেন আসছে। হেড্-লাইটের আলো তীব্রভাবে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

সে একটুও নড়লো না। শুধু পেছন ফিরে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো নিঃশব্দে। এখন সে অনুভব করছে, একটা বিরাট্ আলোর বিন্দু তাকে গাঢ় আলিঙ্গন করতে ছুটে আসছে। আহা সে আসুক! কতোদিন হালদার বাগান লেনের অন্ধকার গলির জীর্ণতম বাড়ির একটা ঘরে শুয়ে সে তো এই আলোর স্বপ্নই দেখেছে। তার অন্ধকার জীবনের চোরাগলিতে সে কতোদিন এই আলোকে মনে মনে কামনা করেছে। আলো, আরো আলো।

হেড্-লাইটের আলোটা আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। আলোর দূতের পদ-শব্দ এবার তার ধমনীর রক্তে বাজতে সুরু করেছে। আর বেশি দেরি নয়। অল্পক্ষণ শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা।

এই মুহূর্তে তার রিণার মুখটা বড় বেশি মনে পড়ছে, খোকনের কচি মুখের সোনা-গলা হাসি। না, আর তার কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। কেউ তার এ পরিণামের জন্যে দায়ী নয়।

কি ভেবে অমিত চোখ মেলে তাকালো।

দূরে নিবিড় কালো গ্রামটার ওপারে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠছে।

কী সুন্দর লাগছে দেখতে! কী সুন্দর এই পৃথিবী!

এই সুন্দর পৃথিবীতে জন্মেছে সে। এখানে বাঁচবার তার অধিকার আছে। তবে কেন সে তার সেই মূল্যবান অধিকারকে আজ গুঁড়িয়ে ফেলতে চলেছে? কেন সে মরবে?

কি দোষ করেছে সে ?

আবার তার পুব দিকের পৃথিবীর দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে। এত সুন্দর সে পৃথিবীকে কখনো দেখে নি। কুয়াশার আবরণ ঈষৎ সরে গেছে। কিন্তু মুখটা বড়ো করুণ, বিষণ্ণ। সেদিকে একটু তাকিয়ে থাকলেই বড়ো মায়া লাগে। অমিত সেদিকে তাকিয়ে ভাবে, এই সুন্দর পৃথিবীতে তাহলে সে মরবে কেন ?

না, সে মরবে না।

পেছন থেকে ট্রেনের বাঁশি কানে এলো। বড়ো কাছে এসে পড়েছে যে ! তাহলে কি সে আবার হালদার বাগান লেনের অন্ধকার ঘরটাতে ফিরে যাবে ?

আবার মনে পড়ে সুপ্রিয়র চিঠি, রিণার মুখ, খোকনের হাসি। ছি ছি ! একী করছে অমিত ? এখনো কি সে দাঁড়িয়ে থাকবে ? একটা কথা মনে পড়াতে অমিতের হাসি পেল। এক অফিসে একটা লোক পান খেয়ে জাবর কাটতে কাটতে তাকে বলেছিল : ফাইন্ আর্ট শিখেছেন, শিখেছেন। টাইপ্-রাইটিংটা শিখে নিন। কাজে লাগবে।

আবার ট্রেনের বাঁশি ! এবার আরো কাছে।

অমিতের গা-টা শির্ শির্ করে উঠলো। সে রেল লাইন থেকে সরে এলো।

শিকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় আলোর অজগরটা তার পাশ দিয়ে ব্যর্থ আক্রোশে মাটিতে লেজ আছ্ড়াতে আছ্ড়াতে গতির আবেগে ছুটে চলে গেল।

এ কী পাগ্লামিতে পেয়েছিল অমিতকে ?

কেন সে এখানে এসেছিল ? কেন সে দাঁড়িয়েছিল লাইনের ওপর ? নিজের পাগ্লামির কথা ভেবে তার হাসি পেল।

পুব দিকে তাকালো সে। চাঁদটাও বুঝি তার মুখের বিষণ্ণতা মুছে তার দিকে চেয়ে হাসছে। অমিত নিজের মনে হাসলো।

তারপর সে ক্লান্তভাবে বাড়ির দিকে ফিরে চলে।

রাত অনেক হয়ে গেছে।

রিণা কি ভাবছে? কি করছে এখন? হয়তো সে না খেয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। কতো দিন খেতে বসে গল্প করতে করতে তাদের হাতের ভাত শুকিয়ে গেছে। তবু গল্প ফুরোয় নি। দুজনের সারাদিনের সঞ্চিত কথা—সব বুকের নিচে জমা হয়ে আছে। খালি করতে না পারলে যে রাতে ভালো ঘুম হবে না।

অমিতের খিদে পেয়েছিল। খাবার কথা মনে পড়তেই খিদেটা যেন বেড়ে গেল তার।

কিন্তু তার পরক্ষণেই মনে পড়লো সুপ্রিয়র চিঠির কথা। কেমন মেয়েলি ছাঁদের অক্ষর, কেমন কবিত্ব-ময় ভাষা। এক বিবাহিতা মহিলার কাছে এমন চিঠি লিখতে লোকটার একটুও লজ্জা হলো না। রিণা বলেছিল, সুপ্রিয় আর এখন সেদিনের মতো নেই। সে সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছে। অনেক দায়িত্বশীল হয়েছে সে। তাছাড়া রিণা এখন বিবাহিতা, সন্তানবতী। সে এখন অন্য জগতের। অমিত মনে মনে বলেঃ মিথ্যে! মিথ্যে।

ছোটবেলায় 'বাছুর-প্রেম' অনেকের থাকে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বোধ বাড়ে, পূর্বের অবাস্তব প্রেমও ফিকে হয়ে আসে। কিন্তু সুপ্রিয় লোকটা কী!

সুপ্রিয়র ওপরে অমিতের যত ঘৃণা, যত রাগ—একসঙ্গে বাড়তে থাকে। এক বিবাহিতা মহিলার সংসারটাকে ভেঙে তছ্‌নছ্‌ করে দিয়ে তার জীবনকে দুর্বিষদ করে তুলতে তার একটুও দ্বিধা হলো না। রিণাকে সে চাকরি দিয়ে উপকার করেছে। কিন্তু উপকার করেছে বলে তাকে তার প্রতিষ্ঠিত গৃহকোণ থেকে ছিন্ন করে এক অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে, এ কি ধরণের উদারতা? যে রক্ষক, শেষে সেই কিনা ভক্ষক হলো। পুরোনো নেম্‌প্লেট সরিয়ে তার নামে নতুন নেম্‌প্লেট লাগাতে রিণাকে উপদেশ দিয়েছে। ইতর আর কাকে বলে?

কিন্তু আবার তার মনটা বিষিয়ে গেল।

সে তো আজ ফিরবে বলে যায় নি। তবু কেন সে ফিরে এলো ?

যদি সে রেল লাইন থেকে নেমে না আসতো, তাহলে কি হতো ? এতক্ষণে তার ছিন্ন ভিন্ন দেহটা লাইনের ওপরে পড়ে থাকতো। কিছু হাড়, কিছু মাংস আর কিছুটা রক্ত। রিণা হয়তো জানতেই পারতো না, সে কখন চুপিসারে এই পৃথিবী থেকে চলে গেছে। যদি সে জানতে পারতো ? তাহলে কি সে কাঁদতো ? রিণা কি তার জন্যে একটুও কাঁদতো না ? তার কান্নারই বা কি প্রয়োজন ? যে অমিত তাকে কিছুই দেয় নি, সে চলে গেছে, তার জন্যে সে কাঁদবে কেন ? যে তাকে সব কিছুই দেবে, সেই সুপ্রিয় তার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে, সে কাঁদবে কেন ?

এত দুঃখেও অমিত হাসলো।

আজ বাড়িতে ফিরে তাকে রিণার রোজগারের ভাত খেতে হবে। তাকে ভাণ করতে হবে, যেন সে চিঠিখানা পড়ে নি।

তা ছাড়া তার অন্য উপায়-ই বা কোথায় ?

চোরের মতো বাড়িতে ঢুকলো সে।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ দরজায় টোকা দিল। রিণা দরজা খোলে না। তবে কি সে ঘুমিয়ে পড়েছে ? রাত অবশ্যি হয়েছে। কিন্তু তাতে রিণার ঘুম এমনি গভীর হয়ে গেছে যে দরজায় এত টোকা দেওয়া সত্ত্বেও তার ঘুম ভাঙছে না।

এবার অমিত কি করবে ?

রিণা যদি দরজা না খোলে! তবে কি সে ফিরে যাবে ? না খেয়ে এই শীতের রাতটা কোথায় কাটাবে সে ?

অমিত বেপরোয়াভাবে দরজায় ধাক্কা দেয়।

রিণা উঠে দরজা খুলে দিল।

দুচোখে তার ঘুম। মুখে তীব্র বিরক্তি। বড়ো আরামের বিছানা ছেড়ে সে উঠে এসেছে। দরজা খুলে দিয়ে সে আবার লেপের আরামে ঢুকে পড়লো। কোন কথাই বললো না।

অমিত দরজা বন্ধ করলো, রিণার দিকে একবার তাকালো। ভাবলো, রিণা খেয়েছে কিনা একবার জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু দেখলো, মেঝেতে তার এঁটো বাসন পড়ে আছে, পাশেই তার জন্যে খাবার চাপা-দেওয়া রয়েছে।

সে তাই আর রিণাকে ডাকলো না।

বাথরুমে গেল সে। হাত-পা-মুখ ভালো করে ধুলো। মুখটা কেমন অস্বাভাবিক রকমের তেতো হয়ে রয়েছে তার।

তারপর আসন পেতে খেতে বসলো সে।

রাতে একা কোনদিন সে খায় না। আজ একা খেতে বসতে তার ভালো লাগছিল না একেবারে। কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছে তার। যেন এই মাত্র সে দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে ফিরে এসেছে। রিণা অন্যদিন যদি আগে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তো তা হলে তার বলবার কিছুই থাকতো না। কিন্তু আজ তার মনের কি যে হয়েছে, একা খেতে বসে ভীষণ খারাপ লাগছে। কেমন যেন কান্না-কান্না পাচ্ছিল তার।

গলা দিয়ে ভাতের গ্রাস তার নামছিল না। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সে খানিকটা জল গিল্‌লো। ঢক্ ঢক্ করে গেলাসের সবটুকু জল গলায় ঢেলে দিল। তারপর খানিকটা ভাত খেয়ে উঠে পড়লো সে।

আলো নিবিয়ে সে লেপের তলায় রিণার পাশেই গিয়ে শুলো।

রিণার পাশে শুয়েছে সে। এখন রিণা তার কতো কাছে। তবু যেন কতো দূরে। এ যেন সে রিণা নয়, তার রিণা নয়। অন্য কেউ। অন্ধকারে তাকে চেনাই যাচ্ছে না। এ ঘরে আজ এতো অন্ধকার!

দুদিন কাটলো এম্‌নিভাবেই।

সেদিন বিকেল-বিকেল রিণা অফিস থেকে ফিরে এলো। আজ যেন সে কারো সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে। চোখে-মুখে একটা উষ্মার ভাব লেগে আছে।

ঘরে ঢুকেই রিণা অমিতকে জিজ্ঞেস করলো : কি করছো ?

উত্তরে অমিত তার মুখের দিকে একবার তাকালো শুধু। কিছু বললো না।

রিণা আবার জিজ্ঞেস করে : এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্স্‌চেঞ্জ থেকে তোমার কোন খবর এলো ?

অমিত তার মুখের দিকে তাকালো না, কিছু বললোও না। শুধু নৈরাশ্য সূচক ভাবে মাথা নাড়লো।

: আর এসেছে—

রিণার গলায়ও নৈরাশ্যের প্রতিধ্বনি।

কিছুক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই।

রিণা কাপড় ছাড়লো। কেবল ব্রেসিয়ার, পেটিকোট আর শাড়িতে দেহটাকে ঢেকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। হেসে বলে : আমার আবার দশ টাকা মাইনে বাড়লো।

অমিত কিছুই বললো না। একবার রিণার দিকে ফিরেও তাকালো না। রিণার মুখের হাসিটা ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে আসে।

: আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে বলো তো ?

তবুও অমিত রিণার কথার উত্তর দিল না।

: বলো না, কি হয়েছে তোমার ?

অমিত বলে : কি হয়েছে, তা কি তুমি জানো না ?

রিণা তার পাশে বসে। বলে : যা হয়েছে, তা তো হয়ে গেছে। তাই নিয়ে মন খারাপ করে বসে থাকলে তো আর সংসার চলে না।

একটু থামলো সে। তারপর বলে : আমারও আর ভালো লাগছে না।

অমিত ভাবে, রিণা কি তাহলে ঘরের ঝগড়ার এই গুমোট্‌-করা পরিবেশে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সত্যিই তো, ঘরের এই চাপ-চাপ অন্ধকার কারই বা ভালো লাগে। ঘরের আঁধার হয় তো ঘুচবে। কিন্তু মনের আঁধার ঘুচবে কি ?

রিণা বলে : আমার আবার মুশ্‌কিল হয়েছে।

রিণা ভেবেছিল, অমিত হয়তো জিজ্ঞেস করবে, কি তার সমস্যা। কিন্তু অমিত কিছুই জিজ্ঞেস করলো না।

ঃ অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাবে থিয়েটার হবে। আমাকে সবাই ধরেছে—

অমিত শুধু একবার রিণার মুখের দিকে তাকালো।

রিণা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বললোঃ প্রথমে আমি 'না' বলেছিলাম। ওরাও ফিরে গিয়েছিলো। ভেবে ছিলাম, ঝামেলাটা বুঝি চুকে গেল। কিন্তু—

অমিত মুখ নিচু করে নীরবে বসে রইলো। ঘরে আলো জ্বালানো হয়নি। মেঝের ওপর সেই মিহি অন্ধকারের ওপর যেন অনেকগুলো বাঁকা-চোরা রেখা হঠাৎ কেঁপে গেল। চোখটা তার খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি? দুচোখ কচ্‌লে নিয়ে সে তাকায়। আবার সেই বাঁকা-রেখার অসংখ্য হিজিবিজি।

ঃ ওরা নাকি অনেক চেষ্টা করেও নায়িকাকে খুঁজে পায় নি। প্রফেশন্যাল নায়িকা অবশ্যি অনেক ভাড়া পাওয়া যায়। তাতে নাকি অফিসের প্রেস্টিজ্‌ থাকে না বলে সকলের ধারণা। তাই আবার তারা আমার কাছে এসেছিল। কলেজে যে অভিনয় করেছিলাম তা নাকি আজও অনেকে ভুলতে পারে নি।

অমিতের মনে পড়ে, কলেজে রিণা একবার কি একটা বইতে নায়িকার পার্ট করেছিল। শুধু মেয়েরাই নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। তাতে রিণার অভিনয়ে সবাই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। সব চেয়ে বেশি অভিভূত হয়েছিল তার সহপাঠী অমিত। ফাইন্যাল ইয়ারের সুপ্রিয় রিণাকে একটা সোনার মেডেল দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সে প্রতিশ্রুতি সে রক্ষা করেছিল কিনা, তা অবশ্যি অমিত জানে না। কিন্তু রিণা স্টেজের বাইরেও সুদক্ষ অভিনেত্রীর মতো অতি নিপুণভাবে অভিনয় করে গিয়েছে তা কি কারো অজানা?

রিণা বলেঃ আমি কিছুতেই রাজি হবো না, তারাও আমাকে ছাড়বে না। নামাবেই—

অমিত বললো : তুমি যখন অভিনয় ভালোই করতে পারো, তখন এতো আপত্তি করছো কেন ?

রিণা হেসে বলে : তুমি কলেজে আমার অভিনয় দেখেছিলে। কেমন করেছিলাম বলো তো ?

: ভালো।

: সত্যি বল্‌ছো, ভালো করেছিলাম ?

: সত্যি ভালো।

রিণা আবার গম্ভীর হয়ে গেল। বললো : আজ আবার সাহেব এসে বললেন, মিসেস রায়, আপনার অভিনয় কি আমরা একটু দেখতে পাবো না ? আচ্ছা বলো তো, কেমন লাগে ? 'না' বলতে পারলাম না। আচ্ছা, তুমি কিছু মনে করলে না তো ?

অমিতের আবার মনে করা ? অমিতের মনে করাতে রিণার কি আসে যায় ? রিণা কি আর অমিতের কথার ধার ধারে ? অমিতকে তো সে আজ দূরে সরিয়ে দিয়ে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন দেখছে।

অমিত বললো : এতে মনে করবার কি আছে ?

রিণা বলে : সাহেব বললেন, মানুষের প্রতিভা নানা বিপরীত পরিবেশের চাপে চাপা পড়ে থাকে। সুযোগ পেলে তা বিকশিত হয়ে ওঠে। কে বলতে পারে, আমাদের রিক্রিয়েশন ক্লাবের অভিনয় আপনার পাব্‌লিক স্টেজে অভিনয়ের সুযোগ এনে দেবে না ? হয়তো ফিল্মেও—। তখন কিন্তু আমার তোমার কথাই বেশি করে মনে পড়ছিল। তুমিও যদি সুযোগ পেতে—

অমিত নিজের মনে মনে বলে : আমার কথা তোমার কতো মনে পড়ছিল, তা আমি জানি। কার কথা তোমার বেশি করে মনে পড়ছিল, তা কি আমার অজানা ? সত্যি রিণা, তুমি চমৎকার অভিনয় করতে পারো। তোমার অভিনয়ের কোন তুলনাই হয় না। তোমার সাহেব ঠিকই বলেছে। তুমি একদিন পাব্‌লিক স্টেজে ঠিক চান্স্‌ পেয়ে যাবে। হয়তো ফিল্মেও—

রিণা উঠে গিয়ে চা করে নিয়ে এলো।

চা খেতে খেতে অমিত জিজ্ঞেস করেঃ নায়ক ঠিক হয়ে গেছে?

রিণা মুখের চা-টুকু কোনো মতে গলা দিয়ে নামিয়ে দিয়ে হেসে উঠলো। বললোঃ কেন? তুমি নায়কের অভিনয় করবে নাকি?

অমিত তার হাসিতে যোগ দিতে পারলো না। বললোঃ তুমি তো জানো, অভিনয় আমার আসে না।

রিণা নিঃশব্দে খানিকটা চা খেল। তারপর বলেঃ হ্যাঁ, নায়ক ওদের ঠিক হয়ে গেছে।

ঃ কে? সুপ্রিয়?

ঃ ইয়ার্কি করো না বল্‌ছি।

অমিত চায়ের কাপটা খালি করে নামিয়ে রাখলো।

রিণা বলেঃ সুপ্রিয়কে তুমি যেমন-তেমন ভেবো না। ও কিন্তু সত্যিই ভালো অভিনয় করতে পারে।

ঃ তাই তো জানি।

ঃ কিন্তু দেখোনি তো? যেদিন অভিনয় হবে, সেদিন আমি তোমাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবো।

অমিত মুখে কিছু না বলে মনে মনে বলেঃ তা তো দেখাতে নিয়ে যাবেই। সুপ্রিয় নায়কের পার্ট করবে, তুমি করবে নায়িকার পার্ট। অভিনয় তো দারুণ জমবে। আর সেই অভিনয় আমি দেখতে না গেলে যে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

রিণা জিজ্ঞেস করেঃ তুমি যাবে তো?

ঃ নিশ্চয়ই যাবো। তুমি যেখানে হিরোইন, সুপ্রিয় যেখানে হিরো, সে নাটক দেখতে পাওয়াও তো একটা লাক্।

ঃ না। তুমি বড়ো বেশি ইয়ার্কি করছো। তুমি সব জিনিস এত লাইট্‌লি নাও কেন বলো তো? এইজন্যেই তোমার কিছু হলো না।

অমিত যেন তড়িতাহত হলো। সে সোজা হয়ে বসে একটু হাসলো। তারপর বললোঃ তাহলে একটু সিরিয়াস্‌লি বলি। কেমন? অভিনয়ের নায়ক-নায়িকারা অভিনয়ের পরেও কি নায়ক-নায়িকার সম্পর্ক রাখবে?

অমিত লক্ষ্য করলো, তার কথায় রিণার মুখটা যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বললো ঃ তাহলে তুমি খুশি হও ?

অমিত হেসে বলে ঃ আমার খুশিতে কি যায় আসে ? নায়ক-নায়িকারা খুশি হবে।

ঃ তুমি আমাকে আজ ভীষণ ক্ষেপাচ্ছ কিন্তু।

ঃ তোমাকে আর ক্ষেপাবো কি ? তুমি এমনিতেই ক্ষেপে আছো।

রিণা অমিতের সাম্‌নে নিশ্চল মডেলের মতো বসে রইলো। একটা নিশ্বাস ছেড়ে সে বললো ঃ বেশ। কালই আমি বলে দিচ্ছি যে আমি নামতে পারবো না। তুমি চাও না যে আমি একটু 'শাইন' করি। তুমি যেমনটি হয়ে আছো, আমাকে ঠিক তেমনি করে রাখতে চাও। আমি কি বুঝিনা ?

অমিত বললো ঃ ছি ছি, এমন কথা বলো না। সুপ্রিয় শুনলে কিন্তু বড়ো হতাশ হয়ে পড়বে।

রিণা এবার বড়ো চটে গেল। সে বললো ঃ তখন থেকে তুমি খালি সুপ্রিয় সুপ্রিয় করছো। আমি কিছু বলছি না, তাই। কিন্তু এই সব ইয়ার্কি লোকে শুনলে কি ভাববে, বলো তো ?

ঃ এখানে তুমি আর আমি ছাড়া অন্য লোক নেই। আর লোকে আজ না-ই শুনুক, দুদিন বাদে তো সব জানাজানি হয়ে যাবে।

ঃ কি জানাজানি হয়ে যাবে ? কি ?

ঃ না, থাক্।

ঃ না, থাকবে কেন ? তোমাকে আজ বলতেই হবে, কি জানা-জানি হয়ে যাবে।

অমিত প্রথমে ভাবলো, কথাটা সে বলবে না। কিন্তু রিণা ছাড়লো না। সে বলতে লাগলো ঃ তোমাকে আজ বলতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত অমিতকে বলতে হলো কথাটা। সে বললো ঃ পুরোনো নেম্‌প্লেট সরিয়ে নতুন নেম্‌প্লেট যখন লাগাবে, তখন তো সবাই জানবে। তখন—

রিণা আগুনের মতো জ্বলে উঠলো।

ঃ তুমি আমার ব্যাগে হাত দিয়েছ কেন? কেন? কেন? কেন তুমি আমার চিঠি চুরি করে পড়েছ?

অমিত হাসতে হাসতে বলেঃ হাত দিয়েছি তোমার ব্যাগ বলে। আর কেন চুরি করে চিঠি পড়েছি? তুমি চুরি করে প্রেম করতে পারো, আর আমি চুরি করে আমার স্ত্রীর কাছে লেখা একখানা চিঠি—

রিণা বলে উঠলোঃ তাহলে আমি একটা কথা বলি। তুমি যখন জানতে সুপ্রিয়র সঙ্গে আমার আগে ভালোবাসা ছিল, তখন তোমার আমাকে বিয়ে করা উচিত হয় নি।

ঃ আমি ভুল করেছি।

রিণার দুচোখে আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছিল। সে প্রায় চিৎকার করে ওঠেঃ সেই ভুল তবে আজ সংশোধন হয়ে যাক্‌।

অমিত আর কিছু বলে না।

রিণা দুম্‌দাম্‌ করে সুটকেশ গুছোলো। আল্‌নার শাড়িগুলো নিয়ে পাট্‌ করে তাতে পুরলো। একটা ব্লাউস্‌ আর একটা কাপড় নিয়ে সে পরতে থাকে। অমিত উঠে গিয়ে তার হাত দুটো ধরে বলেঃ কি ছেলেমানুষী করছো, রিণা?

রিণা চেঁচিয়ে ওঠেঃ তুমি আমার নাম ধরে ডেকো না। তোমার মুখে আমার নাম শুনে ঘৃণায় আমার গা-টা রি রি করে ওঠে। যাও—আমাকে তুমি ছুঁয়োনা—

ঃ তাহলে আজ থেকে সংসার ভেঙে গেল আমাদের?

ঃ হ্যাঁ—

ঃ বেশ।

অমিত বিছানায় শুয়ে পড়ে।

রিণা কাপড় ছাড়লো। আয়নায় চুলটা ঠিক করে নিল। তারপর সুটকেশটা হাতে তুলে নেবার জন্যে এগোয়।

অমিত জিজ্ঞেস করেঃ তাহলে এ বাড়িটা ছেড়ে দেব? গুরুদাস-বাবুকে তাহলে আমি আজই বলে দিই?

রিণা সুটকেশটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো ঃ ক্ষমতা থাকে রাখবার তো রেখো।

অমিত বলে ঃ আর খোকন?

ঃ সে তোমার ছেলে, তোমার দায়িত্ব।

ঃ তোমার কেউ নয়?

ঃ না।

রিণার জুতোর শব্দ সিঁড়ির প্রান্তে মিলিয়ে যায়।

অমিত আর তাকে কিছু বললো না, উঠে গিয়ে তার পথ আগ্‌লিয়ে ধরলো না। রিণার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতেই সে উঠে পড়লো। তুহাতে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ঘুরে দাঁড়াতেই দেয়ালে টাঙানো ফুলশয্যার রাতে তোলা ছবিটা চোখে পড়লো। টান মেরে ওটা ছিঁড়ে এনে সে তুহাতে ছুড়ে ফেলে দিল মাটির ওপর। কাচ আর কাঠের ফ্রেমটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। ছবিটা অসহায়ের মতো মাটিতে পড়ে রইলো। অমিত এবার ওটা তুলে নিয়ে তুহাতে ছিঁড়ে ফেলতে যাবে, এমন সময় তার চোখে পড়লো ফুলশয্যার রাতের রিণার লজ্জা-মধুর মুখটি। ছবিটা সে ছিঁড়তে পারলো না। বিছানার নিচে ওটা রেখে দিয়ে সে টান হয়ে শুয়ে পড়লো।

সুরঞ্জন বললো ঃ এই কদিনে আপনাদের এত ঘটনা ঘটে গেছে, তা তো আমি বুঝতে পারি নি। অবশ্যি এ কদিন আমি নিচের ওদের নিয়ে বড়ো ব্যস্ত ছিলাম। মাঝে একদিন মানে যেদিন গুরুদাসবাবু চেঁচামেচি করছিলেন, সেদিন আপনাদের তুজনকে একসঙ্গে বারান্দায় দাঁড়াতে দেখেছিলাম।

অমিত আর কিছুই বললো না।

অনেক কথা একসাথে বলে সে প্রায় হাঁপিয়ে পড়েছিল। তার বিষণ্ণ চোখ তুটোতে এক করুণ অসহায়তা ফুটে উঠেছিল।

কিছুক্ষণ পরে অমিত বলে : কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছিলাম, রিণা বড়ো বেশি ডেস্পারেট্ হয়ে উঠেছিল। কাকেও সে গ্রাহ্য করছিল না। আমাকে তো একেবারেই না—

সুরঞ্জন ভেবে দেখলো, অমিত ঠিকই বলেছে। কিছুদিন আগে সুরঞ্জন কার্জন পার্কে রিণাকে তার মত বদ্লাবার পরামর্শ দিয়েছিল। রিণা তার কথাগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছিল একেবারে। এখন তো রিণার কাছে অমিতের কোন মূল্যই নেই।

তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা উচিত ছিল।

অমিত বললো : তা কি করি নি আপনি বলতে চান? ভেবে-ছিলাম, রিণা হয়তো বরানগরে গেছে। আমিও বরানগরে গেলাম।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে : কেন? উনি কি বরানগরে যান নি?

: গিয়েছিল। প্রথমে ওখানেই উঠেছিল সে। কিন্তু বেশিদিন ওখানে তার ভালো লাগলো না। এখন সে ওখান থেকে চলে গেছে।

: কোথায়?

: কোন একটা নাকি হোটেল উঠেছে সে।

: আপনি ব্যাপারটা রিণা দেবীর বাবাকে বলে দেখতে পারতেন। তিনি হয়তো রিণাকে বুঝিয়ে বলতেন। আর রিণা দেবীও হয়তো তাঁর বাবার কথা ফেলতে পারতেন না।

অমিত বললো : তাও বলে দেখেছিলাম। উনি বললেন, এসব তো আক্চার হচ্ছে। এই সাত-আট বছরে তুমি নিজের কোন ব্যবস্থাই করতে পারো নি। সে রোজগার করে এনে এতদিন তোমাকে খাইয়েছে। এর বেশি আর কি আশা করতে পারো তার কাছ থেকে?

অমিত তাঁকে বলে ফেলেছিল : তাই বলে আজ রিণা যা করতে যাচ্ছে, আপনি বাবা হয়ে তা সমর্থন করেন?

রিণার বাবা বলেছিল : না। সমর্থন ঠিক করি না। তবে তোমার দিকে চেয়ে আর রিণার কথা ভেবে সমর্থন না করেও পারি না।

অমিত প্রথমে ওঁর কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। সে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিল।

উনি বললেন: তোমার আর বেশিদিন ওর ওপরে নির্ভর করে থাকা উচিত নয়। নিজে কিছু করবার চেষ্টা করো। আর রিণাও যখন তোমাকে আর সহ্য করতে পারছে না, তখন তুজনের কিছুদিন দূরে থাকাই ভালো। আমি আমার মেয়েকে চিনি। এখন তাকে দূরে থাকতে না দিলে সে ভায়োলেণ্ট হয়ে উঠতো। সেটা আরো খারাপ হতো নাকি?

ঠোঁট কাম্‌ড়াতে কামড়াতে অমিত বরানগর থেকে ফিরে এসেছে। একবার ভেবেছিল, সে আগরপাড়া থেকে একবার ঘুরে আসবে। কিন্তু মন উঠলো না। মনটা তার একেবারে ভেঙে গেছে।

সুরঞ্জন অমিতের কথাগুলো শুনলো। সহসা কোন কথা তার মুখে এলো না। অমিতও চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলো। তারপর বললো: আপনি কিছু বলুন। আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনিও দেখি চুপ করে রইলেন।

সুরঞ্জন বললো: এই ভাঙা পৃথিবীতে আপনি এর বেশি আর কি আশা করতে পারেন?

অমিত বললো: আগে আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারতাম না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, আপনার কথা আমার ভালো লাগছে।

সুরঞ্জন বলে: আমিও প্রথম দিকে বুঝতে পারি নি। ভেবে-ছিলাম, যুদ্ধ যা ভাঙবার ভেঙে দিয়েছে, এখন চলেছে গড়ার পালা। কিন্তু তা নয়। যুদ্ধ এখনও ভাঙছে। আমাদের ঘর, আমাদের মন —সে এখনও ভেঙে চলেছে। ভাঙার আর শেষ নেই।

একটু থামলো সুরঞ্জন। তারপর বলে: হয়তো এম্‌নি করেই ইতিহাস এগোয়। এম্‌নি করেই সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হয়।

হালদার বাগান লেনের কানাগলিতে অন্ধকার চাপ বাঁধছিল। মিঠুয়া চা করে দিয়ে গেল। সুরঞ্জন আলো জ্বাল্‌লো। তুজনে বসে চা খেল।

অমিত জিজ্ঞেস করেঃ বাড়িটা কি ছেড়ে দেব? আপনি কি বলেন?

ঃ ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাবেন? আগরপাড়ায়?

ঃ তাই তো ভাবছি, কোথায় যাবো?

অমিত হাসলো নিজের মনে। বললোঃ তাহলে তো একজনের ঘাড় থেকে আরেক জনের ঘাড়ে গিয়ে পড়া।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলোঃ তাহলে মাসে মাসে এতগুলো টাকা—

অমিত বললোঃ রিণার বাবা আমাকে একটা ভালো জিনিস দিয়েছেন। তা হলো নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপদেশ। এখন আপনার কাছে কিছু পেলেই হয়।

সুরঞ্জন বলেঃ আমি আর আপনাকে কি দেব?

অমিত সলজ্জভাবে বলেঃ আপনাকে একটা জিনিস চাইবো। আপনাকে তা দিতে হবে।

ঃ কি বলুন?

ঃ কিছু টাকা।

ঃ টাকা?

সুরঞ্জন টাকার কথায় চমকে উঠেছিল।

নিচের কেতকীদের জন্যে তাকে কিছুদিন বেশি করে টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এখন অমিতকে টাকা দিতে হলে তাকে একটু চিন্তা করে দেখতে হবে। কিন্তু অমিতের মুখের দিকে চেয়ে সে 'না' বলতে পারলো না। হয় তো কদিন তার খাওয়াই হয়নি।

সে জিজ্ঞেস করলোঃ কতো? অমিত বললোঃ একশো।

সুরঞ্জন ভাবে, এতগুলো টাকা একসঙ্গে দেওয়া তার পক্ষে কি সম্ভব হবে?

অমিত বলেঃ ধার নিচ্ছি। শোধ করে দেব।

সুরঞ্জন বললোঃ আজ দিতে পারবো না। কাল বিকেলে—

পরের দিন বিকেলে অমিত সময়মতো এলো। সুরঞ্জন তাকে এনে ঘরে বসালো, সুটকেশ খুলে টাকা দিল। তারপর জিজ্ঞেস

করলো: আর কি খবর বলুন। অমিত এদিক ওদিক তাকালো। বললো: খবর আছে। ভেবেছিলাম, আপনাকে আর কিছু বলবো না। কিন্তু সব যখন আপনাকে বলেছি, তখন আর একটু বাকি থাকে কেন?

অমিত একটু থামলো। বললো: এক গেলাস জল খাওয়াতে পারেন? সুরঞ্জন কুঁজো থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে অমিতের হাতে দিল। অমিত দু ঢোঁকে জলটুকু শেষ করে বললো: আজ আমি একবার গেছিলাম।

: কোথায়?

: ওর অফিসে।

সুরঞ্জন লক্ষ্য করলো, অমিত রিণার নামটা মুখে উচ্চারণ করতেও ঘৃণা বোধ করছে।

সে বলে চলে: আজ দুপুরে হঠাৎ কি খেয়াল হলো, ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কোথাও যাবো, তখনও ঠিক করতে পারি নি। রাস্তায় বেরিয়ে ঠিক করলাম, একবার ওর সঙ্গে দেখা করবো। শেষ বারের মতো তাকে জিজ্ঞেস করবো, ঘর আমাদের ভেঙে গেল কিনা। সত্যি বলতে কি, ভেবেছিলাম, এই কদিনে হয়তো তার মনের পরিবর্তন হয়েছে। আজ হয়তো সে তার সেদিন চলে যাবার জন্যে অনুতপ্ত হবে। বড়ো আশা নিয়ে গেছিলাম, জানেন সুরঞ্জনবাবু। অফিসের গেটে দারোয়ান ছিল, তাকে বললাম: রিণা রায়কে একবার ডেকে দিতে পারো?

সে জিজ্ঞেস করলো: রিণা রায় কৌন্?

আমি চেহারার বর্ণনা দিলাম। বললাম: তোমাদের অফিসের লেডি ডিজাইনার। সে বললো: ও বুঝেছি। সুপ্রিয়বাবু কা মেমসাব্।

আমি কিছুই বলতে পারলাম না। পায়ের তলার মাটি সরে গেলে যেমন হয়, আমারও তেমনি মনে হলো। মাথার ভেতরটা দপ্ করে উঠলো।

দারোয়ানের কথাগুলো যেন সে অনেকদূর থেকে শুনতে পাচ্ছিল ঃ মেমসাব্ তো সুপ্রিয়বাবুকা সাথ্ বাহার গিয়া হ্যায়।

ঃ মনটা বিষাক্ত হয়ে গেল, জানেন সুরঞ্জন বাবু। তখন মনে মনে ভাবলাম, কেন আমি আজ এলাম? কেন আমি আজ ওর খোঁজ করলাম? ছিলাম ভালো। মনের জ্বালা অনেকটা নিবে এসেছিল। আবার আগুন জ্বলে উঠলো। এ আগুন নিবতে কতোদিন যাবে, কে জানে? পায়ের তলায় নিজের ছায়াটাকে লাথি মারতে মারতে ঘরে ফিরে এলাম।

সুরঞ্জন বলতে যাচ্ছিল ঃ কেন গেলেন আপনি? আপনার যাওয়াটা মোটেই ঠিক হয় নি।

কিন্তু সে অমিতকে আর কোন কথাই বলতে পারলো না। অমিত শুধু বলতে লাগলো ঃ ভুল করেছিলাম সুরঞ্জনবাবু। বড়ো ভুল করেছিলাম—

অমিতের মুখে একটা গাঢ় বিষণ্ণতার রং লেগে আছে।

সুরঞ্জন বললো ঃ বসুন। একটু চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে আসি। চা খাবেন তো?

অমিত বলে ঃ থাক্। আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন?

সুরঞ্জন হাসলো। বললো ঃ বসুন। আস্ছি, একটা গল্প শোনাব আপনাকে।

সুরঞ্জন রান্নাঘরে গেল। স্টোভ ধরালো। কেট্লিতে জল চাপিয়ে দিয়ে ফিরে এলো।

সে উনিশ শো তেতাল্লিশ সালের কথা।

একটা তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলে ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে শুয়েছিল। গণেশ এভিন্যুর একটা অফিসের দারোয়ান রোজ তার উদ্বৃত্ত একখানা রুটি তাকে দিত। সময়মতো যেতে না পারলে রুটি-খানা আর পাওয়া যেত না। সেদিন ছেলেটা সারাদিন কিছু জোগাড় করতে পারে নি। সন্ধের পর ছেলেটা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের একটা

বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছিল। ভেবেছিল, আর একটু যাক্, তারপর সে দারোয়ানজীর কাছে গিয়ে তার পাওনা রুটিখানা নিয়ে খাবে। রুটি খেয়ে আঁজলা ভরে রাস্তার কল থেকে জল খাবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঝরাতে যখন ঘুম ভাঙলো, তখন তার ভীষণ খিদে পেয়েছে। গণেশ এভিন্যুর অফিসের সাম্‌নে সে ছুটে গেল। কিন্তু মুখ শুকিয়ে ফিরে আসতে হলো তাকে। দারোয়ানজী খেয়ে কখন গেট্ বন্ধ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। সে 'দারোয়ানজী' 'দারোয়ানজী' বলে কয়েকবার ডাকলো। কিছুতেই দারোয়ানজীর ঘুম ভাঙলো না। সে ফিরে আসে।

আসবার সময় সে দেখলো, তার সাম্‌নেই একটা মিলিটারী ভ্যান্ থেকে কয়েকটা মেয়ে নামলো। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা সত্যিই অদ্ভুত। ছেলেটা ভেবেই পেলো না, এত রাতে এমন সাজ-গোজ করে মেয়েরা মিলিটারী ভ্যান্ থেকে নামছে কেন ? কেনই বা মিলিটারীরা তাদের হাতে এতো নোট গুঁজে দিচ্ছে ? সে ওসবের কোন অর্থই খুঁজে পায় না। পেটে সে খিদের অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে কলের জল খায়। তারপর তার অতি-পরিচিত বেঞ্চিটাতে ফিরে গিয়ে বসে। এখন সে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে পড়লে আর খিদের জ্বালা থাকবে না।

একটু থেমে সুরঞ্জন বললো ঃ একটু বসুন। এতক্ষণে হয়তো জল ফুট্‌তে আরম্ভ করেছে। চা-টা তৈরী করেই নিয়ে আসি, কেমন ?

সুরঞ্জন চা তৈরী করে নিয়ে এলো। চা খেতে খেতে আবার সুরঞ্জন বলতে আরম্ভ করে ঃ জানেন অমিতবাবু, ছেলেটা শুতে যাচ্ছিল, এমন সময় তার চোখে পড়লো, কাছেই দুটো মাতাল বসে ঝগড়া করছে। কলকাতা শহরের অবস্থাই তখন মাতালের মতো। একদিকে তার মিলিটারী ভ্যান্ থেকে বিচিত্র সাজের মেয়েরা নামছে। আর একদিকে পার্কের কোণে মাতালেরা মদ খাচ্ছে। কলকাতা শহরের চোখে তখন ঠুলি বাঁধা। পার্কের আলোগুলোও চোখে ঠুলি বেঁধে পিট্ পিট্ করে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকাচ্ছিল। এখানে-ওখানে

ভয়ের মতো অন্ধকার থম্ থম্ করছে। সেই অন্ধকারে মাতাল দুটো ঝগড়া করছে। ঝগড়া গড়িয়ে মারামারিতে দাঁড়ালো। ছেলেটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। দুজনে দুজনের গলা টিপে ধরেছে। কেউ কাউকে ছাড়ে না। শেষে দুজনেই মরবে নাকি ?

দুজনেরই গলা দিয়ে 'আঁ' 'আঁ' করে একটা বিকট আওয়াজ বেরুচ্ছে।

ভয়ে ছেলেটা কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না, এমন সময় আকাশে একটা ভয়ার্ত বাঁশির স্বর শোনা গেল। বাঁশির সে সুর শুনে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। ছেলেটা চেয়ে দেখলো, রাস্তায় বহু লোক ছুটে চলেছে। তাদের এমন মরীয়া হয়ে ছুটতে দেখে ছেলেটা আরো ভয় পেয়ে গেল। সে কি করবে, ভেবে পেল না।

হঠাৎ মাতাল দুটো কি ভেবে এ ওর গলা ছেড়ে দিল। তারাও মরি বাঁচি করে ছুটে চললো। ছেলেটা শুনলো, একজন বলছে ঃ সাইরেন ! সাইরেন ! আরেক জন বলছে ঃ আ গিয়া ! আ গিয়া !

ছেলেটাও কিছু না বুঝে তাদের পেছনে ছুটতে থাকে। কিছুদূর গিয়ে দেখে, মাতাল দুটো ছুটতে ছুটতে ফিরে আস্ছে। যেন মদের নেশায় লোক দুটো দৌড়ের 'রেস্' দিচ্ছে। ছেলেটা তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। পার্কের পাশেই ছিল একটা এ. আর. পি. শেল্টার। সবাই তাতে ঢুকেছে। ওখানে তিল ধারণেরও স্থান নেই। ছেলেটা ওখানে ঢুকতে গেল। কিন্তু কেউ তাকে একটুও স্থান দিল না। কেউ বললো ঃ গায়ে গন্ধ। কেউ বললো ঃ পকেটমার ! কেউবা মারলো লাথি।

ছেলেটা ফিরে এলো। সে তার সেই প্রিয় আশ্রয়—বেঞ্চিটায় এসে বসে।

সাইরেনের চিৎকার তখন থেমে গিয়েছিল। আকাশে তখন প্লেনের গোঙানি শোনা যাচ্ছিল। সে বেঞ্চিতে টান হয়ে শুয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে আবার সাইরেন বেজে উঠলো।

অল্ ক্লিয়ার !

এ. আর. পি. শেল্টার এতক্ষণ দম বন্ধ করেছিল। এবার যেন দম ছাড়লো। লোকেরা কথা বলতে বলতে ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে আস্ছে।

ছেলেটার বেঞ্চির তলায়ও কারা যেন কথা বলছে। ছেলেটা ঘাড় বাড়িয়ে দেখলো, ছুটো লোক বেঞ্চির তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আস্ছে।

আরে ! এ যে সেই মাতাল ছুটো ! কিছুক্ষণ আগে এরাই তো পশুর মতো মারামারি করছিল। এখন তাদের দেখে মনেও হবে না যে কিছুক্ষণ আগে তারা ছুজনে এক মারাত্মক প্রতিহিংসায় মেতে উঠেছিল।

মাতাল ছুটো সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ছেলেটার দিকে এগিয়ে এলো। ছেলেটা ভয় পেয়ে যায়। ওদের মুখে কিসের যেন গন্ধ ! ছেলেটা আরও ভয় পেয়ে যায়।

একজন বললো ঃ কিরে ? কোথায় ছিলি ?

ভয়ে ভয়ে ছেলেটা বললো ঃ এই বেঞ্চিতে।

ঃ তাহলে তুই আমাদের দলে। কেমন ?

ছেলেটার গলা শুকিয়ে আসছিল।

আরেক মাতাল বললো ঃ খেয়েছিস কিছু ?

ছেলেটা বললো ঃ না।

ঃ মদ নয় রে। বলি, পেটে দানা কিছু পড়েছে।

ঃ না।

ঃ তবে বসে থাক। আমরা নিয়ে আসছি। বসে থাকবি। যাবি না কোথাও। তুই আজ থেকে আমাদের দলে। বুঝলি ?

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা কোথা থেকে রুটি আর তরকারী নিয়ে এলো।

ছেলেটার খাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছিল তার। কতোক্ষণ সে খাবারের লোভ সাম্লিয়ে থাকবে ? ছেলেমানুষ খাবারটুকু গোগ্রাসে গিললো।

একজন মাতাল বললো : 'স্লা'র খুব খিদে পেয়েছিল রে। হ্যাঁরে বাচ্চা. তুই থাকিস্ কোথায় রে ?

ছেলেটা বললো : কোথাও না।

: তা কি হয় ? কোনো একখানে তো থাকিস্ রে বাপু।

ছেলেটা মাথা নাড়ে।

: কোথায় ?

: এইখানে। এই বেঞ্চিতে।

আরেক জন বললো : এক্কেবারে লতুন। ব্যাটাকে দিয়ে কাজ হবে, মাইরি। অন্যজন বললো : এ্যায় শোন্। কোথাও যাবি না। বুঝলি ? এইখানে থাকবি। কাল রাত্তিরে এসে আমরা তোকে আমাদের আড্ডায় লিয়ে যাবো। আমাদের দলের রাণী আছে। দেখলে তোর চোখ ঠিক্‌রে যাবে। আর লড়তে পারবি না। না খেয়ে মরবি কেন রে, স্লা। আমাদের দলে ভিড়ে যা। টাকা ? কতো লিবি ? তুই তখন দুহাতে বিলোবি। যাবি তো কাল ?

: যাবো।

ছেলেটার মুখের কথা নিয়ে মাতাল দুটো কি বলতে বলতে চলে গেল।

ছেলেটা চেয়ে দেখলো, তাদের পা-গুলো ঠিকমতো মাটিতে পড়ছে না। কথায় ঠিক মতো যেন জোর নেই।

অমিত বললো : ভারি ইন্টারেস্টিং তো। এ সমস্ত আপনি পেলেন কোথায় ? আপনাদের রিপোর্টারের লাইনটাই বেশ। অনেক জিনিস দেখা যায়, অনেক কথা শোনা যায়—

সুরঞ্জন বললো : সবটা শুনবেন তো—

অমিত হেসে বললো : কিছু মনে করবেন না, আপনি আমাকে পকেটমার হতে বলছেন না তো ?

সুরঞ্জন হেসে উঠলো। বললো : আরে না না। সবটা শুনুন—

বলে সুরঞ্জন বলতে আরম্ভ করলো : পরের দিন সকালেই ছেলেটাকে সেখান থেকে পালাতে হলো। না পালিয়ে উপায় ছিল না তার। নইলে সেদিন রাতেই তাকে ওদের আড্ডায় যেতে হতো। পালিয়ে কোথায়ই বা যাবে? বৌবাজার স্ট্রীট ধরে শিয়ালদার দিকে হাঁটতে লাগলো সে।

রাস্তার দুদিকে তাকায়। করুণার মুখ খোঁজে। কিছুটা পথ গিয়ে সে একটা কলে আঁজ্‌লায় ভরে জল খেল। জল খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সে দেখতে পেল এক ভদ্রলোক তার দিকে চেয়ে আছে। সেও তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। ভদ্রলোকের চোখে সে করুণার মুখ দেখতে পেল। সে তো এই মুখই অনেকদিন খুঁজছে।

ভদ্রলোক ইশারায় ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন: কোথায় থাকো, খোকা?

: কোথাও না।

কথাটা বলতে তার দুচোখে কান্না এসে গেল।

: কাঁদছো কেন? কি হয়েছে তোমার? খিদে পেয়েছে?

ছেলেটা একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না।

ভদ্রলোক তাকে পয়সা দিলেন। বললেন: খাবার কিনে নিয়ে এসো। এখানে বসে আগে খাও। তারপর শুনবো তোমার সব কথা।

ছেলেটা খাবার কিনে এনে ভদ্রলোকের কাছে বসে খেল। তাকে শোনালো তার ছোট্ট জীবনের নানা দুঃখময় কাহিনী।

সব শুনে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন: পড়াশুনা করলে না কেন?

: করছিলাম তো। কিন্তু হলো না। খেতেই পেলাম না। পড়বো কি করে?

ভদ্রলোক একটু কি ভাবলেন। তারপর বললেন: একটা চাকরি আছে? করবে তুমি?

ছেলেটি বললো: কি চাকরি বলুন। আমি এক্‌খুনি করবো।

ভদ্রলোক একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখলেন—

প্রিয় শৈলেনবাবু,

আপনার ডেয়ারিতে একজন ছেলের দরকার বলছিলেন, না? আমি যে ছেলেটিকে পাঠাচ্ছি, তাকে সেখানে নিয়ে নিলে খুশি হবো। ছেলেটি ভালো। এখানে এখন কেউ নেই। নইলে আমি নিজেই যেতাম। ইতি—

আপনারই

মোকাদ্দেশ মিঞা

ছেলেটিকে তিনি চিঠি দিয়ে ভেতরে শৈলেনবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিখানা হাতে নিয়ে ছেলেটি ভেতরে গেল। যাবার সময় সে ভাবে, যিনি তাকে এতোখানি দয়া করলেন, তিনি একজন মুসলমান। সেদিন সে মুসলমান জাতিকে প্রণাম করলো। যে জাতিতে মোকাদ্দেশ মিঞার মতো মানুষ আছেন, সে জাতি কখনো দেউলে হয়ে যাবে না।

ছেলেটার ওখানে চাকরি হয়ে গেল।

সুরঞ্জন বললো: সেই ছেলেটা কে বলুন তো?

অমিত জিজ্ঞেস করে: কে?

: আমি।

: সত্যি?

: হ্যাঁ।

: এ যে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি নে।

সুরঞ্জন বলে: যুদ্ধের ধাক্কায় ছিট্‌কে পড়েছিলাম। কিন্তু মানুষের ভালোবাসায় কূল খুঁজে পেলাম।

অমিত বলে: এর চেয়ে আরব্য উপন্যাসের কাহিনী বিশ্বাস করা যে অনেক সহজ। ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের সেই ছেলেটা আপনি? কি করে তা হলো?

: সে অনেক কথা। পরে শুনবেন। তবে কি জানেন? দুঃখ এসেছে, বিপদ এসেছে, কিন্তু কখনো ভেঙে পড়ি নি, হেরে যাই নি।

অমিত উঠে এসে সুরঞ্জনের একটা হাত চেপে ধরলো।

ঃ সুরঞ্জনবাবু, গল্পটা বলে বড়ো ভালো করলেন। আমি বড়ো ভেঙে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, হেরে গেছি। আর কখনো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবো না। কিন্তু আপনার গল্প শুনে মনে হচ্ছে, পারবো। আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো, সুরঞ্জনবাবু। দেখি কি হয়।

সুরঞ্জন বললো ঃ উইশ ইওর গুড্ লাক্।

অমিতের চলে-যাওয়া পথের দিকে চেয়ে সুরঞ্জন অনেকক্ষণ বসে ছিল। পারবে তো সে দাঁড়াতে? যদি পারে তাতে তার চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না।

হালদার বাগান লেনের এই সরু গলিতে এখন কানায় কানায় অন্ধকার কাঁপছে।

হেরম্ববাবুকে দেখতে যাওয়া তার আজও হয়ে উঠলো না। কালও যেতে পারেনি সে। কি ভাবছেন হেরম্ববাবু? অবশ্যি যোগমায়া দেবী রোজই যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে যায় কেতকী কিংবা করবী। আর যায় নিশীথ। কোন কোনদিন তুষার।

তুষার একটু অন্য ধরনের ছেলে। বেশ চুপচাপ। ঠাণ্ডা মেজাজ। কথায় বার্তায় বেশ নম্র। তার ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়িতে আর ফরসা রঙে মানায় বেশ। কিন্তু কতোই বা বয়েস ওর? এই বয়েসে ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি কেন? তাও কি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে? আজকাল তরুণ সমাজ অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এভাবে মরীয়া হয়ে উঠেছে কেন? তার ওপর চড়া রঙের জামা, টান-টান প্যান্ট আর ছুঁচোলো জুতো। দৃষ্টি আকর্ষণের এই বহির্মুখী প্রয়াস কি অন্তরের একটা বিরাট্ ফাঁকিকে ঢাকা দেবার জন্যেই?

গলির মোড়ে গাড়ি থামার শব্দ হলো।

গাড়ি করে কে আর আসবেন এ গলিতে? এ গলিতে আসবার আর কে আছেন? হয়তো নবেন্দুবাবু স্কুটারে করে অফিস থেকে ফিরলেন।

সুরঞ্জন কান পেতে রইলো। কিন্তু সিঁড়িতে কারো জুতোর শব্দ শোনা গেল না। হয়তো নবেন্দুবাবু নয়। হয়তো অন্য কেউ।

পাশের বাড়ি দুটোতে কেউ কখনো গাড়ি করে আসে না। একটা বাড়িতে তো দিনরাত মেয়েরা শুধু চিৎকার করে ঝগড়াই করে। কেন যে ঝগড়া করে আর কি নিয়ে যে এত ঝগড়া করে, তা তারাই জানে। সুরঞ্জন অনেকবার চেষ্টা করেছে, তাদের ভাষা বোঝবার। কিন্তু সে তাদের কথার একটি বর্ণও বুঝতে পারে নি। তারা কি হিব্রুতে ঝগড়া করে, না ল্যাটিনে? তবে তারা যখন ঝগড়া করে, সবাই একসঙ্গে চিৎকার করতে থাকে। ফলে কেউ কারো কথা শুনতে পায় না।

সুরঞ্জন তাদের কখনো দেখেনি। তারা বোধহয় রাস্তায় বেরোয় না। অন্ধকার গলির অন্ধকার বাড়িতে তারা বোধহয় নিজেদের ঠিকমতো দেখতেও পায় না। ঠিকমতো চিনতেও পারে না। অন্ধকারে থেকে থেকে তাদের চোখগুলো বুঝি আলো হারিয়েছে। গলার স্বরেই তারা দেখতে পায়। তাই দিয়ে তারা পরস্পরকে চেনে এবং তাই দিয়েই বোধহয় ঝগড়া করে।

সুরঞ্জনের ভারি আশ্চর্য লাগে।

কেউ কারো কথা শোনে না। তবু কথা বলা চাই। বোধহয় অন্য কারণও আছে। অন্ধকারে তারা ঠিক বেঁচে আছে কিনা মাঝে মাঝে একটু পরখ করে দেখতে চায়। গলার স্বর দিয়েই তারা তাই পরখ করে দেখে।

আর একটা বাড়িতে এক বৃদ্ধ মহিলা দিনরাত 'আয় আয়' করে ডাকেন। একদিন মাঝরাতে সুরঞ্জন ঘুম থেকে জেগে শুনলো, বৃদ্ধ মহিলাটি কাকে ডাকছেন: আয়, আয়, আয়—

সেই নিশুতি রাতে খন্‌খনে গলায় আর সেই চিৎকারে সে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যাকেই হোক্, ডাকবার আর সময় পেলে না? এই মাঝরাতে? সুরঞ্জন শুনলো, ডাকটা যেন এই দিকে এগিয়ে আস্‌ছে।

সুরঞ্জন উঠে ঘরে আলো জ্বাললো। উত্তর দিকের জানলাটা খুলে দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাশের বাড়ির সাম্‌নের জানলাটা খুলে গেল।

একটা রক্তশূন্য মুখ। দুই গালে দুখানি ত্রিকোণ হাড়ের সুস্পষ্ট আভাস। শণের মতো শাদা চুল।

ঃ আয়, আয়—

সুরঞ্জন তাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। দুটি কোটরাগত চোখও তার মুখের দিকে চেয়েছিল।

ঃ দেখেছো তুমি আমার রাণীকে?

আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছে সে। নিশুতি রাতে ঘুম ভাঙিয়ে—'দেখেছো তুমি আমার রাণীকে'। যতো সব—

ঃ না। এখানে কোন রাজাও নেই, রাণীও নেই—

বলে সুরঞ্জন জানলাটা বন্ধ করে দিল।

পরে অবশ্য সে জানতে পেরেছে, রাণী আর কেউ নয়। বৃদ্ধার একটি বেরাল। তার জন্যে এত কাণ্ড?

বৃদ্ধার স্বামী যিনি, তিনি পুষেছেন একটি কালো নেড়ি কুকুর। খাইয়ে-দাইয়ে ওটাকে বেশ মোটাসোটা করে তুলেছেন। তার নাম রেখেছেন রাজা। বৃদ্ধা কুকুরটাকে দুচোখে দেখতে পারেন না। তিনিও তার প্রতিবাদে পুষেছেন একটা বেরাল। তার নাম দিয়েছেন রাণী। ওবাড়ির রাজা-রাণীর মধ্যে ঝগড়া এবং বিচ্ছেদ একটা চিরন্তন ব্যাপার। এর মধ্যে একদিন রাজা নাকি রাণীকে রাস্তায় তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে রাণী আর এমুখো হয়নি। বুড়ি রাণীকে সেই থেকে খুঁজে ফিরছেন। যাকে সাম্‌নে পান, তাকেই জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি দেখেছো বাবা? মিঠুয়া সুরঞ্জনকে এই রাজা-রাণীর তথ্যটা জানিয়েছে।

এ গলিতে আর কে গাড়ি করে আসবে?

তবে কি হেরম্ববাবুর কোন নতুন দুঃসংবাদ এলো?

কয়েক মিনিটের মধ্যে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন অঞ্জলি দেবী।

ঃ মাপ করবেন, আপনার পারমিশন্ না নিয়েই ঘরে ঢুকে পড়েছি।

ঃ আজ আবার হঠাৎ কি মনে করে? কোথাও যেতে হবে নাকি?

ঃ না তিনি স্বয়ং এসে হাজির।

ঃ কে?

ঃ কে আবার?

ঃ নিশিকান্তবাবু?

ঃ হ্যাঁ। কিন্তু কি মুশ্‌কিল দেখুন তো। এত বড়ো একজন লোক ওর বাড়িতে ওর সঙ্গে আলাপ করতে এলো। আর লোকটা কিছুতেই তার সঙ্গে আলাপ করবে না। আলাপ তো দূরের কথা, ওকে দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গেল, ফিরবে তো? না। সোজা গিয়ে সে বাথরুমে ঢুকে রইল। এমন লোককে নিয়ে ঘর করা চলে?

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেঃ কেন? উনি এ রকম করছেন কেন?

অঞ্জলি দেবী বলেঃ ওই তো ওর স্বভাব। ওকে নিয়ে কটা বছর এম্‌নি ভাবেই তো আমি জ্বলে পুড়ে মরছি। সামাজিকতা বলে একটা কথা আছে তো? ও তার ধার দিয়েই যায় না। ভেবে দেখুন, এত বড় একটা লোক এলো তোমার বাড়িতে। আর তুমি কিনা তার সঙ্গে একটা কথাও না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাথরুমে বসে রইলে? তোমার বাড়ির যা ছিরি! অন্ধকার এঁদোগলির ইঁদুর-পচা অন্ধকারে তো থাকো! তুমি আর কতো ভালো হবে?

একটু থামলেন অঞ্জলি দেবী। তারপর বললেনঃ তোমার কত ভাগ্যি, উনি তোমার বাড়ি পায়ের ধুলো দিয়েছেন। নিজেই তো দেখি, কতো লোক উমেদারি করে ওঁকে তাদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে: উনি কি সবখানে যান?

অঞ্জলি দেবী প্রায় হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। একটু দম্ নিয়ে বললেন ঃ সুরঞ্জনবাবু, একটিবার দয়া করে চলুন না।

ঃ কেন ?

ঃ ওকে একবার বুঝিয়ে বলবেন।

ঃ অঞ্জলি দেবী, আমাকে ও অনুরোধটুকু না-ই বা করলেন।

অঞ্জলি দেবী একটু কি ভাবলেন। বললেন ঃ বেশ। তা যদি না করবেন, না-ই করলেন। তবু একটু নিচে চলুন। উনি একা-একা বসে রয়েছেন, ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলবেন।

অঞ্জলি দেবী সুরঞ্জনকে বড়ো বিপদে ফেললেন। সুরঞ্জন এই সব দেশনেতাদের কাছ থেকে একটু দূরে-দূরে থাকতে চায়। কিন্তু চাকরি তাকে ওদের কাছেই ঠেলে নিয়ে যায়। আজ আবার অঞ্জলি দেবী তাকে টেনে নিয়ে গেলেন।

অগত্যা সুরঞ্জনকে কাপড় বদ্‌লে নিচে যেতে হলো।

সুরঞ্জন ভাবে, তাহলে গলির মোড়ে যে মোটর গাড়ির শব্দ শোনা গিয়েছিল, তা অন্য কারো নয়, নিশিকান্তবাবুর।

নিশিকান্তবাবু অঞ্জলি দেবীদের সেই বিরাট্ চেয়ারখানায় বসেছেন। মেদবহুল শরীরের অনেকখানি এদিক ওদিক ঠেলে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু চেয়ারের শাসনে তা পারছে না।

সুরঞ্জনকে দেখেই নিশিকান্তবাবু বললেন ঃ আরে, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি, না ?

সুরঞ্জনকে কোন উত্তরই দিতে হলো না। উত্তর দিলেন অঞ্জলি দেবী ঃ প্রেস-কন্‌ফারেন্সে দেখেছেন ওঁকে। উনি অমুক কাগজের রিপোর্টার।

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

হাসতে হাসতে নিশিকান্তবাবু বললেন ঃ জানো ভাই, আমি তোমাদের এই রিপোর্টার জাতটাকে ভীষণ ভয় করি। তোমরা যে কি ভয়ানক, তা তোমরা জানো না। তোমরা ইচ্ছে করলে আমাদের তুলতেও পারো, আবার ইচ্ছে করলে পথেও বসাতে পারো।

তোমরা হয়-কে 'নয়' করো, নয়-কে 'হয়' করো। আমি তোমাদের ভয় করি।

সুরঞ্জন হেসে বললো ঃ আপনি যা খুশি তাই বলে যান। আমি কিন্তু রিপোর্ট নিচ্ছি না।

ঃ আচ্ছা—

বলে নিশিকান্তবাবু গলায় গিট্‌কিরি তুলে হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ ও কাগজে কতোদিন কাজ করছো ?

ঃ প্রায় পাঁচ বছর।

ঃ এখানে কতোদিন আছো ?

ঃ মাস তিনেক হলো এসেছি।

অন্য সময় হলে নিশিকান্তবাবু এ সমস্ত অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের ধারে কাছে আসতেন না। কিন্তু তখন, সেই মুহূর্তে তিনি যেন কেমন অনেক কাছে এগিয়ে এলেন—একেবারে সুরঞ্জনের ব্যক্তিগত ব্যাপারের নিবিড় নিকটে। একথা-সেকথার পর তিনি বললেন ঃ অঞ্জলি, আমি আজ তাহলে চলি। অবিনাশবাবু বোধ হয় আমার সঙ্গে দেখা করতেই চান না।

অঞ্জলি দেবী মুখটা একটু করুণ করে বললেন ঃ ঠিক তা নয়। অসুখের পর থেকেই উনি বেশি লোক বা ভিড় মোটেই সহ্য করতে পারেন না।

ঃ তবে তো ট্রিট্‌মেণ্ট হওয়া দরকার। আমি না হয় টেলিফোনে—

ঃ আপনি মিছিমিছি চেষ্টা করবেন। ওঁকে রাজি করানো যাবে না।

ঃ কী আশ্চর্য !

ঃ হ্যাঁ। এই ক বছরে আমি ওঁকে নিয়ে যে কীভাবে জ্বলে পুড়ে মরছি, সে কেউ জানে না।

ঃ সত্যি অঞ্জলি, ঘরে এত অশান্তি নিয়েও যে তুমি বাইরের কাজ করছো, তা ভেবে যে আমি আরো অবাক হয়ে যাচ্ছি। তোমার কাছ থেকে আমার দেশের মেয়েদের অনেক কিছুই শেখবার আছে।

সুরঞ্জন চেয়ে দেখলো, অঞ্জলি দেবী এত প্রশংসার ভার যেন সইতে পারছেন না। মুখ নিচু করে তিনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঃ চলো, আমাকে একটু এগিয়ে দেবে।

নিশিকান্তবাবু সুরঞ্জনের দিকে চেয়ে বললেন ঃ আচ্ছা ভাই, চলি। তোমার কথা আমার মনে থাকবে।

সুরঞ্জন বললো ঃ গলিটা খুব অন্ধকার। চলুন আমিও যাচ্ছি, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

নিশিকান্তবাবু বললেন ঃ তুমি আর মিছিমিছি যাবে কেন? অঞ্জলি যাচ্ছে, আমি ঠিক চলে যাবো।

সুরঞ্জন দেখলো যে, সে তাঁকে এগিয়ে দিতে যাক, তা নিশিকান্তবাবুর অভিপ্রেত নয়। সে তাই আর উৎসাহ দেখালো না।

একা অঞ্জলি দেবীই অন্ধকারে নিশিকান্তবাবুকে এগিয়ে দিতে গেলেন। গলির মোড়ে তাঁর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই সেখানে এতক্ষণে উৎসাহী দর্শকদের একটা বড়ো রকমের ভীড় জমে গেছে। কারণ তার গাড়ির নম্বরও অনেকেরই জানা।

সুরঞ্জন ওপরে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাথরুমের দরজা খুলে অবিনাশবাবু মুখটা একটুখানি বের করে ডাক দিলেন ঃ ও মশাই—

সুরঞ্জন ফিরে তাকালো।

অবিনাশবাবু হাতের ইশারায় সুরঞ্জনকে কাছে ডাকলেন।

সুরঞ্জন কাছে গেলে তিনি তার কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ চলে গেছে?

ঃ হ্যাঁ—

ঃ কখন গেল?

ঃ এই মাত্র।

ঃ আবার ফিরে আসবে না তো?

ঃ না। আপনি এখন নিশ্চিন্তে ঘরে যেতে পারেন।

অবিনাশবাবু ঘরে ফিরে গেলেন।

সুরঞ্জন ওপরে উঠে গেল। ঘরে গিয়ে বসেছে এমন সময় অঞ্জলিদেবী এসে হাজির।

ঃ আবার এলাম।

ঃ আসুন।

অঞ্জলিদেবী বিছানার ওপর বসলেন। বললেনঃ এই এঁদো গলিতে ওঁর যে কি ভালো লেগেছে জানি না।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেঃ কার কথা বলছেনঃ অবিনাশবাবুর কথা?

ঃ আবার কার? নিশিকান্তবাবুর হাতে একখানা ছবির মতো বাড়ি আছে সি. আই. টি. রোডে। কিনতে পারলে কাজের মতো কাজ হতো। ওঁকে কেনার কথা বলতে এসেছিলেন। উনি কি কিনবেন? বাথরুমে গিয়ে লুকিয়ে বসে রইলেন। ছি ছি, ভদ্রলোক কি মনে করলেন বলুন তো? আমি তো লজ্জায় একেবারে মরে যাচ্ছি।

সুরঞ্জন কি বলবে, ভেবে পায় না। নিশিকান্তবাবুর ওপর অঞ্জলি দেবীর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর উপদেশ অবিনাশবাবু কাজে লাগাতে পারলেন না, এই তাঁর বড়ো দুঃখ।

অঞ্জলিদেবী বললেনঃ বাড়ি না কেনো, নাই কিনলে। নিশিকান্ত-বাবুর বিরাট বাড়ি। অনেকগুলো ঘর খালি পড়ে থাকে। তিনি কয়েকখানা ঘর আমাদের ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন। বলুন তো, আজকালকার দিনে এতখানি কে করে?

সুরঞ্জন জানালো যে, আজকালকার দিনে এতোখানি সতিই কেউ করে না।

ঃ তবে? ওঁকে কি আমি তাতে রাজি করাতে পারলাম? এ বাড়িতে যে উনি কি পেয়েছেন জানি না। উনিও সরবেন না, আমাকেও সরতে দেবেন না। অঞ্জলি দেবী গজ গজ করতে করতে চলে গেলেন।

সুরঞ্জন এবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। চারদিকের মানুষের এত সমস্যা, এত বেদনা—সব তাকেই শোনানো

চাই। তা নইলে আর কে শুনবে ওদের কথা? রিপোর্টার সে। চারদিকের সহস্র ঘটনার সে নীরব দর্শক। সে শুধু দেখে যাবে, কিন্তু বলবে না কিছুই।

যাক, এবার সে নিজের মধ্যে একটু নিজেকে গুটিয়ে আনবে। নিজের বেদনার চারদিকে নিঃসঙ্গ হয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াবে।

হঠাৎ উত্তর দিকের জানলাটা কিসের শব্দে নড়ে উঠলো। ওপাশে আবার ঠেলা দেয় কে?

অনিচ্ছা সত্বেও সুরঞ্জন উঠে গিয়ে ওপাশের জানলাটা খুলে দেয়। দেখে, ওপাশের বাড়ির জানলায় সেই বৃদ্ধা। হাতে তাঁর একখানা লাঠি। লাঠি দিয়ে জানলাটা খুঁচিয়ে তিনি সুরঞ্জনকে টেনে এনেছেন। সুরঞ্জনকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি আমার রাণীকে দেখেছো?

সুরঞ্জন রেগে বলেঃ না।

বলেই তার মুখের ওপরে দড়াম্ করে জানলাটা বন্ধ করে দেয়।



সুরঞ্জন চারদিকে শুধু কান্না শোনে। আঁধারের কান্না। সবাই কাঁদছে। হাসছে যারা তাদেরও হাসির পেছনে সে শুধু কান্নাই দেখেছে। মানুষ এত কাঁদতে পারে?

সবাই আঁধারকে ভয় পায়। সবাই আঁধার থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু পারে না। পারে না বলেই তারা কাঁদে। সে কান্নার কোন নাম নেই, সে কান্নার কোন ভাষা নেই।

সেই ইঁদুরের মরার দৃশ্যটা সুরঞ্জনের প্রায়ই মনে পড়ে।

জলের বালতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তার কি অদম্য প্রয়াস! বাঁচবার জন্য সেও খুঁজেছিল একটু আলো আর একটু বাতাস। কি অসহায় আর কি করুণ লাগছিল তার মুখটা! ছোট

ছোট পা-গুলি তার প্রাণপণে লড়াই করছিল মৃত্যুর সঙ্গে, আঁধারের সঙ্গে।

কিন্তু পারলো না। মৃত্যু তাকে দম বন্ধ করে মারলো। মরবার সময় সে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে গিয়ে হাঁ করেছিল, তা আর বন্ধ হয় নি। আলোর মুখ দেখবার জন্যে সে চোখ মেলে চেয়েছিল, চোখ দুটো তার তাই ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল।

আলো চাই, বাতাস চাই একটু! বাঁচবার জন্যে আরো আলো, আরো বাতাস!

অন্ধকারের মধ্যে মানুষের আত্মা বাঁচবার জন্যে আর্তনাদ করছে। কেউ তাকে বাঁচাবে না, বাঁচাবার চেষ্টাও করবে না। কেন করবে?

সে কি ইঁদুরটাকে বাঁচাতে পারতো না? নিশ্চয়ই পারতো। কিন্তু তাকে বাঁচাবার জন্যে কি সে চেষ্টা করেছিল? করেনি। কেনই বা করবে?

মানুষও তেমনি বাঁচার চেষ্টা করতে গিয়ে একদিন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবে। আর উঠবে না।

পাশের বাড়ির বুড়িটা সুরঞ্জনকে বলেছিল: রাণী আমার কারো বাড়ি চুরি করে খেতে জানে না। আমি তাকে নিজে হাতে খেতে দিয়েছি, তবে সে খেয়েছে। কেউ কি আর আমার মতো হাতে তুলে তাকে খেতে দেবে? তুমি কি বলো?

সুরঞ্জন বলেছিল: তা কি কেউ দেবে?

: তাহলে তাকে ফিরে আসতেই হবে, কি বলো?

বুড়ির খন্‌খনে গলায় একটা ভরসার সুর ভেসে ওঠে।

সুরঞ্জন বলে: নিশ্চয়ই। তাছাড়া যাবে কোথায়? খাবে কোথায়?

বুড়ি প্রায় কেঁদে ফেলে: রাণী নেই, আমারও চোখে ঘুম নেই। কোলের কাছে ঘুমুতো আর গর্ গর্ করে আওয়াজ করতো। সেই আওয়াজে আমারও ঘুম এসে যেত। কদিন হলো কোলের কাছটা একেবারে ফাঁকা পড়ে থাকে।

বুড়ি চোখের কোণে পিচুটি মোছে। মুখে বুড়ির একটিও দাঁত নেই। কথা বলার ফাঁকে কস্ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে। বুড়ি রুমালের মতো কি একটা দিয়ে কস্ দুটো মুছে নেয়।

বুড়ি বলে : রাজার জন্যেই সে বাড়িতে থাকতে পারলো না।

: কেন?

: কেন আবার? যখন তখন তাকে তাড়া করতো যে!

পাছে কেউ শুনতে পায়, এমনি ফিস্ ফিস্ করে বুড়ি কথাটা বললো।

: সে বছর দার্জিলিং গিয়েছিলাম। দার্জিলিং থেকে একটা বাচ্চা বেরাল নিয়ে এসেছিলাম। সে বড়ো হলো। গায়ে কি লোম! যেন তুলোর মতো নরম তুল্ তুল্ করছে তার গা-টা। পাড়ার হা-ঘরে বেরালদের সঙ্গে তাকে মিশতে দিতাম না। মরিস্ সাহেবের বাড়িতে একটা ভালো জাতের হুলো ছিল। তাকে কিছুদিন গেস্ট হিসেবে 'লোন' এনে রাখলাম। হুলোটা দুদিনে বেশ ভাব জমিয়ে নিল। কিছুদিন পরে মরিস্ সাহেবের বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে এলাম। তার কিছুদিন পরে রাণী হলো।

সুরঞ্জন জানলায় দাঁড়িয়ে বুড়ির কথা শুনছিল। সে জিজ্ঞেস করলো : তারপর রাণীর মা কোথায় গেল?

: ছিল অনেক দিন। বেশ ভালোই ছিল। কিন্তু বেশিদিন ভালো থাকতে পারলো না। পাড়ার হা-ঘরে হুলোগুলো তাকে বেশিদিন ভালো থাকতে দিল না। তাদের সঙ্গে মিশে একেবারে খারাপ হয়ে গেল সে। বাড়ি থেকে শেষে একদিন পালিয়ে গেল।

: পালিয়ে গেল? আপনি আর খোঁজ করেন নি?

: না। কেমন যেন ঘেন্না হলো। শেষে কিনা পাড়ার নোংরা হুলোগুলোর সঙ্গে? ছি ছি। এইজন্যে তাকে দার্জিলিং থেকে নিয়ে এসেছিলাম? এ্যাঁ?

একটু থেমে বুড়ি বললো : তা ছাড়া কি জানো? রাণীকে পেয়ে তার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। রাণী যে আরও সুন্দরী।

ঃ তাই বুঝি ?

ঃ হ্যাঁ। এলে দেখো। গা-টা কেমন স্পঞ্জের মতো নরম। দেখলেই গায়ে হাত দিয়ে তোমারও আদর করতে ইচ্ছে হবে। কিন্তু বড়ো 'শাই'—

বুড়ি খন্‌খনে গলায় হেসে ওঠে। তখনই মিঃ গোমেসকে বলেছিলাম একবার মিঃ মরিসের বাড়ি যাও। তখন উনি গেলেন না। তারপরই বাতে শুয়ে পড়লেন। আর যাওয়া হলো না।

বুড়ি বলে চলে ঃ পাড়ার নোংরা হুলোগুলো কতো রকমে তার সঙ্গে ভাব জমাতে আসে। আমি ওদের ওর কাছে ঘেঁষতেই দিতাম না। তুমিই বলো। কেমন অ্যারিস্টোক্র্যাট্ ফ্যামিলিতে ওর জন্ম। ও যাবে ঐ নোংরা হুলোগুলোর সঙ্গে মিশতে ? আর আমি তা অ্যালাউ করবো ?

ঃ তারপর কি হলো ?

ঃ মিঃ মরিস থাকে শিয়ালদার কাছে। সেখানে আমি আর যেতে পারি নি। ভেবেছিলাম, বুড়ো সেরে উঠলে একদিন যাবে। দেখতাম, রাণী কেমন একটু যেন মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়াতো। খাওয়ায় আজকাল তার বিশেষ রুচি ছিল না। তাই বলে সে রাস্তার নোংরা হুলোগুলোকে যে পছন্দ করতো, তা নয়। বরং উল্টে ভীষণ ডিস্‌লাইক্ করতো। হবেই তো। কি রকম অ্যারিস্টোক্র্যাট্ ফ্যামিলির মেয়ে ও। হুলোদের কেউ তার কাছে এলে সে ফোঁস করে উঠতো। আর, রাজা তো একটা হুলোকে মেরেই ফেললো।

সুরঞ্জন বলে ঃ কিছু মনে করবেন না। আপনি মিঃ মরিস, মিঃ গোমেস—এই সব নাম করছেন। কিন্তু কোন চ্যাটার্জী-ব্যানার্জীর নাম তো করছেন না। কি ব্যাপার বলুন তো ?

বুড়ির ম্লান দু চোখে আলো ফুটে ওঠে একটু। বলে ঃ আমরা যে ক্রিশ্চিয়ান্। আগে তো আমরা প্রত্যেক রবিবারে চার্চে যেতাম। মিঃ গোমেস অসুস্থ হয়ে পড়ায় যেতে পারছেন না আজকাল। এখন রবিবার সকালে ফাদার আসেন। ঘরেই প্রেয়ার করেন।

সত্যি কথা বলতে কি, সুরঞ্জন বুড়িকে প্রথমটা চিনতে পারেনি। এখন চেয়ে দেখলো, বুড়ির কপালে সত্যিই সিঁদুর নেই। গলায় ক্রশও আছে। এখন তা সুরঞ্জনের চোখে পড়লো। প্রথমদিন রাতে যখন সে বুড়িকে দেখলো, তখন সে তাকে পাগল বলে মনে করেছিল। অবশ্য পাগ্‌লামি যে নেই, তাও এখন সুরঞ্জন নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না।

বুড়ি বলে ঃ সে কথা এখন থাক। রাণীকে দেখতে পেলে তুমি আমাকে বলবে কেমন? ওকে দেখলেই ঠিক চিনতে পারবে।

সুরঞ্জন বলে ঃ তাহলে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখুন না। কতো আর পড়বে?

ঃ তুমি একটু ব্যবস্থা করে দিতে পারো বাছা?

ঃ তা দিতে পারি। টাকা দশেকের মধ্যে হয়ে যাবে। কি লিখবেন, বলুন? ইংরেজিতে না বাংলায়?

প্রথমে মিসেস্ গোমেস বললেন ঃ ইংরেজিতে। হাজার হোক অ্যারিস্টোক্র্যাট্ ফ্যামিলির মেয়ে তো।

কি ভেবে তারপর বললেন ঃ না বাংলায়ই দিয়ে দাও।

ঃ কি লিখবেন, বলে দিন। পরশুদিনের কাগজে বেরিয়ে যাবে।

ঃ লিখবে—"রাণী, যেখানেই থাক চলে এসো।

—মিসেস্ গোমেস।"

সুরঞ্জন গম্ভীরভাবে বলে ঃ আর একবার ভেবে দেখুন, আপনার রাণী বাংলা ঠিক বুঝে উঠতে পারবে কিনা। যা অ্যারিস্টোক্র্যাট্ ফ্যামিলির মেয়ে!

ঃ ঠিক বলেছ, তবে ইংরেজিতে?

ঃ ইংরেজিও যে আজকাল অনেকেই বলছে।

মিসেস্ গোমেস কেবল শূন্য চোখে চেয়ে রইলেন। সুরঞ্জন জানলা থেকে ধীরে ধীরে সরে আসে।

সুরঞ্জন কোনদিকে না তাকিয়েই বাড়ি ফিরছিল।

কাল 'নাইট ডিউটি' ছিল। রাতে তাই ঘুম হয় নি একেবারে। ম্যাটার ঠিকমতো সাজানো হয়েছিল। একটু পরেই অর্ডার যাবে। পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে একটা বিরাট খবর উড়ে এলো। আবার ম্যাটার ভেঙ্গে সাজানো হলো। ম্যাটার তো সাজানো হলো। কিন্তু মেশিনম্যান হরবিন্দার সিং কোথায়? মদ খেয়ে চুর হয়ে সে একপাশে পড়ে আছে। তাকে টেনে তোলা হলো। মদ খাক্ আর যাই খাক্ হরবিন্দার মেশিনের সাম্‌নে দাঁড়ালেই অন্য মানুষ হয়ে যায়।

সুরঞ্জন তা কাল রাতেই দেখেছে।

সমস্ত শরীরটাকে সোজা করে সে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন একটা পাথরের মূর্তি। ভোর চারটের সময় ছাপা শেষ হলো।

তারপর সুরঞ্জন এককাপ চা খেয়েছিল। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সকাল হলো, আলো ফুটলো। সুরঞ্জন বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

ট্র্যাম থেকে নেমে সে নিজের মনে হাঁটছিল।

গলির মোড়ে পানের দোকানটার সামনে সে এসে গেছে।

আলোর বিপরীতে একটা লম্বা ছায়া এঁকে তার সাম্‌নে কোথা থেকে নিশীথ এসে দাঁড়ালো।

ঃ নমস্কার!

সুরঞ্জন কপালে হাত তুলতেও ভুলে গিয়েছিল।

নিশীথ বলে ঃ আপনার সাথে আলাপ করবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। কিন্তু আপনি তো আমাকে একেবারেই দেখতে পারেন না।

কথাটা শুনে সুরঞ্জন হেসে উঠলো। বললো ঃ কে বলেছে?

ঃ কে আবার বলবে? দেখতেই তো পাচ্ছি। আমরা তো আর grass-এ মুখ দিয়ে হাঁটি না।

ঃ এটা আপনার ভুল ধারণা।

সুরঞ্জন বলে।

নিশীথ কপালটা কোঁচ্‌কালো। বললো ঃ সেই প্রথম দিন থেকে

আপনাকে দেখে আসছি, আপনি আমাকে ডিস্‌লাইক করেন। কেন বলুন তো? আমি কি আপনার পাকা ধানে মই দিয়েছি?

সকাল বেলায় এই সমস্ত কথা শুনতে সুরঞ্জনের একেবারে ভালো লাগছিল না। মাঘ মাসের কাঁচা-মিঠে রোদ্দুরে রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি ধুয়ে মুছে সে বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু পথের মাঝখানে এ কি বিড়ম্বনা!

সুরঞ্জন বলে ঃ আমি একটু একা থাকতেই ভালোবাসি। আমার দুঃখ কিংবা কষ্ট আমি কারো ঘাড়ে চাপাতে চাই না। আপনি আমার এই স্বভাবের কোন ভুল অর্থ করেছেন নিশ্চয়ই।

ঃ দেখুন, আমি কারো পছন্দ-অপছন্দের বড়ো একটা ধার ধারি না। আপনার সঙ্গে আমাদের একটা দরকারী কথা আছে। তাই—

সুরঞ্জনের ভারি বিশ্রী লাগছিল। মাঘ মাসের সকালের এই মিষ্টি মেজাজটা নিশীথ একেবারে নষ্ট করে দিল।

ঃ কি দরকারী কথা, বলুন—

নিশীথ হাতে আওয়াজ করে পাশের দোকানের সাম্‌নে অপেক্ষমান কয়েকটা ছেলেকে ডাক দিল।

ছেলেদের পোষাক পরিচ্ছদ নিশীথের মতোই। মাথার চুলগুলো একই ঢঙে ওল্‌টানো। একই কলে তৈরী সব অতি-আধুনিক কালের পুতুল।

কিন্তু নিশীথ তাকে কি বলবে? কি বলতে পারে সে?

কাল বিকেলেই তো তাকে সুরঞ্জন হাসপাতালে দেখেছিল। যোগমায়া দেবী আর কেতকীকে নিয়ে সে কাল হাসপাতালে গিয়েছিল। সুরঞ্জন গিয়েছিল একটু পরে। মাঝে কয়েকদিন সে হেরম্ববাবুর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে নি। নিজেকে মনে মনে অপরাধী লাগছিল তার। সে তাই কাল হেরম্ববাবুর বিছানার পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাই বলছিল।

হেরম্ববাবুর সঙ্গে কথার ফাঁকে সে লক্ষ্য করেছিল, তার সাম্‌নে নিশীথ একটি কথাও বলে নি। তার আগে অবশ্যি সে হেরম্ববাবুর

বিছানার পাশে বসে কতো কথাই বল্‌ছিল। হাসছিল কথার ফাঁকে ফাঁকে।

সুরঞ্জনকে দেখে কেতকী বলে উঠেছিলঃ এই তো উনি এসেছেন।

শুনে সুরঞ্জনের বুকের ভেতরটা শির্‌ শির্‌ করে উঠেছিল। কেতকীর গলাটা ভারি মিষ্টি। কেমন একটা ক্লান্তির রেশ তাতে যেন লেগে আছে। শীতের শেষে ন্যাড়া গাছগুলোর ডালের ফাঁক দিয়ে যেমন বাতাস বয়ে যায়, তেমনি সুরঞ্জনের ভেতরটা কেমন যেন শিউরে উঠলো। সে কি কোন আশঙ্কা, ভয় অথবা ভালোবাসা! সুরঞ্জন ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি।

সুরঞ্জন কেতকীর দিকে একবারও তাকালো না। কেতকী কেমন সেজেছে, মুখে কেমন একটা আলোকিত ভাব। সুরঞ্জন তার কিছুই দেখলো না। আর যা-ই হোক, কেতকীকে দেখে মনে হবে না যে, সে হাসপাতালে রুগী দেখতে গেছে। তাই বা কেন হবে?

সুরঞ্জন জানে, হেরম্ববাবুর প্রতি কেতকীর কী গভীর টান!

সুরঞ্জনকে দেখে নিশীথের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, অসমাপ্ত কথায় হঠাৎ ছেদ টেনে দিয়ে কি ভেবে সে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায়।

সুরঞ্জন হেরম্ববাবুর বিছানার পাশে গিয়ে বসে।

ঃ আজ কেমন আছেন?

হেরম্ববাবু ম্লান একটু হেসে বলেনঃ একই রকম আছি। কিন্তু রাতে ঘুম একেবারেই হচ্ছে না।

ঃ ডাক্তারকে বলেছেন?

ঃ বলেছি, আজ রাতে একটু ঘুমের ওষুধ দেবেন বলেছেন।

ঃ ঠিক আছে। তাহলেই হবে।

আরও অনেক কথা হলো। পূর্ববাংলার কথা, হালদার বাগান লেনের কথা, সংসার চলার কথা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা।

সুরঞ্জন হেরম্ববাবুকে আশ্বাস দেয়ঃ কিছু ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি আগে সেরে উঠুন তো!

সুরঞ্জনের কথা শুনে হেরম্ববাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছেন।

হাসপাতালের ওয়ার্ডে তখন আলো নিবে এসেছিল। সেই নিবে-আসা আলোর অন্ধকারের মধ্যে হেরম্ববাবুর চোখ দুটো এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে একান্ত অসহায়ভাবে চেয়েছিল।

একটু পরে হেরম্ববাবুর কয়েকজন মক্কেল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কোর্টে বিচারের দিন পড়েছিল তাঁদের। হেরম্ববাবু উপস্থিত না থাকায় আবার দিন পড়েছে। সে বিষয়ে 'কন্‌সাল্ট' করতে এসেছিলেন তাঁরা। হেরম্ববাবুর এ অবস্থা দেখে তাঁরা যাবার সময় তাঁর হাতে কিছু টাকাও দিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘণ্টা পড়লো। বিদায়ের ঘণ্টা। চলে আসতে হবে এবার।

নিশীথ আর কেতকী আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল। কখন তারা বেরিয়ে গিয়েছিল কেউ জানে না।

এবার সুরঞ্জনও বেরিয়ে আসে।

যোগমায়া দেবী এলেন একটু পরে।

হাসপাতালে কিংবা রাস্তায় কেতকী আর নিশীথকে আর দেখা যায় নি।

সুরঞ্জন যোগমায়া দেবীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরলো।

নিশীথের যদি কিছু বলবার থাকে, সে কালও তো বলতে পারতো। তাহলে বাইরে তার একটু অপেক্ষা করলেই হতো। কথা বলতে বলতে বাড়ি ফিরতে পারতো কাল।

কিন্তু সে কাল সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সবার আগে কেতকীকে সঙ্গে নিয়ে কখন বেরিয়ে গেল, কেউ জানে না। এবং সুরঞ্জন জানে, কাল রাত দশটা পর্যন্ত নিশীথ কি কেতকী দুজনের কেউ বাড়ি ফেরে নি।

কাল রাত দশটায় সুরঞ্জন নাইট্ ডিউটিতে বেরিয়ে গিয়েছিল।

আজই বা তার সঙ্গে কি কথা থাকতে পারে নিশীথের?

অনেক নিশীথ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তাদের সে চেনে না। অবশ্য, তাদের সে পানের দোকানের সাম্নে-পাতা ভাঙা বেঞ্চিটাতে সকালে-সন্ধেয় বসে থাকতে বহুবার দেখেছে।

এতগুলি যুবক এমন বিচিত্র বেশবাস পরে দিনরাত ওখানে বসে কি করে? পড়াশুনো নেই, কাজকর্ম নেই, আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই—ওরা কারা? হাসে, তামাসা করে পরস্পরের মধ্যে। তাদের হাসি-তামাসার এক-আধটু টুক্রো পথ চলতে গিয়ে সুরঞ্জনের কানে ভেসে এসেছে। তাতে তার গা শিউরে উঠেছে। একটা অমানুষিক ঘৃণায় তার সমস্ত মনটা রি রি করে উঠেছে।

এই সব আলোচনাই তাহলে এরা করে থাকে। আর এরাই আমাদের কালের প্রতিনিধি। তাদের সঙ্গে সে নিশীথ আর ফ্রেঞ্চকাট্-দাড়ি তুষারকে প্রায়ই দেখে। এই জন্যেই বোধহয় সে নিশীথকে সহ্য করতে পারে না। নাকি অন্য কিছুর জন্যে?

সেই নিশীথরা আজ তাকে কি বলতে চায়? আর কেনই বা বলতে চায়।

: দেখুন, আপনার সঙ্গে আমাদের একটা কথা আছে।

সুরঞ্জন বলে: কি?

নিশীথ তুষারকে বলে: তুই বল্ তুষার—

তুষার বলে: তুই বল্—

নিশীথ বলে: দেখুন, আপনাকে আমাদের পূজাকমিটির ভাইস্ প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। চাঁদা কতো দেবেন, বলুন? আমরা কিন্তু একশো টাকার কম নেবো না।

: এই কথা?

সুরঞ্জনের মনের মধ্যে ঘৃণা আর ক্রোধের একটা মিশ্র অনুভূতি দেখা দিল। সে তাদের দিকে চেয়ে বললো: আমাকে আবার ভাইসের দলে কেন টানছেন আপনারা?

নিশীথ বলে : ও, ভাইস্ প্রেসিডেন্ট হতে চান না আপনি? প্রেসিডেন্ট হতে চান? তুষার, ওকে প্রেসিডেন্ট করে দে। চাঁদা লেখ্ পাঁচশো টাকা।

: থামুন—

সুরঞ্জন প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল। তারপর গলাটাকে একটু নামিয়ে বলে : ওই সব প্রেসিডেন্ট ভাইস্ প্রেসিডেন্ট হবার জন্যে অন্য অনেক লোক আছে। তাদের ধরুন। আমাকে ভুল করে ধরেছেন। আমাকে যা ভেবেছেন, আমি ঠিক তা নই—

: তবে চাঁদাটা—

: চাঁদা?

সুরঞ্জন পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে ওদের হাতে দেয়। বলে : এর বেশি চাইবেন না।

ওরা কি ভেবে টাকাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সুরঞ্জন চলতে আরম্ভ করে।

কিন্তু কেন সে ওদের পাঁচ টাকা দিল? পূজোর নামে? নাকি ওদের ভয়ে? ওরা হয়তো এই টাকা কটা না পেলে তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতো। এই টাকা নিয়ে তারা কি করবে? হয়তো পূজো করবে। দুদিন আমোদ করবে। বেকার যুবকের দল হঠাৎ দুদিন কর্মব্যস্ত হয়ে উঠবে। পাড়ার চায়ের দোকান আর পানের দোকানের ধার শোধ করবে। এত জেনেও সে ওদের পাঁচ টাকা দিল কেন? চাঁদা নয়, সে ওদের দয়া করেছে।

: এই যে, শুনছেন—

পেছন থেকে নিশীথের দল এগিয়ে এলো।

: তাহলে আর একটা কাজ করে দিন।

: কি?

: নিশিকান্ত হাজরাকে আনবার একটু ব্যবস্থা করে দিতে হবে আপনাকে।

: নিশিকান্ত হাজরাকে কেন? তিনি কি করবেন?

একজন বললো ঃ তিনি আমাদের পূজোর উদ্বোধন করবেন।

স্থরঞ্জন কি একটু ভেবে বললে ঃ কিন্তু তাঁকে আনবার ব্যবস্থা আমি কি করে করবো ? তাদের মধ্যে থেকে কে একজন বললো ঃ আপনাকেই ওটুকু করতে হবে।

স্থরঞ্জন বড়ো মুশ্‌কিলে পড়লো। সে যতই এই দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করে, ওরা ততই তাকে ঘিরে ধরবার চেষ্টা করে। শেষে নিশীথ বললো ঃ সেদিন তো এই গলির মোড়ে নিশিকান্তবাবুর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। তিনি কোথায় এসেছিলেন, তাকি আমরা জানি না ?

স্থরঞ্জন বলে ঃ জানেন যদি, যেখানে তিনি এসেছিলেন, সেখানে গিয়ে ধরুন না। আমাকে অযথা ধরছেন কেন ?

নিশীথ বলে ঃ অঞ্জলি দেবীকে আপনি একবার বললেই সমস্ত ব্যবস্থাই পাকা হয়ে যায়। আর কিছু নয়, শুধু তাঁকে একবার মুখ ফুটে বলা।

ঃ তা আপনারাও তো বলতে পারেন। আমি বললে যা হবে, আপনারা বললেও তাই হবে।

ঃ না। আপনাকেই বলতে হবে। আপনার কথা উনি ফেলতে পারবেন না।

স্থরঞ্জন দেখলো, পাড়ার নাড়ি-নক্ষত্র ওদের হাতেই। কোন ঘটনা ওদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। সে বলে ঃ আমার সঙ্গে আস্থন। আপনাদের সাম্‌নেই বলছি। কিন্তু বলে রাখছি, আশা বড় কম।

ওরা সবাই স্থরঞ্জনের সঙ্গে চললো।

সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। স্থরঞ্জন অবিনাশবাবুর ফ্ল্যাটের দরজায় টোকা দিল। অবিনাশবাবু দরজা খুলে দিলেন। হেসে অবিনাশবাবু স্থরঞ্জনের মুখের কাছে কানটা এগিয়ে ধরলেন। বললেন ঃ কি বলছেন ?

স্থরঞ্জন কি বলবে প্রথমটা ঠিক করতে পারলো না। একটু ভেবে নিয়ে বললো ঃ ঘড়ি কেমন চলছে ?

অবিনাশবাবু বললেন : ওকে কি চলা বলে ?

: তাহলে ওটা দোকানে দিয়ে একবার ঠিক করে নিন না।

: দোকানে? তাহলে ভেতরটা ফাঁকা করে দেবে। যেটুকু চলছে, তাও আর চলবে না। মাঝখানে কতকগুলো টাকা বেরিয়ে যাবে শুধু।

অবিশ্বাসীর আশ্চর্য যুক্তি।

একটু থেমে অবিনাশবাবু বললেন : আজকালকার দোকানদার-দের আমি একটুও বিশ্বাস করি না।

কিন্তু সুরঞ্জন জানে, কেবল দোকানদারকেই নয় অবিনাশবাবু কোন মানুষকেই বিশ্বাস করেন না।

বিছানায় বসে অঞ্জলি দেবী তাঁর জামায় একটা ফুল তুলছিলেন। এতক্ষণ সুরঞ্জন সুযোগের অপেক্ষা করছিল। অবশেষে সেই সুযোগ এলো। অঞ্জলি দেবী চোখ তুলে তাকালেন। সুরঞ্জন চোখের ইশারায় তাকে এদিকে ডাকলো। অঞ্জলি দেবী হাতের কাজ ফেলে উঠে এলেন।

: ওরা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়।

: কি কথা ?

: ওদের মুখ থেকেই শুনুন।

: তবে আপনি কেন ?

: উপলক্ষ্য মাত্র।

: আজকাল দেখছি, আপনার বেশ উন্নতি হয়েছে।

: কিসে দেখলেন ?

: চোখে মুখে। শিকারী বেরালের—

: আজ এই পর্যন্ত। ওরা কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। কি বলবো ?

: ওদের একটু আপনার ঘরে নিয়ে যান। আমি আসছি।

অবিনাশবাবু ইতিমধ্যে বিছানায় ফিরে গিয়েছিলেন। চুপ করে বসে কি ভাবছিলেন।

সুরঞ্জন নিজের ঘরে ঢোকে। মিঠুয়া ঘরে ছিল। ছেলেরাও গিয়ে বসলো।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে এসে দাঁড়ালেন অঞ্জলি দেবী।

ঃ কি ব্যাপার, বলুন তো?

সুরঞ্জন বললো ঃ ওদের পূজোর উদ্বোধনের জন্যে নিশিকান্তবাবুকে চাই।

অঞ্জলি দেবী একটা চেয়ারে বসে বললেন ঃ তার আমি কি জানি? নিশিকান্তবাবুর কাছে যান।

নিশীথ বললো ঃ আপনি যদি একটু দয়া করে বলেন—

অঞ্জলি দেবী বললেন ঃ উনি ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। আমার কথা যে রাখবেন তার কোন গ্যারান্টি নেই। তাছাড়া আপনাদের সঙ্গে যেমন পরিচয়, আমার সঙ্গেও প্রায় সেই রকমই পরিচয়।

নিশীথ বলে উঠলো ঃ না না আপনি একবার মুখ ফুটে বললেই হবে।

চোখ ফেরাতে গিয়ে সুরঞ্জন আর অঞ্জলি দেবীর মধ্যে হঠাৎ দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। ছেলেরা কি বলে? এরা এতো সব জানলো কি করে?

অঞ্জলি দেবী কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে বললেন ঃ কি আয়োজন করেছেন পূজোর, আগে শুনি?

নিশীথ বলে ঃ দরবারী কায়দায় প্যাণ্ডেল করা হবে। তিনটি তোরণ থাকবে। প্রত্যেক তোরণে দুটো করে লাউড্ স্পীকার।

ঃ আর?

ঃ মাইক্ তো থাকছেই।

আর একজন বলে উঠলো ঃ সেই সঙ্গে বাছাই-করা গান।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো ঃ বাছাই করা গান মানে? আধুনিক?

ঃ না না, আমরা আধুনিক পছন্দ করি না।

ঃ তবে কি? হিন্দী?

ছেলেটি গম্ভীরভাবে বললো ঃ না, ইংরেজি।

ঃ ইংরেজি !

সুরঞ্জনের ঠোঁট দুটো একটু নড়ে উঠে কোনমতে থেমে গেল।

ছেলেটি আরও উৎসাহিত হয়ে উঠে বললো ঃ তাও যা-তা ইংরেজি গান নয়। একেবারে টুইস্ট্ নাচের বাজনা। তেমন একশোখানা রেকর্ড আমাদের হাতে। পাড়ার লোকে যা কখনো শোনেনি, আমরা এবার তাই শোনাবার ব্যবস্থা করেছি।

নিশীথ বললো ঃ সেই একঘেয়ে বাংলা গান—প্যান্ প্যানানি, জানেন, পাব্লিক আর একদম ও সব শুনতে চায় না। টুইস্ট্ নাচের বাজনার মধ্যে যেমন আছে স্পীড্, তেমনি আছে স্পিরিট। শুনলে মনে হবে, হ্যাঁ একটা জিনিস শুনলাম।

একটা ছেলে এতক্ষণ উস্খুস করছিল। সে বলে ফেললো ঃ শুনলে রক্তটা একেবারে গরম হয়ে ওঠে—

নিশীথ বলে ঃ তুই থাম্ শংকর। তোকে বেশি ডেঁপোমি করতে হবে না। আর পূজোর পর হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ফিল্মের নায়ক-নায়িকারা তাতে অংশ গ্রহণ করবেন। ওটা পরিচালনা করবে তুষার। ফিল্মের লাইনে ওর খুব হাত কিনা।

অঞ্জলি দেবী এতক্ষণ বসে শুনছিলেন। এবার বললেন ঃ তাহলে তো দারুন পূজো হবে !

নিশীথ বলে ঃ সে কথা আর বলতে। আমরা কোন খুঁতই রাখতে চাই না। এখন নিশিকান্তবাবুকে যদি পাই, তবে আর কোন ভাবনাই থাকে না। তাঁর মতো একজন বিখ্যাত লোককে দিয়ে উদ্বোধন, যা-তা কথা নয়। পাব্লিক দেখুক, আমরা কি করতে পারি। এখন আপনিই ভরসা।

অঞ্জলি দেবী বললেন ঃ ওঁকে পাওয়া যাবে ঠিকই। তবে কি জানেন, উনি তো ভীষণ ব্যস্ত। একটু কথা বলে দেখতে হবে। হ্যাঁ, কবে এবং কখন চাই ওঁকে ?

ঃ আটাশে। সন্ধে ছটার সময়। কেমন ?

ঃ ঠিক আছে। তাই হবে।

ঃ ব্যস্। এই তো হয়ে গেল। আমরা এখন চলি।

ওরা চলে গেল। সুরঞ্জন দরজা পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিয়ে এলো।

অঞ্জলি দেবী দুহাতে নিজের হাঁটুটাকে আঁকড়ে ধরে বসেছিলেন। বললেন ঃ ওরা জানলো কি করে ?

ঃ কি ?

ঃ ব্যাপারটা।

সুরঞ্জন বলে ঃ কিছুই ওদের অজানা নেই।

পাড়ায় একটা পূজোর হিড়িক পড়ে গেল। মহা সোরগোল, মহা ধূমধাম। পাড়ার যত দৈন্য, যত দারিদ্র্য সব ঢাকা পড়ে গেল। অনেকদিন পরে এই মরা গলিতে যেন জোয়ার এসেছে। যত অন্ধকার ছিল, যত গুমোট-ধরা বাতাস ছিল, সব মুছে গেছে। জীর্ণ নোনাধরা প্রাচীরগুলোতে আলোর প্রসাধন বার্ধক্যের রূপচর্চার মতো উৎকট হয়ে উঠেছে। নিশীথের দল ভাড়া করা নিয়নের আলোয় মাত্র দুদিনের জন্যে এ গলিটার দুঃখ দুর্দশা আর অন্ধকার মুছে ফেলার যে আয়োজন করেছে, তা যেমনি তীব্র, তেমনি বিপুল। সত্যি, তারা পাড়ার লোকগুলোর চোখ ধাঁধিয়ে দিল। তারা অবাক হয়ে দেখেছে।

কে বলবে যে, দুদিন আগে এই গলির অন্ধকারে মানুষে মানুষে ঠোকাঠুকি লেগে পায়ে চোট খেয়েছে ? কে বলবে যে, এই গলির মেয়ে-পুরুষে ঝগড়া করে চিল আর পায়রাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটায় ? না, বেশিদিন আগেকার কথা নয়। কালই তো একটা কাক মরা ইঁদুরের নাড়ি-ভুঁড়ি ঠুক্‌রে খাচ্ছিল এই গলিতে বসে। একটা লোককে আসতে দেখে কাকটা অতি অনিচ্ছায় উড়ে গিয়ে কানা লাইট-পোস্টটার ওপর বসেছিল। লোকটা লাফ মেরে ইঁদুরটাকে ডিঙিয়ে চলে গেলে কাকটা আবার নেমে এসেছিল। সে কথা আজ আর কেউ ভাবতে পারে না। এটা যে তাদেরই পুরাতন

গলি, এ গলির অন্ধকার কোণ জুড়ে তারাও ইঁদুরের মতো বাসা বেঁধেছে, সে কথা আজ আর কেউ বিশ্বাস করতেই পারবে না।

প্রতিদিন তারা যে গলিটাকে দেখে, এ যেন সেই গলি নয়। আলোয় আলোময় এ এক অন্য ভুবন।

তীব্র আলোর চিৎকারে শীর্ণকায় অন্ধকার গলিটা যেন ফেটে পড়ছে।

সেই সঙ্গে হৃদয়-বিদারক মাইক এবং একটানা টুইস্ট্ নাচের বাজনা।

সন্ধে ছটার সময় নিশিকান্তবাবু পূজোর উদ্বোধন করতে এলেন।

গাড়িতে গাড়িতে গলিটা ভরে গেল। এত দামী দামী গাড়ি কখনো এ গলিতে ঢোকে নি। এত নতুন নতুন মডেলের গাড়ির মুখ এ গলি কখনো দেখে নি।

নিশিকান্তবাবু তাঁর গাড়ি থেকে অত্যন্ত বিনীত কায়দায় নামলেন। দুহাত জোড় করে চিবুকে ঠেকিয়ে বিনম্র ভঙ্গিতে প্লাটফর্ম পর্যন্ত হেঁটে গেলেন তিনি। মুখে দেবতার প্রসন্নতা।

উপবিষ্ট জনতা উঠে দাঁড়ালো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাত-তালি দিয়ে উঠলো। নিশীথের দল গলায় রং-বেরঙের রুমাল বেঁধে ভিড় ম্যানেজ্ করছে। অত্যন্ত ব্যস্ত তারা আজ। তাদের দেখে এখন মনেও হবে না যে, দুদিন আগেও তারা গলির পানের দোকানের নিচে ভাঙা বেঞ্চিটার ওপরে বসে নরক গুল্‌জার করতো।

নিশীথ আর তুষারের গলায়ও রং-বেরঙের রুমাল বাঁধা। তারা দুজনে ভিড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে নিশিকান্তবাবুকে তাঁর জন্যে সাজানো চেয়ারটিতে নিয়ে গেল। তিনি আসন গ্রহণ করলে কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর গলায় মালা দেওয়া হলো। তারপর পাড়ার যারা প্রতিপত্তিশালী তাঁদের পক্ষ থেকে চললো মালা দেওয়ার প্রতিযোগিতা। সেই সঙ্গে মাইকে চললো নাম ঘোষণার পালা। সেই প্রতিযোগিতার যেন শেষ নেই। নাম ঘোষণারও আর সমাপ্তি নেই।

গুরুদাসবাবুও নিশিকান্তবাবুকে একটা মালা পরিয়ে দিয়ে সুরঞ্জনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, তিনি যখন নিশিকান্ত-বাবুর গলায় মালা পরিয়ে দেবেন, তখন যেন সুরঞ্জন একটা ছবি নেয়। সুরঞ্জন তা করলো না। গুরুদাসবাবু বোধ হয় মনে মনে বললেনঃ তাহলে ক্যামেরাটা কি লোককে দেখাবার জন্যে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছো; বাপু? কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। সুরঞ্জনের মনে হলো মালাটা দিয়ে গুরুদাসবাবু কিছুক্ষণ যেন তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সুরঞ্জন তাঁর চোখের ভাষা পড়তে পেরেছিল ঠিকই। কিন্তু তার কোন উত্তর দেয় নি। তবু গুরুদাসবাবু তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন না। কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সুরঞ্জনের চোখে চোখ পড়তেই বলে উঠলেনঃ কিছুই না। ইন্‌ভেষ্ট করে রাখলাম আর কি! ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। কি বলুন?

সুরঞ্জন হাসলো শুধু একটু।

নিশীথ নিশিকান্তবাবুর পরিচয় দিতে গিয়ে বললঃ আজ নিশিকান্তবাবুর পরিচয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। দেশের কে নিশিকান্তবাবুকে চেনে না? শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই তাঁকে চেনেন। যে চেনে না, সে মানুষ নয়। এই নিশিকান্তবাবুর মতো দরদী ব্যক্তি আর কে আছেন? তিনি তাঁর যা কিছু ছিলো, সব দেশের জন্যে ত্যাগ করেছেন। তার কারণ জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। সমস্ত কিছু দান করে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। এমন কি, নিজের জীবনটি পর্যন্ত তিনি দেশের জন্যে দান করে—

হাততালি পড়ে গেল। নিশীথের কথা আর কিছু শোনা গেল না। শুধু নিশিকান্তবাবু একটু নড়ে বসলেন।

হাততালি থামলে নিশীথ বললোঃ তিনি আজ তাঁর পায়ের ধুলো দিয়ে আমাদের পূজোর প্যাণ্ডেলকে ধন্য করেছেন, আমাদের এই পাড়াকেও ধন্য করেছেন। এবার দেশের সেই দরদী বন্ধু, আপনাদের প্রিয় নিশিকান্তবাবু আপনাদের কিছু বলবেন।

উঠে দাঁড়ালেন নিশিকান্তবাবু। সঙ্গে সঙ্গে হাততালি। মাইকের সাম্‌নে একবার গলা খ্যাঁকারি দিলেন। আবার হাততালি। আবার গলা খ্যাঁকারি। আবার হাততালি। এই ফাঁকে সুরঞ্জনের ক্যামেরার বাল্‌ব্‌ ঝল্‌সে উঠলো। হাততালি থামলে তিনি বলে চললেন: আপনারা আমাকে যে আজ অজস্র কাজের ভেতর থেকে টেনে এনে এখানে সম্মানিত করেছেন, তার জন্যে আপনাদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আর অভিনন্দন জানাই তাদের, যারা আজ এখানে এই পূজোর আয়োজন করেছেন। লোকে বলে, আমাদের দেশের তরুণ সমাজ কোন কাজ করতে জানে না। যারা বলে, তারা এসে এই পূজোয় দেখে যাক, এখানকার তরুণেরা কেমন কর্মনিষ্ঠ, কেমন সুশৃঙ্খল। তারা শিখে যাক, কাজ কাকে বলে, শৃঙ্খলা কাকে বলে। আমি এই তরুণদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। এরা সমগ্র দেশের তরুণ সমাজের আদর্শ স্থানীয় হবে। আর কে বলতে পারে, এদের ভেতর থেকে ভবিষ্যতের দেশনেতা বেরিয়ে আসবে না? আসতেই হবে। সে সম্ভাবনাও আমি দেখতে পাচ্ছি।

আবার হাততালি পড়লো। আবার সুরঞ্জনের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ্‌ বাল্‌ব বিদ্যুতের স্বাক্ষর রাখলো।

নিশিকান্তবাবু বলতে লাগলেন: দেশে এখন কোন কিছুরই অভাব নেই। অভাব ছিল ইংরেজ আমলে। তখন মানুষ না খেতে পেয়ে মরত। আর এখন? না খেতে পেয়ে কটা লোক মরছে, বলতে পারেন? মানুষ মরছে তবু। কিভাবে মরছে জানেন? রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে, বেশি খেয়ে মরছে আর গাড়ি চাপা খেয়ে মরছে। গাড়ি চাপা খেয়ে এত মানুষ যে মরছে, তার অর্থই হলো, দেশের লোকের অবস্থা ভালো হয়েছে। গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে। তাই গাড়ি চাপা খেয়ে দেশের মানুষের মৃত্যুসংখ্যা বেড়েছে! আর বেশি খেয়ে যে মানুষ মরছে, তার প্রমাণ হচ্ছে, দেশে ওষুধের দোকানের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। দেশের সমৃদ্ধির লক্ষণ হলো, ওষুধ

কিনতে পারার ক্ষমতা। ইংরেজ আমলে মানুষ ডাক্তার দেখাতে পয়সা পেত না, ওষুধ কেনা তো দূরের কথা। আর এখন? ওষুধের দোকানে লাইন পড়ে। আপনাদের কাছে আমার উপদেশ হলো— এক নম্বর, আপনারা খাওয়া কমান; দু'নম্বর, আপনারা আর পায়ে না হেঁটে গাড়ি চড়ে যাবার অভ্যেস করুন। আমার মনে হয়, সপ্তাহে একদিন অরন্ধন করলে শরীরের উন্নতি হবে। অরন্ধন কোন নতুন কথা নয়। আমাদের শাস্ত্রে আছে। অরন্ধনের মধ্যে যে একটা পবিত্রতা আছে, তাতে মানুষের সাত্ত্বিক গুণ বৃদ্ধি পাবে। আবার হাততালি পড়লো। কিন্তু এবারকার হাততালিতে তেমন জোর নেই। সুরঞ্জনের ক্যামেরা ফ্ল্যাশ্ বাল্ব্ও ঝল্সালো। কিন্তু যেন বক্তৃতার এই অংশটা ঠিকমতো জমলো না।

নিশিকান্তবাবু তাতে দমলেন না। দম নিয়ে বলতে সুরু করলেন: দেশের উন্নতি এখন কি হয়েছে? কিছুই হয়নি। এখন যা দেখছেন, তা তো সামান্য মাত্র। আরো উন্নতি হবে। তবে আপনাদের সবাইকে খাটতে হবে, আরো পরিশ্রম করতে হবে। কতো কাজ আপনাদের সাম্নে রাখা হয়েছে। যে কাজ আপনাদের পছন্দ বেছে নিন। আমি সারাদিনে বাইশ ঘণ্টা পরিশ্রম করি। আপনারাও পরিশ্রম করতে শিখুন। দেশের অনেক কাজই এখন বাকি। আপনাদের সেই সব কাজ করতে হবে। দেশ সত্যিকারের সোনার দেশ হয়ে উঠবে। সর্বশেষে আপনাদের এবং পূজো কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

আবার হাততালি পড়লো। সুরঞ্জনও আবার ছবি তুললো।

কাল সকালের কাগজে নিশিকান্তবাবুর বক্তৃতার সঙ্গে তাঁর ছবিও দেখা যাবে। হয়তো তাঁর ভাষণের ওপর ভিত্তি করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখিত হতে পারে।

গুরুদাসবাবু ক্যামেরায় আসবেন বলে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। শেষে সুরঞ্জনের ওপর রাগ করে চলে গেছেন।

সুরঞ্জন এবার নিশিকান্তবাবুর গাড়ির দিকে এগোয়। অমিত

কোথায় ছিল, এখন এসে সুরঞ্জনের সঙ্গে ভিড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে : কালকের কাগজে তো এ সব ছাপা হবে ?

সুরঞ্জন বলে : হবে বৈকি !

অমিত বলে উঠলো : চমৎকার !

নিশিকান্তবাবু এইদিকে এগোচ্ছিলেন। সুরঞ্জনকে দেখে তিনি চিনতে পারলেন। জিজ্ঞেস করলেন : কেমন বললাম বলো তো রিপোর্টার ?

সুরঞ্জন অমিতের কথাটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল : চমৎকার !

পরম আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন নিশিকান্তবাবু।

গাড়ির কাছে অঞ্জলি দেবী দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁর বাবাও নিশিকান্তবাবুর বক্তৃতা শোনবার জন্যে গাড়িতে মালা নিয়ে এখানে ছুটে এসেছেন।

নিশিকান্তবাবুকে গাড়িতে তুলে দিয়ে নিশীথ বললো : পাব্‌লিক আপনার কথা কিন্তু আরো শুনতে চাইছিল।

নিশিকান্তবাবু বললেন : জানো, আমাকে আজ রাতে আরো তিনটে পূজোর উদ্বোধন করতে হবে ?

: তাই নাকি ? তাহলে আপনাকে আর কষ্ট দেবো না। আমাদের কথা একটু মনে রাখবেন, স্যার।

: নিশ্চয়ই রাখবো।

গাড়িগুলো একে একে চলে গেল। গলিটা আবার ফাঁকা হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টুইস্ট্‌ নাচের বাজনা সুরু হয়ে গেল। হয়তো আজ রাতে আর শেষ হবে না।

সুরঞ্জনকে আবার যেতে হবে। অন্যান্য জায়গায়ও তাকে নিশিকান্তবাবুর বক্তৃতার রিপোর্ট নিতে হবে। ছবিও তুলতে হবে।

শ্যামবাজারের মোড়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিলেই চলবে। যেতে যেতে হঠাৎ তার হাসি পেল। এ যাত্রায় শুধু অবিনাশবাবুই বেঁচে গেলেন। কানে তাঁকে কিছুই শুনতে হলো না। তিনি দিব্যি আরামে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে অন্ধকার ঘরে শুয়ে সময়

কাটাচ্ছেন। আর হেরম্ববাবু? তিনিও এই যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন।

কিছুদূর গিয়ে সুরঞ্জন দেখলো, একটা লোক একটা মাটির ভাঁড়ে রাস্তার ধারের কল থেকে তার কোলের বাচ্চাটাকে জল খাওয়াচ্ছে। বোধহয়, সকলের মতো সেও নিশিকান্তবাবুর বক্তৃতা শুনতে এসেছিল।

শেষে পূজোর হট্টগোল থামলো।

নিয়নের আলো যদিও বা নিবলো, টুইস্ট্ নাচের বাজনা থামে না।

কদিন বাদে টুইস্ট্ নাচের বাজনাও থামলো। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল পাড়ার লোকেরা। কিন্তু কাকে বলতে যাবে তারা? মহাপ্রসাদের মতো তাদের গিলতে হবে ঐ সব বাজনা।

আবার দুদিন বাদেই সুরু হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সারা রাত ধরে বিচিত্র রকমের গান চলতে লাগল। আবার হরেক রকমের গাড়ি, হরেক রকমের মানুষ আর বিচিত্র সব গানের ভিড়ে পাড়ায় চললো অপূর্ব বিচিত্রানুষ্ঠান।

সত্যি, এমন পূজো হালদার বাগান লেনে কখনো হয় নি। নিশীথ আর তুষারের দল যে পূজো করলো, তা অনেকদিন মনে থাকবে এ-পাড়ার লোকেদের!

তুষার বললো: এ বছর শুধু টুইস্ট্ নাচের বাজনাই শোনালাম, আসছে বছর টুইস্ট্ নাচ কাকে বলে, তা-ই দেখাবো। এ পাড়ার লোকেরা জীবনে ভাবতে পারে, ওসব জিনিসের কথা। ওতে কত কি শেখবার আছে?

নিশীথ বলেছিল: নিশ্চয়ই। নতুন কিছু মানেই তো শেখবার জিনিস। পূজোয় বছর-বছর নতুন-নতুন টেক্‌নিক আনতে হবে, বুঝলি?

ঃ সে কথা তোকে আর বলতে হবে না। সিনেমার পর্দায় যাদের দেখে তোরা ফিরে আসিস্, তার মধ্যে সেরাগুলোকে এনে কেমন পাড়ায় হাজির করিয়ে দিলাম বল তো?

পরম তৃপ্তিতে তুষার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে।

বলে ঃ সেদিন বিচিত্রা বোস কেমন নাচলো রে? কেমন ড্রেসে ওকে নাচালাম, দেখলি তো?

নিশীথ ওর হাতটা চেপে ধরে। বলে ঃ বলিস্ না। কোন রকমে একটু ভুলে আছি, মাইরি আর মনে করিয়ে দিস না। আসছে বছর বিচিত্রা বোসের নাম লিস্টের প্রথমেই যেন থাকে, দেখিস্।

সুরঞ্জন অফিস যাবার সময় পানের দোকানের নিচে পাতা বেঞ্চিটা থেকে এই সব কথাবার্তার ছিটে ফোঁটা শুনতে পায়। নিজের মনে সে অফিস যায়, ঘরে ফিরে আসে।

মিঠুয়ার পড়া অনেকদিন ধরতে পারে নি সে। এবার সে মিঠুয়ার পড়ার দিকে একটু মন দেয়। তাও ঠিকমতো হয় না। নিচের বাচ্চু এসে প্রায়ই গোলমাল বাধিয়ে দেয়। সে ঘরে এলে মিঠুয়া বইপত্র রেখে দিয়ে তার সঙ্গে মেতে যায়। বাচ্চু কখনো বা সুরঞ্জনের সঙ্গে সুরু করে দেয় তার নানা আজ্‌গুবি গল্প।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে ঃ আচ্ছা বাচ্চু, তোমাকে এত গল্প বলে কে?

ঃ কেন? বড়দি—

রাতে ঘুমোবার সময় যখন বাচ্চুর ঘুম আসে না, তখন কেতকী তাকে শোনায় কতো ছেলে ভুলানো ছড়া, কতো রূপকথার গল্প।... কতো রাজপুত্তুর, রাজকন্যা, আর কোটাল-পুত্তুরের কথা।.... তেপান্তরের মাঠ, ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী, আর ডাল-নুয়ে-পড়া চাঁপা গাছের কথা।...গল্প শুনতে শুনতে বাচ্চুর চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। মশারির ভেতরের অন্ধকার কখনো হয়ে যায় তেপান্তরের মাঠ, কখনো রং-বেরঙের রাজপ্রাসাদ, কখনো নিবিড় বনভূমি, কখনো বা সাত

সমুদ্দুর তেরো নদীর পার। বাচ্চু তার ঘুম-ভরা চোখে সব দেখতে পায়। তার পাশেই যেন একটা ঠাণ্ডা নদীর মতো কেতকী শুয়ে থাকে! নদীর মতো সে গুন্ গুন্ করে গান গায়। বাচ্চু সেই গান শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

বাচ্চু বলে: বড়দি অনেক ছড়া জানে। তুমি জানো?

সুরঞ্জন মাথা নাড়ে। বলে: না।

গর্বে বাচ্চুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বলে: আর জানো? বড়দি কেমন সুন্দর একটা গান জানে। ঐ গানে একটা গল্পও আছে। একটা দিদি ছিল। কালো তার গায়ের রং। খুব ছড়া জানতো। সুর করে সে তার ভাইকে কতো ছড়া শোনাতো। ভাইটা ছিল ঠিক আমারই মতো। ছড়া শুনতে খুব ভালোবাসতো। দিদির কাছেই ঘুমুতো।

হঠাৎ কি ভেবে বাচ্চু সুরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করে বসে: আচ্ছা, তুমি বাঁশবাগান দেখেছো?

সুরঞ্জন বলে: হ্যাঁ, দেখেছি।

: আমাকে একবার দেখিয়ে আনবে?

: কেন?

বাচ্চু বলে: সেই বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠলে কাজলা-দিদি তার ভাইকে ছড়া শোনাতো কিনা।

: ও—

: দাদা, বাঁশবাগান কেমন?

: আচ্ছা, তোমাকে একদিন দেখিয়ে আনবো।

দিদির মুখ থেকে বাচ্চু কাজলাদিদির গল্প চুপ করে শুয়ে শোনে। চোখে তখন আর তার ঘুম আসে না। সে জিজ্ঞেস করে: কাজলাদিদি অনেক ছড়া জানে, না বড়দি?

কেতকী বলে: অনেক—

: তুই তাহলে ওর কাছ থেকে আরো অনেক ছড়া শিখে নিস নি কেন?

কেতকী বলেঃ ও-মা। শিখবো কেমন করে? কাজলা-দিদি কই?

ঃ কোথায় রে বড়দি?

ঃ ও যে মরে গেছে।

ঃ মরে গেছে?

ঃ হ্যাঁ।

বাচ্চু চুপ করে রইলো। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে। কতো ছড়া জানতো কাজলাদিদি। সে মরেই গেল? কেন মরলো? কি করে মরলো? আর তো কেউ তার মুখ থেকে ছড়া শুনতে পাবে না। কাজলা দিদি তাহলে আর কোনদিন ফিরবে না?

তাকে চুপ করে ভাবতে দেখে কেতকী জিজ্ঞেস করেঃ কি হলো রে? এমন চুপ করে গেলি কেন? ও-মা, তুই কাঁদ্‌ছিস? যেন তোর নিজের দিদি মরে গেছে—

বাচ্চুর গলাটা প্রায় বুজে আসছিলো। সে বলেঃ কাজলা-দিদির জন্যে ভারি কষ্ট হয়, না বড়দি?

ঃ কেন রে? ধর, যদি আমি মরে যাই? তোর কষ্ট হবে?

ঃ যা—

দিদির মুখে হাত চাপা দিয়ে বাচ্চু ঘুমিয়ে পড়ে।

বাচ্চুর কথা শুনে মিঠুয়া হি হি করে হাসে। সুরঞ্জন কিন্তু হাসতে পারে না। তার রূপনারাণ নদী আর বিরামপুর গ্রামের কথা খালি মনে পড়ে। সেখানেও বাঁশবাগান ছিল। তারও মাথার ওপর চাঁদ উঠে আসতো। সে দেখেছে, কতোবার দেখেছে। তার নিজেরই অজ্ঞাতে বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

আজ আবার অনেক দিন পরে মিসেস্ গোমেসের তাঁর বেরালটার কথা মনে পড়েছে। খন্‌খনে গলায় তিনি ডেকে চলেছেনঃ আয়, আয়, আয়—

কেউ সাড়া দেয়না।

কোন সাড়া তিনি পান না। তবু কেন তিনি ডাকেন? আশা

নেই, তবু আশা। যদি সে ফিরে আসে। কোলের কাছে নরম স্পঞ্জের মতো একটা শরীর। গর্ গর্ করে গলার আওয়াজ। বুড়ি তার গলার সেই মিষ্টি শব্দে সমুদ্রের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় যেন। সমুদ্রের গান শুনতে শুনতে বুড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

রাণী নেই। আজ কতোদিন বুড়ির চোখেও ঘুম নেই।

বুড়ি ডেকেই চলেছে ঃ আয়, আয়, আয়—

শেষে সুরঞ্জন যে ভয়টাই করছিল, বুড়ি তাই করলো। হ্যাঁ, জানলায় লাঠির গুঁতো এবার বেশ জোরে জোরেই এসে লাগছে।

সুরঞ্জন উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে দেয়।

মিসেস্ গোমেসের চোখ দুটো যেন আরো ভেতরে বসে গেছে। সুরঞ্জনকে দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ দেখেছো? দেখতে পেয়েছো তাকে?

সুরঞ্জন বলে ঃ না, ম্যাডাম্।

মিসেস্ গোমেসের মুখটা আরো শুকিয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন।

সুরঞ্জন বলে ঃ এত উতলা হচ্ছেন কেন? ও ঠিক ফিরে আসবে। আপনাকে ছেড়ে ও কোথাও থাকতে পারবে না।

বুড়ির মুখের ভাঁজে ভাঁজে আলো উঁকি মারে। বলে ঃ সত্যি বলছো? ও আমার কাছে ফিরে আসবে?

ঃ আমার তো তাই মনে হয়।

ঃ প্রথম প্রথম আমারও তাই মনে হতো। মিস্টার গোমেস বলেছে ঃ ও আর ফিরেছে। কিন্তু আমি তার কথা বিশ্বাস করি না। এতদিন যাকে খাইয়ে দাইয়ে বড় করলাম, সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, তা ভাবতে পারি না।

ঃ আমারও তো তাই মনে হয়, ও আবার ফিরে আসবে।

ঃ বলছো, ফিরে আসবে? কিন্তু মনেও যে বড়ো ভরসা পাই না। দেখতে দেখতে একটা মাসই তো কেটে গেল। ফিরলো না তো?

মিঠুয়া বুড়িকে মোটেই পছন্দ করতে পারে না। তাকে বুড়ি

কয়েকবার বলেছে, রাস্তায় বেরিয়ে খুঁজতে। সে খুঁজেও দেখেছে। কিন্তু কোথাও রাণীর সন্ধান পায় নি। বুড়ি বলেছেঃ তুই খুঁজিস নি। মিছিমিছি বল্‌ছিস।

সেই থেকে মিঠুয়া বুড়ির কথা এক দম শোনে না। বুড়িকে ছুচোখে দেখতে পারে না।

বাচ্চু প্রথম প্রথম বুড়িকে দেখে একটু ভয় পেতো। আজকাল অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। মন দিয়ে তার কথা শোনে।

আজও বাচ্চু স্থরঞ্জনের পাশে দাঁড়িয়ে মিসেস্ গোমেসের কথা শুন্‌ছিল।

ভয়ে সে স্থরঞ্জনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ি বলেনঃ আমরা ক্রিশ্চিয়ান্। তবু পাড়ার ছেলেদের পূজোর চাঁদা দিলাম। তারা বলেছিল. রাণীকে খুঁজে এনে দেবে। কিন্তু কই? ওরা কোন কাজের নয়। গুড্ ফর নাথিং।

স্থরঞ্জন মনে মনে ভাবে, ইনি বোধহয় নিশিকান্তবাবুর সেদিনের উদ্বোধনী ভাষণ শোনেন নি।

নিজের মনে একটু হাসলো সে।

বুড়ির পেছন দিকের ঘর থেকে মিঃ গোমেসের কুকুরের ডাক শোনা গেল। যেন কেঁই কেঁই করে কাঁদছে সে।

বুড়ি বলেঃ রাজারও মন বড়ো খারাপ। বোধ হয় এখন সে একটু অনুতপ্ত।

একটু থেমে বুড়ি আবার বলেঃ তার কোন অ্যারিস্টোক্র্যাসি নেই। কিন্তু দেখছি রাণীর মতো সে আন্‌গ্রেটফুল নয়। বুড়োকে ছেড়ে এক-পা কোথাও যায় না। সব সময় তার পায়ের কাছে পড়ে আছে।

স্থরঞ্জন বুড়ির মুখে রাজ-কাহিনী শোনে।

বুড়ি নিজের মনে বলে চলেঃ আর ছুটো দিন অপেক্ষা করলে তো তাকে মিঃ মরিসের বাড়ি নিয়ে যেতাম। তোর অ্যারিস্টোক্র্যাসির

কথা একেবারে ভুলে গেলি? শেষে কিনা তুই হা-ঘরে বেরালগুলোর সাথে—

সুরঞ্জন বলে: ম্যাডাম্, এবার রাত হলো। আপনি খেয়ে ঘুমোন গিয়ে।

বুড়ি বলেন: মিঃ গোমেসের মতো তুমিও তাহলে আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছো?

সুরঞ্জন বলে: বিরক্ত হই নি, ম্যাডাম্। রাত হচ্ছে, তাই বললাম।

বুড়ি অভিমান-ভরা গলায় বললেন: আচ্ছা বেশ। গুড নাইট্।

মিসেস্ গোমেস জানলাটা বন্ধ করে দিলেন।

সুরঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। বুড়ির মনে বোধহয় একটু আঘাত লেগেছে। কিন্তু সে তো তাঁকে তেমন কিছু বলে নি। মানুষ বুড়ো হলে বুঝি এই রকমই হয়। সামান্য কথায় রেগে যায়।

ও-পাশের বাড়িতে আজ আবার কি নিয়ে ঝগড়া লেগেছে।

সুরঞ্জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে।

কারো কথা কিছুই বোঝা যায় না। কেউ বোধ হয় শুনছে না কারো কথা। কেবল নিজের মনে চেঁচিয়েই চলেছে। যেন অন্ধকারে চোখ বুজে একটা চেঁচানোর প্রতিযোগিতা চলেছে সেখানে। কে, কতোক্ষণ, কতো জোরে চেঁচাতে পারে—তারই কম্পিটিশান।

কদিন পূজোর হিড়িকে এই ঝগড়া শোনা যায় নি। ঝগড়া হয়তো ঠিকই হয়েছিল, কিন্তু মাইকে টুইস্ট্ নাচের বাজনার প্রচণ্ডতায় তা শোনা যায় নি।

এখন ঘরে ঘরে অশান্তি, ঘরে ঘরে ভয়-ভাবনা। প্রত্যেক ঘরেই আজ ঝগড়া। আহার, বিহার, মৈথুনের মতো ঝগড়াও আজকালকার একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাকে চাপা দেবার জন্যেই বোধহয় সেই উৎকট টুইস্ট্ নাচের বাজনার উৎকটতর আয়োজন করা হয়েছিল। যাক্, সেই কদিন ঝগড়ার চিল-ওড়ানে চিৎকার শোনা যায় নি।

আবার সংসারের চাকাটা বুঝি তার পুরাতন খাতে ফিরে এসেছে। এবার থেকে ঝগড়া, কলরব, ঘর-ভাঙাভাঙি এবং কান্না আবার পুরো-মাত্রায় চলতে থাকবে।

উৎসবের মত্ততা থেকে দৈনন্দিন স্বাভাবিকতায় হালদার বাগান লেন আবার ফিরে এসেছে। উৎসবের আলো নিবে গেছে। অন্ধকার গলি আবার অন্ধকারে ফিরে এসেছে। উৎসব-কর্তারাও তাদের যথা-নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে গেছে।

না, হালদার বাগান লেনের কোন পরিবর্তনই হয় নি।

এই কদিন যেন সূর্য ওঠে নি, সূর্য ডোবে নি। এই গলিটায় শুধু চোখ-ঝলসানো নিয়নের আলো ছিল। শুধু মাইকের উন্মত্ত গান ছিল।

হালদার বাগান লেনের লজ্জাশীলা গৃহস্থ বধূটি যেন কদিন বাটনা-বাটা, রান্না-করা, রেশম-বোনা—সব ভুলে গিয়েছিল। আজ আবার তাকে বাটনা বাটতে হবে, রান্না করতে হবে, অফিসের ভাত দিতে হবে। তারপর তাকে দুপুরে রেশম-বোনার গুলি-কাঁটা কোথায় রয়েছে, খুঁজে বের করে নিয়ে নিরিবিলিতে বসতে হবে। উৎসবের নাইলন-ডেক্রণের শাড়িটাকে এবার তুলে রেখে দেবে সে। আবার তাকে গায়ে জড়াতে হবে তার পুরানো আটপৌরে শাড়িখানা। তাতে কতো জায়গায় হলুদের ছোপ, কতো জায়গায় সেলাইর দৈন্য।

হালদার বাগান লেন কদিন বাইরের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে আজ ঘরে ফিরে এসেছে। আবার তার রান্নাঘরগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে রোজকার নিয়মে। ধোঁয়ায় আর কুয়াশায় বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে শ্বাস নিতে সুরঞ্জনের কষ্ট হচ্ছিল।

সে জানলাটা বন্ধ করে বিছানায় উঠে এসে বসে।

মিঠুয়া বোধহয় নিচে গেছে।

বাচ্চুর কি খেয়াল হলো, কে জানে। সে সুরঞ্জনের পাশে বসে নিজের মনে বলেঃ আজ পার্কে ছেলেমেয়েরা কি গান গাইছিল, জানো দাদা?

সুরঞ্জন অন্যমনস্কভাবে বলে ঃ কি গান ?

ঃ কি সুন্দর গানটা—মনে পড়ছে না যে ?

ঃ তাহলে আর কি হলো ?

ঃ তুমি শোনোনি ?

ঃ না। আমি আর শুনলাম কখন ?

সুরঞ্জন শেল্‌ফ্‌ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে পড়তে লাগলো।

বাচ্চু চুপ করে বসে রইলো। তারপর হঠাৎ একসময় বলে উঠলো ঃ মনে পড়েছে দাদা, শুনবে ?

সুরঞ্জন বললো ঃ বলো—

বাচ্চ সুর করে গাইতে লাগলো ঃ

'অকালে পুষিলাম পাখি খুদ কুঁড়া দিয়া রে
সকালে পালাইলেন পাখি দারুণ শেল দিয়া রে।'

সুরঞ্জন তার গানের প্রশংসা করে বলে ঃ বাঃ, তুমি তো বেশ গাইতে পারো, বাচ্চু।

বাচ্চু তার গানের প্রশংসায় যেন একেবারে কেঁচো হয়ে গেল।

সুরঞ্জন ভাবে, এ আবার কোন্ পাখি ? কে তাকে অকালে খুদ-কুঁড়া দিয়ে পুষেছিল ? আর সুদিনের সময় সে বুকে দারুণ শেল দিয়ে উড়ে পালিয়ে গেলই বা কেন ? এ কবেকার কথা ? অনেকদিন আগেকার ? না, আজকের এই বাঁধন-ছেঁড়ার আর্তনাদ ?

বাচ্চু চুপ করে বসে থাকে। কিন্তু তার গান তখনও সুরঞ্জনের কানে বেজে চলে ঃ 'সুকালে পালাইলেন পাখি দারুণ শেল দিয়া রে।' এ যেন কোন মানুষের বুকে শেল নয়। এ যেন বর্তমান কালের বুকে বিদ্ধ দারুণতম শেল। এই শেলের হাত থেকে কি বর্তমান কালের মুক্তি নেই ?

সুরঞ্জনের কানে তবু গানটা বারে বারে ঘুরে বাজতে থাকে।

কতেক্ষণ পরে মিঠুয়া ঘরে এলো।

ঃ দাদাবাবু, খাবে চলো। মা আজকে তোমাকে নিচে খেতে বলেছে। বাচ্চু, তুইও চল্‌—

বাচ্চু নিচে যেতে যেতে বলেঃ আমি নিশীথদার মতো নাচবো।

সুরঞ্জন হেসে বলেঃ তাই নাকি ?

নিচে গিয়ে বাচ্চু বলেঃ নিশীথদা কি রকম নাচছিল, জানো ? এই রকম ?

সে নিশীথের নাচ দেখাতে যাচ্ছিল। কাছেই ছিল কেতকী, সে শাসিয়ে ওঠেঃ কি হচ্ছে বাচ্চু ? বড়দের সম্বন্ধে—

যোগমায়া দেবীও সেখানে ছিলেন। বললেনঃ বড়রা যদি নাচতে পারে, ছোটরা একটু বলতেও পারবে না ?

কেতকী যেন একটু অসন্তুষ্ট হলো।

বাচ্চু সুরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করেঃ সবাই নাচতে পারে, তুমি নাচতে পারো না, দাদা ?

কেতকী এবার ধমক দিলঃ আঃ বাচ্চু! আবোল তাবোল বকলে কিন্তু আজ তোকে গল্প শোনাবো না, কাছে শুতেও দেব না।

বাচ্চু এবার একটু শান্ত হলো। কেতকী জিজ্ঞেস করেঃ আপনাকে সারাক্ষণ নিশ্চয়ই ও বকিয়ে মারে ?

সুরঞ্জন বলেঃ না না। ওর কথা আমার খুব ভালো লাগে।

কেতকী বলেঃ আমাকে তো ও সারারাত বকিয়ে মারে।

যোগমায়া দেবী রান্নাঘরে চলে গিয়েছিলেন। কেতকী আসন পেতে দিল ? গেলাসে জল গড়িয়ে রাখলো আসনের পাশে। সুরঞ্জনকে বললোঃ বসুন। মা ভাত আনছে।

সুরঞ্জন আসনে বসলো।

বাচ্চু দাঁড়িয়ে দেখলো, দিদি তার জন্যে আসন পাতলো না। তাকে খেতেও বললো না।

সে জিজ্ঞেস করলোঃ আমি খাবো না, বুঝি ?

কেতকী বললোঃ তুই চল্, রান্নাঘরে খাবি।

বাচ্চু বলেঃ না। আমি রান্নাঘরে খাবো না। দাদার পাশে বসে খাবো। সে পাশের ঘর থেকে একটা আসন এনে সুরঞ্জনের পাশে পেতে বসে গেল।

কেতকী ধমক দেয়ঃ বাচ্চু দুষ্টুমি করে না। রান্নাঘরে চল্। আমি খাইয়ে দেব।

বাচ্চু বলে : কেন? তুমি এখানেই খাইয়ে দাও না।

যোগমায়া দেবী ভাতের থালা, ডালের বাটি, মাছের তরকারি এনে সুরঞ্জনের সাম্‌নে সাজিয়ে রাখলেন।

কেতকী বলল : দেখ না মা, বাচ্চ এখানে বসেই খাবে বলছে। আমি যত বলছি—

সুরঞ্জন বলে : বাচ্চু এখানে বসেই খাক না। কি হয়েছে? তুমি এখানে বসেই বরং ওকে খাইয়ে দাও।

সুরঞ্জন মনে মনে কেতকীর ওপর বিরক্ত হয়। আজকাল সে ওপরে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। ওপরে তার ঘরে আজকাল সে তো একেবারেই যায় না। নিশীথের সঙ্গেই সে হাসপাতাল যায়, হাসপাতাল থেকে সে ফেরে নিশীথেরই সঙ্গে। সে তো ইচ্ছে করলে সুরঞ্জনের সঙ্গেও যেতে পারে। কিন্তু সে যাবে না। সুরঞ্জনকে বোধ হয় সে পছন্দ করতে পারে না। কিংবা তাকে ভয় পায় সে। নিচে যখন সুরঞ্জন আসে, তখন কেতকী পাশের ঘরে সরে যায়। খেতে যখন বসে, তখন আসনটা পেতে জলের গেলাসটা কোনমতে বসিয়ে দিয়ে সে চলে যায়। অথচ কেতকী কি জানে না, সুরঞ্জনের কাতর দুটো চোখ সারাক্ষণ কাকে খুঁজতে থাকে? হয়তো জানে না, হয়তো জানে। জানে বলেই হয়তো তার এই সচেতন অবহেলা।

আজ তার সাম্‌নে বসে কেতকী বাচ্চুকে খাওয়াবে তাতেও তার আপত্তি? আশ্চর্য! কেতকী তার কাছ থেকে এত দূরে পালিয়ে থাকতে চায় কেন? সুরঞ্জন যে কেতকীর মধ্যে এ যুগের বনলতা সেনকে দেখেছে, তা তো কেউ জানে না। কেতকীও জানে না। কেতকীকে তা সে কোনদিন বলতে পারেনি। বলতেও পারবে না। বনলতা সেনের সঙ্গে রোজ-রোজ দেখা হয় না, বার-বার তার দেখা পাওয়া যায় না। হাজার বছর পরে হয়তো একবার দেখা মেলে তার। তারপর আর মেলে না।

কেতকীকেও সুরঞ্জন যেন অনেক দিন পরে দেখলো। যেন কতো যুগ আগের দেখা!

মনে মনে সুরঞ্জন বলেঃ আমার সাম্‌নে বসে তুমি বাচ্চুকে খাওয়াবে। আমি দু দণ্ড বসে দেখবো। খেতে খেতে যেটুকু দেখতে পাই তাই তো আমার পরম পাওয়া।

সে বাচ্চুকে বলেঃ তুমি এখানেই বসো বাচ্চু, মা তোমাকে এখানেই ভাত দিয়ে যাবেন।

যোগমায়া দেবী কেতকীকে বললেনঃ ওর খাবারটা এনে ওকে তুই এখানেই খাইয়ে দে। কি আর করবি?

কেতকী অত্যন্ত অনিচ্ছায় রান্নাঘর থেকে খাবারের থালা এনে বাচ্চুকে খাওয়াতে বসলো। এখানে বসতে কেতকীর এত অনিচ্ছা দেখে সুরঞ্জন মনে মনে ভারি বিরক্ত হলো।

খেতে বসে বাচ্চু বলেঃ শুধু ডাল কেন? আমার মাছ কই?

কেতকী ডাল-মাখা ভাত তার মুখে গুঁজে দেয়। তার মুখ সে এইভাবে বন্ধ করে দেয়। যাতে সে আর মাছের প্রশ্ন না তোলে।

সুরঞ্জন বসে দেখছিল। বলেঃ কেতকী, ওকে আস্তে খাওয়াও। এত তাড়াহুড়ো করে খাওয়াচ্ছো কেন? ওর খেতে কষ্ট হয় না?

বাচ্চুর মুখটা একটু খালি হতেই সে বলে ওঠেঃ দিদি, মাছ—

কেতকী তার মুখে ডাল-ভাত গুঁজে দেয়।

সুরঞ্জনের ভারি কষ্ট হয়। বলেঃ ওকে মাছ দিচ্ছ না কেন, কেতকী?

কেতকী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলেঃ ও মাছ খেতে ভালোবাসে না।

মুখে ভাত না নিয়ে বাচ্চু প্রতিবাদ করে। বলেঃ তুই তো দিস্ না। মাছ ভালোবাসি না, কে বললে তোকে?

ঃ কে আবার বলবে? তুই তো খেতে চাস্ না।

বাচ্চু বলে নাঃ না, দাদা। দিদি আমাকে মাছ দেয় না।

সুরঞ্জন তার পাতের মাছটা বাচ্চুর পাতে তুলে দেয়।

ঃ খাওয়াও তো ওকে, ও খায় কিনা দেখি—

কেতকী চেঁচিয়ে উঠলো ঃ মা, উনি বাচ্চুকে মাছ দিয়ে দিলেন—

যোগমায়া দেবী কিছুই বললেন না। তিনি যে রান্নাঘরে রয়েছেন, তাও মনে হলো না।

সুরঞ্জন এতক্ষণে বুঝতে পারলো, কেন কেতকী বাচ্চুকে ওখানে বসে খাওয়াতে চায় নি। কেতকী যে সুরঞ্জনের কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে চায়, তা ঠিক নয়। বাজার থেকে শুধু সুরঞ্জনের জন্যেই মাছ আসে। আর কারো জন্যে নয়। আর কাকেও যে মাছ দেওয়া হয় না, তা সুরঞ্জন এতদিন জানতো না। বাচ্চুকেও যে কতোদিন মাছ দেওয়া হয় নি, তা কে জানে?

কেতকী মাছটুকু হাতে নিয়ে বসে রইলো। বললো ঃ কেন আপনি ওকে মাছটুকু দিয়ে দিলেন? আপনাকে কতো পরিশ্রম করতে হয়। ঠিকমতো না খেলে—

সুরঞ্জন বলে ঃ বাচ্চুকেও তো ঠিকমতো খাওয়াতে হবে। নইলে ও বাঁচবে কি করে? নাও ওকে খাইয়ে দাও—

সুরঞ্জন খেতে আরম্ভ করে।

কিছুক্ষণ পরে যোগমায়া দেবী বেরিয়ে এসে কাছে বসেন।

ঃ আর দুটো ভাত দিই।

ঃ না।

কেতকী বলে ঃ ওঁর কিন্তু খাওয়ার খুব অসুবিধে হচ্ছে মা।

সুরঞ্জন বলে ঃ তাই নাকি? কি করে বুঝলে?

ঃ দেখতে পাচ্ছি না? দিন দিন আপনার খাওয়া কমে যাচ্ছে।

যোগমায়া দেবী করুণ চোখে সুরঞ্জনের মুখের দিকে তাকালেন। সুরঞ্জন মুখ নামিয়ে নিল। একটু পরে যোগমায়া দেবী বললেন ঃ আজ হাসপাতালে গিয়েছিলাম।

সুরঞ্জন বলে ঃ আমি আজ খুব চেষ্টা করেছিলাম। যেতে পারলাম না।

করুণ মুখে যোগমায়া দেবী বললেনঃ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

ঃ ডাক্তার কি বলেছেন?

ঃ ঠিকমতো নাকি 'সেট্' হয় নি।

ঃ তারপর?

ঃ বললেন, আবার অপারেশান করে সেট্ করতে হবে।

ঃ সুরঞ্জন আর কিছু বললো না। নিঃশব্দে পাতের অবশিষ্ট ভাতটুকু মুখে তুলে দিয়ে উঠে পড়লো।

এই পরিবারের আর মুক্তি নেই। অন্ধকার থেকে আরেক অন্ধকারে চলেছে এরা। এই অন্ধকারের যেন শেষ নেই। ভাঙা-পা সেট্ করা হলো, প্লাস্টার করা হলো, কতোদিন পরে আবার প্লাস্টার কাটাও হলো। দেখা গেল, ঠিকমতো সেট্ হয়নি। হেরম্ববাবু কবে আর কোর্টে 'জয়েন' করবেন? কবে আবার এই পরিবারের মুখে হাসি ফুটবে? আবার গুরুদাসবাবুর ভাড়া পাওনা হয়ে গেল। সুরঞ্জন কোন্‌দিক যে সাম্‌লাবে ভেবে উঠতে পারে না।

করবী পরীক্ষা দিচ্ছে। সে পাশ করে যদি একটা চাকরি পেয়ে যায়, তবে হয়তো কিছুটা সুরাহা হতে পারে। কিন্তু পাশ করে যে চাকরি পাবে, তারই বা আশা কোথায়?

সুরঞ্জন করবীকে টাইপ-রাইটিং শিখতে বলবে। অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করে কোন লাভ নেই। টাইপ-রাইটিং না শিখলে পাশের কোন মূল্য নেই।

যোগমায়া দেবী বলেনঃ আমি বলছিলাম—

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেঃ কি?

ঃ তুমি আর কতদিন এভাবে আমাদের সঙ্গে কষ্ট ভোগ করবে? তুমি বরং হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা করো, কেমন?

সুরঞ্জন বলেঃ তা হয় না। মিঠুয়াকে কাল থেকে একটু বেশি করে মাছ আনতে বলবেন। বাড়তি যা লাগে, আমি দেব।

সুরঞ্জন চলে যাওয়ার পর যোগমায়া দেবী অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে

রইলেন। নিজের মনে চোখের জল মুছলেন। কেতকী বিছানা করে বাচ্চুকে শোয়ালো। করবী বইপত্র গুছিয়ে রেখে খাবার জন্যে এসে দাঁড়ালো।

যূথিকা পাশের ঘরে নিজের মনে বসে বসে হাসছে।

সুরঞ্জন ঘরে ফিরে এলো। বিছানায় শুয়ে পড়লো লেপ মুড়ি দিয়ে। কিন্তু চোখে ঘুম এলো না। মিঠুয়া এখনো ফেরে নি।

সুরঞ্জন শুয়ে শুয়ে ভাবে।

আজ যোগমায়া দেবী কেন তাকে ওভাবে বললেন? সে মনে বড়ো ব্যথা পেয়েছো। অবশ্য সে জানে, যোগমায়া দেবী কোনদিন তাকে ব্যথা পাবার মতো কথা বলেন না। অন্যের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ করছে সে। সে বিষয়ে তার মতো যোগমায়া দেবীও সচেতন। তাঁর নিজের ছেলেকে দস্যুরা ছিনিয়ে নিয়েছে। সেই দুঃসহ দুঃখ তিনি বুক পেতে সহ্য করেছেন। প্রকৃত দুঃখের সুরু সেইদিন থেকেই। তারপর এক একটা আঘাত এসেছে, তিনি মুখ বুজে তা সহ্য করেছেন। কিন্তু তাঁর চরম দুর্দিন এলো সেদিন, যেদিন পুলিশ অ্যাক্সিডেণ্টের খবর তাঁকে দিয়ে গেছে।

হেরম্ববাবু এতদিন যা হোক করে কায়ক্লেশে সংসার চালিয়ে চলেছিলেন। কোনদিন কারো কাছে হাত পাত্তে হয়নি। এক-আধবার দু'একমাসের ভাড়া বাকি পড়ে গেছে বটে, তবে শোধও হয়ে গেছে। কিন্তু এবার যেন ঝড়ে মূল বৃক্ষটি উপ্ড়ে পড়ে গেছে। তাকে সোজা করে আর দাঁড় করানো যাবে কি?

ডাক্তার বলেছে, আবার অপারেশান করতে হবে, সেট্ করাতে হবে, প্লাস্টারও করাতে হবে। তারপর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা। তারপর কি হবে, তাও জানা নেই।

যোগমায়া দেবী সেই অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে চেয়ে আজ বুঝি ভয় পেয়ে গেছেন। সেই অন্ধকারের দায়-ভাগ সুরঞ্জন নিজে এগিয়ে এসে কাঁধে তুলে নিয়েছে। কিন্তু সে তো পরের ছেলে। সে তাঁর দুর্ভাগ্যের ভাগ নেবে কেন? আর কতোদিনই বা নেবে? অনির্দিষ্ট

কালের জন্যে তো আর তার ওপর নির্ভর করা যায় না? তাহলে তাঁর আর কে আছে? এই বিপদের দিনে কে তাঁদের মুখের দিকে তাকাবে?

সুরঞ্জন মনে মনে বলে: কেন নিশীথ?

কিন্তু সে তো আজকালকার ছেলে। বাঁধন-ছেঁড়া যুগের ছেলে। সে বাঁধতে জানে না। বাঁধতে শেখেনি। সে এই বিপদের দিনে হেরম্ববাবুদের দেখাশুনা করবে, তেমন আশা করাও বৃথা। সে ইচ্ছে করলে পাড়ায় আর একটা হৈ-হুল্লোড় বাধিয়ে দিতে পারে, কিন্তু একটি মানুষেরও দুর্দশার অংশীদার হতে সে চাইবে না। সে শুধু নিজের ফুর্তি জানে, অন্যের কথা ভাববার তার সময় কোথায়? তবে যে সে হাসপাতালে যায়, যোগমায়া দেবীর কাছে খবর নিতে আসে। সে সব কি মিথ্যে?

সুরঞ্জন জানে, ও সব মিথ্যে।

তা হয়তো হেরম্ববাবু বুঝতে পারেন না। কিন্তু যোগমায়া দেবী? তিনিও কি বুঝতে পারেন না? কেন, কেতকীও তো চালাক মেয়ে। সেও কি আজো বুঝতে পারে নি নিশীথকে?

না, পারে নি। পারলে সে নিশীথের সঙ্গে একা-একা হাসপাতালে যেত না। হাসপাতালে তাদের ফেলে রেখে নিশীথের সঙ্গে একা-একা চলে আসতো না। এই চরম দুঃসময়ে গুরুদাসবাবু যদি যোগমায়া দেবীকে তাঁর গয়নাগুলো ফিরিয়ে দিতেন, তাহলে খুব উপকার করতেন। কিন্তু তিনি কি তা দেবেন?

এখন সুরঞ্জন যদি যোগমায়া দেবীকে তাঁর দুর্ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়, তাহলে ওঁদের দেখবার আর কেউ থাকে না। প্রথম দিন থেকেই যোগমায়া দেবীকে সুরঞ্জন এমন চোখে দেখে এসেছে যে, সে তা পারবে না।

এক অদৃশ্য টানে তাকে যোগমায়া দেবী বেঁধে ফেলেছেন।

তাইতো তিনি আজ সুরঞ্জনের খাওয়ার কষ্ট দেখতে না পেরে হোটেলের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। তিনি কি জানেন না,

তার পরিণাম হবে, তাঁদের সকলের অনাহার? জানেন, তবু তিনি না বলে পারেন নি।

কারণ, তিনি যে সুরঞ্জনের মধ্যে তাঁর স্নেহাংশুকে দেখেছেন।

তাইতো সুরঞ্জন কোনদিনই তার মনের কথাটি কেতকীকে বলতে পারবে না। তাকে বলতে পারলে যোগমায়া দেবীর অন্ধ স্নেহের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। না, সে তা পারবে না।

সে শুধু চিরকাল কেতকীকে দেখে যাবে, তার কথা শুনে যাবে। কিন্তু তাকে সে কোনদিন কিছুই বলতে পারবে না।

অনেকদিন আগে যেন সে তাকে দেখেছিল। কিন্তু কবে, কোথায়—তা সে জানে না। হয়তো হাজার বছর আগে। হয়তো মিশরে কিংবা ব্যাবিলনে। আবার কবে দেখা হবে, তা সে জানে না।

কেতকীকে সে কোনদিনই মুখ ফুটে তার মনের কথা বলতে পারবে না।

রাত নিশুতি হয়ে আসছে হালদার বাগান লেনে।

এখনো মিঠুয়া এলো না।

দরজাটা খোলা রয়েছে। তাই সুরঞ্জনের চোখে আর ঘুম আসছে না। একটু চুপ করে শুয়ে থাকল সে।

গলিতে খস্ খস্ করে ইঁদুর হাঁটছে। ডাস্টবিনের ধারে হয়তো কিছু খুঁটে খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই গলি থেকে একটা ইঁদুরের চিৎকার শোনা গেল। বোধ হয় তাকে পেঁচায় ধরেছে। আচ্ছা, পেঁচা ইঁদুরকে ধরে কেন? সে কি সহজাত হিংসা?

সিঁড়িতে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। এত রাতে কে আর আসবে? নিশ্চয়ই মিঠুয়া। মিঠুয়া এলে দরজা বন্ধ করবে, আলো নেভাবে। তাহলেই সুরঞ্জন ঘুমুতে পারবে। ঘরে আলো জ্বেলে রেখে সে একেবারে ঘুমোতে পারে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা ঠেলে যিনি ঘরে ঢুকে এলেন, তিনি অবিনাশবাবু।

ঃ এ কি? অবিনাশবাবু যে! এত রাতে কি মনে করে?

অবিনাশবাবু সুরঞ্জনের কথাগুলো যেন শুনতেই পেলেন না। একে তিনি কানে কম শোনেন, তার ওপর তিনি শীতকালের রাতে মাঙ্কিক্যাপ পরে থাকেন। তাতে শোনার আর কোন পথ থাকে না। গায়ে ছাই-রঙের পুলওভার। এই পোষাকের ভেতরের ব্যক্তিটিকে প্রথম দর্শনেই ঠিক চেনা যায় না।

অবিনাশবাবু কিছু না বলে সুরঞ্জনের বিছানার পাশে এসে বসলেন। সুরঞ্জন উঠে বসলো।

ঃ কি ব্যাপার? কি মনে করে?

অবিনাশবাবু বললেনঃ বেশ কষ্ট হচ্ছে।

ঃ কষ্ট? কিসের কষ্ট আপনার?

সুরঞ্জন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু তার এই প্রশ্নটা অবিনাশ-বাবুর মাঙ্কিক্যাপেই প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো। তাঁর কানের ভিতরে গেল না।

অবিনাশবাবু বললেনঃ অঞ্জলি আজ তিনদিন হলো গেছে। আজও ফিরলো না। মরলাম কি বাঁচলাম—তারও একটা খবর পর্যন্ত নিল না। এর নাম স্ত্রী?

অঞ্জলি দেবী তিনদিন হলো বালিগঞ্জ প্লেসে বাপের বাড়ি গেছেন। কিন্তু সুরঞ্জন জানে, তিনি বাপের বাড়ি যান নি। তাঁকে আজ রাতে যদি খোঁজ করতে হয়, তাহলে বালিগঞ্জ প্লেসে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাহলে ডোভার লেনে যেতে হবে। সমাজের সবচেয়ে উঁচু মহলে তাঁর চলাফেরা। এই ইঁদুর-চষা গলিতে তাঁর মন বসে? বড়ো বড়ো কনফারেন্সের প্রথম সারিতে তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে। বড়ো বড়ো হোটেলের প্রথম শ্রেণীর পার্টিগুলোতে অঞ্জলি দেবীকে যে থাকতেই হবে।

ঃ বড়ো কষ্ট হচ্ছে।

অবিনাশবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে : কেন ? অঞ্জলি দেবীর জন্যে ?

অবিনাশবাবু শুনতেই পেলেন না।

সুরঞ্জন তাঁর প্রায় কানের ওপর মুখ রেখে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো : অঞ্জলি দেবীর জন্যে কষ্ট হচ্ছে আপনার ?

অবিনাশবাবু শুনতে পেয়েছেন। বললেন : না, দাঁতে বড়ো কষ্ট পাচ্ছি।

: দাঁতে ? কি হয়েছে আপনার ?

: মাড়ি ফুলে বড়ো কষ্ট পাচ্ছি।

সুরঞ্জন বললো : ডাক্তার ডেকে দেবো ? কোন ডেন্টিষ্ট ?

অবিনাশবাবু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : কেন ? দাঁতগুলো ওকে দান করবার জন্যে ? ডেন্টিষ্ট এসে বলবে দাঁতগুলো সব তুলে ফেলতে হবে। আপনাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই—

অবিনাশবাবু আর বসলেন না। রাগ করে উঠে চলে গেলেন। সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে গেল।

পরের দিনই হেরম্ববাবুর পায়ের অপারেশান হয়ে গেল। ভাঙাহাড় সেট্ করে প্লাস্টার করে দেওয়া হলো।

জ্ঞান ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল।

ডাক্তার বলেছিলেন : হার্ট বড়ো উইক্।

জ্ঞান ফিরলে অপারেশান থিয়েটার থেকে হেরম্ববাবুকে তাঁর বেডে দিয়ে গেল। বিকেলে চোখ মেলে তিনি বললেন : ওরা আমাকে আর কতো কাটা-ছেঁড়া করবে ? তোমরা আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।

বাড়ি নিয়ে চলো বললেই তো বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। হাসপাতাল থেকে ছুটি দেবে, তবে তো তিনি যাবেন। তাছাড়া হাসপাতালে চিকিৎসার যে সুযোগ-সুবিধে বাড়িতে তা তো পাওয়া যাবে না। ওঠা-বসা-খাওয়া দাওয়ার কতো অসুবিধে !

তা ছাড়া হালদার বাগান লেনের গলিতেই শুধু অন্ধকার নয়, ওঁদের নিচের ফ্ল্যাট্‌টাতে অনাদি অতীতের অন্ধকার যে বরফের মতো চাপ বেঁধে রয়েছে, সেই অন্ধকারে দিনের পর দিন পড়ে থাকতে কি হেরম্ববাবুর ভালো লাগবে? তার চেয়ে হাসপাতালে অনেক আলো, অনেক বাতাস।

কিন্তু হেরম্ববাবুকে আর কিছুতেই বোঝানো গেল না। এই ক মাসে তিনি হাসপাতালের আব্‌হাওয়ায় বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি আর হাসপাতালে থাকবেন না। যোগমায়া দেবীকে বললেন: তোমরা আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।

যোগমায়া দেবী বললেন: বাড়িতে যে তোমার ভারি কষ্ট হবে।

হেরম্ববাবু বললেন: বাড়িতে কবে আর কষ্ট হয় নি, বলো?

হেরম্ববাবুকে কিছুতেই বোঝানো গেল না।

ডাক্তারকে তিনি বললেন: আমাকে এবার ছুটি দিন। বাড়ি চলে যাই।

একদিন সন্ধেয় একখানি অ্যাম্বুলেন্স স্ট্রেচারে করে হেরম্ববাবুকে তাঁর বাইরের ঘরের বিছানায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

যোগমায়া দেবীর কাজ আরো বেড়েছে। সকাল থেকে রাত—তাঁর একদণ্ডও বিশ্রাম নেই। সকলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হয়। তাছাড়া হেরম্ববাবুর কখন কি চাই—সব কিছু তাঁকেই দেখতে শুনতে হয়।

আগে কেতকী তাঁর কাজে কিছুটা সাহায্য করতো। আজকাল তাকে রান্নাঘরের কাছে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কেননা, নিশীথ আজকাল বড় বেশি আসে। একবার এলে সে আর যেতেই চায় না। প্রথম-প্রথম সে একাই আসতো। বাইরের ঘরে হেরম্ববাবুর কবিতা শুনতো আর শত মুখে তাঁর কবিতার প্রশংসা করতো। তাঁর কবিতা শোনার জন্যে নিশীথের কী প্রচণ্ড উৎসাহ!

আজকাল সে আবার সঙ্গে তুষারকে টেনে আনে। কবিতা

শোনার ব্যাপারে তুষারের অবশ্য খুব উৎসাহ নেই। কিন্তু তুষার গল্প শুনতে ভালোবাসে। হেরম্ববাবু তাকে তাঁর ছেলেবেলার কিংবা যৌবনকালের গল্প শোনান। কিংবা পূর্ব বাংলার মাঠ, নদী-নালার গল্প।

নিশীথ তখন পাশের ঘরে বসে কেতকীর সঙ্গে গল্প করে। যোগমায়া দেবীর হয়তো কাউকে বিশেষ প্রয়োজন। তিনি কেতকীকে ডাকেন না। করবীকে ডাকেন। কেতকী কি তা বুঝতে পারে না? কেতকীর উঠে যাওয়া উচিত নয় কি? করবী মাকে সাহায্য করে। কেতকী বসে বসে নিশীথের সঙ্গে শুধু গল্পই করে। বাচ্চুকে স্নান করাতে দেরি হয়ে যায়, খাওয়াতে দেরি হয়ে যায়।

যোগমায়া দেবী বিরক্ত হন। কিন্তু প্রকাশ করেন না।

সুরঞ্জন ওপরে খাবে। তাকে খেতে দিতে হবে। এদিকে উনুনে রান্না চাপিয়েছেন যোগমায়া দেবী। হেরম্ববাবু অনেকক্ষণ হলো, একটু চা চেয়েছেন। যোগমায়া দেবী এখন কোন্ দিকে যান? কোন্ দিক সাম্‌লান। এখন কেতকীকে বড়ো দরকার। কেতকীর অন্তত সেটুকু বোঝা উচিত। মা একা, বাবা অসুস্থ, দাদা ওপরে খাবে। এখন কি তার নিশীথের সঙ্গে বসে গল্প করা সাজে?

আর নিশীথেরই বা কি রকম আক্কেল? এতক্ষণ ধরে বসে তার গল্প করা কি ঠিক? অসুস্থ হেরম্ববাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সে। দেখা করে দুদণ্ড কথা বলে চলে যাও।

না তা সে যাবে না। হেরম্ববাবু কোথায় বাইরের ঘরে পড়ে আছেন। সে কখন উঠে এসে কেতকীর সঙ্গে গল্প জমিয়ে বসেছে। তুষার বাইরের ঘরে বসে হেরম্ববাবুর নানা গল্প শোনে। কখনো বা কবিতার খাতা বের করে তাকে কবিতা শোনান। সকাল বেলায় বসেও ছেলেটা ঘন ঘন হাই তোলে। হেরম্ববাবু শুয়ে শুয়ে নিজের মনে কবিতা পড়ে যান। পড়া হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করেন: কেমন লাগলো?

তুষার তার বৃহত্তম হাইটি তুলে পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে বলে: ভালো—

কবিতা সে শোনে না। হেরম্ববাবুর কবিতায় কি আছে? জলো দেশপ্রেম ছাড়া আর তো কিছু নেই। তুষারের ও সমস্ত ভালো লাগে না। সে এ যুগের ছেলে। চায় জীবন্ত কিছু, যা বাস্তব এবং যা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে। পাশের ঘরে যে জীবন্ত কবিতা রচিত হয়ে চলেছে, হেরম্ববাবুর মৃত প্রাণহীন কবিতার চেয়ে তা অনেক বেশি মূল্যবান।

স্বরঞ্জন এখনি খেয়ে বেরোবে।

মিঠুয়া গেছে দোকানে। কেতকী উঠে এসে তাকে ভাতটা দিয়ে আসতে তো পারে। না, তা সে আসবে না।

যোগমায়া দেবী ডাকেন: করবী, করবী—

: যাই মা—

: দাদাকে ভাত দিয়ে এসো তো।

কেতকী কি যোগমায়া দেবীর কথাটা শুনতে পায় নি? করবীকে তিনি যে ওপরে ভাত নিয়ে যেতে বললেন, ও ঠিক শুনতে পেয়েছে। কিন্তু সে নড়তে পারে না। নিশীথের কথায় সে একেবারে ধরা পড়ে গেছে।

করবী ওপরে স্বরঞ্জনের ঘরে ভাত নিয়ে গেল।

স্বরঞ্জন করবীকে আশা করে নি। হয়তো সে ভেবেছিল, কেতকী আসবে! মসৃণ নিটোল দুটি হাতে টেবিলের ওপর ভাতের থালা এগিয়ে ধরবে। তারপর পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বলবে: খেয়ে নিন। দেরি করবেন না।

কিন্তু কোথায় কেতকী? করবীকে সে এখন ভাতের থালা-হাতে আশা করে নি।

করবী পড়াশোনা নিয়ে থাকে। নিজের মধ্যেই থাকতে সে ভালোবাসে। এতদিন পরীক্ষার পড়া পড়েছে সে। এখন পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন গল্প-পড়ার নেশায় তাকে পেয়ে বসেছে। যেখানে যে-গল্পই সে পায়, তা সে গোগ্রাসে যেন গিলে খায়। তার বিছানার পাশে গাদা-গাদা সিনেমা পত্রিকা জমা হয়ে আছে। গল্প পড়া

হয়ে গেলে সে নায়ক নায়িকাদের জীবনকাহিনী পড়ে। কি করে অমুক নায়ক ফিল্মে প্রথম চান্স্ পেলেন, কি করে অমুক নায়িকা রাতারাতি দেশের গণ-হৃদয়ের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হয়ে উঠলেন, তারই গল্প পড়তে পড়তে করবীর চোখ বুজে আসে।

সে এখন এই অসময়ে সুরঞ্জনের ঘরে ভাত নিয়ে আসবে, তা সুরঞ্জন আশা করে নি।

সে কোথায় এখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিনেমা পত্রিকার পাতা ওল্টাবে। বক্ষে-বক্ষোলীন নায়ক-নায়িকার ছবিতে নিজেকে নায়িকার ভূমিকায় কল্পনা করবে এবং সুনিপুণা নায়িকার মতো মধুর ভঙ্গিতে চোখের পাতাগুলি বন্ধ করে আনবে।

সে সুরঞ্জনের জন্যে ভাত নিয়ে আসবে, এ যে অবিশ্বাস্য !

আসলে সুরঞ্জন কেতকীকেই খুঁজছিল। বিষণ্ণতার মতো তার ঈষৎ ময়লা রং, তার লজ্জা-মধুর হাসি, স্নিগ্ধ প্রসন্ন দুচোখের দৃষ্টি। না ও সব অবশ্যি করবীর নেই। করবীর রং ফর্সা, শরীরের গড়নের মধ্যে আছে আভিজাত্যের বিলাস। করবী যেন আশাতিরিক্ত।

সুরঞ্জন অবাক হয়ে বলে : তুমি ? কেন, মা কই ?

: মা রান্নাঘরে। কেন, মার হাতে না খেলে কি আপনার পেট ভরে না ?

সুরঞ্জন বলে : পেট হয়তো ভরে। কিন্তু—

: কিন্তু ?

: মন ভরে না।

বলে সুরঞ্জন হেসে ফেলে।

করবী বলে : জানেন ? আপনি ভারি দুষ্টু।

: কে বললো ?

: কে আবার বলবে ? দেখতেই তো পাচ্ছি।

: কি দুষ্টুমি দেখতে পেলে ?

: আপনি এসে আমাদের মায়ের আদর কেড়ে নিয়েছেন। মা

আগে আমাদের কতো ভালোবাসতো। এখন মানে আপনি আসার পর—

ঃ ?

ঃ মা একেবারে আমাদের আর ভালোবাসে না।

ঃ তাই নাকি ? মাকে বলতে হবে তো।

করবী আর কিছু না বলে সাম্‌নের চেয়ারটায় বসলো। কিন্তু সুরঞ্জনকে যে জল দেওয়া হয় নি। উঠে গেলাসে জল গড়িয়ে দিল সে।

হঠাৎ করবীর চোখে পড়লো, খাটের ওপর হোল্ড্‌ অলে বেডিং বাঁধা, একটা সুটকেশ গোছানো। এতক্ষণ ওদিকে সে পিঠ ঘুরিয়ে বসেছিল, তাই চোখে পড়ে নি। কিন্তু জল গড়াতে গিয়ে সে ওগুলি দেখে অবাক হয়ে গেল। তবে কি উনি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন ?

করবী জিজ্ঞেস করে ঃ আপনি চলে যাচ্ছেন এখান থেকে ?

ঃ মায়ের আদর যা তোমাদেরই পাওয়া উচিত, তাতে এবার থেকে আর ভাগ বসাবো না।

করবীর মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল। সে বুঝতে পারেনি একটু আগে তার মিথ্যে অভিযোগ এত রূঢ় অসহ্য সত্যরূপে দেখা দেবে।

সে বলে ওঠে ঃ না না, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। আপনি যাবেন না।

সুরঞ্জন করবীর ছেলেমানুষী দেখে হেসে ওঠে।

ঃ বুঝেছি। আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিলেন।

সুরঞ্জন হাসতে থাকে।

করবী বলে ঃ তাহলে এগুলো বাঁধা হয়ে আছে কেন ?

সুরঞ্জন বলে ঃ সেইজন্যেই তো মাকে এখন বেশি করে দরকার। যদি আর না ফিরি। মাকে একবার ডাকো তো—

করবী তার মৃদু অলস ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

একটু পরে যোগমায়া দেবী আঁচলে হলুদ-মাখা হাত দুটো মুছতে মুছতে ওপরে উঠে আসেন।

ঃ কি বাবা, আমার ওপরে না কি রাগ করে চলে যাচ্ছো ?

সুরঞ্জন হেসে বলেঃ করবী গিয়ে আপনাকে লাগিয়েছে, বোধ হয় ?

ঃ হ্যাঁ। ও বললো, তুমি নাকি চলে যাচ্ছো—

ঃ আর ও আমাকে কি বলেছে, জানেন ?

ঃ কি ?

করবী যোগমায়া দেবীর পেছন থেকে ইশারায় বলতে বারণ করে।

সুরঞ্জন বলেঃ আমি আসার পর থেকে ওদের আদর নাকি কমে গেছে। আপনি নাকি—

দুহাত তুলে করবী সুরঞ্জনকে বলতে মানা করছিল। কিন্তু সুরঞ্জন তার ইচ্ছেকে পরাস্ত করে বলে ফেললো কথাটা। আরো কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু যখন সে দেখলো, করবী দুহাত দিয়ে নিজের মুখটা ঢেকে ফেলেছে তখন মাঝপথেই সে থেমে গেল।

যোগমায়া দেবী একটু হাসলেন। বললেনঃ তাই নাকি ? এই কথা বলেছে ? তা বলুক গে। ছেলের আদর সব সময়ই বেশি।

করবী মুখ থেকে হাত নামিয়ে বলেঃ বারে, আমরা বুঝি বানের জলে ?

সুরঞ্জন বললোঃ না, ভাগ্যবানের দলে।

যোগমায়া দেবী বলেনঃ কেমন ? হলো তো ?

সুরঞ্জন গেলাসের জলটুকু শেষ করে বললোঃ আপনাকে বলা হয় নি। বলার সময়ও পাই নি। আজ আমাকে দিল্লী যেতে হবে। ওখানে বড়ো একটা কনফারেন্স হচ্ছে কাল থেকে। অফিস থেকে আমাকেই সিলেক্ট্ করেছে যাবার জন্যে।

করবী বলেঃ তাই বলুন।

যোগমায়া দেবী বলেনঃ তুই থাম্। কদিন থাকবে ওখানে ?

ঃ সবশুদ্ধ দশদিন।

ঃ ভালোভাবে ফিরে এসো, বাবা। আমি তোমার পথ চেয়ে থাকবো।

তারপর কি ভেবে যোগমায়া দেবী করবীকে বললেনঃ রান্নাঘরে একখানা মাছ-ভাজা বাটি চাপা আছে। ছুটে গিয়ে দাদাকে এনে দে।

সুরঞ্জন করবীকে যেতে বারণ করছিল। করবী শুনলো না। মাছের ভাজা এনে পাতে দিল। যোগমায়া দেবী সুরঞ্জনকে মাছের ভাজাটুকু খাইয়ে তবে ছাড়লেন।

করবী সব দেখলো। দেখে বললোঃ একে আদর বেশি। তার ওপর দিল্লী যাওয়া হচ্ছে—

যোগমায়া দেবী বললেনঃ তুই থাম্।

সুরঞ্জন মুখ ধুয়ে এলো। কি ভেবে করবীকে বললোঃ তুমি একটু নিচে যাও করবী। মার সঙ্গে আমার একটু দরকারী কথা আছে।

করবীর নিচে যেতে ইচ্ছে ছিল না। সুরঞ্জন যখন আবার তাকে নিচে যেতে বললো, তখন তাকে যেতেই হলো। সে চলে যেতে সুরঞ্জন যোগমায়া দেবীকে বললেঃ একটু বসুন। এক মিনিট—

সুরঞ্জন তারপর সুটকেশ খোলে।

মিঠুয়া এতক্ষণ কোথায় ছিল। হঠাৎ এখন এসে হাজির।

সুরঞ্জন তাকে কি একটা কাজে নিচে পাঠিয়ে দিল। সুটকেশ থেকে একশো টাকার একখানা নোট বের করে যোগমায়া দেবীর হাতে দিল। বললোঃ টাকাটা রেখে দিন।

ঃ কেন? কি হবে?

ঃ রেখে দিন। এই ক দিন থাকছি না। দরকার যদি হয়?

যোগমায়া দেবী আর কোন কথা বলতে পারলেন না। তাঁর চোখে জল এসে পড়লো। আঁচল দিয়ে তিনি চোখ মুছলেন।

ঃ আপনি যান। মিঠুয়াকে একটু পাঠিয়ে দেবেন।

যোগমায়া দেবী চলে যাবার একটু বাদেই মিঠুয়া ছুটে এলো।

ঃ দাদাবাবু, কি করবো ?

ঃ কিছু করতে হবে না। দয়া করে একটু পড়াশোনা করবে। রাস্তায় রাস্তায় এত ঘোরা ভালো নয়।

মিঠুয়া তখনই বই বের করে পড়তে বসে গেল।

সুরঞ্জনের দিল্লী যাবার কথা শুনে বাচ্চু ছুটে এলো। জিজ্ঞেস করলো ঃ দাদা কোথায় যাবে ? আর আসবে না ?

ঃ আসবো বৈ কি। তুমি পার্কে ছেলেমেয়েদের কাছে আর কি নতুন গান শিখেছ, শোনাও দেখি।

বাচ্চু বললো ঃ নতুন গান আর শিখি নি। ঐ গানটা তো বড়ো—

সুরঞ্জন বলে ঃ কোন্ গানটা। গাও দেখি—

বাচ্চু গাইতে আরম্ভ করে ঃ

আগা-ডালে বসো কোকিল মাঝ-ডালে বাসারে—
ভাঙ্গিলে বিরিখের ডাল জীবনের নেই আশারে।
অকালে পুষিলাম পাখি ঘৃত মধু দিয়া রে
সুকালে পালাইলেন পাখি—"

সুরঞ্জন তার গান শোনে আর হাসে। তার প্লেনের সময় এখনও দেরি। তাই একটু বসে-গড়িয়ে কাটাচ্ছিল সে। বাচ্চুর গান এই সময়টাতে তার বেশ লাগছিল। বললো ঃ বাচ্চু, তুমি অনেক গান শিখে রাখবে। আমি ফিরলে সব শুনবো। কেমন ?

বাচ্চু বললো ঃ আচ্ছা—

সুরঞ্জন লক্ষ্য করলো, তার দিল্লী যাবার কথা শুনে যোগমায়া দেবী এলেন, করবী এলো, বাচ্চু এলো। কিন্তু কেতকী এলো না। যার আসা সে মনে মনে কামনা করেছে, সে-ই এলো না। কি এমন জরুরী কাজে সে এখন ব্যস্ত যে, একটিবার আসার সময় করতে পারলো না ? সে কি তবে এখন বাড়ি নেই ? না, এমন সময় তো কেতকী বাইরে কোথাও যায় না।

না-ই বা এলো কেতকী। তার নিচে যেতেই বা এত আপত্তি কেন ?

আর তাকে তো একবার নিচে যেতেই হবে। দশ দিনের জন্যে সে যাচ্ছে। হেরম্ববাবুর সঙ্গে দেখা করে যাবে না? তখন তাকে দেখে কি কেতকী কোন কথা বলবে না? হয়তো বলবে না। হয়তো বলবে: দিল্লীতে এখন বেশ ঠাণ্ডা। তাই না? সাবধানে থাকবেন। ঠাণ্ডা লাগাবেন না।

কিংবা বলবে: দ-শ-দি-ন। এতদিন ওখানে কি করবেন?

কি বলবে সুরঞ্জন? সে একটা উত্তর মনে মনে ঠিক করে নেয়।

সময় যখন হয়ে এলো, তখন সে নিচে গেল হেরম্ববাবুর সঙ্গে দেখা করতে। কেতকী বাথরুমে ছিল। তার সঙ্গে দেখা হলো না।

হেরম্ববাবুই বললেন: দিল্লীতে এখন বেশ ঠাণ্ডা। সাবধানে থেকো। ঠাণ্ডা লাগিয়ো না।

যোগমায়া দেবীও বললেন: সাবধানে থেকো, বাবা।

মিঠুয়া গলির মোড়ে ট্যাক্সি ডেকে এনেছিল। বাড়ির গেটের কাছে মার পাশে বাচ্চু আর করবী দাঁড়িয়েছিল।

কেতকী তখনও বাথরুম থেকে বেরোয় নি।

না-ই বা হলো দেখা। দিল্লী থেকে ফিরে এলে কেতকী তাকে বনলতা সেনের মতোই হয়তো প্রশ্ন করবে: এতদিন কোথায় ছিলেন?

সেই ভালো। দেখা না হয়ে ভালোই হয়েছে। ফিরে এলে যখন দেখা হবে, তখন আরো ভালো লাগবে। আরো সুন্দর।

তবু সে পিছন ফিরে বার-দুই তাকিয়েছিল। যদি কেতকী বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে থাকে, যদি সে দরজায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে তার চলে-আসা পথের দিকে তাকিয়ে—

দেখতে দেখতে দশটা দিন কেটে গেল।

প্রথম-প্রথম কটা দিন ভালোই কাটলো। তারপর সুরঞ্জন হাঁপিয়ে উঠল। হোটেল, কন্‌ফারেন্স আর টেলিগ্রাম অফিস—এই

তিন-সীমানার মধ্যে সে কটা দিনকে ফেলে রেখে কলকাতায় ফেরার জন্যে প্রস্তুত হলো। কন্‌ফারেন্সের ব্যস্ততায় সে রাজধানীর বিরাট পরিচয় পায় নি। অবশ্য রাজধানীর বিরাট পরিচয় ইতিপূর্বে সে দু-একবার পেয়েছিল। আবার নতুন করে পরিচয় করবার তার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। শেষের দিকে কলকাতা তাকে টানতে লাগলো। হালদার বাগান লেনের সেই অন্ধকার গলি, আলো-বাতাসহীন সেই অন্ধকার বাড়িটা, সেখানকার দুঃখ-সুখের জীবন—তাকে ক্রমাগত টানতে লাগলো।

আবার জিনিসপত্র গোছানো, টাইম মতো প্লেনে ওঠা—সেই বাঁধাধরা প্রোগ্রাম। যাত্রার সংক্ষিপ্ত আয়োজন।

দমদম এয়ার-পোর্টে রান্ ওয়ের আলো দেখে মনটা এক আশ্চর্য অনুভূতিতে ভরে গেল। মনে হলো যেন কলকাতা তাকে প্রশ্ন করছে: 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

প্লেন থেকে নামতে নামতে তার মনে হলো, ক'দিন অদর্শনের পর কলকাতা যেন কোন প্রাচীন নায়িকার প্রশ্ন ধার করে বলছে: 'হে বন্ধু, আছো তো ভালো?'

ভালো? কোথায় ভালো? কলকাতাকে ছেড়ে গিয়ে মনে আর সে ভালো ছিল কই? কলকাতায় যে মনটাকে তার সে ফেলে গিয়েছিল। এবার সেই ফেলে-যাওয়া মনটাকে খুঁজতে হবে, তাকে পেতে হবে। হালদার বাগান লেনের অন্ধকার গলিতে সে তার মনটাকে খুঁজবে।

ট্যাক্সিতে বসে সে ভাবছিল, সে কি তবে শেষে অন্ধকারেরই প্রেমে পড়লো? আলোর মুখ সে কি কোনদিন দেখবে না? মানুষ প্রথম যখন অন্ধকারের মধ্যে এসে পড়ে, তখন অন্ধকারের কুৎসিত রূপ দেখে ভয় পেয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে সে অন্ধকারের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন ভাবে, অন্ধকারই স্বাভাবিক। সেই অন্ধকারকে সে ধীরে ধীরে ভালোবাসতে সুরু করে। যেমন অবিনাশবাবু ভালোবেসেছেন। আর অন্ধকারও ধীরে ধীরে অক্টোপাশের মতো তার

পিচ্ছিল বাহু বাড়িয়ে দিয়ে মৃত্যু আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে। তখন আর পালিয়ে যাবার পথ থাকে না।

না, সুরঞ্জনেরও আর পালাবার পথ নেই। পালিয়ে কোথায়ই বা সে যাবে। এই অন্ধকারে তাকে মরতে হবে। মনে পড়ে, বালতির জলে একদিন একটা ইঁদুর ধীরে ধীরে ডুবে মরেছিল। এই ইঁদুরটাই বুঝি এ যুগের মানুষের প্রতীক, বুঝি এ কালের আত্মা। তারপর গলিতে-পড়ে-থাকা আর একটা ইঁদুরের মৃতদেহের কথাও তার মনে পড়ে। একটা কাক তার পেট ঠুক্‌রে পরম তৃপ্তিতে খাচ্ছিল একদিন। একটা লোককে এদিকে আসতে দেখে কাকটা ভয় পেয়ে উড়ে গিয়ে কানা লাইট্‌-পোষ্টটার ওপরে গিয়ে বসেছিল। লোকটা ইঁদুরের মৃতদেহটাকে ডিঙিয়ে চলে গেলে সেও কানা লাইট্‌-পোষ্ট থেকে নেমে এসে ইঁদুরের পেটটাকে ঠুক্‌রে সে নিজের পেট ভরাতে লেগে গেল।

সেই গলিতে সুরঞ্জন আজ ফিরে যাবে। সেখানে ফিরে যাবার জন্যে তার প্রাণের কান্না সে শুনতে পাচ্ছে। সেখানে সে যেন কতো কালের চেনা মানুষদের ফেলে এসেছে। আজ আবার সে ফিরে চলেছে তাদেরই মাঝখানে।

ট্যাক্সি থেকে নামলো সুরঞ্জন। ঘড়িতে রাত বারোটা বাজে। গলিতে কেউ ছিল না। অন্ধকারে পায়ের তলা দিয়ে গোটা-দুই ইঁদুর ছুটে পালালো। অন্ধের মতো পা ফেলে ফেলে সে এসে দরজার সাম্‌নে দাঁড়ালো। দরজায় কেউ তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল না। সারা বাড়িটা একটা নির্জীব অন্ধকারে পড়ে আছে। কেবল অমিত রায়ের ঘরের ঘুলঘুলি দুটো দুটি জাগ্রত চক্ষুর মতো যেন আলো জ্বেলে জেগে আছে। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন অমিত রায়ের ঘরে আলো জ্বলছে কেন? তাহলে রিণা রায় কি ফিরে এসেছে? এই কদিনে এই বাড়ির কত পরিবর্তন হয়েছে, কে জানে?

মিঠুয়া ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠে দরজা খুলে দিল।

সুরঞ্জন লাউঞ্জে খেয়ে এসেছিল। আর কিছু সে খাবে না। বাথরুমে গিয়ে হাত-পা-মুখ ধুয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো।

অনেকদিন পরে সে যেন নিজের ঘরে ফিরে এলো। কদিন হোটেলের বিছানায় শুয়ে তার মন ভরে নি। কেমন যেন পর মনে হতো হোটেলের বিছানাটাকে। আর এই ঘর, এই ঘরের এই বিছানা—তার যেন কত আপন। সুরঞ্জন একান্ত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে মিঠুয়ার ডাকে তার ঘুম ভাঙলো। মিঠুয়া চা এনে রেখেছে টেবিলে। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়ার রেখা উঠছে।

সুরঞ্জন উঠে ব্রাশ্ মুখে দিয়ে বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে চায়ের কাপ নিয়ে বসলো।

এখন শীত নেই বললেও চলে। একটা মিষ্টি মেজাজ রয়েছে আজকের সকালে। ফাল্গুন মাস এসে গেছে। কালরাতে সে দেখতে পায় নি। হয়তো পার্কের গাছগুলোর পাতা ঝরে গেছে। কচি পাতা গজাতে আর দেরি নেই।

মনে পড়ে, রূপনারাণের তীরে বিরামপুর গ্রামের গাছগুলোও ফাল্গুন মাসে কেমন কচি সবুজ রঙে সাজতো। কেমন উজ্জ্বল মসৃণ রঙ। হাত দিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করতো। কী সুন্দর নরম!

পার্কের দিক থেকে একটা কোকিল ডেকে উঠল।

এক আশ্চর্য খুশিতে তার মনটা ভরে যায়।

মিঠুয়া কাছেই দাঁড়িয়েছিল। কি বলবে বলে সে দাঁড়িয়ে আছে যেন। সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেঃ কি রে, কিছু যেন বলবি, মনে হচ্ছে?

মিঠুয়া দরজার দিকে একটু তাকালো। তারপর বললোঃ জানো দাদাবাবু, নিচের বড়দি কোথায় চলে গেছে—

ঃ কে?

ঃ নিচের বড়দি—

ঃ কোথায়?

ঃ তা কি জানি?

কেতকী কোথায় চলে গেছে? কেতকী এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে? সুরঞ্জনের চোখে এ বাড়ির অন্ধকার যেন আরো অন্ধকার হয়ে গেল।

ফাল্গুন মাসের সেই সকালের যত আলো ছিল, যত গান ছিল, সব একসঙ্গে যেন মুছে গেল। এই মুহূর্তে কে যেন তাকে একটা নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত করে রেখে গেল। চারদিকে যেন তার কেউ নেই। সে শুধু একা বসে বসে একটা দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য হিজিবিজি রেখার একটা অর্থ খুঁজে মরছে। কিংবা একটা পরিচিত মুখ। যে মুখ শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো তুলনারহিত। বিরামপুর থেকে যেদিন সে তার মা আর বোনকে না পেয়ে ফিরে এসেছিল, সেদিনও বুঝি এত অন্ধকার ছিল না, সেদিনও বুঝি তাকে এত একা, এত নিঃসহায় মনে হয় নি। কেতকী তাকে কতখানি ঘিরে ছিল, তা আজ এই প্রথম সে জানতে পারলো। অথচ কেতকীকে কাছে কতটুকু সে পেয়েছিল? কাছে সে প্রায় আসতো না। সুরঞ্জনের কাছ থেকে দূরে-দূরে থাকাই ছিল তার স্বভাব। তা সত্ত্বেও সে যেটুকু তাকে কাছে পেয়েছে, তাতেই তার নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলি কানায় কানায় ভরে উঠেছিল।

কেতকী আজ তাকে এক বিশাল শূন্যতার মাঝখানে ফেলে রেখে চলে গেছে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেঃ কবে গেছে?

মিঠুয়া বলেঃ দিন সাতেক হলো।

কেতকী তাহলে অন্ধকার থেকে পালিয়ে বাঁচলো। এই অন্ধকার থেকে পালিয়ে সে কোথায় বাঁচবে? চারদিকেই যে অন্ধকার। সমস্ত সমাজের সবখানেই যে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সে পথ খুঁজে পাবে তো? বৃষ্টির জল প্রার্থনা করে চাতক পাখি কাঁদে। সে যদি বৃষ্টির জল না পায়, তবে কি সে পচা ডোবার জল খাবে? যদি খায়, তবে যে চাতক পাখির মৃত্যু হবে। কেতকী এক অন্ধকার থেকে পালাতে গিয়ে আর এক পচা অন্ধকারে ডুবে মরবে না তো?

সুরঞ্জনের মনের মধ্যে কে যেন আবৃত্তি করে উঠলো : 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার—

মিঠুয়া বললো : সেদিন থেকে পাড়ার ঐ পাশের দোকানের বেঞ্চিতে আর নিশীথ দাদাবাবুকেও দেখা যাচ্ছে না।

টেবিলের ওপর খবরের কাগজগুলো পড়েছিল। সেগুলো দেখা হয় নি। সুরঞ্জন বলে : কাগজগুলো আমাকে দিয়ে এখন নিচে যাও।

খবরের কাগজে তার রিপোর্ট কি ভাবে ছাপা হয়েছে, তা দেখার মতো মনের অবস্থা এখন সুরঞ্জনের নয়। কিন্তু সে এখন খবরের কাগজের আড়ালে তার মুখটা ঢেকে ফেলতে চায়। এখন তাকে একা থাকতে হবে। সে এখন নিজের চারদিকে একটা আবরণ সৃষ্টি করে তার মধ্যে একা বসে বসে কাঁদবে। কিংবা সে এখন এই মুহূর্তে একটা কিছু অবলম্বন চায়। খবরের কাগজই এখন তার সব চেয়ে বড়ো অবলম্বন।

এ যেন সুরঞ্জনের একটা পরাজয়। হ্যাঁ, সে হেরেই গেল। নিশীথের কাছে সে হেরে গেছে। যে নিশীথকে সে কোনদিন সহ্য করতে পারে নি, তার কাছেই তাকে হেরে যেতে হলো।

কিন্তু নিশীথ কেতকীকে ভালোবাসে, তা জেনেও সে কেন কেতকীকে ভালোবাসলো ? কোনদিন কেতকীকে সে মুখ ফুটে কিছু বলে নি। কোনদিন সে বলতেও পারবে না। বললেও কেতকী তা প্রত্যাখ্যান করতো। নিশীথকে সে ভালোবসেছে ! সেই চঞ্চল বিকৃত-রুচি যুবকের হাতে সে তার হৃদয়কে নিঃসঙ্কোচে তুলে দিয়েছে। নিশীথের সেই চোঙা প্যান্ট, ছুঁচোলো জুতো, রঙবেরঙের ব্লাউসের মতো জামা—এ সব কি কেতকী দেখে নি ? সে যে পানের দোকানের সাম্‌নের বেঞ্চিতে বসে দিন রাত আড্ডা দেয়, তা কি সে জানে না ? পাড়ার পূজোয় বিচিত্রা বোসের নাচ, টুইস্ট্ নাচের বাজনা এবং ভাসানের টুইস্ট্ নাচ—কেতকী নিশ্চয়ই তার খবর রাখে। এত জেনে শুনেও সে শেষে নিশীথের কাছেই ধরা দিল। হয়ত সেই সব দেখে সে নিশীথের প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট হয়েছে।

সুরঞ্জন ভুলে গেছে, কেতকীও একালের মেয়ে। একালের সুকৃতি কিছু নেই। যা আছে, সবই বিকৃতি। সেই বিকৃতির আবহাওয়ায় সে মানুষ হয়েছে। তার কাছে এই বিকৃতিই সত্য। কেতকী সম্পর্কে তার মনে কেমন একটা বিতৃষ্ণা দল পাকিয়ে উঠতে থাকে।

দক্ষিণের নরম বাতাস, পার্কের কোকিলের ডাক—কিছুই আর সুরঞ্জনের ভালো লাগে না। এ বাতাস কিসে ভালো? কোকিলের ডাক তো কানে বিষের মতো লাগছে। সারা সকালটাই তার কাছে আজ বিস্বাদ, বিষাক্ত। তার সাম্‌নে যেন সব রং মুছে গেছে, সব আলো। তার চোখের সাম্‌নে শুধু একটা ধূসর দেয়াল। এই দেয়ালেই সে তার ভাগ্যের পরিহাস দেখতে পায়।

কেন সে ঠিক দশদিনের পর দিল্লী থেকে ফিরে এলো? সে তো আরো কয়েকটা দিন অনায়াসে সেখানে থাকতে পারতো? থাকলো না কেন সে? তাহলে তো এই দুঃসংবাদ সে আরো কটা দিন পরে শুনতে পেতো। তাই বরং ভালো হতো। সব চেয়ে ভালো হতো, যদি সে আর না ফিরতো।

কেতকী তার মনটাকে বড়ো ভেঙে দিয়ে গেছে। সে যে কেতকীকে এতখানি ভালোবাসতো, তা সে এতদিন জানতো না। তার মনের একটা গোপন পাতা যেন এতদিন তার কাছে লুকানো ছিল। কেতকী চলে যাবার পর সেই দুর্লভ পাতাটি তার মনের অজানা কোণ থেকে সে আজ আবিষ্কার করতে পেরেছে। হয়তো কেতকী চলে না গেলে সে তার কোনদিনই সন্ধান পেতো না। তার হৃদয় তার কাছেই হয়তো চির-অজ্ঞাত থেকে যেতো।

কেতকী চলে গিয়ে এক দিক দিয়ে তার ভালোই হয়েছে। সে নিজেকে জানতে পেরেছে। এতদিন সে কাউকে ভালোবাসতে পারে নি। হৃদয়ে কোন নারীকেই পায় নি সে। সে পৃথিবীতে খুঁজেছে শুধু দুজনকে—তার মাকে আর বোনকে। আর কাউকে তার কোনদিন প্রয়োজন হয় নি। কোনদিন যে কোন নারীকে তার প্রয়োজন হবে, তাও সে ভাবে নি। কেতকী যতদিন ছিল, ততদিন সে তাকে

হৃদয়ে অনুভব করে নি। তাকে দেখে সে কেমন যেন একটা পূর্ব স্মৃতির বেদনার মতো একটা আনন্দ অনুভব করেছে মাত্র। কিন্তু তাও ছিল ক্ষণিক। কেতকীকে কতটুকুই বা সে দেখেছে?

আজ কেতকী চলে যেতে সে যেন কেতকীকে পুরোপুরি ভাবেই পেল। এত নিবিড়ভাবে সে তাকে কোনদিন পায় নি। সে কেতকীকে যে ভালোবাসে তাই তার এতদিন অজানা ছিল। আর ভালোবাসার যে অনুভব, তাই কি সে এতদিন জানতো? আজ সে ভালোবাসার অনুভব কি মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে। কেতকী চলে গেছে আর সুরঞ্জনের মনে রেখে গেছে তার দুর্লভ ভালোবাসা। সে চলে গিয়ে তাকে ভালোবাসতে শিখিয়ে গেছে।

কেতকী চলে যাওয়ায় সুরঞ্জন তার হৃদয়টাকে আবিষ্কার করতে পেরেছে। তার মনে হলো, কেবল পার্কেই ফাল্গুন আসে নি। তার জীবনেও ফাল্গুন এসেছে। সে এই প্রথম এলো।

মিঠুয়া এতক্ষণ নিচে ছিল। এখন সে কি দরকারে ওপরে উঠে আসে।

সুরঞ্জন তার পায়ের শব্দ পেয়ে খবরের কাগজখানা মুখের ওপর তুলে নেয়। মিঠুয়া হাতে কি নিয়ে নিচে নেমে যায়। সুরঞ্জন কাগজটাকে চোখের সাম্‌নে থেকে নামিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

বুকের ভিতরটা কেমন যেন টন্‌ টন্‌ করতে থাকে। সে মনে মনে ভাবে, এরই নাম বুঝি ভালোবাসা!

এক সময় ঘড়িতে চোখ পড়তেই সে প্রায় লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। এরই মধ্যে এত বেলা হয়ে গেছে? সে যে বুঝতেই পারে নি। ভালোবাসা বুঝি মানুষকে এমনি ভুলিয়ে রাখে, এমনি বুঝি মানুষকে তার রুটিন্‌-বাঁধা সময়ের হাত থেকে ছিনিয়ে আনে, বিনা কাজে তার বেলা কাটিয়ে দেয়।

কিন্তু আজ তাকে যে একবার যেতেই হবে। আজ অফিসে তার অনেক কাজ। ফিরতে দেরি হতেও পারে। কন্‌ফারেন্সের পুরোপুরি

রিপোর্ট যে তাকে আজকেই পেশ করতে হবে। এখন স্নান করতে হবে, খেতে হবে, তারপর বেরুতে হবে। তাড়াতাড়ি সে বাথরুমে ঢুকে গায়ে জল ঢালতে আরম্ভ করলো। জল ঢালতে গিয়ে যেন তাকে কেমন একটা নেশায় পেয়ে বসলো। জল ঢালতে তার কি যে ভালো লাগছে, সে কাউকে বলে বোঝাতে পারবে না। একটা আশ্চর্য অনুভূতি তাকে যেন জড়িয়ে ধরছে।

একেই বলে বুঝি ভালোবাসা!

মিঠুয়া নিচে খাবার আনতে গিয়ে খালিহাতে ফিরে এলো।

ঃ কি হলো?

ঃ মা তোমাকে নিচে খেতে বললো।

সুরঞ্জন নিচে গেল।

চারদিকে কেমন যেন একটা নিস্তব্ধ শূন্যতা। কেউ কোন কথা বলছে না। কিন্তু দেওয়ালের ইঁটগুলো পর্যন্ত ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলতে চাইছে।

হেরম্ববাবু বাইরের ঘরে শুয়ে আছেন। যোগমায়া দেবী রান্নাঘরে। যূথিকাও সেই দিকে। করবী এ ঘরে আসন পাতছে, জল গড়াচ্ছে। বাচ্চুকে সে কোথাও দেখতে পেল না।

করবী আসন পেতে জল গড়িয়ে দিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাতের থালা এনে রাখলো সুরঞ্জনের সাম্‌নে।

সুরঞ্জন খেতে আরম্ভ করে। মুখ নিচু করে সে বসে খাচ্ছিল। সামনে মেঝেতে একটা ছায়া দেখে সে চম্‌কে ওপরের দিকে তাকালো।

যোগমায়া দেবী অনেক কেঁদেছেন। কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলে গেছে তাঁর। চুলে কতদিন চিরুণী পড়ে নি কে জানে? যেন এই পরিবারের ওপর দিয়ে একটা কালবোশেখী ঝড় বয়ে গেছে।

সুরঞ্জন বেশিক্ষণ তাঁর দিকে তাকাতে পারে না। ভাতের থালার ওপর চোখ নামায়। যোগমায়া দেবী দাঁড়িয়েই রইলেন। বসতে পারলেন না। সুরঞ্জন দিল্লীতে কেমন ছিল, সে কথাটুকু জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু পারলেন না।

সুরঞ্জন বুঝতে পারলো, যোগমায়া দেবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। তাঁর ভারি নিশ্বাসের শব্দ তার কানকে ফাঁকি দিতে পারে নি। তিনি যেন তাকে কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না। সুরঞ্জনের খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতায় কেটে গেল। শেষে কতো কালের কান্না যেন হঠাৎ কথা বলে ওঠে : শুনেছ, বাবা?

সুরঞ্জন মুখ না তুলেই বলে : শুনেছি।

এবার যোগমায়া দেবীর কান্না গলা ছাপিয়ে গেল। তিনি বললেন : আমি ওকে বড়ো বিশ্বাস করেছিলাম। ও আমার বুকটাকে একেবারে ভেঙে দিয়ে গেছে।

সুরঞ্জন নিঃশব্দে খেয়ে যায়। একটি কথাও বলে না। কথা বলার মতো তার মনের অবস্থাও নয়। আর সে যোগমায়া দেবীকে কি বলেই বা সান্ত্বনা দেবে? তারই এখন সান্ত্বনার দরকার। যোগমায়া দেবীকে সান্ত্বনা দেবার ভাষাই তার এখন হারিয়ে গেছে।

যোগমায়া দেবী বললেন : ছেলেটাকে ভালো বলে জানতাম। তার মনে এই কুবুদ্ধি ছিল জানলে—

সুরঞ্জন কিছু বলে না। করবী দূরে দাঁড়িয়ে সব শুনছে।

: জানতাম ও পরোপকারী ছেলে। পরের উপকার করতে ও ভালোবাসে। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম। ও এতদিন পরোপকারীর অভিনয় করে গেছে। আমি বুঝতেই পারি নি।

সুরঞ্জন কিন্তু বুঝতে পেরেছিল। একটা অন্ধ বোধশক্তি তার সকল অনুভূতিতে একটা ঘৃণার ভাব জাগিয়ে তুলেছিল। তাই সে কোনদিন নিশীথকে সহ্য করতে পারে নি। অবশ্য সুরঞ্জন সেই ঘৃণাকে একটা অর্থহীন ঈর্ষা বলে মনে করেছিল। নিশীথ কি তা বুঝতে পারেনি? পেরেছিল বই কি! একদিন তো সে তা প্রকাশও করে ফেলেছিল।

যোগমায়া দেবী বললেন : আজ বুঝতে পারছি সে এই কু-মতলবেই এ বাড়িতে ঢুকেছিল।

এখন যোগমায়া দেবীর চোখে জল নেই। সুরঞ্জন তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পারে না। কিন্তু বুঝতে পারে, সে চোখে এখন আগুন জ্বলছে।

ঃ বিশ্বাস করে ওর সঙ্গে কেতকীকে সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছি, হাসপাতালে যেতে দিয়েছি। তখন যদি জানতাম—

যোগমায়া দেবী কাকে বিশ্বাস করেন? এই বিশ্বাসহীন, বিশ্বাসঘাতক যুগকে তিনি আরো বিশ্বাস করেন? নিশীথ তো এই যুগেরই প্রতিভূ মাত্র। দোষ তার নয়, সমগ্র যুগটাই তার এই কুকীর্তির জন্যে দায়ী। যে যুগ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকে সুরু হয়েছে, সে যুগটাকে মানুষ দেখতে পায় না। সেই যুগ মানুষের মধ্যেই ঠাঁই নিয়ে মানুষের আত্মাকে খুন করেছে। মানুষ এখন তাই বড় বেশি দেহ-সর্বস্ব।

নিশীথের দোষ নেই, দোষ একালের এই অন্তঃসার-শূন্য, বহির্মুখী যুগের। যোগমায়া দেবী তাকেই বিশ্বাস করে যে ভুল করেছেন, আজ দুঃখের মূল্যে সেই ভুলের মাশুল তাঁকে দিতেই হবে।

যোগমায়া দেবী নিজের মনে বলে চললেনঃ তোকে এতদিন খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলাম, শেষে তুই আমার মুখে চুনকালি দিয়ে গেলি? একবার তুই আমার মুখের দিকে তাকালি না, বুড়ো বাবা পা ভেঙে শুয়ে আছে, তার কথাও একটিবার ভাবলি না। আর ছোট্ট ভাইটা, যাকে তুই নিজের হাতে মানুষ করেছিস্—

যোগমায়া দেবী আর কথা বলতে পারলেন না। কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

সুরঞ্জনের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে এবার উঠে পড়লো। করবী হাতে জল ঢেলে দিল। মুখ ধুয়ে সুরঞ্জন ঘরে এসে দাঁড়ালো।

ঃ সব সম্পর্ক কাটিয়ে দিয়ে চলে গেলি তুই। কেন আমি তোকে বড় করে তুললাম? কেন আমি তোকে আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মেরে ফেললাম না?

এমন সময় রান্নাঘর থেকে যুথিকা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। তারপরই চিৎকার : না—না—না—

যুথিকার হাসিতে যোগমায়া দেবী হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

: সর্বনাশী, হাসির আর সময় পেলি না। আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে আর তোর হাসি পাচ্ছে। দাঁড়া—

যোগমায়া দেবী উঠে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। বোধ হয় যুথিকাকে মারতেই যাচ্ছিলেন তিনি। করবী গিয়ে তাঁর সাম্‌নে দাঁড়ায়।

: মা, কি হচ্ছে কি ? দাদা রয়েছেন, দেখছো না।

যোগমায়া দেবী লজ্জা পান। একটু থেমে ধীর গলায় জিজ্ঞেস করেন : তুমি ভালো ছিলে তো, বাবা ?

সুরঞ্জন জানালো, সে ভালোই ছিল।

: মাথাটা আমার ঠিক নেই। কিছু মনে করো না, বাবা।

পাশের ঘর থেকে হেরম্ববাবু ডাকলেন : করবী—

: কি বাবা ?

: রঞ্জন চলে গেছে ?

: না।

: একটু এ ঘরে আসতে বল্, মা।

সুরঞ্জন লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে যায়। অসুস্থ মানুষ ভাঙা পা নিয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। আগে সুরঞ্জনের তাঁর সঙ্গে দেখা করাই উচিত ছিল। তিনি নিজে দেখা করবেন বলে ডেকে পাঠিয়েছেন ভেবে সুরঞ্জনের ভারি খারাপ লাগছিল।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে : কেমন আছেন ?

হেরম্ববাবু বলেন : কিছুই বুঝতে পারছি না।

একটু থেমে বললেন : আমার আর ভালো থাকার কোন অর্থ হয় ? এবার 'ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা আলোয় আলোয় চলে যাই। যাক্, তুমি ভালো ছিলে তো ? দিল্লীতে এখন ঠাণ্ডা কেমন ?

: বেশ ঠাণ্ডা। এখানকার চেয়ে অনেক বেশি।

হেরম্ববাবু বললেন ঃ আমাদের এখানে আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। শুনেছ বোধহয় ? এখানে অবশ্য দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য কিছুই শুনবে না। ঘটনা নয়, শুধু দুর্ঘটনাই। চোখের সামনে কতো দুর্ঘটনাই তো ঘটলো।

হাসলেন হেরম্ববাবু। একটু থেমে বললেন ঃ নিশীথ হয়তো ভেবেছে, আমি পুলিশে খবর দেব, মামলা করবো। কিন্তু তা করবো না। কি হবে ও সব করে ? ওতে জ্বালা বাড়বে। জ্বালার উপশম হবে না। তবে ও যে একটা স্কাউণ্ড্রেল, তা আমার জানা ছিল না।

কথা বলতে গিয়ে হেরম্ববাবু একটু হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। একটু দম নিলেন তিনি। বললেন ঃ দোষ কারো নয়। দোষ আমারই। দোষ আমার ভাগ্যের। এতদিন মেয়ের বিয়ে দিতে পারি নি। কোনদিন দিতে পারবো, তারও সম্ভাবনা নেই। তারাও বড়ো হয়েছে, বুঝতে শিখেছে। আর চারদিকে তো এই সব ঘটনাই বেশি করে ঘটছে। কোর্টে কতো ধরনের কেস্ আসে, শুনে আমরা অবাক হয়ে যাই। দেশে এই সব সোশ্যাল ক্রাইম্ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কোর্টে কতটুকু আসে ? চাপা দিয়ে দেওয়া হয় অনেক বেশি। তাহলে ভেবে দেখ, সমাজের অবস্থা কি ? তবে কি জানো ? একটা বিরাট্ পরিবর্তনের আগে সব সমাজেই এই রকমের একটা ভূতের নৃত্য সুরু হয়ে যায়। ফরাসীদেশে, সোভিয়েট রাশিয়ায় আর আমাদের ঘরের পাশে—

সুরঞ্জন বলে ঃ এখন আমাদের ঘরের কথাই বলুন।

ঃ কি আর বলবো। সবই তো দেখতে পাচ্ছো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বসো—

না সুরঞ্জন এখন আর বসবে না। তাকে এক্ষুনি অফিসে যেতে হবে। বোধ হয় একটু দেরিই হয়ে গেল আজ।

সে বললো ঃ আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে। রিপোর্টটা অফিসে বসেই তৈরী করবো।

ঃ আচ্ছা, তাহলে এসো। এসো কিন্তু মাঝে মাঝে।

ঃ আসবো।

এখন যোগমায়া দেবীর সাম্‌নে যাওয়ার ইচ্ছে সুরঞ্জনের একেবারে নেই। সে আর তাঁর কান্নামুখ দেখতে চায় না। অথচ সুরঞ্জনকে ওপরে যেতে হলে যোগমায়া দেবীর ঘরের ভেতর দিয়েই যেতে হবে।

সুরঞ্জন যোগমায়া দেবীর ঘরে পা দিয়েই শুনলো, যোগমায়া দেবী বলছেন ঃ পালিয়েই যখন গেলি, তখন আমাকে যেন তোর মুখ আর দেখতে না হয়। যেখানে গেছিস, সেখানে যেন সুখী হোস্‌।

সুরঞ্জন সিঁড়ি দিয়ে আসতে আসতে শুনলো, যোগমায়া দেবী বলছেন ঃ তুই কক্‌খনো সুখী হতে পারবি না। আমাকে কাঁদিয়ে—

তাড়াতাড়ি জামা কাপড় বদ্‌লে নিয়ে সুরঞ্জন বেরিয়ে যাচ্ছিল। বেরিয়ে যেতে যেতে একটু থম্‌কে দাঁড়ালো। যোগমায়া দেবী বাচ্চুকে বকছেন ঃ এ কি রকম স্নান করে এলি তুই? গায়ে মাথায় সাবানের ফেনা লেগে—

করবী বলছে ঃ আমি বললাম, আমি স্নান করিয়ে দিই। ওর আবার আমার স্নান করানো পছন্দ হয় না। বড়দি ওকে যা করে রেখে গেছে, না—

বাচ্চু বলে ঃ কেন? আমি তো ভালো করে স্নান করেছি—

সুরঞ্জন আর দাঁড়াতে পারলো না। সময়ও নেই। সে বেরিয়ে গিয়ে গলিতে এসে পড়লো।

হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবে কেতকীর জন্যে কারো কোন কষ্ট হবে না। কষ্ট হবে শুধু বাচ্চুর। সে একা স্নান করতে পারে না। অন্যেরা তাকে স্নান করিয়ে দেবে, তাও তার পছন্দ নয়। সে নিজের হাতে বোধহয় ঠিক মতো খেতেও জানে না। বড়দির হাতেই তার খাওয়ার অভ্যেস। বড়দি চলে যাওয়ার পর থেকে হয়তো তার ঠিক মতো নাওয়া হয় না, পেট ভরে হয়তো সে ভাতও খাচ্ছে না। কিন্তু রাতে সে ঘুমুতে পারছে কি? বড়দির মতো কে তাকে রূপকথার গল্প আর সুর করে ছড়া শোনাবে? সে যে রূপকথার গল্প আর ছড়ার সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তো। এখন সে কি করে? এখন কি সে

একাই ঘুমোয়? দিদির কথা ভাবতে ভাবতে হয়তো তার দুচোখের ঘুম ছুটে যায়। আর হয়তো ঘুম আসে না। হয়তো শুয়ে শুয়ে কাঁদে। কে আর দেখেছে তার কান্না? কেতকী চলে গিয়ে বাচ্চুরই ভারি অসুবিধে হয়েছে।

যেতে যেতে সুরঞ্জন দেখে, পানের দোকানের পাশের বেঞ্চিটায় একা তুষার বসে বসে সিগারেট টানছে। আর কেউ নেই।

সেদিন অফিস থেকে ফিরতে সুরঞ্জনের একটু দেরি হয়েছিল। সন্ধের পর সে বাড়িতে ঢুকতেই বাচ্চু তাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো: মা, দাদা এসেছে—

যোগমায়া দেবী বললেন: দাদাকে বল্‌, আমি তাকে একটু ডাকছি।

: চলো দাদা। মা ডাকে—

বাচ্চু এসে সুরঞ্জনের হাতে ধরলো।

সুরঞ্জন যোগমায়া দেবীর ঘরে গিয়ে দেখলো, ওপরের ছবি বৌদি যোগমায়া দেবীর সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন। ছবি বৌদির সঙ্গে ইতিমধ্যে সুরঞ্জনের আলাপ হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করতে গিয়ে অনেকবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে। বড়ো আলাপী মেয়ে ছবি বৌদি। বেশ হাসি খুশি। নিজের ঘর-সংসার নিয়ে দিব্যি সুখে আছেন তিনি। একালের সমুদ্র মন্থনের বিষ যেন তাকেই শুধু স্পর্শ করেনি। ছবি বৌদি সত্যিই সুখী। নবেন্দুবাবুর সঙ্গে প্রায়ই স্কুটারে চড়ে বেড়াতে যেতে তাঁকে দেখা যায়। কিন্তু বড়ো গোছানো ও হিসেবী মেয়ে তিনি। তাঁর কথায় বার্তায়ও তা বেশ বোঝা যায়। বেশি কথা বলেন না তিনি। কোনো অনাবশ্যক কথায় কিংবা কোনো অনাবশ্যক কাজে তিনি সময় নষ্ট করেন না। বাড়িতে একটা মাত্র ঝি দিয়ে তিনি সমস্ত কাজ সেরে ফেলেন। অথচ বাইরে বেড়াতে যাবারও সময়ের অভাব হয় না তাঁর। সিঁড়িতে

সুরঞ্জনের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। দেখা হলেই হাসিমুখে তিনি জিজ্ঞেস করেন : কেমন আছেন ?

ছবি বৌদিকে সুরঞ্জনের বেশ ভালো লাগে।

সুরঞ্জনকে দেখে আজ ছবি বৌদি বলে উঠলেন : আরে, কি খবর ? আপনাকে যে অনেকদিন দেখি না।

সুরঞ্জন বলে : কদিন কলকাতায় ছিলাম না।

: ও, হ্যাঁ। কে যেন বলছিল, আপনি দিল্লী গেছেন। দিল্লী থেকে কবে ফেরা হলো আপনার ?

: কাল রাতে ফিরেছি।

: কেমন ছিলেন ? ভালো তো—

: এই এক রকম আর কি।

: এদিকে দেখুন তো এঁর কি বিপদ। মেয়েটা একটা বাজে ছেলের সাথে পালিয়ে গেল। বাপ মা, ভাই বোন সব ফেলে। ছি ছি—

ছবি বৌদি হয়তো আরো কিছু বলতেন। কিন্তু ওপর থেকে নবেন্দুবাবুর গলা ভেসে এলো : ছবি, আলমারির চাবিটা দিয়ে যাও। ছবি—

: যাই—

বলে ছবি বৌদি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সুরঞ্জনকে বললেন : এখন চলি, উনি ডাকছেন। আবার দেখা হবে, কেমন ?

: আচ্ছা—

ছবি বৌদি বেরিয়ে গেলেন।

যোগমায়া দেবী উঠে গিয়ে বিছানার তলা থেকে একখানা চিঠি এনে সুরঞ্জনের হাতে দিলেন। সুরঞ্জন চিঠিখানা হাতে নিয়ে চম্‌কে উঠলেন। নিচে নাম লেখা—‘কেতকী’। কেতকী তাহলে চিঠি দিয়েছে। কোথায় আছে সে এখন ? কোথায় ?

চিঠিখানা এক নিশ্বাসে সে পড়ে ফেললো :

মা, আমাকে ক্ষমা করো। আমাদের রেজেষ্ট্রী হয়ে গেছে। আমরা ভালোই আছি। তুমি আমাদের আশীর্বাদ করবে না ? বাবার জন্যে

আর বাচ্চুর জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়। তুমি আর বাবা আমাদের প্রণাম নিও। বাচ্চু, করবী আর যূথিকার জন্যে আমাদের ভালোবাসা রইলো। ইতি—

কেতকী

সুরঞ্জন মনে মনে বললো ঃ গৌরবে বহুবচন।

যোগমায়া দেবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি দেখলে?

সুরঞ্জন বললো ঃ যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন ওরা ভালো আছে।

যোগমায়া দেবী বলে উঠলেন ঃ ভালো থাকলেই ভালো। আমাকে আশীর্বাদ করতে বলেছে।

একটু থেমে বললেন ঃ বেশ। আশীর্বাদ করছি, তোরা সুখী হ'?—

আঁচল দিয়ে যোগমায়া দেবী চোখ মুছলেন।

তারপর বললেন ঃ দেখো তো, চিঠিটা কোন্খান থেকে লিখেছে—

সুরঞ্জন আবার চিঠিটা দেখলো। যেখান থেকে চিঠিটা লেখা হয়েছে সেখানকার ঠিকানা নেই। তবে যেখানে চিঠিখানা পোষ্ট হয়েছে, তার ছাপ রয়েছে উল্টো পিঠে।

ছাপের হরফগুলো থেকে পাঠোদ্ধার করে সুরঞ্জন বললো ঃ কলকাতার বিডন স্ট্রীট এলাকা থেকে।

ঃ তাহলে কলকাতাতেই আছে ওরা?

ঃ তাই তো দেখছি।

যোগমায়া দেবী চিঠিখানা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছু বললেন না। সুরঞ্জনও আর কিছু না বলে ওপরে উঠে এলো। ওপরে এসে দেখলো, বাচ্চু মিঠুয়াকে গান শোনাচ্ছে—

'অকালে পুষিলাম পাখি, খুদ কুঁড়া দিয়া রে—

সুরঞ্জনকে দেখে তার গান বন্ধ হয়ে গেল।

সুরঞ্জন জামা কাপড় বদ্লালো। মিঠুয়াকে বললো ঃ চা নিয়ে আয়। যা—

মিঠুয়া চা আনতে গেল নিচে। বাচ্চুকে একা ঘরে রেখে স্বরঞ্জন বাথরুমে গেল।

স্বরঞ্জন ভাবে, বাচ্চু এখন এই সময়ে এ-গান গাইছে কেন? সে কি বড়দিকে তার ভুলতে পারছে না? তার বড়দি কি তাকে ভুলতে পেরেছে? চিঠিতে লিখেছে, বাচ্চুর জন্যে তার বড়ো কষ্ট হয়। কথাটা কি সত্যি? হবেই তো। ছোটবেলা থেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, তাকে ছেড়ে গিয়ে তো মন খারাপ হবেই কেতকীর।

স্বরঞ্জনের এখন আবার গায়ে জল ঢালতে ইচ্ছে করছিল। সে জানে এ হলো এক রকমের পাগলামি। না, এ পাগলামির কাছে নিজেকে তুলে দেওয়া ঠিক হবে না। গায়ে জল ঢালতে গিয়েও সে ঢালে না। শরীর খারাপ করবে।

ঘরে ফিরে এসে স্বরঞ্জন দেখলো, বাচ্চু একা-একা বসে আছে। তাকে দেখে স্বরঞ্জনের ভারি কষ্ট হলো। বাচ্চু একা-একা বসে কি ভাবছে? হয়তো সে তার বড়দির কথাই ভাবছে। আজকাল সে কেমন যেন একটু দমে গেছে। তার আগেকার চঞ্চলতা আর নেই। একটু ঝিমিয়ে পড়েছে সে যেন।

স্বরঞ্জন জিজ্ঞেস করে: একা বসে কি ভাবছো, বাচ্চু? মিঠুয়ার সঙ্গে নিচে গেলে না কেন?

সে উঠে এসে স্বরঞ্জনের পাশে বসলো। বলে: আমাকে একদিন বাঁশবাগান দেখিয়ে আনবে, দাদা? বাঁশবাগান কেমন?

স্বরঞ্জন তাকে কাছে টেনে আনে। বলে: নিশ্চয়ই দেখিয়ে আনবো।

: আচ্ছা ওর মাথায় চাঁদ ওঠে?

: ওঠে বৈকি!

আজ কাজলা দিদির কথা মনে পড়েছে বাচ্চুর। এখন বাচ্চুর মনে কাজলা দিদি আর বড়দি—দুইই একাকার হয়ে গেছে।

এমন সময় উত্তর দিকের জানলায় লাঠির বাড়ি পড়তে লাগলো।

সুরঞ্জন উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে দিল। এত জোরে জানলায় খোঁচা মারলে খড়খড়িগুলো হয়তো কোন্‌দিন ভেঙে যাবে।

ওপাশের জানলায় মিসেস্ গোমেস দাঁড়িয়েছিলেন। সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো ঃ কি বলছেন ?

মিসেস্ গোমেস কিছুই বললেন না। একটা কাঠের মূর্তির মতো অপলক চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কালো হয়ে গেছে তাঁর মুখটা। মুখে অনেক ভাঁজ পড়েছে, চুলের রং আরও সাদা হয়ে গেছে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেঃ কি হলো আপনার? রার্ণা ফিরেছে তো ?

করুণ ভাবে মিসেস্ গোমেস মাথা নাড়লেন। বললেন ঃ না।

সুরঞ্জন বললোঃ আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। সে ফিরে আসবে।

ঃ মিথ্যে আশ্বাস আর দিও না। আমি জানি, সে আর ফিরে আসবে না।

গলাটা মিসেস্ গোমেসের কেঁপে উঠেছিল। চোখের কোণটাও বুঝি একটু ভিজে উঠেছিল। সুরঞ্জন তা আর দেখতে পায় নি।

কারণ মিসেস্ গোমেস আর কোন কথা না বলেই জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

সুরঞ্জনও জানলা বন্ধ করে দিয়ে বাচ্চুর পাশে এসে বসলো।

তার কানে বাজতে লাগলো মিসেস্ গোমেসের কথার রেশটুকু ঃ সে আর ফিরে আসবে না।

তারপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। হালদার বাগান লেনের বয়স আরো কয়েকদিন বেড়ে গেছে।

ঘটনা উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নি বটে, কিন্তু যা কিছু ঘটেছিল সব থিতিয়ে গেছে।

নিশীথের সঙ্গে কেতকীর চলে যাওয়া ব্যাপারটা একদিন মনে হয়েছিল একটা ভূমিকম্পের চেয়েও দুঃসহ ঘটনা। মনে হয়েছিল, সূর্য-পরিক্রমার পথে চলতে গিয়ে পৃথিবী বুঝি অন্য কোন পথে ঘুরে গেল। আর বুঝি সূর্য উঠবে না, অস্ত যাবে না। কিন্তু এখন তা আর মনে হয় না। সূর্য ঠিক উঠছে এবং অস্তও যাচ্ছে। হালদার বাগান লেনের একটা মেয়ে কোন একটা বিকৃত-রুচি ছেলের সঙ্গে কবে পালিয়ে গেছে, তার খবর বলার সময় কারও নেই। বোধ করি প্রয়োজনও নেই। কেতকী যে এ বাড়িতে ছিল, তার কোন চিহ্নই নেই। কেতকী না থাকার জন্যে পৃথিবীটা আর থম্‌কে থেমে নেই।

সুরঞ্জন ভাবে, কি করে কেতকীর সমস্ত চিহ্ন হালদার বাগান লেনের এই বাড়ি থেকে মুছে গেল? কে সকলের মন থেকে তার স্মৃতিগুলিকে চুরি করে নিল?

সময়। সময়ই সব চুরি করে নিয়েছে। কেতকীর যা কিছু ছিল, যা কিছু সে পেছনে ফেলে গিয়েছিল সব চুরি করে নিয়েছে সুচতুর সময়। না, চুরি সে করেনি, চুরি সে করে না। সে সব ঢেকে দিয়েছে তার বিপুল আস্তরণ দিয়ে। কিছু নেই, সব কোথায় যেন ঢাকা পড়ে গেছে। হালদার বাগান লেনের এই অন্ধকার বাড়িতে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, তা সময়ের শুশ্রূষায় ধীরে ধীরে সেরে উঠেছে। মানুষের কতো বেদনার ক্ষত এইভাবে সময়ের হাতে সেরে যায়। তা নইলে পৃথিবীটা অসংখ্য বেদনার লাশঘরে পরিণত হতো।

কেতকীর কথা বোধ হয় আর যোগমায়া দেবী তত ভাবেন না। হেরম্ববাবু? তিনিই কি ভাবছেন? বোধ হয় না। আর বাচ্চু? তারও মনে কাজলা দিদি ফিকে হয়ে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে সুরঞ্জনের মনে পড়ে রিণা রায়ের কথা। রিণা রায়ও তো অমিতকে ফেলে চলে গেছে। হয়তো অমিতের মনের ক্ষতটিও সময়ের হাতের স্পর্শে সেরে গেছে। কিন্তু এখন অমিত রায় তার ফ্ল্যাটে একা-একা কি করে? বিছানায় শুয়ে সে কি অতীত প্রেমের

স্মৃতির কথা ভেবে দিন কাটায়? কিংবা রিণা রায়ের ছবি মনে মনে এঁকে একটা দুঃখের পাহাড় তৈরী করে তোলে?

সত্যি, বহুদিন কেটে গেল। অমিত রায়ের কোন খবরই সে নিতে পারে নি। অমিত কি হালদার বাগান লেনের এই অন্ধকার থেকে পালিয়ে বেঁচেছে? যেমন করে রিণা, কেতকী পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে?

অনেকদিন অমিতের খবর নেওয়া হয় নি।

সেই-যে অমিত তার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে গেছে, তারপর থেকে আর তার কোন খোঁজই নেই। টাকা নেওয়ার দৈন্যটুকু ঢাকবার জন্যেই কি অমিতের এই অজ্ঞাতবাস? না, তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে কি সুরঞ্জন তাকে টাকা দিয়ে ভুল করলো?

সুরঞ্জন খবরের কাগজটা চোখের সাম্‌নে ধরে অনেক কথার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। কানাগলির অন্ধ চোখে সকালের সামান্য আলো পড়েছে! তবু এই সকালে সুরঞ্জনকে আলো জ্বালিয়ে কাগজ পড়তে হয়।

কাগজের পাতা ওল্‌টাতে গিয়ে চিত্র প্রদর্শনী কলমে কতকগুলো ছবি চোখে পড়ে তার। অর্ধমনস্কভাবে সে ছবিগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যায়। ওপরে ক্যাপ্‌শান দেওয়া—"ফুটপাতে চিত্র প্রদর্শনী"। ক্যাপ্‌শানে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। সাধারণত এ রকম ক্যাপ্‌শান চোখে পড়ে না। বিমলবাবুই তো তাদের কাগজের চিত্র-সমালোচনা করে থাকেন। ক্যাপশানটা বোধহয় তাঁরই দেওয়া।

সুরঞ্জনের বড়ো ভালো লেগেছে ক্যাপ্‌শানটা: ফুটপাতে চিত্র-প্রদর্শনী।

তার নিচে লেখা: কলকাতায় এই প্রথম।

এমনিতে ক্যাপ্‌শানে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু খবরটা নতুন বটে।

সুরঞ্জন খবরটা মন দিয়ে পড়ে। শিল্পী তার প্রতিভাকে নিয়ে ফুটপাতে নেমে পড়েছে আজ। এটা শিল্পীর 'মর্যাদা' না অমর্যাদা—

সুরঞ্জন বুঝে উঠতে পারে না। তবে একটা যন্ত্রণাকাতর মুখচ্ছবি তার চোখের সাম্‌নে ফুটে ওঠে। সে মুখ অমিত রায়ের।

স্বরঞ্জন মন দিয়ে লেখাটা পড়ে।

এ কি! এ যে অমিত রায়েরই ছবির এক্‌জিবিশান।

অমিত তাহলে রিণা রায়ের জন্যে দুঃখে বেদনায় ভেঙে পড়ে নি। কিংবা রিণার স্মৃতি রোমন্থনে দিন কাটিয়ে দেয় নি। সে তার শিল্পী-চেতনাকে মূল্য দিয়েছে। রিণাকে হারিয়ে সে তার শিল্প-চর্চার জগতে ফিরে গেছে। এতদিন হয়তো রিণা তাকে আড়াল করে রেখেছিল। আজ সেই আড়াল সরে গেছে। সে আজ তার সাম্‌নে দেখতে পেয়েছে শিল্পের পথ। আজ সে একা, তাই একনিষ্ঠ।

অমিতকে তার আজ বড়ো ভালো লাগছে। কাগজটা হাতে নিয়ে সে অমিতের ফ্ল্যাটে ছুটে গেল। দরজায় ঘা দিল: অমিত বাবু, অমিতবাবু—

দরজা খুলে অমিত সুরঞ্জনকে দেখে অবাক হয়ে যায়।

: একি, আপনি? আসুন, আসুন—

: আরে, করেছেন কি?

: কেন?

: ফুটপাতে ছবির এক্‌জিবিশান্‌ করেছেন—

: কেন? খারাপ করেছি?

সুরঞ্জন অমিতের এই প্রশ্নে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল! কিন্তু তা সাময়িক। সে হেসে বলে: না না, খারাপ কেন হবে? নতুন, মানে একেবারে নতুন আমাদের দেশে।

অমিত হাসলো। করুণ তার হাসি।

সুরঞ্জন বলে: খবরটা পড়ে চারদিকে যে হৈ হৈ পড়ে যাবে।

অমিত শুধু হাসে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে: কতগুলো ছবি?

: বেশি নয়। মাত্র চল্লিশ খানা।

: এতগুলো ছবি আঁকলেন কবে?

ঃ ধরুন, চল্লিশ দিন লেগেছে।

সুরঞ্জন চেয়ে দেখলো, অমিতের দুচোখে আর সেই হতাশার অন্ধকার নেই। সেখানে আজ সে আলো দেখতে পেল। চোখ দুটি আজ তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সাফল্যের আনন্দে।

না, আজ সে ব্যর্থ নয়। কোন ব্যর্থতা আজ তার দুচোখে ছায়া ফেলতে পারে নি। আজ সে সফল, আজ সে সার্থক।

সুরঞ্জনের মনে পড়ে, এই অমিত রায় একদিন উল্টোডাঙার কাছে রেল লাইনে দাঁড়িয়েছিল মরবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। এই অমিত রায় রিণার রোজগারের ভাত খেয়েছে বলে মুখ বুজে তীব্র গঞ্জনা শুনেছিল। আর আজ? আজ অমিত রায়কে তার বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে ঃ কাগজটা পড়েছেন? কি বলেছে—

অমিত বলে ঃ পড়বোনা ঠিক করেছি। যদি খারাপ বলে, মনটা ভীষণ ভেঙে যাবে।

সুরঞ্জন হেসে বলে ঃ না না, খারাপ বলে নি। খুব প্রশংসা করেছে।

অমিত হাসলো শুধু। বললো ঃ আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে মেটিরিয়াল কিনেছি। তারপর রাত দিন তুলি ধরে বসেছি। কতো রাত যে জাগতে হয়েছে, তার ঠিক নেই। কেমন একটা পাগলামিতে পেয়েছিল যেন। তুলি ধরছি, আর ছবি এসে যাচ্ছে। মনে এত ছবি কোথায় ছিল, জানতাম না। নিজেই অবাক হয়ে যেতাম। একদিন কি হয়েছে, জানেন? স্টোভে ভাত চড়িয়ে দিয়ে বসে ছবি আঁকছি। ছবিটার একটু বাকি। একটু রং মিলে গেলে উঠে পড়বো। কিছুতেই রংটা মেলাতে পারছি না।

অমিত হাসলো।

সে কি বলতে চাইছে সুরঞ্জন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ তারপর?

ঃ শেষে রং মিলিয়ে দিলাম। কিন্তু ঘড়িতে দেখি, রাত আড়াইটা

বেজে গেছে। রান্না ঘরে গিয়ে দেখলাম, ভাত পুড়ে কখন খাক্ হয়ে গেছে। তেল ফুরিয়ে স্টোভটাও কখন নিবে গেছে। হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে এক গেলাস জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

কথাটা শুনে সুরঞ্জনের বড়ো কষ্ট হলো। অমিতের মনে কিন্তু কোন কষ্ট নেই। সে বলেঃ কিন্তু সেদিন আমার মনে কোন কষ্ট হয় নি, জানেন? খিদের কথা মনেও হয় নি। একটা আশ্চর্য আনন্দে মনটা ভরে ছিল। মনের আনন্দে ঘুমিয়ে পড়লাম।

অমিত বলে চলেঃ ছবি তো আঁকলাম। কিন্তু ছবি নিয়ে কি করবো? কোথায় এক্‌জিবিশান করবো? কয়েকটা গ্যালারিতে গেলাম। অথরিটিদের সাথে কথা বললাম। কয়েকখানা ছবি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওঁদের দেখালাম। ওঁরা বললেন, পরে জানাবো। কেউ কিছুই জানালেন না। আবার দেখা করলাম। ওঁরা বললেনঃ অসুবিধে আছে। 'হল' একেবারে বুক্‌ড্। অনেক ঘোরাঘুরি করে যখন কিছুই হলোনা, তখন বাধ্য হয়ে ফুটপাতে নেমে পড়লাম। বলুন, ভুল করেছি?

সুরঞ্জন মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনছিল, কোন উত্তর দিতে পারলো না।

অমিত চৌরঙ্গী রোডের একপাশে ছবি টাঙিয়ে বসেছে। তাছাড়া তার উপায়ই বা কি ছিল? কলকাতা শহরে যার কিছু নেই, তার ফুটপাত আছে। ফুটপাত সবাইকেই স্থান দেয়। কাউকে ফেরায় না। অমিত দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে। কেউ দ্বার খোলে নি। সবাই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ফুটপাত তাকে ফেরালো না। ফুটপাতের পাশেই হলো তার ছবির এক্‌জিবিশান। ভয় ছিল পুলিশের। পুলিশ যদি তুলে দেয় তাহলে সে কি করবে? সে মনে মনে একটা প্ল্যান্ ঠিক করে ফেলেছিল। তবে পুলিশ আসে নি। তবু উদ্বেগ যে ছিল না, তা নয়।

উদ্বোধন নেই, বক্তৃতা নেই, আলোর সমারোহ নেই—তবু এক্‌জিবিশান। অমিতের আঁকা ছবির প্রথম এক্‌জিবিশান। তবে

দর্শকের অভাব হলো না। অল্প সময়ের মধ্যেই ভিড় জমে উঠলো—কৌতূহলী জনতার ভিড়।

ফুটপাতে তারা কখনো এমন ছবি দেখে নি। এ যেন মামুলি রীতিতে আঁকা ছবি নয়। কিছু নতুন ধরনের। রঙের মধ্যে কালো এবং রক্তিমার প্রাধান্য বেশি। হলুদ কিছু কিছু আছে। সবুজ বা নীল নেই বললেও চলে। অমিত কি শুধু যন্ত্রণার রঙ্‌কেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে? দুচোখের কালো এবং বুকের মধ্যে যন্ত্রণার রক্তিমা—এই দুটো রঙ্‌কেই সে বেশি করে তার ছবিতে এনেছে।

ভিড় জমছে আর সরে যাচ্ছে। চোখের দেখা দেখে যে যার কাজে চলে যায়। ফুটপাতের শূন্য উপকূলে অমিত তার ছবিগুলোর পাশে একটা টুল পেতে বসে থাকে।

কিন্তু কতোদিন সে এভাবে বসে থাকবে? পেটও তো চালাতে হবে। কিন্তু কি করে চালাবে সে? আর যে চলে না। দুচার আনা পয়সায় কি পেট ভরে? আগেকার মতো তেমন দিনও নেই। জিনিসপত্রর দাম ভীষণ চড়া। দু-চার আনা পয়সায় কিছুই হয় না। কাঁহাতক আর রাস্তার কল থেকে জল খাওয়া যায়?

অমিত জিজ্ঞেস করে: কতোই বা আর জল খেতে পারি, বলুন? তারও তো একটা লিমিট্‌ আছে। খিদে পেলেই জলের কলের দিকে ছুটে যাই। কলেও সব সময় জল থাকে না।

এদিকে রাস্তার ধুলো বালি লেগে ছবিগুলো ময়লা হয়ে যাচ্ছে। রংগুলো সব ম্লান হয়ে আসছে। দুদিন বাদে আর আগেকার সেই উজ্জ্বলতা থাকবে না।

অমিতের মনেও অন্ধকার জম্‌ছে। এবং ভয়। এতদিন যা হোক করে চলেছে। এখন কি করে চলবে? আজকাল খালি খিদে পায়। খিদেটা একটু কম করে পেলে হয় না? কিংবা পেটটাকে বাদ দিয়ে দিলে কেমন হয়?

দিনরাত খালি খিদে, খিদে, খিদে—

একখানা ছবিও বিক্রী হলো না। কি করে চলবে? আর কে-ই বা কিনবে তার ছবি? এদেশে কি ছবির কোম কদর আছে? এদেশে যা কিছু সব জীবন্ত কারবার, ছবির কারবার নেই। তা নইলে অজন্তা, ইলোরা, খাজুরাহো বা কোণারক এতদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে কেন?

এবার উপোস।

অমিতের তাছাড়া আর উপায় নেই। সুরঞ্জনের কাছেও হাত পাতবার তার মুখ নেই। সুরঞ্জনের কাছ থেকে সে টাকা ধার করেছে, এখনও শোধ দিতে পারে নি। আবার তার কাছে গিয়ে সে চাইবে কি করে?

দেখতে দেখতে সাতদিন তো কেটে গেল। ফুটপাতে সে সাত-দিন ধরে ছবির এক্‌জিবিশান করছে। লোকে ভিড় করে ছবি দেখে আর চলে যায়। সকালে অমিত স্নান করে ভাতে ভাত একটু মুখে গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় চৌরঙ্গী। সেখানে ছবি টাঙিয়ে টুলের ওপর বসে থাকে। মনে কতো আশা। আজ হয়তো তার একখানা ছবি বিক্রী হবে। হাতে টাকা আসবে। পেট ভরে দুটি খেতে পাবে আজ, গুরুদাসবাবুকে বাড়িভাড়ার টাকাটা দেবে, রং কিনবে, তুলি কিনবে, ইজেল কিনবে।

আরো অনেক ছবি আঁকার মেটিরিয়াল হাতের কাছে পাবে সে।

কিন্তু তার আশা কোনদিনই পূর্ণ হয় না। একখানা ছবি বিক্রী তো দূরের কথা, কেউ দামটুকুও জিজ্ঞেস করে না। সন্ধের পর সে ছবিগুলো গুছিয়ে কাঁধে, মাথায় করে, ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হালদার বাগান লেনের অন্ধকার বাড়িটাতে ফিরে আসে।

সবাই ছাড়বে। কিন্তু গুরুদাসবাবু ছাড়বেন না। তিনি রোজকার অভ্যেস মতো একবার করে ভাড়ার তাগাদা ঠিক দিয়ে যাবেন। পেটে ভাত নেই, ভাড়া দেবে কি? মুদির দোকানেও টাকা না দিলে আর কোন জিনিসপত্র দেবে না, বলে দিয়েছে।

সেদিন অমিত শুধু স্নান করেই ছবিগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল। খাবার কিছু জুটলো না। যথারীতি সে ছবিগুলো টাঙিয়ে টুল পেতে একপাশে বসে রইলো হতাশ ভাবে। দুপুরের দিকে রোদ্দুরে পিচ্ গলতে আরম্ভ করেছে, আগুনের হল্‌কা বয়ে নিয়ে আসছে বোশেখ মাসের গরম বাতাস। রুমাল ভিজিয়ে নাকে চাপা দিয়ে বসে থাকতে হলো।

বিকেলের দিকে রোদ্দুর পড়ে এলে একটু করে ভিড় জমলো কয়েকজন বিদেশী ফুটপাত দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছিল। ছবিগুলোর দিকে চোখ পড়তেই তারা দাঁড়িয়ে যায়। মনে হলো, ট্যুরিস্ট। বোধ হয় ভারত-দর্শনে এসেছে। দাঁড়িয়ে ওরা ছবিগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। দুখানা ছবি তারা বাছলো। দাম জিজ্ঞেস করলো।

অমিত বললো : বললাম, তোমরা বিদেশী, যা খুশি দাও। আসলে কি জানেন? তখন যা পাই, তাই ভালো। পেট আর শুনছিল না কিছু। শুধু শুধু একটা 'বিদেশী'র দোহাই দিলাম মাত্র। ওরা কি করলো জানেন? দেড় হাজার টাকার কারেন্সি নোট হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো : খুশি? সত্যিকথা বলছি, সুরঞ্জন বাবু। আমি এতটা আশা করিনি। প্রথমে তো আমি বিশ্বাস করে উঠতেই পারছিলাম না। কেমন যেন বোকা বনে গেলাম। ওদের হয়তো কিছু বলা আমার উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। লোকগুলো চলে যেতে সে কথা আমার হুশ হলো। রাস্তার লোকগুলো আরো কৌতুহলী হয়ে বোধ হয় আমাকে দেখছিল। তারা আর ছবি দেখছে না। কেবল আমাকেই দেখছে। আমার কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল। বিশ্বাস করুন, আমার চোখে জল এসে পড়ছিল। এতো টাকা আমার দুখানা ছবির জন্যে কেউ দেবে, কোনদিন কল্পনাও করিনি। কিন্তু পরে ছবির সারির দিকে চোখ পড়তেই মনটা কেমন যেন বেদনায় ভরে গেল। আমার ব্যথা দিয়ে আঁকা, আমার এতদিনের দুঃখের সাথী ছবি দুটো আর

নেই। সেখানে কেমন একটা অসহ্য শূন্যতা পড়ে আছে। বোধ হয় সেই জন্যেই বেশি করে কান্না পাচ্ছিল।

অমিত বলে চলে ঃ সেদিন দেড় হাজার টাকা পকেটে নিয়ে এ বাড়িতে ফিরে এলাম। মনে হচ্ছিল, আপনার কাছে ছুটে যাই। আপনার জন্যেই তো এ সব সম্ভব হয়েছে।

সুরঞ্জন বাধা দিয়ে বলে ঃ সাম্‌নাসাম্‌নি এভাবে প্রশংসা করবেন না। আমার ভারি খারাপ লাগে।

অমিত সুরঞ্জনের দুটো হাত চেপে ধরলো। বললো ঃ সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, আপনার সেই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গল্প, সেই চাকরি জোটানোর গল্প আমি ভুলতে পারি নি। সেই গল্পের কথা মনে পড়লেই আমি যেন মনে মনে শক্তি ফিরে পাই। সত্যি কথা বলছি, রিণা চলে যাবার পর আমি যেন একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, শেষ হয়ে গেলাম। আর উঠতে পারবো না, বাঁচতে পারবো না। কিন্তু আপনি আমাকে শক্তি দিলেন। মনে যে কি শক্তি ফিরে পেয়েছি, তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। তাছাড়াও আপনি দিয়েছেন টাকা। সেই টাকা দিয়ে আমাকে আপনি ছবি আঁকতে বাধ্য করেছেন। সে কথা আমি ভুলতে পারিনি। সেদিন বাড়ি ফিরেই আপনার ঘরে দেখলাম অন্ধকার। আপনি ঘরে নেই। ফিরে এলাম। টান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। দোকানে কিছু খেয়ে এসেছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা। মাঝরাতে যখন ঘুম ভাঙলো, দেখি আলোটাও নেভানো হয় নি।

কথার মাঝখানে অমিত হঠাৎ থেমে গেল। সুরঞ্জনের মুখের দিকে এক মুহূর্ত সে চেয়ে রইলো।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো ঃ কি হলো ?

অমিত বলে ঃ একটু চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে আসি।

সুরঞ্জন বাধা দিয়ে বলে ঃ চা খেয়ে আসছি। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

অমিত হাসে। বলে : কষ্ট? কোন কষ্টই আর কষ্ট বলে মনে হয় না, জানেন? আমি এখন অল্-প্রুফ্।

অমিত রান্নাঘরে চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে এলো।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো : তারপর?

: তারপরের দিনই এক রিপোর্টার ভদ্রলোক এলেন। অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। ছবি দেখলেন। ছবি তুললেন। আমারও ছবি তুললেন। ভদ্রলোক চলে যেতে মনে পড়লো, ওঁকে তো জিজ্ঞেস করা হলো না, উনি কোন্ কাগজ থেকে এসেছিলেন।

সুরঞ্জন হেসে বললে : আমাদের কাগজ থেকেই এসেছিলেন। আমাদের বিমল বাবু—উনি আমাদের কাগজের চিত্র-সমালোচক।

: আজ তা জানতে পারলাম। আগে কিন্তু জানতে পারিনি। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। তার কদিন বাদেই দেখি, এক আর্ট গ্যালারির কর্তৃপক্ষ-স্থানীয়া এক ভদ্র মহিলা পাঁচ শো টাকা দিয়ে আমার একখানা ছবি পছন্দ করে কিনে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় নিজের পরিচয় দিয়ে বলে গেলেন, পরে আমাদের গ্যালারিতে আপনার ছবির একজিবিশান হবে, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। একদিন কিন্তু এই ভদ্রমহিলাই আমাকে দেখা করবার সুযোগ না দিয়ে দারোয়ান দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

কথার মাঝখানে উঠে গিয়ে অমিত রান্নাঘর থেকে চা তৈরী করে নিয়ে এলো। চা খেয়ে সে সুটকেশ খুলে সুরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করে : বলুন, আপনাকে কতো টাকা দিতে হবে। আপনার তখন দেওয়া একশো টাকার দাম আমার কাছে ছিল হাজার টাকা। বলুন, এখন কতো দিলে তা শোধ হবে?

সুরঞ্জন বলে : আপনার দেখছি আজ সবেতেই বড়ো বাড়াবাড়ি। আপনি সেই একশো টাকাই দেবেন।

অমিত টাকা ফেরৎ দিল। দুচোখে তার কৃতজ্ঞতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। বলে : আজও এক্‌জিবিশান করছি—সার্বজনীন গ্যালারি ফুটপাতে। নিমন্ত্রণ নয়, অনুরোধ। আসবেন তো?

ঃ আসবো।

চা খেতে খেতে অমিত বলেঃ ক'টা দিন কী আশ্চর্য পাগলামিতে যে পেয়েছিল, তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। তুলি ধরেছি আর সঙ্গে সঙ্গে ছবি হয়ে উঠেছে। কদিন পৃথিবীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই ছিল না। বাইরে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, কিছুই জানি না।

অমিত আস্তে আস্তে বলে চলে তার শিল্পী-জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। কি করে সে কদিন বাইরের জগতের কথা ভুলে ছিল, কি করে সে নিজের অনুভূতির মধ্যে ডুবে ছিল—সেই সব কথা সে আজ সুরঞ্জনকে বলে শোনায়। সুরঞ্জনও অবাক হয়ে শোনে। অমিতের প্রতি তার কেমন একটা অন্ধ সহানুভূতি আছে। এই যুগের সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। সে উঠে দাঁড়াক, জয়ী হোক জীবন-সংগ্রামে—এই তো সুরঞ্জন চায়।

মাঝে মাঝে সুরঞ্জন এই কথাই ভাবে, যুগ বড় না মানুষ বড়। বর্তমান যুগ বড় শক্তিশালী। সে তিমিঙ্গিলের মতো মানুষের সব কিছুকে গ্রাস করতে চায়। কিন্তু মানুষের শক্তির ওপর আস্থা আছে সুরঞ্জনের। সে জানে এবং বিশ্বাস করে, মানুষ একদিন তার মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যুগের চক্রান্তের ওপরে জয়ী হবে।

অমিত যুগের বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পারছে—এতেই তার আনন্দ। কিন্তু সে ঠিকমতো উঠে দাঁড়াতে পারবে তো? বড় আঘাত খেয়েছে সে। সব চেয়ে বড় আঘাত তাকে দিয়েছে রিণা। রিণা তার মনটাকে ভেঙে একেবারে চুরমার করে দিয়ে গেছে। কিংবা রিণাই তাকে জাগিয়েছে। ক্লান্ত, অবসন্ন, হতাশ অমিতের মনটাকে জাগাতে বোধহয় বাইরের দিক থেকে একটা বড় ধরনের আঘাতের প্রয়োজন ছিল। রিণা তাকে সেই আঘাত দিয়েছে। রিণাই জাগিয়ে তুলেছে তার শিল্পী চেতনাকে।

তারপর থেকেই তো সুরু হয়েছে যুগের জড়তার হাত থেকে অমিতের মুক্তির সাধনা।

অমিত হেসে ওঠে। বলেঃ একদিন যারা আমাকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিয়েছে, তারাই আজ স্থান দেবার জন্যে ডাকছে। দেশে এতগুলো আর্ট গ্যালারি আছে, কেউ আমাকে প্রথমে একটু স্থান দেয়নি। আজ তারাই আমার ছবি কিনছে। ডাকছে একজিবিশান করবার জন্যে। হাসি পায় কিনা, বলুন ?

সুরঞ্জন লক্ষ্য করে, অমিত এতক্ষণের মধ্যে বোধহয় একবার মাত্র রিণার নাম মুখে এনেছিল। তার নাম মুখে উচ্চারণের সময় তার মুখে কোন বিকৃতিও ছিল না। শুধু কথার স্রোতে একটা ফেনাপুঞ্জের মতো নামটা উচ্চারণ করে সে চলে গেছে। সে কি তবে আর রিণাকে চায় না ? রিণার কথা ভাবে না একেবারে ? মন থেকে সে কি রিণাকে চিরদিনের মতো মুছে ফেলেছে ?

অমিতের কথায় সুরঞ্জন কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

যে রিণা তাকে দুঃখের দিনে ছেড়ে চলে গেছে, তাকে কি সে তার আনন্দের দিনে ফিরে পেতে চায় না ?

সুরঞ্জন একটু ঘুরিয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করেঃ এরপর কি করবেন, ঠিক করেছেন ?

অমিত বলেঃ এরপর আমি ছবি আঁকতে বসবো। [illegible] ছবি আঁকবো। মেটিরিয়াল সব কিনে রেখেছি। [illegible] গোটা কতক এক্‌জিবিশান করবো। ছবি যদি বিক্রী হয়, তবে—

ঃ তবে ?

ঃ সেই টাকায় স্টুডিও খুলবো। চৌরঙ্গীতেই খুলবো ঠিক করেছি। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন তো ?

ঃ নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু আমাকে দিয়ে কতটুকু সাহায্য হবে আপনার ? যাকে দিয়ে আপনার সবচেয়ে বেশি সাহায্য হতো, তিনি যদি ফিরে আসতেন, সব দিক ভালো হতো।

অমিত সে কথায় কিছু না বলে জিজ্ঞেস করেঃ আপনি আজ অফিস যাবেন না, সুরঞ্জনবাবু ?

সুরঞ্জন অমিতের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

অমিত কি তাহলে আর রিণাকে চায় না? কিংবা কাজের ভিড়ে রিণাকে ভুলে থাকতে চায়? অমিতের মনটা সে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারলো না।

অমিত বলেঃ কিছু মনে করবেন না সুরঞ্জনবাবু, এবার আমাকে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। বেলা কিন্তু অনেক হয়ে গেছে।

সুরঞ্জন ভুলে গিয়েছিল, আজ তাকেও সকাল-সকাল অফিসে যেতে হবে। অফিসে গিয়ে আজ তাকে একটা রিপোর্ট তৈরী করতে হবে।

সে উঠে পড়ে। জিজ্ঞেস করেঃ রিণা দেবীর কথা, আপনি আর ভাবেন না? অমিত একটু থেমে বলেঃ ভাবি কিন্তু ভাবতে চাই না।

আবার কি ভেবে একটু থামলো সে। বললোঃ

ভেবে আর কি হবে বলুন? যাক্, আপনি আজ আসছেন তো?

সুরঞ্জন ভুলে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেঃ কোথায়?

সে কি? আপনি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?

সুরঞ্জন লজ্জিত হয়। বলেঃ আপনার এক্জিবিশানে? নিশ্চয়ই আসবো। অমিত হেসে বলেঃ ফুটপাত। মনে থাকে যেন। সেখানে আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পারবো না।

সুরঞ্জন হেসে বলেঃ আমাকে অভ্যর্থনা করতে হলে তো ওয়েলিংটন স্কোয়ার চাই। পাবেন ওয়েলিংটন স্কোয়ার?

অমিত বললোঃ তা অবিশ্যি পাবো না।

বলে সুরঞ্জনের সঙ্গে সেও হো হো করে হেসে ওঠে।

সুরঞ্জনকে ঘরে দেখতে না পেয়ে মিঠুয়া খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করেছিল। নিচে যোগমায়া দেবীকে জিজ্ঞেস করেছে, অঞ্জলি দেবীকে জিজ্ঞেস করেছে। কেউ বলতে পারে নি সুরঞ্জনের কথা। শেষে সুরঞ্জনকে অমিতের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে সে নিশ্চিন্ত

হলো। দাদাবাবু এমন তো কোনদিন করে না। আজকাল দাদাবাবুর মনটা যে ভালো নেই, তা মিঠুয়া বুঝতে পারে। কারণ, দাদাবাবু আজকাল আর তার পড়াশুনার কোন খোঁজ-খবরই নেয় না। কি যে হয়েছে দাদাবাবুর, কে জানে? যাক্, তাতে সেও যেন খানিকটা বেঁচে গেছে।

বিকেলে একটু রোদ্দুর পড়তে সুরঞ্জন বেরিয়ে পড়লো। অমিতের নিমন্ত্রণ নয় যদিও, অনুরোধ আছে। সেই অনুরোধ রক্ষা করতে বেরিয়ে পড়লো সে। অফিস থেকে বেরিয়ে বাসে উঠলো। ফুটপাতে অমিতের ছবির এক্‌জিবিশান। একেবারে দীনতম আয়োজন। সেখানে যেতে হলে পায়ে হেঁটে যাওয়া উচিত। এস্‌প্লানেডের ক্রশিং-এ এসে সে বাঁ দিকের ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগলো।

নিজের মনে হাঁটতে হাঁটতে সে এসে পার্ক স্ট্রীটের মোহানায় দাঁড়ালো। ওপারে একটা নির্জন ব-দ্বীপে গান্ধীজি লাঠি হাতে একা চলেছেন। এপারে একা ফুটপাতের ওপরে ছবি সাজিয়ে বসেছে অমিত। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে একরাশ কৌতুহলী জনতা।

সুরঞ্জন একটু দূর থেকে সেই দিকে চেয়ে দেখলো।

এ-পাশে শিল্পীর অসম্মান। ওপাশে নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত একক-পথিক গান্ধীজি। তাঁর পাজ্‌রা-বের-করা বুকটা এই দৃশ্যে কি ফেটে যাবে না? কিংবা তাঁর পাঁথরে-তৈরী বুক শিল্পীর এই দৈন্যে কি কখনো গলে যাবে না? পাথর হয়তো গলবে, কিন্তু তাঁর বুক গলবে না। কেননা শিল্পের মণ্ডন-কলা, শিল্পীর আনন্দ তাঁর কাছে অমিতব্যয়।

শান্তিনিকেতনের একটা ঐতিহাসিক ঘটনার কথা স্মরণ করে সুরঞ্জন মনে মনে হাসলো।

কিন্তু তিনি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে এক্‌লা চলার প্রেরণা অমিতকে দেন নি? অমিতকে সবাই ছেড়ে গেছে। কিন্তু সে ভেঙে পড়ে নি। যে একা, যে অসহায়, গান্ধীজি তাকে চিরকাল একা পথে চলার প্রেরণা দেবেন।

সুরঞ্জনকে দেখতে পেয়ে অমিত কি করবে প্রথমে ভেবে উঠতে পারলো না। এদিকে তখন গান্ধীজির পেছনে ময়দানের কোণে বিরাট একটা সূর্য ডুবছে।

অমিত নিজে উঠে দাঁড়িয়ে করুণ মুখে সুরঞ্জনের দিকে তার টুলটা এগিয়ে দিল।

ঃ কিছু যদি মনে না করেন—

সুরঞ্জন বলতে যাচ্ছিল ঃ থাক, দরকার নেই।

কিন্তু অমিতের মুখের দিকে চেয়ে সে তা বলতে পারলো না।

পরমুহূর্তেই তার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কথা মনে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে সে টুলটা টেনে নিয়ে বসে পড়লো।

সুরঞ্জন বসলে তার কানের কাছে মুখ এনে অমিত বললো ঃ অনেক কথা আছে। কিন্তু এখন বলা যাবে না।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো ঃ আবার কি হলো ?

ঃ হয়েছে অনেক কিছু। কিন্তু যা-ই হোক, আপনাকে না বলে কিছু করবো না।

ঃ আচ্ছা।

সুরঞ্জন হাসলো। কিন্তু মনে তার অনেকগুলি অসম্ভব অবাস্তব ঘটনা ভিড় করে এলো। অমিতের জীবনে আবার কোন্ নতুন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে ? সে কিছুই ভেবে উঠতে পারলো না। রিণা অথবা ছবি—কে তার জীবনে ঘটতে যাচ্ছে ? কিন্তু রিণা তো তাকেই ত্যাগ করে গেছে। সে তো রিণাকে ত্যাগ করেনি। রিণার চোখে নতুন স্বপ্ন, নতুন পরিকল্পনা। সে আবার আজ পেছন ফিরে তাকাবে কেন ? পেছন ফিরে তাকালেই তো সে আর এখন অমিতকে দেখতে পাবে না। সুপ্রিয় যে সেখানে একটা দুর্ভেদ্য আড়াল সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে।

অমিত বললো ঃ আপনার দেরি দেখে আমার মনে হচ্ছিল, আপনি বুঝি আজ আর এলেন না।

সুরঞ্জন বললো ঃ না। কথা যখন দিয়েছি—

ঃ কাল থেকে এক্‌জিবিশান বন্ধ রাখছি।

ঃ কেন?

ঃ অনেক তো হলো। আর কেন? আজও তিনখানা ছবি বিক্রী হয়েছে। একটা ফরেন এম্‌ব্যাসী থেকে কিনে নিয়ে গেল। এবার কয়েকদিন ছুটি নিয়ে ঘরে বসে ছবি আঁকবো, ঠিক করেছি।

সুরঞ্জন অমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সে তার মুখের আড়ালে মনটাকে খুঁজে পেল না। অমিত কেন ফুটপাত থেকে ঘরে ফিরে যেতে চায়? সে কি টাকা এবং সামান্য মাত্র স্বীকৃতি পেয়ে তার আত্মসম্মানে ফিরে এসেছে? অথবা অহংকার? কিংবা অন্য কিছু?

সুরঞ্জন চেয়ে দেখলো, গান্ধীজির চারদিকে অন্ধকার জড়ো হচ্ছে। সুরঞ্জন ভাবে, এ অন্ধকারের নাম কি? নাম যা-ই থাক, এ অন্ধকার বড়ো কুটিল।

অমিত একে একে ছবিগুলো খুলে গুছিয়ে নিল। পার্ক স্ট্রীটের একটা দোকান থেকে ভাড়া-করে আনা টুলটা ফেরৎ দিয়ে এলো। তারপর একটা ট্যাক্সী ডেকে তাতে উঠে বসলো।

ট্যাক্সীতে ঠিক মতো বসে অমিত বলে ঃ আজ রিণা এসেছিল।

ঃ তাই নাকি? কি ভেবে?

ঃ কাগজে কাল সে ছবি দেখেছে, খবরটাও পড়েছে। কাগজে জায়গাটারও উল্লেখ ছিল। আজ তাই এসে হাজির।

বোশেখ মাসের তুপুর। রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। রাস্তা গরম পিচের নদী হতে চায়। ফুটপাতেও বুক-ফাটা রোদ্দুর। কোথাও একটু ছায়া নেই। অমিত এক্‌জিবিশান সাজিয়ে বসে আছে।

রাস্তায় গাড়ির ভিড় নেই, ফুটপাতের পথিক যারা, তাদের সংখ্যাও নগণ্য। কেমন নির্জন, পরিত্যক্ত মনে হয় গ্রীষ্মের তুপুরের চৌরঙ্গী। অমিতের মতো প্রাণের দায় যাদের রয়েছে, তারাই ফুটপাতে রোদ্দুর সয়ে বসে থাকে।

অমিতের চোখ দুটো জ্বালা করছিল। তাই সে চোখ বুজে বসেছিল তখন। হঠাৎ রাস্তার ওপর থেকে এক ঝলক গরম বাতাস উঠে এলো। তাকে জড়িয়ে ধরলো, তার সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

ঃ কেমন আছো ?

যেন কতোদূর থেকে পিয়ানোর শব্দ ভেসে এলো। ভারি মিষ্টি।

কান আবার শুনতে চায় সেই গানের মতো কথাটুকু। সে চোখ খোলে না।

ঃ কথা বলছো না যে !

কিন্তু চোখ খুললে যদি পিয়ানোর সেই দূরাগত সঙ্গীত হারিয়ে যায় ? কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে অমিতের। দিবা স্বপ্ন। চোখ খুললে তার দিবাস্বপ্ন যদি ভেঙে যায় ?

চোখ খুলবে না সে ঠিক করেছিল। কানের ইচ্ছের চেয়ে চোখের ইচ্ছেই হলো বড়ো। চোখ খুলে তাকালো সে।

রিণা। এই কি সেই রিণা ? যে রিণা তার গত কয়েক বছরের দুঃখ-সুখের বখরা নিয়েছিল, যে তার নিজের ছিল, অথচ আজ তার কেউ নয়। সেই রিণা আজ আবার এসে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে নতুন এক নায়িকার মতো। রিণা তো তাকে ত্যাগ করে গেছে। আবার সে ফিরে এসে তাকে ডাকে কেন ? তাছাড়া দুপুরের তেজী রোদ্দুর। অভিসারের সময়ও এটা নয়। তবে রিণা পুরাতন অমিতের সাম্‌নে নতুন করে এসে দাঁড়ায় কেন ? সে তো তাদের সংসার ভেঙে দিয়ে গেছে। তবে আবার সে ফিরে আসে কেন ?

অমিতের মনটাকেও তো সে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়ে গেছে।

আবার সে ফিরে আসে কেন ?

অমিত তার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয়। চোখের সাম্‌নে দুলে ওঠে গ্রীষ্ম দুপুরের পোড়-খাওয়া প্রকাণ্ড একখানা

গড়ের মাঠ। তার ঘাসগুলির মুখ শুকিয়ে গেছে। তার গাছগুলির পাতা ঝরে গিয়ে কেমন যেন কংকাল-সার হয়ে গেছে। অথচ তাদেরই ডালে ডালে চলেছে বাউণ্ডুলে কাকদের গৃহরচনার আয়োজন। সাম্‌নে চৌরঙ্গী রোডের বুকটাও গলে যাচ্ছে।

অমিত একবার তাকিয়েছিল রিণার মুখের দিকে। আর সে তাকাতে পারে না। তাকাবার ইচ্ছেও নেই। একবার তাকিয়েই সে রিণার মুখটা এক নিমেষে দেখে নিয়েছে। রিণার মুখটা বড়ো শুকিয়ে গেছে—ঠিক ময়দানের ঘাসের মতো। সেদিনের রিণার মুখে যে আশ্চর্য স্নিগ্ধতা ছিল, তা আজ নির্মমভাবে অনুপস্থিত। দুচোখে তার আর আলোর গভীরতা নেই। রিণার মুখটাকে চিনতে তার আজ সত্যি কষ্ট হচ্ছিল।

অমিত আজ কি বলবে রিণাকে? কি কথা আজ তাকে বলা যেতে পারে? কোন কথাই যে আজ তার নেই। রিণা যে তার সব কথাগুলিকে গলা টিপে খুন করে রেখে গেছে। যে কথা আজ সে বলতে যায়, সে কথাটাই ব্যথায় আর্তনাদ করে ওঠে। কোন কথাই সে আজ বলতে পারে না।

রিণা বলে: কতো ছবি তুমি এঁকেছো! কী চমৎকার তোমার হাত হয়েছে!

রিণা হয়তো ভেবেছিল, অমিত তার কথায় তার দিকে চোখ তুলে তাকাবে। তার মনের বন্ধ ঘরের তালা খুলবে। কিন্তু রিণাকে হতাশ হতে হলো।

কিছুক্ষণ পরে অমিত চোখ তুলেই প্রশ্ন করলো: কেন?

প্রশ্নটা ঠিক মতো না বুঝেই রিণা বললো: কেমন আছো?

: কেন? কি দরকার?

রিণা বলে: দরকার তোমার না থাকতে পারে, আমার আছে।

অমিত কোন কথা খুঁজে পায় না।

রিণা বলে: আজকের কাগজে দেখলাম, তোমার ছবির রিভিউ বেরিয়েছে। আশ্চর্য প্রশংসা। পড়ে তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হলো

বড়ো। তুমি কেমন আছো জানতে এলাম। নিশ্চয়ই এবার সব ম্যানেজ করে নিয়েছো। আর নিশ্চয়ই আমাকে তোমার দরকার হবে না।

অমিতের ইচ্ছে করছিল, সে বলে যে সত্যি তাকে আর তার কোন দরকার নেই। কিন্তু কেন যেন সে ও কথা বলতেই পারলো না।

রিণা জিজ্ঞেস করেঃ কথা বলছো না কেন?

অমিত হঠাৎ বলে ওঠেঃ আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

রিণার মুখের দিকে অমিত তাকায় নি। যদি তাকাতো, সে হয়তো দেখতে পেত, তার দুটি চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। গলায়ও লেগেছিল সেই করুণ বিস্ময়ের আভাস।

রিণার গলাটা কেঁপে উঠেছিল। সে বললোঃ তাই নাকি? বেশ, তাহলে ঘৃণা করেই দুটি কথা বলো।

অমিত আবার হেরে গেল। কোন কথাই খুঁজে পেল না সে। আজ তার কাছে রিণার আসাটা এত অপ্রত্যাশিত যে সে কোন-মতেই প্রস্তুত ছিল না। এতদিন সে শুধু ছবির জগতে ডুবে ছিল। রিণার কথা কবে তার মন থেকে ফিকে হয়ে মুছে গিয়েছিল। তার মনে রিণার কোন কথা নেই। শুধু ছবি, কেবল ছবি। অথচ একদিন রিণা ছাড়া তার মন অন্য কিছু জানতো না। আজ রিণা নেই, সেখানে এসেছে ছবি। কে জানে, হয়তো রিণাই ছবি হয়ে গেছে।

পর মুহূর্তেই সে ভাবেঃ না না, তাকি সম্ভব? রিণা তো ছবির শত্রু। যতদিন রিণা ছিল, ততদিন সে একখানাও ছবি আঁকতে পারেনি। মনে পড়ে, একখানা ছবি সে এঁকেছিল। তাও রিণাই নষ্ট করে দিয়েছিল। ছবিটার ওপরে এক দোয়াত চাইনিজ্ ইঙ্ক ঢেলে দিয়েছিল সে। এখন অমিত বুঝতে শিখেছে, রিণা থাকলে ছবি হয় না। রিণা আবার জিজ্ঞেস করেঃ আমার কথা আর তোমার মনে পড়ে না?

কি বলবে অমিত? মনে পড়ে না বললে তো মিথ্যে বলা হয়। পড়ে বললেও তার মনের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে যায়। তাহলে কি

বলবে সে? আচ্ছা, যদি সে জিজ্ঞেস করেঃ আমার কথা কি তোমার মনে পড়ে? তাহলে কেমন হয়? তাহলে যে সে রিণার কাছে পুরোপুরি প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

না, সে কিছুই বলবে না।

রিণা তাকে ছাড়বে না। সে আবার জিজ্ঞেস করেঃ বলো, আমার কথা তোমার মনে পড়ে?

অমিত বলেঃ না। পড়ে না। আর কেনই বা পড়বে? তুমি আমার কে?

ঃ কেউ নয়? কিন্তু একদিন কেউ ছিলাম তো।

ঃ যেদিন ছিলে, সেদিন ছিলে। আজ তুমি কেউ নও। তোমার কথাও ভাবি না। ভাবতে—

একটা শক্ত কথা বলতে যাচ্ছিল অমিত। কিন্তু বলতে পারলো না। রিণা বলেঃ থেমে গেলে কেন? বলো না। আমার কথা ভাবতে?

অমিত দাঁতে দাঁত চেপে রাখে।

রিণা বলেঃ আমার কথা ভাবতেও আজ তোমার ঘৃণা হয়।

অমিত বলেঃ হ্যাঁ, ঘৃণা হয়। কেন হবে না?

রিণা আর কোন কথা বলতে পারে না। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। ফুটপাতের ধারে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে তাকায়। ফুটপাতের বাতাসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস রাখে।

অমিতের চোখে বিশাল গড়ের মাঠ কাঁপতে থাকে।

রিণা অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করেঃ খোকন কেমন আছে?

ঃ কোন খবর রাখি না।

অমিত যেন রিণার দিকে কথাটা ছুঁড়ে দেয়।

ঃ খোকনের জন্যে মনটা বড়ো খারাপ লাগে।

শুধু খোকনের জন্যে? অমিত মনে মনে বলেঃ শুধু খোকনের জন্যেই তোমার মনটা খারাপ হয়। আমার জন্যে তোমার মন খারাপ হয় না? হবেই বা কেন? সুপ্রিয় যে আজ তোমার সব।

অমিত অন্যদিকে চেয়েছিল। তবু সে বুঝতে পারে, রিণা রুমাল দিয়ে তার চোখ মুছলো।

ঃ খোকনকে আমাকে দেবে?

তার কান্না তার কথায় স্পষ্ট হলো।

অমিত বলেঃ খোকনকে দেবার মালিক আমি নই। তাকে দেবার ক্ষমতাও আমার নেই।

ঃ তুমি তার বাবা।

ঃ আর তুমি তার মা।

রিণা এবার জোরে কেঁদে ফেললোঃ না, আমি তার কেউ নই।

ঃ তাহলে তাকে চেয়োনা।

অমিত একটু থামে। তারপর বলেঃ তুমি আমাকে অনেক দিন খাইয়েছিলে। তোমার কাছে আমি ঋণী। খোকনকে ছাড়া তুমি অন্য কিছু আমাকে চাইতে পারো। আমার যদি সাধ্য হয়, তা দিয়ে আমি তোমার ঋণ শোধ করবো।

রিণা জিজ্ঞেস করেঃ সত্যি বলছো?

ঃ সত্যি।

রিণা একটু চুপ করে থাকে। বোধ হয়, সে ভাবে অমিতের কাছে সে কি চাইবে আজ। তারপর বলেঃ তাহলে দাও—

ঃ কি?

ঃ একটা কথা।

রিণা আজ তার কাছে একটা কথা শুধু চায়? বেশ, রিণাকে সে কথা দেবে।

ঃ কি কথা, বলো—

ঃ তুমি আজ থেকে চৌরঙ্গী রোডে তোমার ছবির এক্‌জিবিশান করতে পারবে না। বলো, কথা দাও—

অমিতকে শেষে এই কথা দিতে হবে? তাকে আজ থেকে চৌরঙ্গী রোড থেকে বিদায় নিতে হবে? কিন্তু এই চৌরঙ্গী রোড যে তাকে সুনাম এনে দিয়েছে, টাকা এনে দিয়েছে। রিণার কথায়

তাকে আজ থেকে ত্যাগ করতে হবে? আর সে যে এই চৌরঙ্গী রোডেই তার স্টুডিও খোলার স্বপ্ন দেখে এসেছে কতোকাল। রিণাও তো জানে, তার সেই ব্যর্থ কল্পনার কথা। আজ সাফল্যের দিনে সে তার সেই নিঃসঙ্গ কল্পনাটিকে কেড়ে নিতে চায়? না, তেমন কথা সে দিতে পারবে না।

রিণা বলে: চুপ করে রইলে যে। কথা দাও—

অমিত বলে: তেমন কথা আমি দিতে পারবো না।

: কথা তোমাকে দিতেই হবে। চৌরঙ্গী রোডে আমার অফিস। এখানে কিছুতেই তোমার এক্‌জিবিশান করা চলবে না।

: চৌরঙ্গী রোডে তোমার অফিস তো তাতে আমার কি?

: তোমার কিছু নয়, কিন্তু আমার সব। আমার মান, মর্যাদা, ইজ্জৎ—সব এইখানেই। অফিসের লোকেরা এই নিয়ে হাসাহাসি করবে। তাতে আমার ভীষণ খারাপ লাগবে।

: সুপ্রিয় আর তুমি একসঙ্গে থাকো, তা নিয়ে কেউ হাসাহাসি করে না? তাতে তোমার খারাপ লাগে না?

রাগে রিণা দাঁত দিয়ে তার ঠোঁটটা চেপে ধরলো। প্রায় চিৎকার করে উঠতে সে যাচ্ছিল।

এমন সময় অমিত চেয়ে দেখলো, একটা লোক বাস থেকে লাফ দিয়ে নামলো! অমিতের চিনতে কষ্ট হলো না যে লোকটি, সুপ্রিয়।

: এদিকে চলে এসেছ, জানতেই পারি নি। চেয়ারটা খালি দেখেই বুঝলাম, আজকের কাগজের খবর তোমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। কি ব্যাপার, বলো তো? এভাবে আমাকে না বলে?

রিণা সুপ্রিয়র কথার কোন জবাবই দিল না। সে দুচোখে আগুন নিয়ে অমিতের দিকে চেয়ে রইলো। দাঁতে দাঁত চেপে বললো: অসভ্য, ইতর কোথাকার! কেন আমাকে এভাবে জ্বালাচ্ছো?

সুপ্রিয় আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে আসে। বলে: স্কাউণ্ড্রেলটা তোমাকে কি বলেছে, শুনি? তুমি সরে যাও। আমি দেখে নিচ্ছি।

রিণা হাত বাড়িয়ে সুপ্রিয়কে আটকায়। সুপ্রিয় আর এগোতে

পারে না। রিণা বলে ঃ কলকাতায় এত জায়গা থাকতে এত রাস্তা থাকতে, তুমি কেন চৌরঙ্গী রোডে বসেছ, তা কি আমি জানি না? আমি তোমাকে এই শেষবারের মত বলে যাচ্ছি, অনেক জ্বালিয়েছ, আর জ্বালিয়োনা।

সুপ্রিয়র হাতে একটা টান দিয়ে রিণা চলতে থাকে। সুপ্রিয় রিণার সঙ্গে চলে যায়। যাবার সময় সুপ্রিয় অমিতের দিকে তার দুচোখের অগ্নি গোলক দুটি নিক্ষেপ করে যায়।

অমিত প্রথম দিকে ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। এক্ষেত্রে কি করতে হবে, তাও সে ঠিক করে উঠতে পারে নি। ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারলো, তখন সেও উঠে দাঁড়িয়েছিল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল, সে সুপ্রিয়র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলো, তার সুনাম, তার নতুন প্রতিষ্ঠা—সবই যে তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। সুপ্রিয়র কিছুই যাবে না। ক্ষতি হবে তারই।

ততক্ষণে রিণা সুপ্রিয়কে নিয়ে চলে গেছে।

অমিত চারদিকে তাকায়। ভাগ্যিস্, রাস্তায় লোকজন ছিল না। থাকলে কি ভাবতো সবাই।

কিন্তু রিণাই বা কেন এসব করলো? সুপ্রিয়ও তাকে কি ভেবেছে, কি জানি?

অমিত নিজের মনে হাসলো ঃ আমি অসভ্য, আমি ইতর, আমি স্কাউণ্ড্রেল!

ট্যাক্সী থেকে নামতে নামতে অমিত বলে ঃ সুরঞ্জন বাবু, ঠিক করলাম, কাল থেকে চৌরঙ্গী রোডে আর আমি ছবির এক্জিবিশান করবো না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুরঞ্জন রিণার কথাই ভাবছিল

রিণা শেষ পর্যন্ত অমিতকে চৌরঙ্গী রোডে তার ছবির এক্জিবিশান করতে বারণ করেছে। অমিত চৌরঙ্গী রোডে ছবির এক্জিবিশান করলে রিণার অসুবিধে হবে বৈ কি! চৌরঙ্গী রোডে তার অফিস। তাকে ঐ ফুটপাত ধরে সুপ্রিয়র সঙ্গে চলাফেরা করতে হয়। তার চলাফেরার পথের ধারে তার অতীত জীবনের স্মৃতি পসরা সাজিয়ে বসে থাকবে, সেটা তার সহ্য হবে না। সহ্য না হবারই কথা। তার চোখ এখন সাম্‌নের দিকে। পেছনের দিকে ফিরে তাকাবার আর ইচ্ছে নেই।

তার জীবনের যত গ্লানি, সব পেছনেই পড়ে থাক।

সে তার জীবন থেকে অমিতকে মুছে ফেলতে চায়। পুরাতনকে মুছে ফেলে নতুনের প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিংবা নতুনকে মুছে ফেলে পুরাতনের প্রতিষ্ঠা করতে চায়? সুপ্রিয় তো তার জীবনে নতুন নয়, পুরাতন।

তবে যে রিণা আজ অমিতের কুশল-বার্তা জিজ্ঞেস করেছিল? তা কি শুধু অভিনয়? খোকনের জন্যে তার মন কি সত্যি খারাপ হয়? সে কি এখনও অমিতকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি? এখনও কি খোকন তার মন জুড়ে রয়েছে? অমিত তাকে কটা বছর ঘিরে রেখেছিল। অমিতের জন্যে তার টান থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু খোকনের জন্যে তো তার টান থাকার কথা নয়। রিণা খোকনের মা হলেও মায়ের কর্তব্য করে নি। মায়ের কর্তব্যের মধ্যেই তো মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। সেই কর্তব্যের মধ্যে ছেলে মাকে খুঁজে পায়।

কিন্তু খোকনের ক্ষেত্রে রিণা মা হয়েও দূরবর্তিনী।

খোকন রিণার কাছ থেকে কিছু পায় নি। সুতরাং খোকনের জন্যে রিণার মন খারাপ হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না।

তাহলে তার কান্না, তার চোখের জল—সবই মিথ্যা? সবই অভিনয়? সত্যি, রিণা এত জানে?

অমিতের কাছ থেকে একটা কথা আদায় করবার জন্যে, তাকে

চৌরঙ্গী রোড থেকে বিদায় করবার জন্যে চমৎকার অভিনয় করেছে রিণা।

অমিতও তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছে। সে বলেছে, সে রিণার কথা রাখবে। সে আর চৌরঙ্গী রোডে তার ছবির এক্‌জিবিশান করবে না।

হয়তো অমিত চায়, রিণা সুখী হোক। সে শুধু তাকে শান্তিতে এখন ছবি এঁকে যেতে দিক।

না, সে আর কিছু চায় না।

রিণাকে সে আর চায় না। যে তার বুক ভেঙে দিয়ে গেছে, তাকে আর সে তার বুকে ফিরিয়ে নেবার কথা কল্পনাই করতে পারে না। রিণা এখন সুপ্রিয়র বক্ষ-লগ্না। সে আজ সুপ্রিয়র তৃষ্ণা মেটাক্। তাকে আর সে চায় না। সুপ্রিয়কে নিয়ে সে এখন সুখী হোক, শান্তিতে থাকুক।

তাই বোধহয় অমিত রিণার অনুরোধ রাখবে, ঠিক করেছে। বোধহয় সে এখন রিণার কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়। রিণা কাছে এলে যে তার ছবি দূরে সরে যায়। রিণা দূরেই থাক। তাকে সে আর কাছে পেতে চায় না।

কিন্তু যদি রিণার কান্না সত্যি হয়? যদি তার চোখের জল আন্তরিক হয়? তাহলে? তাহলে কি হবে?

তাহলেও অমিত রিণার দিকে ফিরেও তাকাবে না। রিণার জন্যে অমিতের চোখে আর ভালোবাসা নেই। আছে শুধু ঘৃণা।

রিণা সেই ঘৃণা নিয়ে কি করবে?

অমিত হয়তো আজ রিণাকে বলতে পারতো: আমি তোমাকে এখন থেকে শুধু ঘৃণাই দিতে পারবো, রিণা।

তার উত্তরে রিণা তাকে কি বলতো? হয়তো বলতো: বেশ, তাই দিও। কিংবা বলতো: তার বেশি যে নেবার ক্ষমতা আমার নেই।

সুরঞ্জন এ সমস্ত খাপছাড়া কথা মিছিমিছি ভাবছে কেন?

বড়ো গরম পড়েছে কলকাতায়। পাখা চালিয়েও অনেক রাত পর্যন্ত চোখে ঘুম আসে না তার। অনেক চেষ্টা করলো সে। ঘুম কিছুতেই আসছে না।

অমিতকে সে জিজ্ঞেস করেছিল : চৌরঙ্গীতে আপনার স্টুডিও খোলার তাহলে কি করলেন ?

অমিত বলেছিল : সে এখন তোলা থাক। আরো কিছু ছবি আঁকি, বুঝলেন ?

: বেশ। তাহলে ও পাড়ায় আপনার স্টুডিওর জন্যে এখন ঘর খুঁজবো না ?

: কি করি বলুন তো ? রিণা যে এত করে আমাকে বলে গেল—

অমিত কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

তারপর হঠাৎ বলে উঠলো : না, আপনি ঘর খুঁজবেন। আমি চৌরঙ্গী রোডেই স্টুডিও খুলবো। রিণা আমার কে ? কেন আমি তার কথা রাখতে যাবো ? রিণার জন্যে আমার কোন দুর্বলতাই নেই।

সুরঞ্জনের চোখে ঘুম নেই। কিন্তু মিঠুয়া মেঝের ওপর দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছে। ঘুমের মধ্যে তার দেহাতি-ভাষায় কি যেন সে বিড় বিড় করে বললো, সুরঞ্জন বুঝতে পারলো না। শুধু মনে মনে হাসলো সে।

মিঠুয়া বাংলাভাষা বেশ ভাল করেই শিখেছে। সে বাংলায় অনর্গল কথা বলে যেতে পারে। মুখে একটুও আট্‌কায় না তার। কিন্তু সে তার দেহাতি ভাষা একেবারে ভুলতে পারে নি। যে ভাষায় তার মুখ ফুটেছিল, তা বুক থেকে একেবারে মুছে যায় নি। জেগে যখন থাকে, তখন তাকে তার শেখা-ভাষায় কথা বলতে হয়। কিন্তু ঘুমিয়ে যখন সে পড়ে, তখন তার দেহাতি বেদনা বুকের ভেতর নিজের মনে গুঁড়ি মেরে হাঁটতে থাকে।

অন্ধকারে সুরঞ্জন নিজের মনে হাসে।

অতীত সংস্কারকে বোধ হয় মন থেকে কোনকালেই মুছে ফেলা যায় না। কেউ কোনদিন পারে নি। কেউ পারেও না।

অমিতও পারবে না।

অমিত বলেছে, সে রিণাকে তার মন থেকে মুছে ফেলেছে। কিন্তু মুছে ফেলা এতই কি সহজ ?

ঘুরে ফিরে সুরঞ্জন আবার অমিত-রিণার কথায় ফিরে আসে। হয়তো এই রাতে রিণা সুপ্রিয়র বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। নিঃসঙ্গ বিছানায় রিণার স্মৃতিকে বুকে নিয়ে ঘুমুতে অমিতেরও হয়তো কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু সুরঞ্জনের চোখে ঘুম নেই কেন ? অন্যের বেদনা সে কেন নিজের মধ্যে টেনে আনে ? অন্যের ব্যথায় কেন সে জ্বলে পুড়ে মরে ?

কোন মানে হয় না তার অন্যের বেদনা চুরি করার।

না, সে আর অন্যের বেদনায় নিজের বুক পোড়াবে না।

সে নিজের বেদনায় ফিরে আসে। কিন্তু কি তার বেদনা ?

সে নিজেই জানে না।

সে অনেক খোঁজে। বুকের গভীরে চেয়ে ছাখে। না, কিছুই নেই। কেউ নেই। যা ছিল, সব হারিয়ে গেছে। ছোটবেলার বিরামপুরের কথা তার মনে পড়ে। একটা নিমগাছে ছুটো শালিক বাসা বেঁধেছিল। কিছুদিন পরে শালিক ছুটো কোথায় উড়ে পালিয়ে গেল। আর ফিরে এলো না। করুণ বাসাটা নিমগাছটার বুকে একটা পুরাতন ক্ষতের মতো বহুদিন ছিল।

ইস্কুল যাবার পথে সে সেই বাসাটাকে কতবার দেখেছে। তেমনি একটা করুণ বাসা তার বুকের মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সে বাসায় শালিকেরা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। কোনো ভোরে সে বাসার আর ঘুম ভাঙবে না।

রাস্তায় একটা নেড়ি কুকুর ডেকে উঠলো। খস্ খস্ করে অনেকগুলো গা-শিরশির-করা পায়ের শব্দ শোনা গেল। বোধ হয় ইঁদুরদের নিশি-অভিসার চলেছে বাইরের অন্ধকার গলিতে।

এর পর বাদুরের ডানার শব্দ শোনা যাবে। তারপর শোনা যাবে কয়েকটা ইঁদুরের মুমূর্ষু আর্তনাদ।

এ সব সুরঞ্জনের কাছে ছোটবেলার মুখস্ত-করা নাম্‌তার মতো।

রাতের এই অন্ধকারে যখন গরমের অস্বস্তিতে চোখে ঘুম আসে না, তখন মনটা কেবলি নিজেকেই খোঁজে।

সুরঞ্জনও নিজের হৃদয় খুঁড়ে তার বেদনাকে খুঁজলো অনেক।

ধীরে ধীরে সেই অন্ধকারে ভেসে ওঠে একটি সুন্দর বিষণ্ণ মুখ।

সে মুখ কেতকীর।

কোথায় যেন সে তাকে প্রথম দেখেছিল, ঠিক মনে করতে পারে না। তার কাছে সে মুখের একটা তীব্র আকুতি আছে। তার কথা মনে পড়লেই সে যেন কেমন হয়ে যায়। যতদিন কেতকী এ বাড়িতে ছিল, ততদিন সে তার নিজের বেদনাকে চিনতে পারে নি। কেতকী চলে যাবার পর থেকেই তার মনে ভালোবাসার জন্ম।

সে যতদিন ছিল, সুরঞ্জন জানতো না ভালোবাসা কাকে বলে। শেষে ভালোবাসা এলো, কিন্তু বড়ো দেরিতে। সেই সঙ্গে এলো দুঃখ।

একটা বিরাট্ শূন্যতা রেখে কেতকী নিশীথের সঙ্গে কোথায় চলে গেছে।

সে কি এই কলকাতায় আছে? কিংবা অন্য কোথাও? নাকি বিদিশায় অথবা শ্রাবস্তীতে?

তার কাছে বিদিশা, শ্রাবস্তী, কলকাতা—সব একাকার হয়ে যায়।

সুরঞ্জন ভাবে। এবার সে:নিজেকে নিয়েই ভাবে।

জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট পেয়েছে সে। তার মতো এত কম বয়েসে এমন করে বাস্তবের সঙ্গে ক জনের পরিচয় ঘটেছে?

তবু সে এত রোম্যান্টিক হলো কি করে?

যখন সে রিপোর্ট লেখে কিংবা সমাজ বা ইতিহাসের কথা ভাবে, তখন সে অত্যন্ত বাস্তব। জীবনের প্রতিটি অলিগলির খবর রাখে সে।

মানুষের কত দোষ ত্রুটি, কত পতন-স্খলন, বাঁচার কত সংগ্রাম—অনেক কিছুই দেখেছে সে। তা সত্ত্বেও সে এত রোম্যান্টিক কেন? ক্ষুধা তৃষ্ণার মতো ভালোবাসাও তো একটা জৈব ব্যাপার। তবে সে তাকে এভাবে ভাবে কেন? বুকের মধ্যে একটা আশ্চর্য অনুভব। একটা দীর্ঘস্থায়ী বেদনা।

এখন সে এই বেদনা নিয়ে কি করবে?

না। তার চোখে ঘুম আর আসবে না।

সে বিছানায় উঠে বসলো। কি ভেবে উঠে আলো জ্বাললো। কলম আর লেখার প্যাড্ নিয়ে বসলো। রিপোর্টটা লিখে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

প্যাড্টা টেনে এনে লিখতে আরম্ভ করলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বেশ কয়েক লাইন লিখেও ফেললো। তারপর কি লিখবে ভাবছিল সে। নোট বুকের পাতায় টুকে-রাখা পয়েন্টগুলোর ওপর কিছুক্ষণের জন্যে চোখ বুলিয়ে নেয়।

এমন সময় তার ঘরের দরজায় একটা ভয়ার্ত করাঘাত শোনা গেল।

এত রাতে তার ঘরের দরজায় কে আঘাত করে? কার কি দরকার থাকতে পারে তার সঙ্গে? মুহূর্তের মধ্যে কতকগুলো অসংগত এবং অসংলগ্ন ভাবনা তার মনের ভেতর দিয়ে কয়েকটা তির্যক আলোর রেখা এঁকে দিয়ে যায়।

কে আসতে পারে এত রাতে?

এই গরমের অসহ্য রাতে নিচের বুনো উচ্ছৃঙ্খলতা কি আরো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে?

সে ভাবছিল যূথিকার কথা। যূথিকা কি আজ রাতে হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছে?

নাকি নিচের অঞ্জলি দেবী?

এই রাতে কি তাঁর নিশিকান্তবাবুর কাছে দেশোদ্ধারের কাজে যেতে হবে? একা যেতে হয়তো ভয় করছে তাঁর। এত রাতে

ডোভার লেনে তাঁকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবার জন্যে সুরঞ্জনকে আজ আবার দরকার হয়ে পড়েছে ?

কিংবা কেতকী ?

কেতকী কেন আসবে ? সে তো অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। নিশীথের সঙ্গে সে এই আঁধারের সমুদ্র ডুব-সাঁতারে পার হয়ে যাবে বলে কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

হয়তো আজ এই রাতে সে চুপি চুপি ফিরে এসেছে। এ বাড়ির সব ঘরে গেছে সে। কেউ হয়তো দরজা খোলে নি। সুরঞ্জনের ওপর তার গভীর বিশ্বাস। কেউ না খুলুক, সুরঞ্জন নিশ্চয়ই তার ঘরের দরজা খুলে দেবে। সে হয়তো তাই সব দরজা থেকে ঘুরে সুরঞ্জনের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সুরঞ্জন কি দরজা খুলবে না ? তবে সে এত দেরি করছে কেন ? সুরঞ্জন মনে মনে ভাবে, কেতকীই বা আসবে কেন ?

না, কেতকী নিশ্চয়ই নয়।

তবে কে ?

আবার দরজাটার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠলো।

সুরঞ্জন উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

একি ? এ যে হাসি-ঝি। ছবি বৌদির ঘরে কাজ করে। কিন্তু সেই বা এসে এত রাতে দরজায় ধাক্কা দেবে কেন ?

সুরঞ্জন প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

ছবি বৌদির সঙ্গে তার এমনি আলাপ হয়েছে। ছবি বৌদি চা করে একবার তাকে খাইয়েছে। সেই সূত্রে হাসি-ঝি তাকে চেনে। সেও হাসিকে চেনে। কিন্তু সুরঞ্জন ছবি বৌদির সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে, তা বোধ হয় নবেন্দুবাবুর যে বিশেষ অভিপ্রেত নয়, তা নবেন্দুবাবুর ব্যবহারে বেশ বোঝা গেছে। সুরঞ্জন তাই ওঁদের নিচে ওঠা-নামার সময় দরজা বন্ধ করে রাখে।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে হাসি ভয়ার্ত অথচ চাপা গলায় ককিয়ে ওঠে : দাদাবাবু গো—

ঃ কি ? কি হয়েছে, হাসি ?

ঃ সর্বনাশ হয়েছে, দাদাবাবু—

সুরঞ্জন বলে ঃ কি হয়েছে বলোনা।

হাসির চোখে মুখে দারুণ ভয়, ভীষণ উৎকণ্ঠা। গলাটা ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। থুথু গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে হাসি বললো ঃ বৌদি কেমন করছে, একবার দেখবে এসোনা।

সুরঞ্জন কি করবে ভাবছিল। বোধহয় একটু ইতস্তত করছিল সে। বিশেষ করে নবেন্দুবাবুকে তার চিন্‌তে বাকি নেই। শেষে ছবি বৌদির উপকার করতে গিয়ে তাকেই বিপদে ফেলা কি ঠিক হবে ?

হাসি বলে ঃ দাদাবাবু বাড়ি নেই। কদিন হলো কোথায় গেছে, ফেরার নাম নেই। এদিকে বৌদি কি খেয়ে কেমন করছে। এত রাত্তিরে আমি কোথায় যাই, কাকে ডাকি। তোমার ঘরেই দেখি, আলো জ্বলছে। একবার চলোনা দাদাবাবু—

হাসির সঙ্গে সুরঞ্জন ছবি বৌদির ফ্ল্যাটে গেল।

স্কুটারে চড়ে ছবি বৌদি নবেন্দুবাবুর সঙ্গে রোজ বেড়াতে যান। তাঁদের সুখ-সৌভাগ্যে সবাই ঈর্ষা করে। ছবি বৌদির দিকে তাকিয়ে ওপাশের রিণা রায় আর নিচের কেতকী নিজের নিজের স্বপ্ন রচনা করেছে। সেই ছবি বৌদির আজ আবার কি হলো ?

সুরঞ্জন ছবি বৌদির ঘরে ঢুকে দেখলো, ঘরময় মদের গন্ধ। একটা বিলিতি বোতল মেঝের ওপর পড়ে আছে। আর তার পাশেই বিশৃঙ্খল বেশবাসে একরাশ বমির মধ্যে টান হয়ে শুয়ে আছেন ছবি বৌদি।

হাসি ছবি বৌদির অসাড় দেহটাকে কাপড় দিয়ে ঠিক মতো ঢেকে দেয়।

সুরঞ্জন চেয়ে দেখে, ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো পড়ে রয়েছে। একপাশে বিছানা। কিন্তু বিছানায় বালিশ নেই। বালিশগুলো মাটিতেই গড়াগড়ি খাচ্ছে। ফুলদানি, জল আর রজনীগন্ধার

স্টিক্‌গুলো—ঠিক ছবি বৌদির মতোই উচ্ছৃঙ্খল ভাবে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে আছে। আর সেই সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র ভাঙা কাঁচের টুক্‌রো।

যে গেলাসে ছবি বৌদি মদ খেয়েছিলেন, নেশার ঘোরে ওটা তিনি ভেঙেই ফেলেছেন। শুধু মদের গেলাসটাই নয়, নেশার ঘোরে বালিশগুলো তিনি ঘরময় ছুঁড়ে মেরেছেন। ফুলদানি, রজনীগন্ধার স্টিক্‌—সব তিনিই ছড়িয়েছেন ঘরময়।

ছবি বৌদি মদ খেয়েছেন?

সুরঞ্জন দেখলো, একটা বোতলের অনেকখানি মদ তিনি খেয়ে ফেলেছেন। মেঝে থেকে গড়ানো বোতলটা তুলে নিয়ে সে দেখে, ওতে খানিকটা মদ অবশ্যি তখনো রয়েছে। কিন্তু মেঝেয় গড়িয়ে পড়েছে অনেকখানি। বোধ হয় বোতলটাকে নিয়েও ছোঁড়াছুঁড়ি করেছিলেন ছবি বৌদি।

কিন্তু ছবি বৌদি মদ খেয়েছেন কেন?

এমন সুখী, সন্তুষ্ট জীবন তাঁদের। তবু ছবি বৌদি মদ খেয়েছেন? কিন্তু কেন? ছবি বৌদি কি মদ খেতে অভ্যস্ত? তিনি অভ্যস্ত না-ও হতে পারেন। নবেন্দুবাবু হয়তো মদ খেয়ে থাকেন। তা নইলে বাড়িতে মদের বোতল আসে কোথা থেকে?

আজ নবেন্দুবাবু বাড়ি নেই। নবেন্দুবাবুর অনুপস্থিতির সুযোগে ছবি বৌদি মদ খেলেন কেন? বোধহয় একটু বেশি করেই খেয়েছেন। তাই তিনি টাল সাম্‌লাতে পারেন নি!

কিন্তু হঠাৎ মদের বোতলে ছবি বৌদির হাত পড়লো কেন? তাঁর মনের কোণে কোনো গোপন বেদনা আজ মোচড় খেয়ে হঠাৎ চাঙা হয়ে ওঠেনি তো? হয়তো উঠেছিল। ছবি বৌদি হয়তো তাকে মদ খাইয়ে অসাড় করে দিয়েছেন আজ। কিন্তু কি সেই বেদনা?

না, সুরঞ্জন তা জানে না।

হাসি বলে: আজ সকাল থেকে বৌদি রাগ করে কিছু খায় নি।

: তাই নাকি?

খালি পেটে মদ খেয়ে ছবি বৌদি কি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন? তা যাই হোক।

মদ খেয়েছেন তাই রক্ষে। অন্য কিছু খেলে তো আর কথাই ছিল না। ছবি বৌদি বোধহয় হাতের কাছে মদ ছাড়া আর কিছুই পান নি। তাই নির্জলা মদের ওপর দিয়ে কাজ সারতে চেয়েছিলেন।

এখন তো ডাক্তার ডাকা দরকার। সুরঞ্জন ভাবে, কিন্তু ডাক্তার ডাকাও কি ঠিক হবে? ডাক্তার এসেই বা কি দেখবে? দেখবে, গৃহস্থ ঘরের এক বউ মদ খেয়ে মাটিতে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। তা কি ছবি বৌদির পক্ষে সম্মানের হবে? যা করলে ছবি বৌদির মান-মর্যাদার হানি হয়, এমন কিছু করা তার ঠিক হবে না। তাছাড়া এত রাতে ডাক্তারই বা সে পাবে কোথায়? ডাক্তার ডাকতে গেলে যে ব্যাপারটা আরো জানাজানি হয়ে পাড়ায় একটা ঢি ঢি পড়ে যাবে। তাহলে কাল আর ছবি বৌদি এ বাড়িতে মুখ দেখাতে পারবে না। পাড়ার লোকেরা ছবি বৌদির দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসবে।

তার উপকার করতে এসে এত বড় অপকার সে করতে পারবে না।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলোঃ তোমাদের বাথরুমে জল আছে, হাসি?

ঃ আছে, দাদাবাবু।

ঃ তাহলে বৌদিকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ভালো করে জল ঢেলে স্নান করিয়ে দাও।

সুরঞ্জনের কথামতো হাসি বাথরুমে একটা হাতল-দেওয়া চেয়ার রেখে এলো। তারপর দুজনে মিলে ধরাধরি করে ছবি বৌদিকে বাথরুমে নিয়ে গেল। চেয়ারে তাকে বসিয়ে রেখে সুরঞ্জন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। তখনও ছবি বৌদি মাথা তুলে সোজা হয়ে বসতে পারছেন না।

সুরঞ্জন কোথায় যেন শুনেছিল, ভালো করে স্নান করিয়ে দিলে মদের নেশা অনেকখানি কেটে যায়। সুরঞ্জন বাইরে অন্ধকার

বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনতে পায় বাথরুমে জল ঢালার শব্দ। হাসি ছবি বৌদিকে ভালো করে স্নান করিয়ে দিচ্ছে।

জল ঢালার শব্দ কিছুক্ষণ পরে বন্ধ হয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পরে বাথরুমের দরজা খুলে হাসি বেরিয়ে এলো। ফিস্ ফিস্ করে সুরঞ্জনের কানের কাছে বললো : স্নান করিয়ে দিয়েছি, দাদাবাবু।

হাসি সব বুঝতে পেরেছে। কিছুই গোপন রইল না তার কাছে। বাড়ির ঝি-চাকরের কাছে এই সব গোপন কথা জানাজানি হওয়া যে মোটেই নিরাপদ নয়, তা সুরঞ্জন জানে। তার চেয়েও বড়ো কথা হলো, ব্যাপারটা তার কাছে বড়ো খারাপ লাগছিল।

হাসি অন্ধকারে সুরঞ্জনের মুখের দিকে তাকালো।

সুরঞ্জন বললো : এবার তাড়াতাড়ি ঘরটা পরিষ্কার করে ফেল, দেখি।

হাসি ঘর পরিষ্কার করতে লেগে যায়।

সুরঞ্জন বাথরুমের দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু ছবি বৌদিকে এ কী অবস্থায় রেখে গেছে হাসি। তার গায়ে এক টুক্‌রোও কাপড় নেই। লজ্জা নিবারণের এতটুকু ব্যবস্থাও করে যায় নি সে।

হাসি ঘরটা পরিষ্কার করলো। বিছানাটা ঠিক মতো পেতে দিল। সুরঞ্জন তাকে বললো : শুক্‌নো জামা কাপড় বাথরুমে নিয়ে যাও, হাসি।

ছবি বৌদিকে হাসি শুক্‌নো জামাকাপড় পরিয়ে দেয়! তারপর দুজনে ওকে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। একটু গরম দুধও খাইয়ে দেওয়া হলো ওকে। পাখা চালিয়ে দেওয়া হলো ফুল্ স্পীডে।

কিছুক্ষণ পরে ছবি বৌদি চেঁচিয়ে উঠলেন : কোথায় যাবে? নীলিমার কাছে? যাও দেখি, কেমন করে যাবে। আমি তোমাকে যেতে দেবো না। কিছুতেই না—

ছবি বৌদির গলায় নেশার ঘোর। কথায় তীব্র শাসনের সুর। সুরঞ্জন হাসিকে ঘরের দরজা-জানলাগুলো সব বন্ধ করে দিতে বললো।

সুরঞ্জন জানে, ছবি বৌদিকে এখন হয়তো কিছুতেই চুপ করানো যাবে না। থামবেন না তিনি কিছুতেই।

কিন্তু এভাবে চেঁচালে যে সব জানাজানি হয়ে যাবে। কাল তাহলে ছবি বৌদি সকলের কাছে মুখ দেখাবেন কি করে?

হাসি দরজা-জানলা বন্ধ করে দিল।

ছবি বৌদি আবার নতুন করে চিৎকার আরম্ভ করলেন।

ঃ এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে তুমি এভাবে আমার সর্বনাশ করলে কেন? আমি তো বেশ ছিলাম। স্বামী সংসার নিয়ে সুখে ছিলাম। তুমি ওখান থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এলে কেন? যদি নিয়ে এলে আমাকে আবার ঘর বাঁধতে দিলে না কেন? তাই তুমি এতদিন রেজেষ্ট্রী করতে চাও নি? আজ অফিসের স্টেনো নীলিমা তোমার সব হলো। আর আমি যে ঘর-সংসার ফেলে তোমার সঙ্গে পালিয়ে এলাম, আজ আমি তোমার কেউ নয়, না? কেন তুমি আমাকে ভুলিয়ে এখানে নিয়ে এলে? কেন, কেন?

ছবি বৌদি কপাল চাপ্‌ড়াতে লাগলেন।

সুরঞ্জন ভাবে, আর কি তার এখানে থাকা ঠিক? যে ছবি বৌদিকে সে এতদিন সুখী সন্তুষ্ট বলে ভেবেছে, আজ তারই গলায় আত্মবিলাপের সুর কেন? তাকে ভাগ্যবতী ভেবে সবাই ঈর্ষা করেছে। সুরঞ্জনও দেখেছে, হালদার বাগান লেনের এই অন্ধকার বাড়িতে একমাত্র ছবি বৌদিই সুখী। অন্ধকার সবাইকে গিলেছে, কিন্তু ছবি বৌদিকে গিলতে পারে নি। এই বিস্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে এক টুক্‌রো আলোর আভাসের মতো সে দেখেছে ছবি বৌদিকে। নবেন্দুবাবুর সঙ্গে স্কুটারে চড়ে তিনি যখন বেড়াতে যেতেন, কিংবা পার্টিতে যোগ দেবার জন্যে যেতেন, তখন কেবল সুরঞ্জনই নয়, রাস্তার লোকেরাও তাকিয়ে দেখেছে তাকে। তার হাল্কা শিল্কের শাড়ি, স্লিভ্‌লেস্ ব্লাউজ, রুজ্ লিপ্‌স্টিকের আড়ালে এত কান্না কোথায় লুকানো ছিল?

ছবি বৌদি আরো কত কি বলছিল। শোনার ইচ্ছে ছিল না সুরঞ্জনের।

রাতও বোধহয় বড় বেশি নেই।

গ্রীষ্মকালের রাত। আর একটু পরেই গলিতে কাক ডেকে উঠবে।

সকাল হবে। এ বাড়ির অন্ধকারের কান্না, রাতের চিৎকার—সব চাপা পড়ে যাবে।

মানুষেরা কাজে বেরুবে। মাথার ওপরে ঈশ্বর নেই, পায়ের নিচে মাটি নেই। এমনি এক দুঃসহ শূন্যতার ভেতর দিয়ে তারা একটা দিন কাটিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে আসবে। হয়তো নবেন্দুবাবুও ঘরে ফিরে আসবেন। আবার সুরু হবে আঁধারের পালাগান। চাপা কান্না আর অসহায় চিৎকারে রাত মুখর হয়ে উঠবে।

সুরঞ্জন উঠে পড়লো। হাসিকে বললোঃ আমি এখন আসছি। তুমি একটু দেখো। বাড়াবাড়ি করলে আমাকে ডেকো। তবে মনে হয়, আর বাড়াবাড়ি করবেন না।

সুরঞ্জন ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। ঘুমও এলো কিছুক্ষণের মধ্যে। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলো একটু। কিন্তু একটা দুঃস্বপ্নের মতো কাল রাতের স্মৃতি তার চেতনাকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রইলো।

আর তাহলে তার দাঁড়াবার মাটি রইলো না। এ বাড়ির একমাত্র ছবি বৌদির মধ্যেই সে একটা সুখী পরিবারের ছবি দেখতে পেয়েছিল। কাল রাতের দুর্ঘটনায় সেই ছবিটা ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে।

মিঠুয়া চা নিয়ে এলো। অফিসের সময় হলে সে স্নান করে নিচে গেল। করবী তাকে খেতে দিল। খাওয়ার পর বাচ্চু জিজ্ঞেস করলোঃ দাদা, আমাকে বাঁশবাগান দেখিয়ে আনবে না?

তাকে সুরঞ্জন একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে ওপরে চলে আসে।

সমস্ত কাজ একটা যান্ত্রিকভাবে চলতে থাকে।

জীবিকা-জীবনযাত্রা—সবই চলে। কিন্তু কি যেন নেই। কিসের যেন একটা অভাব। সেই অভাব নিতান্তই এ যুগের। বাইরের

সবই ঠিক আছে। কিন্তু শাঁস নেই। সারটুকু নেই। জীবন এমন দেউলে, এমন রিক্ত কোন কালেই হয় নি।

তাহলে বাইরে থেকে যা কিছু একালে দেখা যায়, তাকে বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ সেইটাই তার আসল রূপ নয়। ভেতরে রয়েছে তার একটা করুণ কাতর চেহারা। তার বর্ণনা নেই। কিন্তু বেদনা আছে।

সেই বেদনা সুরঞ্জনকে ভেতর থেকে নাড়া দিয়েছে।

বাইরে যাকে ঈর্ষা করি, মনে করি সেই বুঝি সুখী, বুঝি সব পেয়েছে, কিন্তু তার অন্তরে যে শুধু বিষের জ্বালা। তার জ্বালাটুকু দেখতে পাই না। দেখি, তার বাইরের জৌলুস।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিন বিকেলেও দেশবন্ধু পার্কে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল। সুরঞ্জন তাদের আনন্দের কলতান সারা মনে মেখে বাড়ি ফিরে এলো।

বাড়ি ফিরে সে জামাকাপড় বদ্‌লালো, বাথরুমে গিয়ে স্নান করলো।

মিঠুয়া চা খাবার নিয়ে এলো নিচ থেকে। সুরঞ্জন চা জল-খাবার খেয়ে আবার জামাকাপড় বদ্‌লালো।

এখন তার ছবি বৌদির খোঁজ-খবর নেবার জন্যে একবার যাওয়া দরকার।

কিন্তু সে যাবে না ঠিক করলো।

কাল সুরঞ্জন যে ছবি বৌদির অনেক কিছুই জানতে পেরে গেছে, ও কথা ছবি বৌদি যেন জানতে না পারে। কিন্তু হাসি যদি বলে দেয়? তা তো সে বলে দেবেই। তাকে তো সে বারণ করে আসে নি। একটা ভুল হয়ে গেছে।

হাসিকে কেন সে বারণ করে দিল না?

এখন সে দেশবন্ধু পার্কে গিয়ে একা একা বসবে। দীঘিটার কালো জলে সে তার মনের ছায়া খুঁজবে। নিজের হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগিয়ে তার মুখ দেখবে সে।

এমন সময় দরজায় হাসি এসে দাঁড়ালো।

ঃ দাদাবাবু, আপনাকে বৌদি ডাকছে।

ইচ্ছে ছিল না। তবু সুরঞ্জনকে ছবি বৌদির ঘরে যেতে হলো।

ছবি বৌদি তাকে ঈশারায় বিছানায় বসতে বললেন। কিন্তু সে বিছানায় বসলো না। কাছেই একটা চেয়ার ছিল। সে সেই চেয়ারে বসলো।

ঃ শুনলাম, কাল হাসি আপনাকে ডেকে এনে খুব কষ্ট দিয়েছে।

সুরঞ্জন বললো ঃ ও কিছু নয়। আপনি কিছু মনে করবেন না।

সুরঞ্জন দেখলো, ছবি বৌদির মুখের চেহারা মুহূর্তের মধ্যে বদ্‌লে গেল। তিনি বললেন ঃ কিছু মনে করেছি বলেই আপনাকে ডেকেছি।

সুরঞ্জন ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

আজ ছবি বৌদিকে দেখে কে বলবে যে, কাল রাতে এই ঘরে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটেছিল। এবং সেই ঘটনার দুঃসাহসী নায়িকা ছিল এই ছবি বৌদি।

ঃ হাসি—

ছবি বৌদি হাসিকে ডাক দিলেন। হাসি পাশের ঘরে কি করছিল। ডাক শুনে সে এ ঘরে এসে দাঁড়ালো।

ঃ কাল তুই এঁকে ডেকে এনেছিলি কেন? কে তোকে ডেকে আনতে বলেছিল? কার কথায়—

ঃ তুমি এমন করত্তেছিলে, বৌদি যে, আমি ভয় পেয়ে গেছনু। আমার মাথার কিছু ঠিক ছিল নি।

ঃ কিছু না জেনে শুনে বাইরের লোককে এভাবে ঘরে ডেকে আনা তোর ঠিক হয় নি। আর কখনো যেন এ রকম না হয়।

হাসি মাথাটা একটু কাত্‌ করে সম্মতি জানালো।

ছবি বৌদি বললো ঃ যা, কি করছিলি কর গে, যা—

হাসি পাশের ঘরে চলে যায়।

একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে সে। ক্ষুণ্ণ হবারই তো কথা। বৌদি কেমন করছে। বাড়িতে অন্য কেউ নেই। কি হতে কি হবে, কে জানে।

সবই ঠিক আছে। কিন্তু শাঁস নেই। সারটুকু নেই। জীবন এমন দেউলে, এমন রিক্ত কোন কালেই হয় নি।

তাহলে বাইরে থেকে যা কিছু একালে দেখা যায়, তাকে বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ সেইটাই তার আসল রূপ নয়। ভেতরে রয়েছে তার একটা করুণ কাতর চেহারা। তার বর্ণনা নেই। কিন্তু বেদনা আছে।

সেই বেদনা সুরঞ্জনকে ভেতর থেকে নাড়া দিয়েছে।

বাইরে যাকে ঈর্ষা করি, মনে করি সেই বুঝি সুখী, বুঝি সব পেয়েছে, কিন্তু তার অন্তরে যে শুধু বিষের জ্বালা। তার জ্বালাটুকু দেখতে পাই না। দেখি, তার বাইরের জৌলুস।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিন বিকেলেও দেশবন্ধু পার্কে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল। সুরঞ্জন তাদের আনন্দের কলতান সারা মনে মেখে বাড়ি ফিরে এলো।

বাড়ি ফিরে সে জামাকাপড় বদ্‌লালো, বাথরুমে গিয়ে স্নান করলো।

মিঠুয়া চা খাবার নিয়ে এলো নিচ থেকে। সুরঞ্জন চা জল-খাবার খেয়ে আবার জামাকাপড় বদ্‌লালো।

এখন তার ছবি বৌদির খোঁজ-খবর নেবার জন্যে একবার যাওয়া দরকার।

কিন্তু সে যাবে না ঠিক করলো।

কাল সুরঞ্জন যে ছবি বৌদির অনেক কিছুই জানতে পেরে গেছে, ও কথা ছবি বৌদি যেন জানতে না পারে। কিন্তু হাসি যদি বলে দেয়? তা তো সে বলে দেবেই। তাকে তো সে বারণ করে আসে নি। একটা ভুল হয়ে গেছে।

হাসিকে কেন সে বারণ করে দিল না?

এখন সে দেশবন্ধু পার্কে গিয়ে একা একা বসবে। দীঘিটার কালো জলে সে তার মনের ছায়া খুঁজবে। নিজের হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগিয়ে তার মুখ দেখবে সে।

এমন সময় দরজায় হাসি এসে দাঁড়ালো।

ঃ দাদাবাবু, আপনাকে বৌদি ডাকছে।

ইচ্ছে ছিল না। তবু সুরঞ্জনকে ছবি বৌদির ঘরে যেতে হলো।

ছবি বৌদি তাকে ঈশারায় বিছানায় বসতে বললেন। কিন্তু সে বিছানায় বসলো না। কাছেই একটা চেয়ার ছিল। সে সেই চেয়ারে বসলো।

ঃ শুনলাম, কাল হাসি আপনাকে ডেকে এনে খুব কষ্ট দিয়েছে।

সুরঞ্জন বললোঃ ও কিছু নয়। আপনি কিছু মনে করবেন না।

সুরঞ্জন দেখলো, ছবি বৌদির মুখের চেহারা মুহূর্তের মধ্যে বদ্‌লে গেল। তিনি বললেনঃ কিছু মনে করেছি বলেই আপনাকে ডেকেছি।

সুরঞ্জন ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

আজ ছবি বৌদিকে দেখে কে বলবে যে, কাল রাতে এই ঘরে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটেছিল। এবং সেই ঘটনার দুঃসাহসী নায়িকা ছিল এই ছবি বৌদি।

ঃ হাসি—

ছবি বৌদি হাসিকে ডাক দিলেন। হাসি পাশের ঘরে কি করছিল। ডাক শুনে সে এ ঘরে এসে দাঁড়ালো।

ঃ কাল তুই এঁকে ডেকে এনেছিলি কেন? কে তোকে ডেকে আনতে বলেছিল? কার কথায়—

ঃ তুমি এমন করতেছিলে, বৌদি যে, আমি ভয় পেয়ে গেছনু। আমার মাথার কিছু ঠিক ছিল নি।

ঃ কিছু না জেনে শুনে বাইরের লোককে এভাবে ঘরে ডেকে আনা তোর ঠিক হয় নি। আর কখনো যেন এ রকম না হয়।

হাসি মাথাটা একটু কাত্‌ করে সম্মতি জানালো।

ছবি বৌদি বললোঃ যা, কি করছিলি কর গে, যা—

হাসি পাশের ঘরে চলে যায়।

একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে সে। ক্ষুণ্ণ হবারই তো কথা। বৌদি কেমন করছে। বাড়িতে অন্য কেউ নেই। কি হতে কি হবে, কে জানে।

সে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল বৈকি। ভালো-মন্দ বাছ-বিচার না করে সে পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিল সুরঞ্জনের কাছে। তারপর বৌদিকে সারিয়ে তোলার জন্যে কতো কি সে করেছে। তাকে সে সারিয়েও তুলেছে। সেই বৌদি আজ তাকে কিনা বক্‌লো বাইরের লোকের সাম্‌নে।

হাসি পাশের ঘরে চলে যাবার পর ছবি বৌদি সুরঞ্জনকে বলে ঃ আপনারও হাসির মুখে কথাটা শুনে ঝাঁপিয়ে পড়া ঠিক হয় নি।

মনে মনে সুরঞ্জন ছবি বৌদির ওপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠছিল।

কাল রাতে সে ছবি বৌদির উপকার করতেই এসেছিল। উপকার করে সে আজ অনেকগুলো আপত্তিকর কথার সম্মুখীন হয়েছে। গৃহস্থ ঘরের বউর মদ খাওয়া দোষের হলো না। তাকে ভালো করে তোলার চেষ্টা করাটাই হলো দোষের? সুরঞ্জন মনে মনে ঠিক করে, সে আর কখনো এই সব ঝামেলার মধ্যে যাবে না।

কি দরকার এই সব ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার?

ছবি বৌদি বলে ঃ আমাদের গোপনীয়তাটুকু আপনার না জানলেই কি চলছিল না? কি মতলব আপনার বুঝি না।

সুরঞ্জন বলে ঃ মতলব আমার কি, তা আমি নিজেই ঠিকমতো জানি না। তবে আপনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে আর স্থির থাকতে পারি নি। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছি। আমার যতখানি সাধ্য, আমি করেছি।

ছবি বৌদির মুখের চেহারাটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। কিছুটা করুণ এবং বিপন্ন। তাঁর মুখের চেহারাটা ধীরে ধীরে বদলে যায়। ছবি বৌদি সুরঞ্জনের দিকে এগিয়ে আসে।

ঃ কাল কিছু বকাবকি করেছিলাম কি?

ঃ করেছিলেন।

ঃ সত্যি?

ঃ সত্যি।

ঃ আর আপনি সব শুনেছেন? ছি ছি, আমার যে মরে যেতে

ইচ্ছে করছে। আপনি কেন ওসব শুনেছেন? কেন আপনি চলে গেলেন না। ছি ছি—

তুজনেই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকে। কারো মুখে কোন কথাই নেই। শেষে সুরঞ্জন কথা বলে। সে জিজ্ঞেস করেঃ আচ্ছা বৌদি, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

ছবি বৌদি বলেঃ করুন।

ঃ উত্তর দেবেন তো?

ঃ উত্তর দেবার মতো হলে নিশ্চয়ই দেব।

ঃ কাল আপনি মদ খেয়েছিলেন কেন?

প্রথমে ছবি বৌদি ও বিষয়ে কিছু বলতেই চাইছিলেন না। বলেছিলেনঃ এ উত্তর দেবার মতো কথা নয়। নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার—

কিন্তু তারপর কি ভাবলেন তিনি। বললেনঃ আপত্তি করে কি হবে? আর কাল তো আপনি সবই শুনেছেন। আজ না হোক একদিন তো সব জানাজানি হয়ে যাবে।

একটু থেমে তিনি বললেনঃ জানেন, সুরঞ্জনবাবু, আমার মতো আন্‌ফরচুনেট্‌ আর কেউ নেই।

ঃ কেন?

ছবি বৌদি সেদিন তাঁর জীবনের করুণ কাহিনী শোনালেন।

ছবির মতো রূপ-যৌবন নিয়ে ছবি বৌদি নেবুতলার চিরঞ্জীব চৌধুরীর সঙ্গে চমৎকারভাবে ঘর সংসার পেতেছিলেন। মাথার ওপরে আর কেউ ছিলেন না। কাজেই খুব অল্প বয়সেই ছবি বৌদিকে ঘোরতর সংসারী হয়ে উঠতে হয়েছিল।

চিরঞ্জীব চৌধুরীর বিরাট উলের কারবার। কাশ্মীর থেকে তিনি উল কিনে এনে বাংলা দেশের বাজারে বিক্রী করেন। কলকাতার লিণ্ড্‌সে স্ট্রীটে বিরাট দোকান তাঁর। অনেক টাকার কারবার। প্রচুর কর্মচারী। কিন্তু বাড়িতে চিরঞ্জীববাবু আর ছবি তুজনে বড়ো

একা। দুজনের মনটাকে ভরে দেবার জন্যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি তাদের সংসারে আর আসেনি। তার জন্যে কারো মনে দুঃখও নেই, দুঃখের বিরুদ্ধে অভিযোগও নেই।

একবার কাশ্মীর থেকে উলের সওদা করে ফিরবার সময় চিরঞ্জীববাবু সঙ্গে নবেন্দুবাবুকে নিয়ে ফিরলেন। নবেন্দুবাবু চিরঞ্জীববাবুর বাল্যবন্ধু। কেবল বাল্যবন্ধুই নয়। প্রথম যৌবনে যখন দুজনে একসঙ্গে কলেজে পড়তেন, তখন একই মেসে, একই ঘরে থাকতেন দুজনে। বিয়ে না করে দুজনে একটা ব্যবসা করবার প্ল্যান করতেন মেসে বসে বসে! কিন্তু কলেজের পড়া চুকিয়ে দিয়ে দুজনে যখন কোথায় ছিট্‌কে পড়লেন, তখন প্ল্যানটির স্মৃতিটুকু ছাড়া আর কিছু অবশেষে রইলো না। ব্যবসা করবেন তাঁরা। অনেক বড় ব্যবসা। অনেক টাকা হবে। অনেক খাতির। সে সব এখন স্বপ্নের মতো মনে হয়। পরীক্ষায় পাশের পর নবেন্দুবাবু একটা চাকরি পেয়ে জলন্ধর সিটিতে চলে যান। চিরঞ্জীববাবুও চাকরি নিয়ে চলে যান গৌহাটিতে।

গৌহাটি থেকে ফিরলেন কলকাতায়। মাথায় ব্যবসার চিন্তা। অল্পদিনের মধ্যে ব্যবসা সুরুও করলেন।

কিছুকালের মধ্যেই ব্যবসা জমে উঠলো। লাভের কড়ি আসতে লাগলো আশাতিরিক্ত ভাবে। সেই সঙ্গে এলো একটা বাড়ি আর ছবির মত সুন্দরী ছবি বৌদি।

তখন চিরঞ্জীববাবুর সুদিন। তবু তিনি নবেন্দুবাবুকে ভুলতে পারেন নি। নবেন্দুবাবুকে নিয়ে ব্যবসা করবেন—সেই কল্পনার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে বৈ কি! নবেন্দুর কথা তাঁর মনে ফিকে হয়ে আসে।

এদিকে নবেন্দুবাবু যে চাকরি নিয়ে জলন্ধর গিয়েছিলেন, সে চাকরিটার পরমায়ু বেশি দিন ছিল না। চাকরিটা ছেড়ে যাওয়ায় তাঁকে নতুন চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হলো। নানা জায়গায় ইণ্টারভিউ দিয়ে ঘুরছিলেন তিনি। কিন্তু মনের মতো চাকরি তাঁর ভাগ্যে নেই।

সেবারেও তিনি দিল্লীতে একটা ইণ্টারভিউ দিয়ে কলকাতায় ফিরছিলেন। ট্রেনে চিরঞ্জীববাবুর সঙ্গে দেখা।

চিরঞ্জীববাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন : কি করছিস আজকাল ?

নবেন্দুবাবু হেসে বলেছিলেন : শুধু ইণ্টারভিউ দিচ্ছি।

: কেন ? সেই চাকরিটা ?

: নেই। ওটা তো টেম্পোরারি ছিল।

চিরঞ্জীববাবু বলেছিলেন : আমি তোকে চাকরি দেব। কতো টাকা পেলেঁ তুই খুশি, বল্ ? কিন্তু একটা কথা—

: কি ?

: আমার কথামতো তোকে চলতে হবে। চলবি তো ?

: চলবো।

নবেন্দু নেবুতলার চিরঞ্জীববাবুর বাড়িতেই উঠলো।

কয়েকদিন পরে চিরঞ্জীববাবু একটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে তার একটা চাকরি জুটিয়ে দিলেন। বললেন : ভেবেছিলাম, আমার ব্যবসাতেই তোমাকে ঢুকিয়ে নিই। কিন্তু ভেবে দেখলাম, বন্ধু বান্ধব নিয়ে ব্যবসা না করাই ভালো।

নবেন্দু বলেছিল : না ভাই, আমার একটা চাকরি জুটিয়ে দাও। তাহলেই চলে যাবে। ব্যবসা আমার ঠিক ধাতে আসে না। তাতে ঝামেলা বড় বেশি।

এদিকে ছবি বৌদি সদা-ব্যস্ত চিরঞ্জীববাবুর সংসারে একা-একা প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। এবার সময় কাটাবার একজন সঙ্গী পেয়ে গেলেন তিনি। ভারি মিশুক আর চট্পটে স্বভাবের লোক নবেন্দুবাবু। সিনেমা, থিয়েটার দেখতে যেতে হবে কিংবা কোথাও বেড়াতে— নবেন্দুবাবু রয়েছেন। গানের জলসা কিংবা নৃত্যানুষ্ঠান—কোন কিছুই বাদ পড়ে না আর। আর চিরঞ্জীববাবুর পথ চেয়ে বসে থাকতে হয় না। কবে চিরঞ্জীববাবুর সময় হবে, তার জন্যে হা-পিত্যেশ করবার প্রয়োজনও আর হয় না।

কিন্তু কিছুদিন পরেই দুজনের ইচ্ছেমতো বাইরে বেরুনো বন্ধ হয়ে

গেল। চিরঞ্জীববাবু অসুখে পড়লেন। প্রথমে জ্বর, তারপর বুকের ব্যথা। এক্স-রে নেওয়া হলো। দেখা গেল, দুটো লাঙসেই ধরেছে।

অর্থাৎ টি-বি।

সময় মতো চিকিৎসা আরম্ভ হলো। টি-বি হস্‌পিট্যালের কেবিনে থাকেন চিরঞ্জীববাবু। নবেন্দু দেখাশোনা করেন, ঘর-আর-হস্‌পিট্যাল করেন, ব্যবসার খবরাখবরও চিরঞ্জীববাবুর কাছে পৌঁছিয়ে দেন। চিরঞ্জীববাবুর কোন নির্দেশ থাকলে তাও লিণ্ড্‌সে স্ট্রীটে পৌঁছিয়ে দেন।

কিছুদিন পরে চিরঞ্জীববাবু সেরে উঠলেন। তাঁকে এবার কোনো স্যানিটোরিয়ামে গিয়ে থাকতে হবে।

তাই হলো। কাশ্মীরের একটা স্যানিটোরিয়ামে চিরঞ্জীববাবু থাকলেন। নেবুতলার বাড়িতে শুধু ছবি বৌদি আর নবেন্দুবাবু।

কথার মাঝখানে ছবি বৌদি আগুন আর ঘিয়ের উপমা দিলেন। বললেনঃ একদিন গভীর রাতে নবেন্দু আমার ঘরে এলো। একবার মনে হয়েছিল, ওকে ফিরিয়ে দিই। কিন্তু ফেরাবো, সে ক্ষমতা আমার ছিল না। আর ফেরাবোই বা কেন? সেদিন থেকে আমি নবেন্দুর কাছে নিজেকে তুলে দিয়েছি। বুঝেছি, নবেন্দুকে ছাড়া আমি বাঁচব না। নবেন্দুই আমার সব। টাকা, বাড়ি, বিষয়-সম্পদ সব আমার কাছে মিথ্যে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলোঃ কিন্তু চিরঞ্জীববাবু? তাঁকে আপনি ভুলে গেলেন?

ছবি বৌদি বললেনঃ না ভুলিনি।

নবেন্দুর তুলনায় উনি অনেক বড়ো। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বাঁচবার জন্যে আমার নবেন্দুকে চাই।

চিরঞ্জীববাবু কাশ্মীরের স্যানিটোরিয়াম থেকে ফিরে এলেন।

তিনি কি করে সব জানতে পেরে গেলেন।

সব জেনে শুনে তিনি একদিন বললেন : আর তো তোমাদের এখানে থাকা চলে না ! অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করো।

ছবি বৌদি বললেন : সেদিন আমার সত্যি কান্না পাচ্ছিল। সে আনন্দে কি দুঃখে তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। উনি যে কতো বড়ো, তা সেইদিন বুঝতে পারলাম। হিমালয়ের মতো বড়ো। হিমালয়কে ভালোবাসা যায়। কিন্তু হিমালয়কে নিয়ে ঘর-করা চলে না। কয়েকদিন পরেই নবেন্দুর সঙ্গে এখানে এসে উঠলাম।

সুরঞ্জন ছবি বৌদির মুখে একালের নায়িকার প্রেমের উপাখ্যান শুনছিল। যে কালে প্রেম দেহ-সীমায় বন্দী, সেই কালেরই প্রেমের কাহিনী।

ছবি বৌদি বললেন : উনি ঠিকই করেছিলেন। নেবুতলার বাড়িতে থাকলে আমি দম বন্ধ হয়ে মরে যেতাম। তাছাড়া মনটাকে বাদ দিয়ে তো আর ঘর করা যায় না।

একটু থামলেন ছবি বৌদি। তারপর বলে চললেন : পাঁচবছর এসেছি এ বাড়িতে। দুজনে থাকছি একসঙ্গে। সবাই দেখছে স্কুটারে করে বেড়াতে যাচ্ছি। নতুন নতুন শাড়ি গয়না—সবই পাচ্ছি। কিন্তু আজও পর্যন্ত ও আমাকে একটা সামাজিক স্বীকৃতি দেয়নি। কিছুই না। নাম-মাত্র একটা রেজেষ্ট্রী। তাও না। কতোবার বলেছি। সব সময় ও কথাটা হেসে উড়িয়ে দেয়। আচ্ছা বলুন তো, হেসে উড়িয়ে দিলে এ সব কথার কি কোন সমাধান হয় ?

সুরঞ্জন বললো : তা হয় না ঠিক। কিন্তু যে পথ আপনারা বেছে নিয়েছেন, তাতে গোলমাল রয়েছে অনেক। যেমন ধরুন, ডাইভোর্স অর্ডার কোর্ট থেকে পেতে হবে। তার জন্যে চিরঞ্জীববাবুর সম্মতি পাওয়া চাই।

ছবি বৌদি বললেন : ও সমস্ত হয়ে গেছে। উনি কিছু ত্রুটি রাখেন নি। আপনাকে বলছিলাম না, ওঁর মতো মানুষ হয় না।

: তবে আর রেজেষ্ট্রীতে অসুবিধে কি ?

ঃ অসুবিধে কিছুই নেই। অসুবিধে শুধু ও-ই সৃষ্টি করে চলেছে।

ঃ তার মানে ?

ওর অফিসে নতুন এক স্টেনো এসেছে—নাম নীলিমা ব্যানার্জী। ঠিক নতুন নয়। প্রায় বছর তুয়েক হবে। এখন আবার ও ও-ই স্টেনোর সঙ্গে—

ছবি বৌদি আর কথা বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। ফুঁসতে লাগলেন নিজের মনে। চোখে তাঁর জল ছিল না। জলের পরিবর্তে আগুন জ্বলছিল তু'চোখে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেনঃ আমাকে আমার ঘর সংসার থেকে টেনে বের করে এনে এভাবে প্রতারণা করাটা কি আপনি সমর্থন করেন ?

সুরঞ্জন বলেছিলঃ তা যদি বলেন, কোনটাকেই আমি সমর্থন করি না। কেউ বোধ হয় করবেও না। বিশেষ করে আমি এ ব্যাপারে একেবারে প্রাচীন পন্থী।

ছবি বৌদির চোখে-মুখে হাসি ফুটে ওঠেঃ তাই বুঝি ? আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

মনে হলো, ছবি বৌদি বর্তমানের উগ্র আধুনিকতায় যেন একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর কথায়বার্তায় এক অসীম ক্লান্তির রেশ।

সুরঞ্জনও ভেবে দেখেছে, এই আধুনিকতার শেষ কোথাও নেই। মানুষের জীবন এভাবে চলতে থাকলে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছোবে, তা কারুর জানা নেই। পরিণাম নেই, শুধু চলা। তাতে যে জীবনের অপঘাত মৃত্যু ঘটবে। সুরঞ্জন ভাবতে গিয়ে সেই আশঙ্কায় বারে বারে শিউরে উঠেছে।

ছবি বৌদি বলেনঃ নীলিমাকে নিয়ে নাকি ও দার্জিলিং গেছে। আজ কুড়ি দিন হলো। ফেরার নাম নেই। এই যদি তার মনে ছিল, তবে আমার সঙ্গে এই ছলনাটা করলো কেন ?

আবার ছবি বৌদি থামেন। বলেনঃ আমি এখন কি করবো, বলতে পারেন? কাল তাই বেশি করে মদ খেয়েছিলাম। খালি পেটেই খেয়েছিলাম। কিন্তু কিছু হলো না। আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। জানেন, সুরঞ্জন বাবু?

সুরঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেঃ এর জন্যে আপনিও তো কিছুটা দায়ী। শুধু নবেন্দুবাবুকে দোষ দিয়ে তো কোন লাভ নেই।

ঃ বিশ্বাস করুন, আমি কিছুতেই আর ওকে রাজি করাতে পারছি না। কিছুই নয়। একটা মাত্র সই। সাক্ষী কেউ না থাক, আপনি তো আছেন। খুঁজলে আর একজনও পাওয়া যাবে।

সুরঞ্জনকে এবার উঠতে হবে। পার্কের বাতাসে একটু গা জুড়িয়ে না এলে আবার কাল রাতের মতো তার ঘুম আসবে না। সারারাত ছট্ফট্ করে মরতে হবে। কলকাতায় বড় গরম পড়েছে এ বছর।

ছবি বৌদি বললেনঃ আপনারা সবাই আমাকে বাইরে থেকে দেখে মনে মনে ভেবেছেন, আমি খুব সুখী। এক সময় আমিও ভেবেছি, আমার মতো সুখী কে? কিন্তু কেউ আমার মনটাকে দেখেনি। সবাই দেখেছে, নতুন শাড়ি আর গয়না পরে স্কুটারে চড়ে ওর সঙ্গে বেড়াতে গেছি। দেখে ভেবেছে, আমার মতো সুখী বুঝি আর কেউ নেই। কিন্তু আমি জানি আমার মতো অসুখী আর কে আছে? আজ যদি ও আমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়, আমার কি হবে বলতে পারেন? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো? ছবি বৌদি এবার হুহু করে কেঁদে ফেললেন।

সুরঞ্জন ভাবছিল, এই সেই ছবি বৌদি, যাঁকে দেখে সে একদিন আদর্শ সুখী জীবনের স্বপ্ন এঁকেছিল, যাঁর মধ্যে এ বাড়ির সবাই এক পারিবারিক সুখের দুর্লভ সন্ধান পেয়েছিল। সেই ছবি বৌদি আজ কাঁদেন। আর নবেন্দুবাবু যদি তাঁর দিকে ফিরে না তাকান, তবে তো আর তাঁর এই কান্নার কোন সমাধানই নেই। ছবি বৌদিকে

ঃ অসুবিধে কিছুই নেই। অসুবিধে শুধু ও-ই সৃষ্টি করে চলেছে।

ঃ তার মানে?

ওর অফিসে নতুন এক স্টেনো এসেছে—নাম নীলিমা ব্যানার্জী। ঠিক নতুন নয়। প্রায় বছর দুয়েক হবে। এখন আবার ও ও-ই স্টেনোর সঙ্গে—

ছবি বৌদি আর কথা বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। ফুঁসতে লাগলেন নিজের মনে। চোখে তাঁর জল ছিল না। জলের পরিবর্তে আগুন জ্বলছিল দু'চোখে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেনঃ আমাকে আমার ঘর সংসার থেকে টেনে বের করে এনে এভাবে প্রতারণা করাটা কি আপনি সমর্থন করেন?

সুরঞ্জন বলেছিলঃ তা যদি বলেন, কোনটাকেই আমি সমর্থন করি না। কেউ বোধ হয় করবেও না। বিশেষ করে আমি এ ব্যাপারে একেবারে প্রাচীন পন্থী।

ছবি বৌদির চোখে-মুখে হাসি ফুটে ওঠেঃ তাই বুঝি? আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

মনে হলো, ছবি বৌদি বর্তমানের উগ্র আধুনিকতায় যেন একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর কথায়বার্তায় এক অসীম ক্লান্তির রেশ।

সুরঞ্জনও ভেবে দেখেছে, এই আধুনিকতার শেষ কোথাও নেই। মানুষের জীবন এভাবে চলতে থাকলে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছোবে, তা কারুর জানা নেই। পরিণাম নেই, শুধু চলা। তাতে যে জীবনের অপঘাত মৃত্যু ঘটবে। সুরঞ্জন ভাবতে গিয়ে সেই আশঙ্কায় বারে বারে শিউরে উঠেছে।

ছবি বৌদি বলেনঃ নীলিমাকে নিয়ে নাকি ও দার্জিলিং গেছে। আজ কুড়ি দিন হলো। ফেরার নাম নেই। এই যদি তার মনে ছিল, তবে আমার সঙ্গে এই ছলনাটা করলো কেন?

আবার ছবি বৌদি থামেন। বলেন : আমি এখন কি করবো, বলতে পারেন ? কাল তাই বেশি করে মদ খেয়েছিলাম। খালি পেটেই খেয়েছিলাম। কিন্তু কিছু হলো না। আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। জানেন, সুরঞ্জন বাবু ?

সুরঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে : এর জন্যে আপনিও তো কিছুটা দায়ী। শুধু নবেন্দুবাবুকে দোষ দিয়ে তো কোন লাভ নেই।

: বিশ্বাস করুন, আমি কিছুতেই আর ওকে রাজি করাতে পারছি না। কিছুই নয়। একটা মাত্র সই। সাক্ষী কেউ না থাক, আপনি তো আছেন। খুঁজলে আর একজনও পাওয়া যাবে।

সুরঞ্জনকে এবার উঠতে হবে। পার্কের বাতাসে একটু গা জুড়িয়ে না এলে আবার কাল রাতের মতো তার ঘুম আসবে না। সারারাত ছট্‌ফট্‌ করে মরতে হবে। কলকাতায় বড় গরম পড়েছে এ বছর।

ছবি বৌদি বললেন : আপনারা সবাই আমাকে বাইরে থেকে দেখে মনে মনে ভেবেছেন, আমি খুব সুখী। এক সময় আমিও ভেবেছি, আমার মতো সুখী কে ? কিন্তু কেউ আমার মনটাকে দেখেনি। সবাই দেখেছে, নতুন শাড়ি আর গয়না পরে স্কুটারে চড়ে ওর সঙ্গে বেড়াতে গেছি। দেখে ভেবেছে, আমার মতো সুখী বুঝি আর কেউ নেই। কিন্তু আমি জানি আমার মতো অসুখী আর কে আছে ? আজ যদি ও আমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়, আমার কি হবে বলতে পারেন ? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো ? ছবি বৌদি এবার হুহু করে কেঁদে ফেললেন।

সুরঞ্জন ভাবছিল, এই সেই ছবি বৌদি, যাঁকে দেখে সে একদিন আদর্শ সুখী জীবনের স্বপ্ন এঁকেছিল, যাঁর মধ্যে এ বাড়ির সবাই এক পারিবারিক সুখের দুর্লভ সন্ধান পেয়েছিল। সেই ছবি বৌদি আজ কাঁদেন। আর নবেন্দুবাবু যদি তাঁর দিকে ফিরে না তাকান, তবে তো আর তাঁর এই কান্নার কোন সমাধানই নেই। ছবি বৌদিকে

তাহলে কি আজীবন কেঁদেই যেতে হবে? কে জানে, হয়তো তাই।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে হাসি ছুটে এসে বলে গেল: বৌদি, দাদাবাবু এসে গেছে।

সুরঞ্জন বললো: আমি তাহলে এখন আসি, বৌদি।

সেদিন বড় খারাপ লাগছিল সুরঞ্জনের।

নবেন্দুবাবু ঘরে ঢুকছেন, আর তখনই কোন কথা না বলে চোরের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সুরঞ্জন। দুজনের চোখাচোখি হয়েছিল সেদিন। তাও ক্ষণিকের জন্যে। কিন্তু কোন কথা হয় নি। ব্যাপারটা সুরঞ্জনের ভারি বিশ্রী লাগছিল।

নবেন্দুবাবু কি ভাবলেন, জানি না। কিন্তু সুরঞ্জনের ভারি খারাপ লাগছিল।

সেদিন বেরিয়ে না এসে যদি সে বসে থাকতো, তবে বোধ হয় তার এত খারাপ লাগতো না। কিন্তু বসে থেকেই বা সে সেদিন নবেন্দু-বাবুর সঙ্গে কি কথা বলতো? ছবি বৌদির সঙ্গে তার আলাপ থাকলেও নবেন্দুবাবুর সঙ্গে তো কোনদিন কোন আলাপ হয় নি।

সে তো কোন কথা না বলে বেরিয়ে চলে এলো। একবারও সে তখন ভাবেনি, ছবি বৌদির কি হবে? ছবি বৌদি কারুর সঙ্গে কথা বলে, নবেন্দুবাবু তা পছন্দ করেন না। সে কথা তো ছবি বৌদি তাকে বলেছেন। নবেন্দুবাবুর আচরণেও তা স্পষ্ট।

আবার তাঁর অনুপস্থিতিতে ছবি বৌদি একজন বাইরের লোককে ঘরের মধ্যে ডেকে এনে কথা বলেছেন, তা কি তিনি ক্ষমা করতে পারবেন?

সুরঞ্জন ভেবেছিল, নবেন্দুবাবু ছবি বৌদিকে বোধ হয় সন্দেহ করবেন। হয়তো এই ব্যাপারটাকে নিয়ে তাঁদের পারিবারিক শান্তিতে একটা বড় রকমের ফাটল ধরবে।

কিন্তু পরের দিন সন্ধের একটু আগেই সুরঞ্জন দেখলো, নবেন্দুবাবু ছবি বৌদিকে স্কুটারে নিয়ে বেড়াতে চললেন। হাল্‌কা সিল্কের শাড়িতে স্লিভ্‌লেস ব্লাউস আর মুখের রুজ্‌ লিপ্‌স্টিকে ছবি বৌদির মনের খুশি তখন ছড়িয়ে পড়ছিল।

যাক্‌, বাঁচা গেল। ছবি বৌদির তাহলে কোন বিপদ হয় নি।

সুরঞ্জনের বুকের ওপর থেকে একটা দুশ্চিন্তার পাথর নেমে গেল।

রাতে নবেন্দুবাবুরা বেড়িয়ে ফিরলেন। সুরঞ্জন শুনলো, তাঁর স্কুটারের ঘড়ঘড়ানি সিঁড়ির নিচে এসে থামলো। সিঁড়িতে তাঁর জুতোর শব্দও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু সেই জুতোর শব্দ সুরঞ্জনের দরজার সাম্‌নে এসে থেমে গেল কেন?

দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন নবেন্দুবাবু। কিন্তু কেন? ছবি বৌদিকে কি তিনি এখনও ক্ষমা করে উঠতে পারেন নি?

সুরঞ্জন উঠে দরজা খুলে দিল।

নবেন্দুবাবুর মুখে মৃদু হাসির রেখা। বড়ো রহস্যজনক সেই হাসি।

ঃ সেদিন রাতে আপনি যে উপকার করেছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ।

সুরঞ্জন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তার মুখে কোন কথা ছিল না। তবু তারও তো কিছু বলা দরকার। নবেন্দুবাবু তাকে তাঁর উপকার করার জন্যে ঘরে এসে ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন। আর সুরঞ্জন তার উত্তরে কিছু বলবে না? কিন্তু কি-ই বা বলবে সে? বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে কিছু বলার জন্যে যখন সে তৈরী হলো, তখন নবেন্দুবাবু চলে গেছেন।

ছবি বৌদি দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সিল্কের শাড়িতে দক্ষিণের বাতাস খেলা করছিল।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলোঃ রেজেষ্ট্রী হয়ে গেল?

ছবি বৌদি মাথা নাড়লেন।

ঃ তবে ?

ঃ এমনি একটু ঘুরে এলাম আর কি !

স্থরঞ্জন অসম্পূর্ণ রিপোর্টটা নিয়ে বসলো। কয়েকটি বাক্যও তাতে যোগ হলো। কিন্তু একটু পরেই মিঠুয়া নিচ থেকে ছুটতে ছুটতে এলো।

ঃ দাদাবাবু—

ঃ কি রে ?

ঃ বড়দি ফিরে এসেছে।

ঃ কে ফিরে এসেছে ?

ঃ নিচের বড়দি গো—

স্থরঞ্জনের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে আবার জিজ্ঞেস করলো ঃ কে ? কেতকী ?

মিঠুয়া মাথা নেড়ে বললো ঃ হ্যাঁ।

স্থরঞ্জনের বুকের ভেতরটা কেমন এক আশ্চর্য অনুভূতিতে মোচড় দিয়ে উঠলো। কেতকী ফিরে এসেছে ? কেন সে ফিরে এলো ? সবাই তাকে ভুলে গিয়েছিল। আবার কেন সে ফিরে এলো ? সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ির সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তার সম্মান, তার প্রতিষ্ঠা সবই তো লুপ্ত হয়ে গেছে। এমনকি, তার স্মৃতিটুকু তাও মুছে গেছে। আবার সে ফিরে এলো কেন ? তার লুপ্ত স্মৃতি হয়তো আবার বেঁচে উঠবে। কিন্তু কেতকী তার আগেকার প্রতিষ্ঠা কি আবার ফিরে পাবে ?

এই অসম্মানের বোঝা বইবার জন্যে কি সে ফিরে এলো ? কেতকী না ফিরলেই বোধ হয় ভালো হতো।

স্থরঞ্জন বললো ঃ ঠিক আছে। তুই যা—

মিঠুয়া জিজ্ঞেস করে ঃ খাবে না ? রাত তো অনেক হলো।

ঃ আমার খাবার ওপরে নিয়ে আয়।

ঃ নিচে যাবে না ?

ঃ না। যা বললাম, তাই কর।

মিঠুয়া ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। আজ হঠাৎ তার দাদাবাবুর কি হলো, সে বুঝতে পারলো না।

সুরঞ্জন হাতের কলমটা বন্ধ করে সরিয়ে রাখলো। আর লেখা আসবে না। এই অবস্থায় কি কোন সিরিয়াস্ লেখা আসে?

সুরঞ্জন ভাবে, কেতকী যতদিন এ বাড়িতে ছিল, ততদিন সে কেতকীকে পায় নি। কেতকী ছিল তখন যেন কত সুদূরের!

একদিন সে নিশীথের সঙ্গে চলে গেল। তখনই সুরঞ্জন মনে মনে তাকে পেয়েছিল। তার সমস্ত অস্তিত্বকে কেতকী যেন আচ্ছন্ন করে রয়েছিল এতদিন। আজ সে ফিরে এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে গেল অনেক দূরের। দূর আকাশের নক্ষত্র যেমন, কেতকীও আজ তার কাছে তেমনি।

কেতকীর না-আসাই ছিল ভালো।

সুরঞ্জন কেতকীর মুখটা মনে মনে আঁকবার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই সে আঁকতে পারে না। বিদিশার অন্ধকার নিশা, শ্রাবস্তীর শিল্পকর্ম—সব আজ হারিয়ে গেছে। কেতকী আজ বড় ছোট, বড় সাধারণ মেয়ে।

সে কল্পনার পটে আসে না।

খাবার খেয়ে সুরঞ্জন বিছানায় শুয়ে পড়লো। আজ কোন লেখা হবে না। বিছানায় শুয়ে সে ঘুমোবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘুম এলো না।

গত যুদ্ধের সময় সে এই সমাজকে দেখেছে। তখন বয়েস তার কম ছিল। সব ঠিকমতো বুঝে ওঠার ক্ষমতা তখনো তার হয় নি। তবু যেটুকু দেখেছে এবং যেটুকু সে বুঝেছে, তাতে সমাজের স্বাভাবিক রূপকে সে খুঁজে পায় নি।

দেহকে পসরা করে দল বেঁধে মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। বিদেশী সৈন্যদের ক্ষুধার সরবরাহের জন্যে একদল দিশি দালালও সেদিন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সে ছিল যুদ্ধের সময়। সারা দেশের বুকের ওপর ছিল দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা। কিন্তু এখন? এখন তো যুদ্ধ নেই। ঘরের মেয়েরা আজ দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে নি সত্য, কিন্তু গোপনে নিশি-অভিসারে আজ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে তারা।

আজ তাদের কিসের দুর্ভিক্ষ? কিসের অভাব?—কেউ জানে না। কোথায় যাবে তারা? তাও জানে না।

ঘর তাদের আজ আর বেঁধে রাখতে পারছে না। ঘরের বাঁধন কবে শিথিল হয়ে গেছে। নিচের অঞ্জলি দেবী ঝড়বৃষ্টি তুচ্ছ করে নিশিকান্ত-বাবুর কাছে ছুটে যান। ওপরের রিণা রায় অমিতের বুকে শান্তি খুঁজে পেল না। সে আজ সুপ্রিয়র বক্ষোলীনা। ছবি বৌদি—যাঁকে সে গৃহস্থ ঘরের আদর্শ বধূ বলে ভেবেছিল, যাঁর মধ্যে একটা সুখী সংসারের ছবি সে দেখতে পেয়েছিল, তিনিও চিরঞ্জীববাবুর ঘর ভেঙে দিয়ে নবেন্দুবাবুর সঙ্গে পালিয়ে এসেছেন। এখনও তিনি সামাজিক স্বীকৃতি পান নি বলে মদ খান। আর নবেন্দুবাবুও অফিসের স্টেনো নীলিমা ব্যানার্জিকে নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে যান। আর কেতকী? সেও পাড়ার একটা লক্কা ছেলের সঙ্গে ক মাস কাটিয়ে তার বাপ-মার কাছে নিঃশব্দে ফিরে আসে। তার জন্যে এতটুকু দুঃখ নেই, লজ্জা নেই। আজ বুঝি এইটেই সত্য, এইটেই স্বাভাবিক।

মনু, পরাশর, রঘুনন্দন—তাঁরা আজ কোথায়? রামমোহন, বিদ্যাসাগর—তাঁরাই বা কোথায় গেলেন?

সুরঞ্জন পাশ ফিরে শুলো। বড় গরম লাগছে আজ আবার। বড় গরম—সে এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগলো কিছুক্ষণ। চেয়ে দেখলো, মিঠুয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। সুরঞ্জন কি ভেবে হঠাৎ উঠে পড়লো। আলো জ্বাললো। কলম-প্যাড্ নিয়ে লেখার টেবিলে বসলো।

লেখা শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লো। এবার ঘুম এলো, নিবিড় শান্তির ঘুম।

•

সকাল হতেই মনে পড়লো, কেতকী ফিরে এসেছে।

নিশীথের সঙ্গে ক মাস কাটিয়ে সে আবার ফিরে এসেছে হালদার বাগান লেনের এই অন্ধকার খুপরিতে।

সুরঞ্জনের হাসি পায়। পূজোর উদ্বোধন করতে এসে নিশিকান্ত-বাবু এ পাড়ার এই লক্কা ছেলেদের সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি এদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি।'

এই সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ !

নিশীথ তার প্রথম নমুনা।

এবার সুরঞ্জনের আর হাসি পায় না। দুঃখ হয়। সারা সমাজটাই আজ পচতে সুরু করেছে। কোথাও আর সুস্থতা নেই। একটু নির্মল আলো ! না, কোথাও নেই।

সেদিন কিসের যেন ছুটি ছিল। অফিস যেতে হবে না। সারা সকাল সেদিন সুরঞ্জনের হাতে জমে উঠেছিল। কিছু করবার নেই। রিপোর্টটা কাল রাতেই সে শেষ করে ফেলেছে।

এখন তাহলে কি করবে সে ? কিছু একটা তো করা চাই।

মিছিমিছি বিছানায় একটু গড়ালো। দরজার ওপরের তাকে টিনের ভাঙা সুটকেশটা চোখে পড়লো। আরে, এই সুটকেশটা এলো কোথা থেকে ? কার সুটকেশ এটা ?

সুরঞ্জন ভুলে গেছে সুটকেশটার কথা। গিরিজাবাবু—যিনি এই ঘরে সুরঞ্জনের আগে ছিলেন, সুটকেশটা তো তাঁরই সম্পত্তি।

এতদিন সে সুটকেশটা দেখছে। কিন্তু ওটার কথা সে একেবারে ভুলে গেছে। সুরঞ্জন গুরুদাসবাবুকে সুটকেশটা নিয়ে যেতে বলেছিল। তিনি নেন নি। বলেছিলেন জানলা দিয়ে ফেলে দিতে।

সুরঞ্জনের মনে পড়ে, তার মধ্যে সে রেখে দিয়েছিল দু খানা ছবি, কয়েকখানা চিঠি আর একখানা ডায়েরী।

সুরঞ্জন উঠে সুটকেশটা নামালো। ছবি দু খানা দেখলো। গিরিজাবাবুর ছবিখানা বেশ কম বয়েসের তোলা। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর ছবি একটু বেশি বয়েসের। তাঁকে দেখে সুরঞ্জনের মনে পড়ে

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার লাইন, 'পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিন্দুর।'

সুরঞ্জন ডায়েরীটা বের করে এনে সুটকেশটা বন্ধ করে তুলে রেখে দিল। অনেক ধুলো জমেছিল ডায়েরীটাতে। অনেকদিনের ধুলো।

সুরঞ্জন ধুলো ঝেড়ে ওটা পড়বার চেষ্টা করে।

বাঁকা চোরা, হিজিবিজি লেখা। কোথাও অক্ষর বেঁকে গেছে, লাইন বেঁকে গেছে কোথাও।

প্রথমে তার ভয় হয়েছিল, কি জানি গিরিজাবাবু কি লিখেছেন তাঁর ডায়েরীতে। না জানি, তাঁর জীবনের কোন গোপন কথা! কিন্তু তা কি পড়া সুরঞ্জনের ঠিক হবে?

অনুমতি ছাড়া অন্যের ডায়েরী পড়া!

সুরঞ্জন ভয়ে ভয়ে ডায়েরীটা পড়তে আরম্ভ করে।

গিরিজাবাবু ছিলেন রিটায়ার্ড পোষ্ট মাস্টার। চাকরি নিয়ে তাঁকে সারা বাংলা দেশ ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী আর দুই ছেলে, দুই মেয়ের সংসার। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন, মানুষ করেছেন।

মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। একজন রমা—থাকে জব্বলপুরে। আরেকজন মনোরমা থাকে দিল্লীতে। দুজনের স্বামীই প্রতিষ্ঠিত সরকারী অফিসার।

দুই ছেলে—সুধীর আর সুবীর। সুধীর জার্মানীতে থাকে। বিয়ে করেছে এক জার্মান মহিলাকে। সুবীর ক'বছর হলো আমেরিকায় গেছে। যাবার আগে সে একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে গেছে। আগেই ঊর্মিলা দেবী মারা গিয়েছিলেন। কাজেই সংসার ভেঙে যাবার দুঃখ আর ওঁকে পেতে হয় নি।

দুঃখ যা কিছু, সমস্তই গিরিজাবাবুকে সহ্য করতে হয়েছিল।

গিরিজাবাবুর সংসার ভেঙে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু মনে মনে তিনি সংসার বেঁধে রেখেছিলেন। ছেলেদের সঙ্গে তার পত্রালাপ বন্ধ

হয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু রমা-মনোরমাকে তিনি প্রায়ই চিঠি লিখতেন। ডায়েরীতে তার উল্লেখ আছে।

সমস্ত ডায়েরীটাই ঊর্মিলা দেবীকে উদ্দেশ করে লেখা।

একজায়গায় তিনি লিখেছেন ঃ

'আজ তোমার কথা বিশেষ করে মনে পড়লো। মনোরমা আজ চিঠি লিখেছে, সুধীর নাকি একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে বিয়ে করে আমেরিকা চলে গেছে। বিয়ে করলো, আমেরিকা গেল, আমাকে জিজ্ঞেস করলো না, একবার বলেও গেল না। তুমি ভাগ্যবতী। তোমাকে এ দুঃখ সইতে হলো না। তুমি বেঁচে থাকলে এ দুঃখ সহ্য করতে পারতে না। আমাকে আর কতোদিন এ দুঃখ সইতে হবে— বলতে পারো ?···রমা আমাকে জব্বলপুরে গিয়ে থাকতে বলেছে। আমি যাবো না। আমি কারো গলগ্রহ হয়ে বাঁচতে চাই না।'

সুরঞ্জন বুঝতে পারে, বড়ো অভিমানী প্রকৃতির লোক ছিলেন গিরিজাবাবু। বাইরে তিনি বৃদ্ধ হলেও অন্তরে ছিল শিশুর মতো অভিমান। ছেলেরা বড় হয়েছে, পৃথিবীকে চিনেছে। যার যেখানে স্থান, খুঁজে নিয়েছে। আর বৃদ্ধ গিরিজাবাবু নিজের ঠোঁট চেপে ধরে শুধু কেঁদেছেন। কেঁদেছেন আর অভিযোগ করেছেন ঊর্মিলা দেবীর কাছে ঃ শোন, তুমি শোন। সুধীর আজ জার্মানীতে গেল। আমাকে একটিবারও বলে গেল না। সত্যিই তো, আমি কে ? কেউ না।

ডায়েরীর যে পাতায় তাঁর লেখা শেষ হয়েছে তাতে তিনি লিখেছেন ঃ

'আর টানতে পারছি না। এবার তোমরা আমাকে ছুটি দাও। কতোদিন হলো এ পৃথিবীতে এসেছি। অনেক দিন তো হলো। আর বেশিদিন থাকা উচিত নয়। শরীরও আর চলছে না। মাঝে মাঝে জ্বর হয়। ডাক্তার দেখিয়ে কি হবে ?···আর পারছি না।··· এবার আমাকে নিয়ে চলো····'

তারপর আর কিছু নেই।

একটা বিশাল শূন্যতা ডায়েরীর শেষ কটি সাদা পাতায় ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু দাম্পত্য প্রেমের কি মধুর চিত্র তিনি রেখে গিয়েছেন ডায়েরীর পাতাগুলোতে। প্রতিটি পাতায় তিনি ঊর্মিলা দেবীকে কি গভীর করে পেয়েছেন, আর রেখে গিয়েছেন তাঁর কি গভীর ভালোবাসার স্বাক্ষর !

সুরঞ্জন ভাবলো আজকের দিনের কথা। ভাবলো অঞ্জলি দেবী, রিণা রায়, ছবি বৌদি আর কেতকীর কথা।

ঊর্মিলা দেবী কি এই পৃথিবীর কেউ ছিলেন ?

আর গিরিজাবাবু ছিলেন কোন পৃথিবীর ?

গিরিজাবাবু আর ঊর্মিলা দেবীরা চলে গেছেন। আজ নতুন যুগ এসেছে। এসেছে নতুন যুগের হাওয়া। সেই হাওয়ায় পুরাতন যা কিছু—সব ভেঙে গেল, উড়ে গেল···

ঊর্মিলা দেবী সেই দৃশ্য দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু গিরিজাবাবু সব দেখে গেছেন। অক্ষম অসহায় বৃদ্ধ নীরব দর্শকের মতো নতুন যুগের চেহারা দেখে গেছেন।

গিরিজাবাবুর মৃত্যুর পর একটা যুগ শেষ হয়ে গেল।

তারপর যে যুগ এলো, সেই যুগের নায়ক হলেন নিশিকান্তবাবু, নবেন্দুবাবু আর অমিত রায়। এই পর্বের সর্বশেষ ব্যক্তি হলো নিশীথের দল।

কটা দিন সুরঞ্জনের বড়ো এলোমেলো ভাবে কেটে গেল। কোন কাজই সে ভালোভাবে করতে পারেনি। অথচ তার কাজেরই প্রয়োজন ছিল বেশি। মনটাও ছিল বড় এলোমেলো। একটা কাজ করতে গিয়ে শেষ না করেই সে আর একটা কাজ করে ফেলে। তাতে কাজের চেয়ে অকাজই সে করেছে বেশি, ভুলের মাত্রা গিয়েছে বেড়ে।

সে যেন এই কটা দিন পালাতে চেয়েছিল। কোথাও পালাতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সে কোথায় পালাবে? দার্জিলিং

কিংবা সিমলায়, পুরী কিংবা বিশাখাপট্টম—যেখানেই হোক সে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু আপাতত তার কোথাও গেলে চলবে না। অফিসেই তার অনেক কাজ জমে আছে। তার তো এখন বাইরে যাওয়া চলবে না।

তাহলে কাজ। শুধু কাজ। কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতে হবে। হ্যাঁ, তাকে হারিয়ে যেতে হবে। তাই সে কাজের মধ্যেই এতদিন পালিয়েছিল। কাজের জটের মধ্যে ঢুকে সে শুধুই জট পাকিয়েছে। তবু তার মধ্যেও সে ভুলতে পারেনি কেতকীর কথা।

কেন কেতকী ফিরে এলো?

সে তো এক গভীর অনুভবে কেতকীকে পেয়েছিল। মাকড়সা যেমন করে নিজের শরীর থেকে একটা সূক্ষ্ম সূতো বের করে জাল বুনে তার মধ্যে নিশ্চিন্তে বাস করে, সুরঞ্জনও তেমনি এক আশ্চর্য অনুভবের জাল বুনে তার মধ্যে বাস করেছিল। কেতকী ফিরে এসে সেই জালটা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়েছে। সে তাই এখন আর দাঁড়াবার স্থান খুঁজে পাচ্ছে না। অস্থির হয়ে কাজের গুহার মধ্যে সে আশ্রয় খুঁজছে।

কিন্তু পায় নি।

এখন তার মনের সেই অবস্থা অনেকটা কেটে গেছে। এখন তার একবার কেতকীকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়। কেতকী কি সেদিনের মতোই আছে? না কি এই ক'মাসে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে? তার চেহারার সেই বিষণ্ণ মাধুর্য এখনও আছে? না কি সে এই ক'মাসে পুড়ে একেবারে কালো হয়ে গেছে?

কেতকীকে দেখতে তার বড়ো ইচ্ছে হয়।

কেতকীর একবার কি দেখা পাওয়া যায় না?

কেন পাওয়া যাবে না?

সে ইচ্ছে করলেই তো কেতকীকে দেখতে পায়। কিছুই নয়, শুধু তার একটিবার মাত্র নিচে যাওয়া।

কেতকী ফিরে আসার পর সুরঞ্জন আর নিচে যায় নি। মিঠুয়া তার খাবার ওপরে নিয়ে আসে। ওপরে মাঝে মাঝে যোগমায়া দেবী

আসেন, করবী আসে। তাঁদের মুখে সুরঞ্জন হেরম্ববাবুর খবর নেয়। হেরম্ববাবুকে মাঝে একবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবার ডাক্তার বাবুরা প্লাষ্টার খুলে দিয়েছে। কিন্তু পা-টা অস্বাভাবিক-ভাবে সরু হয়ে গেছে। কোন সাড়া নেই পা-টার। যোগমায়া দেবী দুবেলা ম্যাসেজ করছেন। একজন এক্সপার্ট দিয়ে ম্যাসেজ্ করালে হয়তো ভালো হতো। কিন্তু সে উপায় নেই। পয়সা কোথায়?

যোগমায়া দেবী যতখানি পারেন, ম্যাসেজ্ করে দেন। কিন্তু কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না।

যোগমায়া দেবী দুঃখ করে বলেন: আর কতোদিন পারি বলো তো? তবু একটু উন্নতি হলে মনে একটু জোর পেতাম।

সুরঞ্জন আশ্বাস দিয়ে বলেছে: এখুনি অধৈর্য হবেন না। এ সব কেস্ রাতারাতি ভালো হয় না। একটু সময় নেয়।

যোগমায়া দেবী বলেছেন: তুমি বলছো। তাই তোমার কথাটা মেনে নিলাম। কিন্তু উনি যে সেরে উঠবেন, আবার আগেকার মত কোর্টে বেরুবেন। আমি ভাবতেই পারি না।

: দেখবেন উনি ঠিক সেরে উঠবেন, কোর্টেও বেরুবেন।

সুরঞ্জনের কথায় যোগমায়া দেবী ভরসা পান। বলেন: তুমি বলছো। তোমার কথাই যেন সত্যি হয়।

একটু থেমে বললেন: তোমাকে যেন বেশিদিন আর কষ্ট দিতে না হয়।

: তার মানে? আমাকে আপনি দূরে সরিয়ে দিতে চান না কি?

: তোমাকে দূরে সরাই, সে ক্ষমতা আমার নেই।

যোগমায়া দেবী চলে যান।

সব কথা হয়। শুধু কেতকীর কথাই হয় না।

কেতকী ফিরে এসেছে। এ খবরটাও সে পেয়েছে মিঠুয়া আর বাচ্চুর মুখে। যোগমায়া দেবী কেতকী সম্বন্ধে একেবারে নীরব। তাঁর মনের এক জায়গায় আশ্চর্য শীতলতা।

কেতকীর চারদিকেও একটা নির্জন নীরবতা।

যোগমায়া দেবী কেতকী সম্বন্ধে কিছুই বলেন না।

করবীও না।

যূথিকা তো শুধু সময়ে-অসময়ে খিল খিল করে হাসে। কেন হাসে, কি যে তার সেই হাসির অর্থ—তা সে জানে না।

তবে সে কাকে জিজ্ঞেস করবে?

বাচ্চুকে সে একদিন কথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলঃ বাচ্চু, নিশীথ আসে না তোমাদের বাড়ি?

বাচ্চু বলেছিলঃ কে? নিশীথদা?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ জানো দাদা, নিশীথদা না ভারী মিথ্যেবাদী।

ঃ কেন রে?

ঃ আমাকে একটা বন্দুক কিনে দেবে বলেছিল। তারপর যে গেছে, আর আসে না। দাদা, আমাকে তুমি একটা বন্দুক কিনে দেবে?

ঃ বন্দুক? বন্দুক নিয়ে তুমি কি করবে?

ঃ মারবো—

ঃ আরে সর্বনাশ! কাকে মারবে?

ঃ কাককে।

ঃ কেন? হঠাৎ কাকের ওপর তোমার রাগ কেন?

ঃ কাককে কেমন বিচ্ছিরি দেখতে, কেমন বিচ্ছিরি গলা। আর—

ঃ আর কাকের কি বিচ্ছিরি?

ঃ আর কাকে যে ধান খেয়ে যায়—

ঃ কাকে ধান খেয়ে যায়?

ঃ হ্যাঁ। তুমি জানো না বুঝি? পার্কে যে ও-বাড়ির বুলু, টোটন বাপী সবাই গায়, কাওয়ায় ধান খাইল রে—

সুরঞ্জন বাচ্চুর কথা শুনে হাসতে পারে না। সে অবাক হয়ে যায়। এত কথা বাচ্চু শিখলো কোত্থেকে?

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেঃ কাওয়া যে কাক, তা তুমি জানলে কোত্থেকে, বাচ্চু ?

ঃ কেন 'চোঙ্গা' জমাদার সেদিন গলি ঝাঁট দিতে দিতে কাককে কাওয়া বলে গালাগাল দিচ্ছিল যে। কাক ডাস্টবিনের ময়লা এনে গলিতে ফেলে কিনা।

বাচ্চু ছগন জমাদারকে 'চোঙ্গা' বলে।

সুরঞ্জনের হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু হাসতে পারলো না।

ঃ বলো না দাদা, আমাকে একটা বন্দুক কিনে এনে দেবে ?

সুরঞ্জন বাচ্চুকে একটা খেলার বন্দুক কিনে দিয়েছে। সেই সঙ্গে কয়েকটা ক্যাপও।

বাচ্চু তাই নিয়ে কাকের দিকে তাক্ করেছে। আওয়াজ হয়েছে, কিন্তু কাক মরে নি। উড়ে পালিয়েছে।

বাচ্চু তাই হতাশ হয়ে সুরঞ্জনের কাছে এসে বলেছেঃ এ বন্দুকে কাক মরে না। তোমার বন্দুক তুমি ফিরিয়ে নাও। আমি এ বন্দুক নেবো না।

ঃ বারে, তুমিই তো বন্দুক চেয়েছিলে।

ঃ হ্যাঁ। এই বন্দুক চেয়েছিলাম নাকি ? এতে খালি দুম্ করে আওয়াজ হয়। কাক মরে না, উড়ে পালায়।

ঃ পালায় নাকি ? তুমি তাহলে বন্দুক ছুঁড়তে জানো না।

বাচ্চু ঠোঁট ফুলিয়ে বলেঃ না। জানি না আবার। কি বাজে বন্দুক এনে দিয়েছ—

সুরঞ্জন বাচ্চুকে কাছে টেনে আনে। বলেঃ বন্দুকে কাক মরে না। কাকেরা তো ভীষণ চালাক। বন্দুক দিয়ে ওদের মারা যায় না।

ঃ তবে কি দিয়ে মারা যায়, বলো না ?

ঃ এটম্ বোমা দিয়ে।

বাচ্চু তারপরই সুরু করলোঃ আমাকে একটা এটম্ বোমা কিনে এনে দাও না—

ঃ দেব !

ঃ কবে দেবে বল।

ঃ আচ্ছা, আজ না হয় কাল।

সেদিন সময় মতো সুরঞ্জন অফিসে গিয়েছিল। কিন্তু অবেলায় তাকে ফিরে আসতে হলো অফিস থেকে।

দার্জিলিঙে একটা উচ্চ পর্যায়ের কন্‌ফারেন্স হচ্ছে। সেখানে কাগজের স্পেশাল রিপ্রেজেন্‌টেটিভ হয়ে যাঁর যাবার কথা হয়েছিল, তাঁর মা কাল রাতে মারা গিয়েছেন। তিনি যেতে পারবেন না। ডিরেক্টর সুরঞ্জনকে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছেন।

সুরঞ্জনও মনে মনে কাজ খুঁজছিল। সে হঠাৎ কাজ পেয়ে গেল।

তাকে আজ সন্ধের প্লেনে শিলিগুড়ি রওনা দিতে হবে।

সে তাই আজ সকাল সকাল ফিরে এসেছে। তাকে তৈরী হতে হবে। জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে নিতে হবে।

সময় হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

তাই সে ট্যাক্সি করেই বাড়ি ফিরলো।

ওপরে যাবার আগেই ঝোঁকের মাথায় সে নিচের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে। হেরম্ববাবু শুয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এত সকাল-সকাল ফিরলে যে ?

ঃ ডিরেক্টার বললেন, আজই দার্জিলিং যেতে হবে। ওখানে কন্‌ফারেন্স হচ্ছে কিনা—

ঃ কখন প্লেন ?

ঃ সন্ধে সাতটায়—

ঃ তাহলে যাও। তৈরী হয়ে নাও !

যোগমায়া দেবী খেতে বসেছিলেন। বাচ্চু বড়দির কাছে শুয়েছিল। যোগমায়া দেবী বললেন: দেখতো বাচ্চু কে কথা বলছে। রঞ্জন এলো নাকি ?

বাচ্চ রঞ্জনের নাম শুনে তিন লাফে এসে সুরঞ্জনের হাত ধরলো।

ঃ চল, মা ডাকছে—

ঃ কেন ?

ঃ জানিনা। আমার এটম্ বোম এনেছ ?

ঃ এই যা। ভুলে গেছি যে! কি হবে ?

বাচ্চু সুরঞ্জনের হাত ছেড়ে দিল।

সুরঞ্জনের কোনদিকে আজ খেয়াল নেই। সে আজ পালিয়ে বাঁচার মতো কাজ পেয়ে গেছে। সে হুড়মুড় করে যোগমায়া দেবীর ঘরে ঢুকে পড়ে।

যোগমায়া দেবী বসে খাচ্ছিলেন। সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে সব শেষে তিনি খেয়ে থাকেন। তাই খেতে তাঁর সব দিনই বেলা গড়িয়ে যায়।

যোগমায়া দেবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজ এত সকাল-সকাল চলে এলে যে ? শরীর খারাপ করেনি তো ?

ঃ না। শরীর ভালোই আছে। এই যা—

সুরঞ্জনের খেয়াল হলো ঝোঁকের মাথায় পায়ের জুতো খুলতেও সে ভুলে গেছে! জুতো শুদ্ধ পায়ে সে যোগমায়া দেবীর ঘরে ঢুকে বড়ো অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

এ-ঘরে যোগমায়া দেবী ঠাকুরের পূজো করেন। সবাই মাটিতে বসে খায় এখানে। ছিঃ ছিঃ! বড়ো ভুল হয়ে গেছে তার।

সুরঞ্জন কি করবে, ভেবে পাচ্ছিল না।

যোগমায়া দেবী বললেন ঃ তাতে কি হয়েছে ?

সুরঞ্জন চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পায়, সাম্‌নে কেতকী দাঁড়িয়ে আছে। কেতকী বোধহয় শুয়েছিল। তার চোখ দুটো ফুলে রয়েছে। মাথায় চুল দাঁড়কাকের বাসার মতো উচ্ছৃঙ্খল। কোথায় বিদিশার রাত ? কোথায় শ্রাবস্তীর কারুকাজ ? এ কি হয়েছে কেতকীর চেহারা ?

চোখে চোখ পড়তেই কেতকী মুখটা নামিয়ে নেয়।

দাঁড়িয়ে থাকতে বোধহয় অস্বস্তি হচ্ছিল কেতকীর। বোধহয় সে পালাতে চাইছিল। হ্যাঁ সে, পালিয়ে গেলেই ভালো হতো। কিন্তু পালাবার পথ ছিল না।

দরজায় প্রায় পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়েছিল সুরঞ্জন।

সুরঞ্জনের মনে পড়ে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে শুয়ে সে কতোদিন পশ্চিমদিকের বড়ো ঘড়িওয়ালা বাড়িটার মাথার ওপরে শুক্লপক্ষের চাঁদকে মাঝরাতে অস্ত যেতে দেখেছে। কি করুণ, বিষণ্ণ চাঁদ!

কেতকীকে আজ ঠিক তেমনি লাগছে।

সুরঞ্জন ভেবেছিল, কেতকী হয়ত তাকে জিজ্ঞেস করবে: এতদিন কোথায় ছিলেন? 'কোথায়' না বলে সে হয়তো বলবে: এতদিন কেমন ছিলেন?

কিন্তু আজ সুরঞ্জন দেখলো কেতকী কোন কথা না বলে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে যেন। তখন সুরঞ্জনেরই ইচ্ছে করছিল, সে জিজ্ঞেস করে: ভালো আছো তো কেতকী?

কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলো না সে। পাছে তাতে কেতকী আরও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

সুরঞ্জন যোগমায়া দেবীকে কিছু না বলে জুতোর ফিতে খুলতে আরম্ভ করে।

যোগমায়া দেবী বলেন: আবার জুতো খুলছো কেন?

সুরঞ্জন বলে: আপনি এ ঘরে পূজো করেন। এ ঘরে আপনার ঠাকুর রয়েছেন।

যোগমায়া দেবী একবার সুরঞ্জনের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন: ঠাকুর? আর নেই বাবা। তুমি জুতো পরেই ঘরে এসো।

কথাটা বলতে তার গলাটা যেন একটু কেঁপে উঠলো।

সুরঞ্জন চেয়ে দেখলো, যেখানে ঠাকুরের ছোট্ট একটি সিংহাসন পাতা ছিল, সেখানে কেমন একটা নিঃসীম শূন্যতা শুয়ে আছে। সুরঞ্জন সেইদিকে তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে।

বলে: তাইতো। কি হলো ঠাকুর?

যোগমায়া দেবী বললেন: ঠাকুরকে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। সিংহাসনটা ভেঙে একদিন উনুন ধরিয়ে ফেলেছি।

যোগমায়া দেবীর ঠোঁটের কোণদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

সুরঞ্জন অবাক হয়ে যোগমায়া দেবীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তার মুখে কোন কথা এলো না।

যোগমায়া দেবীর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি বললেন : কেনই বা মিছিমিছি এই শালগ্রাম শিলা বয়ে বেড়ানো। পাথর পাথরই। পাথর কখনো দেবতা হয়? তা যদি হতো, আমার এ দুর্দশা কেন? আমার এ দুর্দশা কি তিনি দেখতে পাচ্ছেন না? চোখ থাকলে তবে তো দেখতে পাবেন।

সুরঞ্জনের চোখের সাম্নে যেন দু' দুটো বিশ্ব মহাযুদ্ধ ঘটে গেল। মাথার ওপরে এটম্ বোমা, পায়ের তলায় হিরোসিমা নাগাসাকি। কেতকীর দিকে তাকালো সে। হঠাৎ তাকে মনে হলো, সে যেন বাংলা দেশের মেয়ে নয়, যেন হিরোসিমা-নাগাসাকিরই এক ধর্ষিতা তরুণী। আর পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার বাচ্চু—এক নিষ্পাপ পবিত্র হৃদয়, বুঝি অনাগত কালের দেবতা।

জুতোর ফিতে খোলা হয় নি সুরঞ্জনের। পাথরের মূর্তির মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। মুখে সে হাসি আনবার চেষ্টা করলো, কিন্তু হাসি এলো না।

শেষে যোগমায়া দেবীও?

যাঁরা সন্ধেবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করতেন, যাঁদের ভক্তিতে রোজ দুবেলা ভগবানের অভিষেক হতো, তাঁদেরই একজন আজ বলেন কিনা ভগবান নেই?

আজ সত্যিই ভগবানের সিংহাসন নেই। ভেঙে গেছে। ভগবান বসবেন কোথায়?

: এ কি করেছেন আপনি? সত্যি ঠাকুরকে বিদেয় করে দিয়েছেন?

সুরঞ্জন কথাটা হাল্কাভাবে বলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কথাটা যেন ধিক্কারের মতো শোনালো যোগমায়া দেবীর কানে।

চোখে জল এসে পড়লো তাঁর। পাতের ভাত তুলে নিয়ে তিনি কলতলার দিকে চলে গেলেন।

রান্নাঘর থেকে যূথিকা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো। সেই সঙ্গে চিৎকার: না, না, কিছুতেই না—

সুরঞ্জন চেয়ে দেখলো, পটে-আঁকা ছবির মতো নিস্পন্দভাবে কেতকী দাঁড়িয়ে আছে। মলিন, বিষণ্ণ। কুয়াশা রাতের নিষ্প্রভ চাঁদ।

প্রথমে সুরঞ্জনই কথা বললো। জিজ্ঞেস করলো: দাঁড়িয়ে রইলে কেন, কেতকী? বসো—

সুরঞ্জনের মুখে নিজের নাম শুনে কেতকী এই প্রথম চম্‌কে উঠলো। এ তো দরদ-ভরা আবাহন, এ তো ভালোবাসার ডাক।

সুরঞ্জনের চোখে কেতকী মুহূর্তের জন্যে কি যেন দেখলো। হয়তো সে সুরঞ্জনের চোখে খুঁজছিল রাতের নীড় কিংবা আকাশের ক্ষমা। তার দুচোখে সে কি দেখলো, তা সে-ই জানে। সে চোখ নামিয়ে নিল। বললো: থাক্‌। আপনি বসুন—

মেঘ সরিয়ে চাঁদের মুখে যেমন এক করুণ হতাশ হাসি ফুটে ওঠে, কেতকীর মুখে তারই আভাস।

সুরঞ্জন বলে: আমার যে বসবার সময় নেই কেতকী। আজকের সন্ধের প্লেনে আমাকে দার্জিলিং যেতে হচ্ছে। গোছগাছ করা কিছুই হয়নি।

তেমনি মিহি গলায় কেতকী জিজ্ঞেস করে: দার্জিলিং কেন?

সুরঞ্জন বলে: অফিসের কাজে।

: ফিরছেন কবে?

সুরঞ্জনের বুকের ভেতরে কে যেন একটা হিম-শীতল প্রলেপ বুলিয়ে দিল। যাকে সে এতদিন খুঁজেছে এই তো সে তাকে পেয়ে গেছে। এই তো বুঝি নাটোরের বনলতা সেন। তার গলার স্বর ছিল বুঝি এমনি করুণ, এমনি গভীর।

উত্তর দেবার কথা ভুলে গিয়েছিল সুরঞ্জন।

কেতকী বললো : কই, বললেন না তো ?

: কি ?

: কবে ফিরছেন ?

: বেশি নয়, আট-দশদিন বাদেই ফিরছি।

যোগমায়া দেবী হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এলেন।

সুরঞ্জন তাঁকে বলে : আজ সন্ধেয় আমি দার্জিলিং যাচ্ছি। অফিস থেকে পাঠাচ্ছে। আট-দশদিন পরে ফিরবো।

যোগমায়া দেবী বোধ হয় একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে বললেন : সেদিন দিল্লী থেকে ফিরলে। আজ আবার দার্জিলিং ?

সুরঞ্জন বলে : আমার চাকরিটাই তো ঘুরে বেড়ানো।

সুরঞ্জনের কোথাও যাওয়ার কথা শুনলেই যোগমায়া দেবী কেমন যেন হয়ে যান। কোন কারণে কোথাও যদি তাকে বদ্‌লি করে দেয়, তাহলে কি হবে তাঁর সংসারের ? সে কথা তিনি কি একবারও ভাবেন না ? ভাবেন বৈ কি ! কিন্তু ভেবেই বা কি হবে ? তার কি কোন কূলকিনারা আছে ? তিনি বোধহয় আজকাল আর কিছু ভাবতেই পারেন না। একেবারে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

তাঁর নিজের কাপড় সব ছিঁড়ে গেছে। করবীরও কাপড় নেই। যোগমায়া দেবীর যে কাপড়টা একটু ভালো আছে, করবী তাই পরে বাইরে বেরোয়। ইতিমধ্যে একবার সে যোগমায়া দেবীকে বলেছিল : মা, একখানা কাপড় কিনে দাও না।

যোগমায়া দেবী জবাবে বলেছিলেন : সবই তো দেখতে পাচ্ছিস্। কি করে কিনে দিই, বল্ ?

করবী বলে : পূজোর সময় যে শাড়িটা কিনে দিয়েছিলে, ওটাতে আর চলছে না মা। সেলাই করে আর পরা যায় না। কতো আর সেলাই করি, বলো ?

: সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করি, বল্‌তো ?

: তাহলে বেরুবো না ?

ঃ আমার কাপড়টা পরে বেরোস্—

একটু থেমে করবী বলেছিলঃ কয়েকটা টাকা আমাকে তুমি ধারই দাও না মা। আমি একটা কাপড় কিনি। চাকরি করে শোধ করে দেব।

কিন্তু সংসার চালাতেই যোগমায়া দেবী হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, টাকা ধার দেবেন কোত্থেকে? থাকলে নিজের মেয়েকে টাকা ধার দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

করবী আজ যোগমায়া দেবীর সেই শাড়িটা পরে বেরিয়েছে। বোধহয় চাকরির খোঁজে। এই বাজারে কে তাকে চাকরি দেবে? কি চাকরিই বা সে করবে? তবু মেয়েটা চাকরি করে যদি বাপমার দুঃখ ঘোচাতে পারে, তবে মন্দ কি? পরের ছেলের গলগ্রহ হয়ে বেশিদিন থাকা কি ভালো?

করবীই তো তাঁর এখন একমাত্র ভরসা।

বলা যায় না, সুরঞ্জন যদি কোনদিন তাঁদের ছেড়ে দূরে চলে যায়।

সুরঞ্জন তাঁদের জন্যে যথেষ্ট করেছে, এবার তাকে রেহাই দেওয়া দরকার। প্রত্যেক মাসে তার কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিতে হয়। যোগমায়া দেবীর ভারি কষ্ট হয়।

তবু সুরঞ্জন কোথাও যাচ্ছে জানলে তাঁর মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। নিজের ছেলেকে দূরে পাঠাতে সব মায়ের যেমন হয়ে থাকে।

সুরঞ্জন বলেঃ আমার কিন্তু কিছুই গোছানো হয় নি। মিঠুয়া কোথায় কে জানে?

সে আর কিছু না বলে ওপরে উঠে এলো।

মিঠুয়া ওপরেই ছিল।

খবরটা শুনে যা যা গুছিয়ে দেবার গুছিয়ে দেয় সে। তাকে আজকাল আর বেশি কিছু বলতে হয় না। ক'দিন সেখানে থাকতে হবে আর জায়গাটা ঠাণ্ডা না গরম—শুধু এই টুকুই বলে দিতে হয়। তারপর যা করবার সে করে ফেলে।

বাচ্চু একটুও কাছ-ছাড়া হয় নি। সারাক্ষণ সে সঙ্গেই আছে। সুরঞ্জনকে একটু নিরিবিলিতে পেয়ে সে তার প্রতিশ্রুতিটা তাকে আর একবার মনে করিয়ে দেয়।

সুরঞ্জন মিঠুয়াকে বলে ঃ আর একটা কাজ করবি। পয়সা নে। বাচ্চুকে একটা এটম্ বোমা কিনে দিবি? কেমন, হলো তো বাচ্চু?

মিঠুয়াকে পয়সা দিল সুরঞ্জন।

সন্ধের কিছু আগে মিঠুয়া ট্যাক্সি ডেকে আনলো। মালপত্র বিকেলেই সুরঞ্জন 'বুক্' করে রেখে এসেছিল। কাজেই মালপত্রের আর ঝামেলা ছিল না। বেরুবার সময় সে যোগমায়া দেবীর সঙ্গে দেখা করতে নিচে যায়। যোগমায়া দেবী বাথরুমে ছিলেন। বললেন ঃ এসো বাবা। সাবধানে থেকো।

হেরম্ববাবুর সঙ্গে দেখা করে সুরঞ্জন বেরিয়ে এসে দেখতে পায়, দরজার একপাশে কেতকী দাঁড়িয়ে আছে। যেন একটি ম্লান ক্লান্ত গোধূলি। সুরঞ্জন কাছে আসতেই কেতকী বলে ঃ আমাকে আপনি ক্ষমা করেছেন?

সুরঞ্জন থমকে দাঁড়ায়।

ঃ ও-কথা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছো, কেতকী?

ঃ বলুন না, আমাকে আপনি ক্ষমা করেছেন?

সুরঞ্জন কি কেতকীকে ক্ষমা করতে পেরেছে? সে কে? তার ক্ষমা করার প্রশ্ন ওঠেই বা কেন?

অনেকগুলো কথা সুরঞ্জনের মনে জেগে ওঠে। কিন্তু এত সব কথা ভাববার সময় তার নেই।

সে বলে ঃ ফিরে আসি। তারপর বলবো।

কেতকী নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

ঃ আপনিও আমাকে ক্ষমা করলেন না? জানেন, আমাকে কেউ ক্ষমা করে নি। ভেবেছিলাম কেউ না করুক, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। দেখলাম, আপনিও না।

ঃ ফিরে আসি কেতকী, এখন সময় নেই।

হালদার বাগান লেনে একটা ক্লান্ত গোধূলি নিবে গেল।

একেই তো সুরঞ্জন খুঁজছিল।

হালদার বাগান লেনের অন্ধকার কানা গলিতে এক গোধূলির ম্লান আলোয় সে তার ভালোবাসাকে খুঁজে পেল।

কতোদিন সে ভেবেছিল, কেতকীকে সে এবার থেকে ঘৃণা করবে। ঘৃণাই সে শুধু দিতে পারবে কেতকীকে। কিন্তু আজ তার কেতকীকে বড়ো ভালো লাগলো। ভালোবাসা ছাড়া কেতকীকে কি কিছু দেওয়া যায়?

সারাক্ষণ তার কানে ঘুরে ফিরে জাগছিল কেবল একটি কথা ঃ আমাকে আপনি ক্ষমা করেছেন?

একটা গান বাজছিল এতক্ষণ। এইমাত্র থেমে গেছে। তার সুর সারাক্ষণ তার কানে যেন বেজে চলেছে।

দার্জিলিঙে নানা কাজের ফাঁকে সে মনে মনে সেই গানের কলি কুড়িয়েছে। 'ম্যালে' সমস্ত দিনের শেষে সন্ধে এসেছে। পাখিরা ডানার রোদ মুছে ফেলেছে। পৃথিবীর সব রং মুছে গেলে অন্ধকার নেমে আসে। তখন সুরঞ্জনের সাম্‌নে আর কেউ থাকে না। শুধু অন্ধকার আর ম্লান গোধূলির মতো কেতকী। কিন্তু কেন সে কেতকীকে এ ভাবে ভাবছে? কেতকীকে এ ভাবে ভাবা তো তার ঠিক নয়। ভেবে তো তাকে পাওয়া যাবে না কোনদিন। সে অনায়াসে নিজেকে নিশীথের হাতে তুলে দিয়েছে। সুরঞ্জন তাকে কোনদিন পাবে না। তবে সে তার কথা এতো ভাবছে কেন?

কেতকীর দুচোখে আজ নিশীথের মুখ। সুরঞ্জন সেখানে অবান্তর। তবু সারাক্ষণ কেতকীই তার মনটাকে ঘিরে থাকে।

যতদিন কেতকী হালদার বাগান লেনের ঐ অন্ধকার বাড়িতে ছিল, ততদিন সে তার কথা এ ভাবে ভাবেনি। যখনই সে হারিয়ে

গেল, তাকে পাওয়ার ইচ্ছেটা ততই প্রবল হয়ে উঠলো। এখন তো সেই ইচ্ছেটা আরোও প্রবল। একটা অজানা ফুলের গন্ধের মতো কেতকী তাকে সারাক্ষণ জড়িয়ে থাকে।

কন্‌ফারেন্সে রিপোর্ট নেওয়া, আর রিপোর্ট লেখা, ঠেলাঠেলি করে টেলিগ্রাম অফিসে যাওয়া, খবর পাঠানো—এত সব কাজের মধ্যেও সে কেতকীকে ভুলতে পারে না।

শেষের দিকে একদিন সুরঞ্জন জ্বর নিয়ে হোটেলে ফিরলো। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর। ভেবেছিল দু একদিনের মধ্যেই জ্বর সেরে যাবে। কিন্তু তা হলো না।

কন্‌ফারেন্স শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাজ ছিল না কিছুই। একদিন বিশ্রাম নিয়েই সে কলকাতা রওনা দিল।

জ্বর গায়ে নিয়ে সুরঞ্জন ফিরেছে দেখে যোগমায়া দেবী অস্থির হয়ে উঠলেন। মিঠুয়া ডাক্তার ডেকে আনলো। বাচ্চু বসে রইলো সারাক্ষণ। ডাক্তার দেখে চলে গেলে করবী এলো! করবী জিজ্ঞেস করলোঃ দাদা, এখন আপনার কেমন লাগছে?

সুরঞ্জন সংক্ষেপে জবাব দিলঃ ভালো।

ঃ আপনার রিপোর্ট নিয়ে কলকাতায় যে হৈ হৈ পড়ে গেছে।

ঃ তাই না কি?

ঃ আপনিই তো কন্‌ফারেন্সের অলিগলির খবর দিয়েছেন। এত সব কেউ লিখতে পারে, কারো জানা ছিল না।

সুরঞ্জন বলেঃ এত সব ঘটতে পারে, আর লিখতে পারে না কেউ?

ঃ সত্যি দাদা, ওরা সব কি?

ঃ ওরা সব ওই রকমই।

একটু থেমে বলেঃ আরো অনেক ঘটনা ঘটেছিল, তা লিখতে পারি নি।

ঃ তাই নাকি?

করবী আরো অনেক কথাই বলেছিল। সে সব এখন আর সুরঞ্জনের মনে নেই।

বিকেলে ঘরে কেউ ছিল না।

মিঠুয়া বাচ্চুকে নিয়ে পার্কে গেছে। করবী বোধহয় চাকরির খোঁজে বেরিয়েছে। যোগমায়া দেবী হেরম্ববাবুকে নিয়ে হয়তো এখন ব্যস্ত আছেন।

এখন কেউ ঘরে এলে বেশ হয়। দু দণ্ড শান্তি পাওয়া যায় কথা বলে।

সুরঞ্জন কেতকীর কথা ভাবছিল। এখন কি কেতকী একটিবার আসতে পারে না? দুটি কথা বলে, কপালে একটু হাত বুলিয়ে দেয়। অসুখের সময় মানুষ বড়ো অসহায় হয়ে পড়ে। নিজেকে বড়ো একা মনে হয়। বড়ো শীতল মনে হয় তার চারদিক। অসুখ যত ছোটই হোক—এ হলো অসুস্থ মানুষের সাধারণ মনস্তত্ত্ব।

কাল থেকে সুরঞ্জন ফিরেছে। আজ সন্ধে হতে চললো! কেতকী একবারও আসবার সময় পেল না? সুরঞ্জনের অসুখ করেছে, কিংবা আবার নিশীথ এসে তাকে গল্পের ছলে ঠায় বসিয়ে রেখেছে! কেতকী নিশ্চয় শুনেছে। শুনেও সে একবার আসতে পারলো না?

গত শীতের সময় যখন তার জ্বর হয়েছিল তখন কেতকীই তো তাকে দেখেছিল। এবারে অসুখের কথা শুনে তার কি মনে পড়ছে না, সে সব কথা?

সুরঞ্জনের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো।

আর মনে পড়লেই বা কি? এখন সে নিশীথের মধ্যে ডুবে আছে। নিশীথ তাকে সব সময় ঘিরে রয়েছে। সুরঞ্জনের কথা মনে পড়লেও কেতকী আসতে পারবে কেন তার কাছে?

দরজায় খুট্ করে একটা শব্দ হলো। কে এলো, ঘাড় বাঁকিয়ে দেখবার ক্ষমতা নেই সুরঞ্জনের। মাথাটা ভীষণ ধরে আছে।

কে আর আসবে? হয়তো কেতকীই এলো। কেতকীর কথা ভাবতেই তার বুকের ভেতর রক্ত যেন হঠাৎ চম্‌কে উঠলো।

: শুনলাম, আপনার নাকি জ্বর হয়েছে?

এ কার গলার স্বর? কেতকীর তো নয়। তবে কার?

নিচের অঞ্জলি দেবী? নাকি ছবি বৌদি? নাকি রিণা রায়?

কে এলো?

: কে? এদিকে আসুন। দেখতে পাচ্ছি না।

অঞ্জলি দেবী সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন।

: এই শুনলাম, সেদিন আপনি দার্জিলিং গেছেন। আজ শুনলাম, জ্বর নিয়ে ফিরেছেন। আপনার এত জ্বর হয় কেন বলুন তো?

: তাতে জ্বরের আর দোষ কি বলুন?

: না না। আমি সে কথা বলছি না। এ বয়সে সকলের একটু জ্বর হয়েই থাকে। এ জ্বরের নাম—ভালোবাসার জ্বর।

: যাঃ। কি যে বলেন আপনি। যাক, কোথায় যাচ্ছেন?

: বাপের বাড়ি।

: আসুন তাহলে। সন্ধে হয়ে যাচ্ছে আপনার।

অঞ্জলি দেবী অনেকক্ষণ ধরে সুরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কেমন একটু অন্যমনস্ক ভাব। কিংবা নতুন কিছু যেন তিনি সুরঞ্জনের মুখে আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন।

: কি দেখছেন এমন করে চেয়ে?

: আপনাকে?

: হঠাৎ—

: আপনাকে কেমন যেন আজ বোকা-বোকা লাগছে।

: বোকা-বোকা?

: হ্যাঁ—

: আশ্চর্য!

: আশ্চর্য কিছু নয়। ভালোবাসলে সব পুরুষ মানুষকেই এমনি বোকা-বোকা মনে হয়ে থাকে। আপনি কি কারো প্রেমে পড়েছেন নাকি?

ঃ প্রেমে ?

ঃ হ্যাঁ—

ঃ তা তো জানি না।

ঃ বারে, ভালোবাসবেন আপনি, জানবে অন্যলোক ?

ঃ অভিজ্ঞ লোক আপনি। আপনার অভিজ্ঞতার মূল্য—

সুরঞ্জন হেসে উঠলো। অঞ্জলি দেবী ব্যাগটা হাত বদল করলেন। বললেন ঃ শিকারী বেরালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। আর সব শিকারী বেরালের গোঁফ এক রকমেরই হয়ে থাকে।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ তাই। আচ্ছা, আমি এখন চললাম। এ ভালোবাসার জ্বর। ভালোবাসার লোক এলেই সেরে যাবে।

অঞ্জলি দেবী বেরিয়ে গেলেন।

আবার নিঃসঙ্গতা! বাইরে ম্লান আলোর অন্ধকার। ঘরে অন্ধকারের মহোৎসব।

সেই অন্ধকারে সুরঞ্জন নিজের মুখটাকে কল্পনা করবার চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু নিজের মুখটাকে সে আঁকতে পারলো না। কেন পারে না ? আয়নায় নিজের মুখটাকে সে তো অনেকবার দেখেছে। তবু আঁকতে পারে না কেন ? মানুষ অন্যের মুখ কল্পনা করতে পারে, আঁকতে পারে। নিজের মুখ আঁকতে পারে না কেন ?

নিজের মুখ আঁকতে পারলে সে দেখতে পেত একটি ভালোবাসার মুখ। তার মুখে নাকি ভালোবাসার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। অঞ্জলি দেবী তা দেখতে পেয়েছেন। ভালোবাসার মুখে নাকি একটা বোকা-বোকা ভাব থাকে। ভালোবাসলে নাকি মানুষকে বোকা দেখায়। ভালোবাসা কি তাহলে বোকামি ?

আহা, সব মানুষই যদি তেমনি বোকা হতো!

বেশি চালাক হয়ে পৃথিবীর তো এই চেহারা। সব মানুষ আবার কবে তেমনি বোকা হবে ?

মাথার কাছে কার পায়ের শব্দ হলো।

সুরঞ্জন চম্‌কে উঠলো। কে?

কে ঘরের মধ্যে?

কষ্ট হচ্ছিল। তবু সুরঞ্জন ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালো। মাথার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। কে? কে? একটি মৃদু অস্তিত্ব। তার মুখ দেখা যায় না। কিন্তু তাকে চেনা যায়।

ঃ কেতকী?

কেতকী সাড়া দিতে পারলো না। কান্না এসে গেল তার গলায়। অন্ধকারে কান্নার শব্দ শুনলো সে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে ঃ কেতকী, কাঁদছো তুমি?

কেতকী বলে ঃ আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন?

হাত বাড়িয়ে সুরঞ্জন কেতকীর একখানা হাত ধরলো।

ঃ কেন তুমি এমন করলে, কেতকী?

ঃ ভুল করেছি। কিন্তু তাই বলে কি আমাকে কেউ ক্ষমা করবে না?

সুরঞ্জন কেতকীর হাত ছেড়ে দেয়। বলে ঃ আলোটা জ্বালতে পারবে কেতকী?

ঃ অন্ধকার বলেই ঘরে আসতে পারলাম। আলো জ্বালা থাকলে বোধ হয় আসতে পারতাম না। আপনার অসুখ করেছে, শুনেছি। কিন্তু আসতে পারছি না কিছুতেই।

সুরঞ্জনের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠলো। সে হঠাৎ বলে ফেললো ঃ আমিও তোমার পথ চেয়ে ছিলাম, কেতকী।

কথাটা বলেই সুরঞ্জন কেমন যেন হয়ে যায়। বোধহয় এভাবে কথাটা বলা ঠিক হয় নি। না জানি কেতকী কি ভাবলো। সে কথাটা একটু শুধ্‌রিয়ে নেবার জন্যে বলে ঃ গত অসুখের সময় তুমি ছিলে কিনা।

কেতকী হাত বাড়িয়ে সুরঞ্জনের কপালে রাখলো।

সঙ্গে সঙ্গে সুরঞ্জনের গলাটা ব্যথায় টন্‌টন্‌ করে উঠলো। সে বলে ঃ কেন তুমি এমন করলে, কেতকী?

ঃ আমি তখন বুঝতে পারি নি। ও আমাকে ভুল বুঝিয়েছিল। ও যত কথা বলেছিল, সব মিথ্যে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমি কেন গিয়েছিলাম? আমি কি ভুল করেছি। কী ভুল—

শেষের দিকে কেতকীর গলাটা কান্নায় ককিয়ে উঠেছিল। সুরঞ্জনের কপাল থেকে একটা হাত তুলে নিয়ে সে চোখ মুছলো।

সুরঞ্জন এখন কি করবে? সে কেতকীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে একি করে বসলো? তার অন্তরের গভীরে যেখানে সব চেয়ে বেশি কান্না জমে আছে, সেখানেই যে সে হাত দিয়ে ফেলেছে।

কেতকী ক্ষমা চাইতে এসেছিল। সে তো তাকে ক্ষমা করলেই সে ফিরে যেত। কিন্তু কেতকী তার কাছে ক্ষমা চাইতেই বা আসবে কেন? কে সে? তার ক্ষমাতে কেতকীর কি যায় আসে?

হয়তো সুরঞ্জনের সরল সহৃদয় ব্যবহারই তার জন্যে দায়ী। তার সহৃদয়তাই কেতকীর মনটাকে আজ ভিন্নমুখী করে দিয়েছে। যেখানে তার অপরাধের হিসেবনিকেশ সে তার বাপ মায়ের সঙ্গে করতে পারেনা, সেখানে সে কেন মার্জনা চাইতে ছুটে এসেছে সুরঞ্জনের কাছে?

কেতকীকে এ পৃথিবীর কোন একজনের কাছে ক্ষমা পেতে হবে। কিন্তু কার কাছে? হেরম্ববাবু বা যোগমায়া দেবী কেউ কোন কথাই বললেন না তাকে। বাবার পায়ের কাছে সে কেঁদে প্রণাম করে দাঁড়ালো। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কে?

ঃ আমি কেতকী।

ঃ অ—

কেতকী সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যোগমায়া দেবীর কাছে গেল। যোগমায়া দেবীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল সে। যোগমায়া দেবী তাকে তাঁর পা ছুঁতেই দিলেন না।

কিন্তু কেঁদে ফেললেন হু হু করে। বললেনঃ তুই চলে গিয়েছিলি যখন, তখন ফিরে এলি কেন? ভেবেছিলাম, কেতকী আমার নেই, মরে গেছে। আমি তোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তুই আবার ফিরে এলি কেন?

ঃ আমার যে আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই, মা—

কেতকী সত্যি আর দাঁড়াতে পারছিল না। তার পায়ের তলার মাটিটা থরথর করে কাঁপছিল। মাথাটাকে সে কিছুতেই সোজা করে রাখতে পারছিল না। মাটির মধ্যেই মিশে যেতে চাইছিল তার মাথাটা।

যোগমায়া দেবী বললেনঃ যার সঙ্গে গিয়েছিলি, তার কাছেই জায়গা পাবি, যা—

কেতকী দাঁড়িয়ে রইলো।

তার চোখের জলে ঘরের মেঝেটা ভিজে উঠলো।

যোগমায়া দেবী বললেনঃ রুগ্ন বাবা পড়ে রইলো, মা পড়ে রইলো, ছোট বোনেরা পড়ে রইলো, আর বাচ্চু, যাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলি, সেও পড়ে রইলো—

যোগমায়া দেবীর গলাটা বুজে এসেছিল। তিনি আর কথা বলতে পারলেন না।

ঃ আমাকে মাপ করো, মা—

ঃ তুই আমার বুক ভেঙে দিয়ে গেছিস্।

যোগমায়া দেবী চোখের জল মুছতে মুছতে অন্য কাজে চলে গেলেন।

করবী ঘরে ঢুকে বড়দিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলো শুধু তাকে। কোন কথা বললো না।

কেতকী ভেবেছিল, করবী অন্তত তার সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু দেখলো, সেও কথা বললো না। কথা না বলেই পাশের ঘরে চলে গেল।

তাহলে রইলো আর কে? কেউ নেই।

করবী পাশের ঘরে চলে যেতে সে যেন কেমন একটা হঠাৎ-শূন্যতা অনুভব করলো। এ বাড়িতে সে একেবারে নিঃসঙ্গ, একাকী। কি করবে, সে ভেবে পাচ্ছিল না। সে কি এখান থেকে চলে যাবে? এখানে তার থাকা কি আর সম্ভব? এমন সময় কোথা থেকে এলো

বাচ্চু। সেও দূর থেকে বড়দিকে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। কাছে এলো না।

কেতকী তাকে দেখে কেঁদে ফেললো। ডাকলো ঃ বাচ্চু—

বাচ্চু সাড়া দিল না।

ঃ বাচ্চু, তুইও আমাকে দূর করে দিলি? বাচ্চু—

ছুটে গিয়ে সে বাচ্চুকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। আর পারলো না সে। কান্নায় একেবারে ফেটে পড়লো।

সেই থেকে কেউ কথা বলে না কেতকীর সঙ্গে।

কেতকী এ বাড়িতে একেবারে নিঃসঙ্গ।

এ বাড়ির কেউ তাকে ক্ষমা করে নি।

হেরম্ববাবু, যোগমায়া দেবী, করবী—কেউ না। তবে সে কি করবে?

কোন একজনের কাছে তো তাকে ক্ষমা পেতে হবে। কে তাকে ক্ষমা করবে? যোগমায়া দেবীর ঘরে ঠাকুর নেই। থাকলে কেতকী হয়তো তাঁর কাছেই ক্ষমা চাইতো।

তবে কে তাকে ক্ষমা করবে?

সেদিন সন্ধেয় সে সুরঞ্জনের দু চোখে ক্ষমা দেখেছিল।

আজ সে তাই খুঁজতে এসেছে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো ঃ কেন? নিশীথ কি তোমার সঙ্গে কোন প্রতারণা করেছে? কোন ছলনা?

কেতকী কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে বিছানার পাশে মেঝের ওপর বসে পড়লো। তা দেখে সুরঞ্জন বললো ঃ বিছানার ওপরে উঠে বসো, কেতকী।

কেতকী তেমনি বসে রইলো। কাঁদছিল সে। বিছানার ওপরে সে নিজের থেকেই মাথাটাকে চেপে ধরলো।

ঘরে আলো ছিল না। অন্ধকার।

সেই ছুঁচ-ফুটানো অন্ধকারে সুরঞ্জন শুনলো শুধু ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। আর শুনলো এক বিধ্বস্ত হৃদয়ের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী।

হালদার বাগান লেনের অন্ধকার থেকে পালিয়ে তারা হেদুয়া পার্কের কাছে একটা ভাঙা পোড়ো বাড়িতে কয়েকদিন লুকিয়ে ছিল। সেখানে নিশীথের দূর সম্পর্কের এক মাসী থাকে। সেই মাসীর কাছে কেতকীকে রেখে নিশীথ সারাদিন কোথায় চলে যায়। রাতে আসে। মাসীকে টাকা দেয়। মাসী তাকে আর নিশীথকে থাকতে দেয় একটা ঘরে।

এমনিভাবে ক'টা দিন কাটলো।

কিন্তু তারপর কেতকী হাঁপিয়ে উঠলো। এ কেমন ধরনের জীবন? এমন জীবন তো কেতকী চায় নি। নিশীথও তো তাকে এমন জীবন-যাপনের আশা দেয় নি। তবে সে তাকে এখানে এনে কেন তুললো?

এ যে এক-অন্ধকার থেকে আরেক-অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়া।

এ কী করলো সে?

নিশীথ তবুও তাকে ভরসা দেয়ঃ এতেই তুমি ভেঙে পড়লে, কেতকী? এটাকে তুমি পারমানেণ্ট মনে করছো কেন? এ তো কয়েক দিনের মামলা। তারপর আমরা চলে যাবো।

কেতকী জিজ্ঞেস করেছিলঃ কোথায়?

ঃ বাইরে কোথাও।

ঃ কোথায় শুনি?

ঃ দার্জিলিং, সিমলা, বোম্বে, না হয় ওয়াল্‌টেয়ার—

বাইরে যাবার কথায় কেতকীর মনটা নেচে ওঠে। বলেঃ সত্যি?

কিন্তু তার পরেই মনটা কেমন যেন দমে যায়। বলেঃ বাইরে যাবে বলছো, কেন বলো তো?

ঃ বারে। তোমাকে নিয়ে 'হানিমুনে' যাবো না?

কেতকী ধীরে ধীরে বলেঃ বিয়ে না করেই 'হানিমুন'?

ঃ দোষ কি? বিয়ে মানে তো কতকগুলো আবোল তাবোল মন্ত্র—এ্যাঁ?

: তা কেন? রেজেষ্ট্রী—

: দুর্। আমার ও সবেতেও বিশ্বাস নেই। কাগজে সই করলেই বিয়ে, নয়তো বিয়ে নয়? এত সবের পরেও তুমি কাগজে সই করতে বলছো? কাগজ ছেঁড়া যায়, মন কি ছেঁড়া যায়, কেতকী?

সারাক্ষণ কেতকীর মনে বাজতে থাকে একটা কথা: কাগজ ছেঁড়া যায়, মন কি ছেঁড়া যায়, কেতকী?

অন্ধকার বিছানায় নিশীথের বুকে মুখ লুকিয়ে কেতকী বলেছিল: তাহলে চলো। কালই চলে যাই—

: কোথায়?

: বাইরে—

: যাই বললেই তো আর যাওয়া যায় না। বাড়ি থেকে টাকা সরাতে হবে। তবে তো—

: বাড়ি থেকে টাকা সরানো? মানে তুমি টাকা চুরি করবে?

শুনে নিশীথ হাসে। বলে: বাড়ি থেকে টাকা চুরি আবার চুরি নাকি? সে তো আমারই টাকা। বাবা বেঁচে আছে, তাই বাবার। বাবার পরে তো ও টাকা আমারই। নিজের টাকা নেওয়া কি চুরি করা?

কেতকী সোজা হয়ে নিজের বালিশে শোয়।

নিশীথ তাকে কাছে টেনে এনে বলে: চুরির কথা শুনে যে তুমি একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে, কেতকী। এখন কোত্থেকে টাকা এনে মাসীকে দিচ্ছি, তা জানো?

কেতকী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে: কোত্থেকে?

নিশীথ বলে: কোত্থেকে আবার? পকেট মেরে—

: পকেট মেরে?

: হ্যাঁ। বন্ধুদের পকেট মেরে।

কেতকীর দুচোখে ঘরের অন্ধকার যেন বড় বেশি কালো হয়ে ওঠে। সে কিছু বললো না। নিশীথ হেসে বলে: ধার বলে তাদের

কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসছি। ওরা ভাবছে শোধ করে দেব। কিন্তু কোনদিন দেব না।

: কেন দেবে না ?

: আরে দূর্! বন্ধুদের টাকা আবার শোধ দিতে হয় নাকি ? ও তো দক্ষিণা। তুমি কিছু ভেবো না। আমি বাড়ি থেকে টাকা সরাই। তারপর চলে যাব এখান থেকে।

: তাই চলো। আমার আর এখানে একদম ভাল লাগছে না।

: আমারই কি ভালো লাগছে, কেতকী ? কোথাকার কোন্ মাসী, তার ঠিক নেই। টাকা নিয়ে হোটেল খুলেছে এখানে।

কেতকী আবার কিছুক্ষণের জন্যে নীরব হয়ে যায়।

নিশীথ জিজ্ঞেস করে : কি হলো, চুপ করে আছো যে ?

: কলকাতা ছেড়ে যেতে বড়ো কষ্ট হবে।

: কিসের কষ্ট ?

: বাবা অসুস্থ। তাকে কি আর দেখতে পাবো ? মা, করবী আর—

: তুমি একটা আস্ত পাগল। মা, বাবা, করবী কি কারো চিরদিন থাকে ? এ পৃথিবীতে কেউ কারো নয়, বুঝলে ?

কেতকী ফুপিয়ে কাঁদছিল। বললো : বাচ্চুর জন্যে মনটা বড় কাঁদছে। নিশ্চয়ই সে আমার কথা ভাবছে। আমাকে কতো খুঁজছে।

নিশীথ এবার রাগ করে। বলে : তাহলে কাল সকালেই ফিরে যাও।

কেতকী চুপ করে থাকে। কি যেন ভাবে। বলে : ফেরার মুখ আর আমার নেই।

দুদিন পরেই তারা সেই পোড়ো বাড়ি থেকে রওনা দিল।

ট্রেনে বসে কেতকীর মনটা দুঃখ ও আনন্দ—এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে গেল। নতুন জায়গা দেখার আনন্দের সঙ্গে বাবা-মা-বাচ্চুকে ছেড়ে যাবার দুঃখ মিশে একাকার হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ সে নিঃশব্দে জানলার বাইরে চলন্ত পৃথিবীর দিকে চেয়ে রইলো। গাড়ির দোলায় দুলছে ট্রেন, সমস্ত শরীর, সমস্ত মন। কেতকীর চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠলো এক উজ্জ্বল পৃথিবী, সেখানে অসুস্থ বাবার কাত্‌রানি নেই, মার বিষণ্ণ মুখ নেই, ঘরের অন্ধকার নেই, কোন অভাব নেই। সেখানে সে আছে আর নিশীথ আছে। আর বিশ্বজোড়া আলো আছে।

এক জোড়া বুনো হাঁসের মতো তারা উড়ে চলেছে। মাথার ওপরে বিশাল নীল আকাশ, সামনে আলো-বাতাসের উজ্জ্বল হাতছানি। পেছনে পড়ে রইলো ধোঁয়া-আর-অন্ধকারে-ভেজা এক পুরাতন পৃথিবী।

নতুন পৃথিবীতে কেতকী মনে মনে বাসা বাঁধছে। সেখানে সে মনের মতন করে ঘর সাজিয়েছে। আলো আছে, বাতাস আছে, প্রকাণ্ড নীল আকাশ আছে মাথার ওপর। ছোট্ট একটু বাগান। জানলায় আকাশী রঙের পর্দা। ঘরে রবীন্দ্রনাথের ছবি, ফুলদানিতে কিছু রজনীগন্ধার স্টিক্। আর কি চাই? এইতো বেশ!

না, আর বেশি কিছু নয়।

একটু সচ্ছলতা আর একটি একনিষ্ঠ হৃদয়।

কেতকী জিজ্ঞেস করলো: এখন আমরা তাহলে কোথায় চলেছি?

নিশীথ উত্তর করেছিল: পুরী—

ট্রেনের শব্দ 'পুরী' কথাটাকে নিশীথের মুখ থেকে লুফে নিয়ে নানা ছন্দ রচনা করে ছুটে চললো।

পুরীর একটা হোটেলে উঠেছিল তারা। হোটেলে উঠবার আগে কেতকীকে তার নিজের সিঁথিতে একটু সিঁদুর লেপে নিতে হয়েছিল। সেই সিঁদুর যে কতো মিথ্যে, কতো অর্থহীন—তা কেতকী আর নিশীথের মতো আর কে জানতো?

দুজনেই তাই নিয়ে কতো হাসাহাসি করেছে। কেউ বলেছে সতীত্বের লেবেল, কেউ বলেছে বিবাহিতার বিজ্ঞাপন।

সে যাই হোক, হোটেলে তাদের কোন অসুবিধেই হয় নি।

হোটেলের সামনেই সমুদ্র। সমুদ্রের অসংখ্য ঢেউ। সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, নুলিয়াদের সমুদ্র-যাত্রা—সবই কেতকীর মনে পরম আনন্দের স্মৃতি হয়ে জেগে রইলো। মাঝে আবার কিছুদিন তারা ভুবনেশ্বর, কোনারক, চিল্কা ঘুরে এলো।

আবার পুরীর সেই হোটেল।

সেই একই ঘর, সেই একই সমুদ্রের গর্জন, জলের তোলপাড়, সেই একই ঠাকুর-চাকরের রান্না। যুবক ম্যানেজারের সেই নিপুণ ব্যবসায়ীর ভঙ্গিতে প্রশ্ন: কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো, বৌদি? হলেই জানাবেন কিন্তু—

ছিম্‌ছাম্‌ চেহারার সেই ম্যানেজারকে কেতকীর বড়ো ভালো লেগেছিল। সে-ই তো তাকে প্রথম বৌদি বলে ডেকেছিল।

কিন্তু সেই ডাক কদিন পরে কেতকীর বড়ো কৃত্রিম বলে মনে হলো।

আর ভালো লাগছিল না কেতকীর। পুরীতে সে একেবারে হাঁপিয়ে উঠলো।

কেতকী কি এই রকম জীবন চেয়েছিল? মুরগীর খাঁচার মতো হোটেলের এই বন্দী-জীবন তো সে কোনকালেই চায় নি। সে চেয়েছিল একটি সুখের সংসার। ঘর বাঁধতেই চেয়েছিল সে, উড়ে বেড়াতে চায় নি।

সাজানো-গোছানো ঘর। হ্যাঁ, সারাদিন সে তা নিজের হাতেই সাজাবে, নিজের খুশিমতো গোছাবে। সেখানে রান্না করবে ইচ্ছে মতো। কাপড়ে হলুদের ছোপ লাগবে, গরম ফ্যানে হাত পোড়াবে। তবু তার কোন কষ্টই থাকবে না। নানা রকমের রান্না করে সে বসে নিশীথকে খাওয়াবে।

পুরী তার বড়ো একঘেয়ে লাগছে। আর ভালো লাগছে না এখানে।

হাওয়া-বেরিয়ে-যাওয়া বেলুনের মতো পুরীতে কেতকীর শেষ দিনগুলো একেবারে চুপ্‌সে গেল।

তারই মধ্যে একদিন নিশীথ বললো ঃ টাকা পয়সা যা এনেছিলাম, সব তো ফুরিয়ে এলো। এখন তো ফিরতে হয়। কি বলো?

নিশীথের কথায় কেতকীর মন আনন্দে নেচে উঠলো। বললো ঃ চলো। আমারও আর এখানে ভালো লাগছে না। কতোদিন হলো কলকাতা ছেড়ে এসেছি, বলো তো?

আবার দুদিন কাটলো।

পুরী-বাসের দিন ফুরিয়ে আসছে। শেষের দিনগুলো আনন্দে ভরে তুলতে হবে তো! মনের আনন্দে কেতকী সমুদ্রে স্নান করলো, চরে ঝিনুক কুড়িয়ে ঘুরে বেড়ালো। আরো গভীর মনোযোগের সঙ্গে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখতে লাগলো।

কি জানি, আবার কবে পুরী আসতে পারবে তারা।

সেদিন দুপুরে নিশীথ স্যুটকেশ গুছোতে সুরু করে দিল।

কেতকীও সঙ্গে লেগে গেল জিনিসপত্র গুছোতে। শাড়িখানা ভাঁজ করতে করতে কেতকী জিজ্ঞেস করলো ঃ ট্রেন কখন?

সংক্ষেপে নিশীথ উত্তর করলো ঃ সন্ধ্যেয়—

কেতকী লক্ষ্য করছে, নিশীথ আজ বড় অন্যমনস্ক। কি যেন সে ভাবছে। কেতকী তার মনের কোন হদিশ খুঁজে পাচ্ছে না।

নিশীথ ডাকে ঃ কেতকী—

ঃ কি?

ঃ এখন তো দুজনের কলকাতা ফেরার মতো টাকা নেই। তাছাড়া হোটেলেও অনেক টাকা বাকি পড়ে গেছে। এখানে টাকা না মিটিয়ে তো আর যাওয়া চলে না। বন্ধুদের কাছে টাকার জন্যে চিঠি লিখেছিলাম। কোন শ্লা-ই উত্তর দেয় নি। এখন কি করা যায়, বলো তো?

নিশীথ যে ভয়াবহ চিত্র আঁকলো, কেতকী তার কোন কূল কিনারা খুঁজে পেল না। শুধু জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমার কাছে এখন কতো আছে?

নিশীথ তার পকেট থেকে কয়েকটা খুচরো টাকা আর একখানা ট্রেনের টিকিট বের করে এনে সামনের টেবিলের ওপর রাখলো।

কেতকী জিজ্ঞেস করলো : একখানা টিকিট কেন ?

নিশীথ কেতকীকে পাশে বসিয়ে বললো : সেই জন্যেই তো বলছি।

: কি বলছো ?

: তুমি অবস্থাটা বুঝতে পারছো তো, কেতকী ?

কেতকী চুপ করে রইলো।

নিশীথ বলে : আমি বলছি কি ? দুটো দিন তুমি এখানে থাকো। আমি টাকা নিয়ে ফিরে আসছি। তাছাড়া কলকাতায় গিয়ে বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে তো। বাবা রাজি না হলে একটা বাড়ি ভাড়া করে রেখে আসবো। সেখানে গিয়ে দুজনে উঠবো। ঠিক তুমি যেমনটি চাও আর কি !

বলে নিশীথ একটু হাসলো।

কেতকী বললো : আমি থাকবো ? এখানে ? একা ? আর তুমি চলে যাবে ?

: হ্যাঁ। কি হয়েছে তাতে ? দুটো দিন মাত্র। তারপর তো আমি ফিরে আসছি।

: না। তা হবে না। আমি এখানে একা থাকতে পারবো না। তোমার সঙ্গে যাবোই।

নিশীথ বলে : একটা কথা কেন বুঝতে পারছো না, কেতকী ? এটা প্রেষ্টিজের প্রশ্ন। টাকা না দিয়ে এখান থেকে যাওয়া চলবে না। আর কলকাতা না গিয়ে টাকা পাওয়াও যাবে না। এখন যদি অবুঝ হও, আমি কি করি, বল তো ?

কেতকী কি ভাবলো। বললো : ঠিক কবে আসছো, বলে যাও। আমি কিন্তু তোমার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকবো।

নিশীথ কেতকীকে বুকে চেপে ধরে বলে : লক্ষ্মী সোনা ! এই তো কথার মতো কথা।

কেতকীর দুচোখে জল এসে পড়লো।

ঃ কই বললে না তো কবে আসছো?

ঃ পরশু—

ঃ ঠিক?

ঃ ঠিক।

সেদিন সন্ধেয় কেতকী নিশীথকে ট্রেনে তুলে দিতে গেল।

ট্রেনে নিশীথের পাশে বসে সে বললোঃ আমি এই বসলাম, আর নামবো না।

নিশীথ হাসলো একটু। বললোঃ তোমাকে এম্‌নি পাশে বসিয়েই নিয়ে যাবো। বুঝলে?

দরজা দিয়ে কেতকী মানুষের ব্যস্ততা দেখছে। ব্যস্ততা বাড়ছে ক্রমাগত। ট্রেন ছাড়তে বুঝি আর বেশি দেরি নেই।

কেতকী জিজ্ঞেস করেঃ কলকাতায় গিয়ে আমার কথা ভুলে যাবে না তো?

নিশীথ বলেঃ আরে দূর্‌। তা কি হয়? তোমাকে ভুলবো আমি? কি যে বলো—

ট্রেনে প্লাটফর্মে মানুষের ব্যস্ততা আরো বাড়ছে।

নিশীথ কব্জি ঘড়িটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলেঃ ট্রেন ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই। এবার তুমি নেমে যাও, কেতকী।

ঃ আমি নামবো না। তোমার সঙ্গে যাব কলকাতায়।

ঃ যাবেই তো। তবে আজ নয়—

ঃ না। আজই—

ঃ হোটেলে যে জিনিসপত্র পড়ে রইলো—

ঃ পড়ে থাক। আমি যাবো—

ঃ ছেলেমানুষী করো না, কেতকী। নেমে পড়ো—

কেতকীর হাত ধরে নিশীথ প্লাটফর্মে নেমে এলো। বললোঃ তোমাকে একা রেখে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তাছাড়া উপায় নেই, কেতকী।

কেতকী একবার নিশীথের মুখের দিকে তাকালো। জলের ভারে আর চোখ তুলে তাকাতে পারলো না।

ট্রেন চলতে আরম্ভ করেছিল। নিশীথ ছুটে গিয়ে চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়লো। নিশীথকে যতক্ষণ দেখা গেল, কেতকীর চোখে পলক পড়লো না। তারপর কিছুক্ষণ পরে সমস্ত ট্রেনের ছায়াটা ঝাপ্‌সা হয়ে তার দুচোখ থেকে মুছে গেল।

চোখ মুছে সে চেয়ে দেখলো, প্লাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেছে। লোক-জনের ব্যস্ততা আর নেই।

এক আশ্চর্য শূন্যতা কেতকীর মনে ফেলে রেখে নিশীথ চলে গেল। আর কেতকী রিক্সায় করে হোটেলে ফিরে এলো একা একা।

রাস্তার দুপাশে আলো, ঝাউ গাছ, চরের বালি আজ তার কাছে বড়ো রুক্ষ, বড়ো ধূসর লাগলো। হোটেলে কিছু না খেয়েই সে শুয়ে পড়লো নিঃশব্দে। বিছানায় শুয়ে ভাবলো, কাল সকাল হবে। কালকের দিনটাও কেটে যাবে। তারপর পরশু দিন আসবে। সেদিন তো নিশীথ আসবে। তখন হোটেলের এই সমুদ্রমুখী ঘরটা আর নিঃসঙ্গ লাগবে না।

সে চোখ বোজে। চোখ বুজলেই তো একটা দিন।

পরের দিন সকাল হলো।

যাক, আর একটা দিন।

একটা নিশ্বাস ফেলে কেতকী সমুদ্রের চরে বেরিয়ে পড়লো। সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে একা-একা বি. এন. আর. হোটেলের দিকে হেঁটে গেল। পা দিয়ে বালি সরিয়ে ঝিনুক কুড়িয়ে আঁচলে ভরতে লাগলো। ফিরবার সময় সবগুলো ঝিনুক একটা বাচ্চা মেয়ের হাতে ঢেলে দিয়ে সে হোটেলে চলে এলো।

সেদিন সে সমুদ্রে স্নান করতে গেল না। হোটেলের বাথরুমেই স্নান সেরে নিল।

পুরীতে নিশীথ-ছাড়া তার একটা দিন কেটে গেল।

পরের দিন বেলা নটার মধ্যেই স্নান করে সে স্টেশনে গেল। আজ নিশীথ আসবে কলকাতা থেকে।

দুদিন সে চুল বাঁধে নি, ইস্ত্রি-করা কাপড় ভাঙে নি। আজ সে চুল বেঁধেছে, ইস্ত্রি-ভাঙা কাপড়ও পরেছে। আজ যে নিশীথ আসবে। কেতকীর আজ ভারি আনন্দ।

ট্রেন আসবার অনেক আগেই কেতকী স্টেশনে গিয়ে হাজির।

ট্রেন এলো। অনেক লোক এলো। কেতকী ভিড়ের মধ্যে নিশীথকে খুঁজলো। কিন্তু নিশীথ কই?

নিশীথ তো এলো না। নিশীথ এলো না কেন?

কেতকী ভাবে, তা কি হয়? নিশীথ কি না এসে পারে? সে এসেছে নিশ্চয়ই। ভিড়ে তাকে কেতকী খুঁজে পাচ্ছে না। নিশীথকে যে আসতেই হবে।

সারা প্লাটফর্ম জুড়েই ভিড়। এতো লোকের ভিড়ে কি নিশীথকে খুঁজে পাওয়া যায়? নিশীথ নিশ্চয়ই এসেছে। এই ভিড়ে কেতকীকে সে দেখতে না পেয়ে হয়তো সোজা হোটেলে চলে গেছে।

কেতকী রিক্সায় করে তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে আসে।

হোটেলে ফিরেও সে নিশীথকে দেখতে পায় না।

হয়তো ভিড় ঠেলে ট্রেন থেকে নামতে নিশীথের দেরি হয়ে গেছে। কিংবা হয়তো রাস্তার মধ্যে সাইকেল রিক্সাটা খারাপ হয়ে গেছে।

কেতকী রাস্তার দিকের বারান্দায় নিশীথের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দিন ফুরিয়ে রাত এলো। রাত ভোরও হলো। তারপর কতোবার সূর্য উঠলো, সূর্য ডুবলো। সমুদ্র বুক ফাটিয়ে হু হু করে কাঁদলো।

এবার কেতকীর পালা। কেতকীও সমুদ্রের মতো বুক ফাটিয়ে ক দিন কাঁদলো। নিশীথ এলো না। নিশীথের কোন চিঠিও এলো না।

তবু আশা যায় না।

যদি নিশীথ আসে।

কিন্তু পনেরদিন কাটলো। আর কতোদিন সে শবরীর মতো প্রতীক্ষা করবে? কেতকী একদিন মন ঠিক করে ম্যানেজারকে বললো। শুনে ম্যানেজার বললো: এ আর নতুন খবর কি, বৌদি? এতো আকৃচারই হচ্ছে। আপনি তাহলে এবার ঘর ছেড়ে দিন।

: আমিও তাই ভাবছিলাম, ম্যানেজার বাবু। কিন্তু আপনার কতো টাকা বাকি আছে বলুন তো?

: দেড়শ' টাকার মতো হবে।

কেতকী হাতের ক গাছি চুড়ি, আর হাতের একটা আংটি খুলে ম্যানেজারের হাতে দিয়ে বললো: এতে আপনার টাকা শোধ হবে না?

ম্যানেজারবাবু একটু চিন্তা করে বললো: আর কিছু নেই কাছে?

কেতকী বললো: গলার সরু এক গাছি হার।

: ঠিক আছে। ওটা থাক্। আমার একটু ক্ষতি হয়ে গেল আর কি?

কেতকী বললো: হারটা থাকলেও তো চলবে না, ম্যানেজার-বাবু।

: কেন?

: কলকাতায় ফিরবো না?

: কলকাতায় ফিরবেন?

: তাছাড়া কোথায় যাবো?

ম্যানেজার হাসতে থাকে। বলে: কলকাতায় যেতে চাইছেন, যান। কিন্তু এসব কেসে কেউ আর কলকাতায় ফেরে না।

: ফেরে না? তবে কোথায় যায়?

: ইণ্ডিয়ায় অনেক জায়গা আছে, বৌদি।

কেতকীর মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। ম্যানেজারবাবু কি বিশ্রী ইঙ্গিত করলেন তাকে। সে শক্ত গলায় বলে: থাকুক। হারটা নিয়ে আমাকে কিছু টাকা দিন। আমাকে কলকাতায় ফিরতেই হবে।

গলার হারটা খুলে দিতে কেতকীর বড় কষ্ট হচ্ছিল। হারটা যে তার মায়ের দেওয়া—এক জন্মদিনের উপহার।

আর তার গায়ে এক রত্তিও সোনা রইলো না।

এবার কলকাতায় পাড়ি।

পুরীতে পড়ে রইলো নিশীথের-সঙ্গে-কাটানো কতকগুলি আনন্দ-ঘন দিন।

ট্রেনে বসে কেতকী ভাবতে লাগলো। এবার সে কোথায় গিয়ে উঠবে? নিশীথের দেখা পাবে কি করে? সে তো নিশীথের ঠিকানা জানে না। নিশীথ তাকে কোনদিন তা বলে নি। সব বলেছে সে। বাবার কথা, মার কথা, বিষয়-আশয়ের কথা। কিন্তু ঠিকানার কথা তো কখনো বলে নি সে। মিঠুয়া তাকে মাঝে মাঝে তার কথামতো রাস্তার আড্ডা থেকে ডেকে আনতো। কোথায় তার আড্ডা, তা কেতকী জানে না।

নিশীথ কি তাহলে এতদিন তার সঙ্গে প্রতারণাই করেছে? শুধু ভালোবাসার খেলা? এতদিন সে যত কথা বলেছে, সব কি তাহলে মিথ্যে?

মিথ্যে ছাড়া আর কি!

সে তাকে বিশ্বাস করেছিল। বিশ্বাস করে নিজেকে সে সম্পূর্ণ-ভাবে তুলে দিয়েছে তার তাতে, তার খেয়ালখুশির হাতে। তারপর সে তাকে দূর বিদেশের এক হোটেলে ফেলে পালিয়ে গেল ভীরুর মতো। বলেছিলঃ ফিরে আসবো। আবার তোমাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবো। কিন্তু সে তো আর ফিরলো না। এর নাম প্রতারণা ছাড়া আর কি হতে পারে?

কেতকী আবার ভাবে, নিশীথ যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে? কিংবা কোন অ্যাক্সিডেন্ট? তাহলে সে নিশীথের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ করছে না কি?

তাই যদি হবে, তবে সে এতদিন তাকে বিয়ে করলো না কেন? সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে যদি মিথ্যে, রেজেষ্ট্রী করে বিয়েই বা সে করলো

না কেন? কাগজের সই মিথ্যে—নিশীথ তাকে বলেছিল। মনের সই-ই সত্যি। তবে এই পনেরো দিনে সে ফিরে আসতে না পারলেও একখানা চিঠি দিতে পারলো না?

এ কি ব্যবহার করলো নিশীথ তার সঙ্গে?

ট্রেনে বসে কেতকী ভাবছিল নিশীথের এতদিনের ব্যবহারের কথা।

নিশীথ এ কী নিষ্ঠুর খেলা খেললো তার সঙ্গে! তাকে তার বাপ-মায়ের আশ্রয় থেকে বের করে এনে দূর বিদেশে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেল?

ট্রেন কলকাতার কাছাকাছি এসে গেছে। এবার এলো নতুন ভাবনা।

কলকাতায় গিয়ে সে কোথায় উঠবে? কলকাতার কোন্ দরজা খোলা আছে, হে ঈশ্বর!

ট্রেন থেকে নেমে সে হাঁটতে লাগলো। হাওড়ার ব্রিজ পেরিয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে আহিরিটোলা ঘাট।

তখন সবে সকাল হয়েছে। স্নানের ঘাটে ভিড়। গঙ্গায় নেমে সে স্নান করলো। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা! আমার পাপ মোচন করো! আমি পাপ করেছি। আমাকে ক্ষমা করো মা।

মাথাটা জলে ডুবিয়ে আঙুলে আঁচল জড়িয়ে সিঁথিটাকে খুব করে ঘসলো। ভালোবাসার খেলার সিঁদূর গঙ্গার জলে মুছলো কি? আয়না কোথাও নেই। থাকলে একবার সে দেখে নিত, সিঁদূরটা ঠিকমতো মুছেছে কিনা।

আবার জলে মাথা ডুবিয়ে সে সিঁথিটাকে ঘসে। আবার ঘসে। আবার—

তারপর সে ওপরে উঠে এসে শুক্‌নো কাপড় পরলো।

সারাদিন ঘাটে বসে সে গঙ্গার ঢেউ গুনলো। তারপর সন্ধে হলে একটা রিক্সা ডেকে সে ফিরে এলো হালদার বাগান লেনের সেই-অন্ধকার বাড়িটাতে।

রাস্তায় তখন কেউ ছিল না। কেউ দেখতে পায় নি তাকে। দেখতে পেলে বোধহয় সে মরেই যেত।

কেতকীর বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

একটু থেমে সুরঞ্জন বলে: ও কি ধরনের ছেলে আমি জানতাম। তাই তার এ ব্যবহারে তুমি আশ্চর্য হয়েছো। কিন্তু আমি হই নি।

: তবে আপনি আগে আমাকে বলেন নি কেন?

: বলি নি। কিন্তু তোমার বোঝা উচিত ছিল। তার পোষাক-আশাক, কথাবার্তা দেখেও কি তুমি বুঝতে পারো নি?

কেতকী চুপ করে বসে রইলো।

তখনও কাঁদছিল সে। তার কান্নার আর বিরতি নেই।

এত সব শুনেও কি সুরঞ্জন কেতকীকে ভালোবাসে? সুরঞ্জন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার বুকের নিচে যে অনুভূতি আজ মাথা কুটছে, তার নাম কি? সে কি সহানুভূতি অথবা ভালোবাসা?

সুরঞ্জন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে শুয়ে রইলো। তারপর বড়ো চঞ্চল হয়ে উঠলো সে। বুকের ভেতরে তার কেমন একটা জ্বালা করতে লাগলো। ধীরে ধীরে সেই জ্বালা ছড়িয়ে পড়লো তার দুচোখে। দম তার যেন বন্ধ হয়ে আসছে। উঃ, ভারি কষ্ট হচ্ছে তার।

হঠাৎ সে ডেকে উঠলো: কেতকী—

: কেন?

: আলোটা জ্বালো, কেতকী। ঘরে বড়ো অন্ধকার—

কেতকী আলো জ্বাললো। সারা ঘরময় আলো যেন চিৎকার করে ফেটে পড়লো।

চোখ মেলে তাকাতে পারছিল না সুরঞ্জন। চোখ বন্ধ করেই শুয়েছিল সে। চোখ বন্ধ করেই সে জিজ্ঞেস করলো: কলকাতায় ফিরে আর নিশীথের খোঁজ করো নি?

: করেছিলাম।

সুরঞ্জন চেয়ে দেখে, কেতকী দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুহাতে মুখটা ঢেকে। বোধহয়, এ আলো সে সহ্য করতে পারছে না। সুরঞ্জন আবার চোখ বন্ধ করে জিজ্ঞেস করে
ঃ কোথায়? তার বাড়িতে?

ঃ না। মিঠুয়া তার বাড়ি কোথায় জানে না। তার বন্ধুদের সে জিজ্ঞেস করেছিল।

ঃ তারপর? তারা কি বলেছে?

ঃ তারা ঠিকানা দিয়েছিল। মিঠুয়া সেখানে গিয়ে একটা খাটাল দেখতে পেয়েছে শুধু। নিশীথ মিথ্যে কথা বলেছিল। তার বাবা দুধের ব্যবসাই করে। আর কিছু করে না।

ঃ আর নিশীথ?

কেতকী চুপ করে থাকে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে ঃ নিশীথ কি করে?

ঃ সে কি করে, কোথায় থাকে—কেউ জানে না।

ঘরময় আশ্চর্য নীরবতা।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হলো। বোধহয় নবেন্দুবাবু আর ছবি-বৌদি বেড়িয়ে ফিরলেন। জুতোর শব্দ দোতলার একপাশে ফিকে হয়ে গেল।

কেতকী বলে ঃ তাহলে আপনিও কি আমাকে ক্ষমা করলেন না?

ঃ আমাকে একটু একা থাকতে দাও, কেতকী।

ঃ বুঝেছি, আপনিও না।

সুরঞ্জন চোখ খুলে তাকালো। কেতকী নেই। কখন নিঃশব্দে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। আর ঘরে ফেলে গেছে একখানা বিশাল শূন্যতা।

সুরঞ্জন অন্যদিকে পাশ ফিরে শুলো।

কয়েকদিন পরেই সুরঞ্জন সেরে উঠলো।

সেদিন অফিসে গিয়েছিল সে। নিজের টেবিলে বসে সে কাজ করছিল। এমন সময় ডিরেক্টারের পার্সোন্যাল বেয়ারা এসে তাকে বললো : বড় সাহেব আপনাকে ডেকেছেন।

কাজ ফেলে রেখে সুরঞ্জন ডিরেক্টারের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালো।

ডিরেক্টার কাকে ফোন করছিলেন। ফোনে কাকে যেন তিনি বলছিলেন : ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করবেন। এ্যাঁ? ক্ষমা করলেন তো?

একটু থেমে বললেন : না। ভবিষ্যতে আর এ রকম হবে না।

সুরঞ্জনকে তিনি ইশারায় বসতে বললেন। তারপর ফোনে বললেন : আচ্ছা। দেখবেন, ভবিষ্যতে আর হয় কিনা।

টেলিফোন রেখে সুরঞ্জনের দিকে ঘুরে বসলেন বড় সাহেব। বললেন : তোমারই জন্যে আমাকে লোকের কাছে বেইজ্জত হতে হলো।

সুরঞ্জন তো অবাক হয়ে গেল। বললো : আমার জন্যে?

: হ্যাঁ। শুনলে না? আমাকে বাধ্য হয়ে ক্ষমা চাইতে হলো।

: ক্ষমা? আপনাকে? কার কাছে?

: যার নামে লিখেছিলে। তোমাকে কন্‌ফারেন্সের রিপোর্ট পাঠাবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। কন্‌ফারেন্সের বাইরে কে কি করলো, তার রিপোর্ট পাঠাতে কে বলেছিল?

সুরঞ্জন কি বলতে যাচ্ছিল। তাকে বলতে না দিয়ে ডিরেক্টার বললেন : লিখলে আবার এমন লোকের নামে, যে ক্ষেপলে আমাদের কাগজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর কী সব কেচ্ছাকাহিনী—ছি ছি।

সুরঞ্জন বললো : ঘটনা ঘটতে পারে আর লিখলেই যত দোষ?

ডিরেক্টার সাহেব বললেন : Certainly! 'There are many things in heaven and earth, that can be dreamt of, Horetio!' তাই বলে সব কথা তুমি লিখতে পারো না।

ঃ বেশ। আর লিখবো না।

ঃ আর একবার তুমি কার নামে কি যেন লিখেছিলে, তার জন্যে আমার কাছে টেলিফোন এসেছিল। তাও তোমাকে জানানো হয়েছিলো।

সুরঞ্জন জানালো যে, তা হয়েছিল।

ঃ তবে ?

ঃ এবার থেকে আর হবে না।

ঃ এতদিন কাজ করছো, বুঝতে পারছো না যে, কলমে ধার থাকলে এ যুগে চলে না। কলমটাকে একটু ভোঁতা করে নাও, বুঝলে হে—

সুরঞ্জন মাথা নেড়ে একটা নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

মনটা তাই তার একেবারে ভালো ছিল না।

এই নিয়ে দু বার সে বড় সাহেবের ধমক্ খেলে।

মেজাজটা তাই আজ বড়ো বিশ্রী হয়ে আছে।

তার ওপর বাড়িতে এসে সে দেখলো, মিঠুয়া ঘরে নেই। নিচে গেল সে। সেখানেও মিঠুয়া নেই। কোথায় গেল মিঠুয়া? মিঠুয়াকে নিয়ে আর পারা যায় না। ঘরে আজকাল এক মুহূর্তও সে থাকে না। শুধু এখানের কথা ওখানে, ওখানের কথা এখানে করে বেড়ায়। আজ আসুক।

সে-ই তো নিশীথের কাছে কেতকীর কথা বয়ে নিয়ে গেছে। আর কেতকীর কাছে নিশীথের কথা। আজ কেতকীর এই অবস্থার জন্যে সেও তো খানিকটা দায়ী। তাকে কি সেইজন্যে রাখা হয়েছে ?

কতোক্ষণ পরে মিঠুয়া ঘরে ঢুকলো।

ঃ জানো, দাদাবাবু—

সুরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠেঃ আর জানাতে হবে না। তুই বেরিয়ে যা—

মিঠুয়া দাদাবাবুর এই চেহারা কখনও দেখে নি। সে জানতো তার দাদাবাবু একেবারে মাটির মানুষ। সে যে রেগেও যেতে পারে, সে এই প্রথম জানলো।

ধমক্ খেয়ে মিঠুয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে।

ঃ দাঁড়িয়ে রইলি যে! বেরিয়ে যা—

ঃ তোমার শরীর কি ভালো নেই, দাদাবাবু?

ঃ তাতে তোর কি? তুই বেরিয়ে যা আমার চোখের সাম্‌নে থেকে—

মিঠুয়া তেমনি চেয়ে রইলো।

ঃ আমি কি কোন দোষ করেছি, দাদাবাবু?

ঃ দোষ করিস নি? কোথায় থাকিস আজকাল? দেখা পাওয়া যায় না? এ্যাঁ?

অপলক চোখে চেয়ে রইলো মিঠুয়া।

ঃ এদিকে আয়।

মিঠুয়া কাছে এগিয়ে আসে।

সুরঞ্জন বলে ঃ নিশীথের কাছে তুই যেতিস্ কেন?

মিঠুয়া ভয়ে ভয়ে বলে ঃ বড়দি যেতে বলতো।

ঃ বড়দি যেতে বলতো—

চেঁচিয়ে উঠলো সুরঞ্জন।

ঃ বড়দি যেতে বললেন। আর উনিও চলে গেলেন। বলি, তুই আছিস্ কার কাছে? আমার কাছে, না বড়দির কাছে? কে তোকে রেখেছে?

মিঠুয়া ভয়ে ভয়ে বললো ঃ তোমার কাছে—

ঃ তবে? বড়দির কথাতে তুই চলে গেলি যে? আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলি?

মিঠুয়া নীরব।

ঃ কিরে? চুপ করে রইলি কেন? এতক্ষণ তো বেশ কথা বলছিলি। এখন চুপ করে আছিস যে? দিন রাত বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। দরকারের সময় তোকে একটু পাবার উপায় নেই। আমি কি তোকে এই রকম বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবার জন্যে রেখেছিলাম? যা, আজ থেকে তোকে আর আমার কোন

দরকার নেই। তোকে ছুটি দিয়ে দিলাম, যা। ক দিনের মাইনে পাবি তুই? এই মাসের? এই নে—

পকেট থেকে মিঠুয়ার একমাসের মাইনের টাকা বের করে সুরঞ্জন তার দিকে ছুঁড়ে দেয়। বলে ঃ যা, আর তোকে আমার দরকার নেই।

মিঠুয়া কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে ঃ এমন আর হবে না, দাদাবাবু।

ঃ আমি কোন কথা শুনতে চাই না তোর। তুই চলে যা—

টাকা কটা কুড়িয়ে নিয়ে মিঠুয়ার হাতে গুঁজে দিয়ে সুরঞ্জন উঠে দাঁড়ায়। বলে ঃ বেরো তুই আগে ঘর থেকে। নইলে আমি জামা কাপড় ছাড়বো না।

মিঠুয়া মুখ নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুরঞ্জন এগিয়ে গিয়ে দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

এতদিন সে মিঠুয়াকে ভালো বলেই জানতো। সে যে দূতীয়ালি করে একটা জীবনকে এভাবে ডোবাতে বসেছে, তা সে জানতেই পারে নি। জানতে পারলে সে অনেক আগেই মিঠুয়াকে বিদায় করে দিত।

আজ কেতকীর এভাবে সর্বনাশ হলো কেন? তার জন্যে মিঠুয়ার দূতীয়ালি কি একেবারে দায়ী নয়? আর মিঠুয়া যদি দায়ী হয়, সুরঞ্জন কেন দায়ী হবে না? আজ মিঠুয়াকে বিদায় করে দিয়ে সে ভালোই করেছে।

তার জন্যে তার এতটুকু দুঃখ নেই।

সুরঞ্জন পোষাক বদ্‌লালো। বাথরুমে গেল। জল ঢেলে ভালো করে স্নান করলো। তারপর ঘরে এসে চুপ্‌চাপ বসে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে দরজায় শব্দ হলো।

মিঠুয়া আবার ফিরে এলো নাকি? যদি সে ফিরে আসে, সুরঞ্জন তাকে তাড়িয়ে দেবে। তাকে আর সুরঞ্জনের কোন দরকার নেই!

সুরঞ্জন উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। দেখলো, মিঠুয়া নয়, অমিত রায়। অনেকদিন পরে অমিত রায়ের সঙ্গে তার দেখা হলো। ওদের খবর সুরঞ্জন অনেকদিন রাখে নি।

অমিতকে দেখে সুরঞ্জন হেসে বললোঃ আসুন, আসুন। অনেকদিন কোন খবর নেই যে আপনার ?

অমিত ঘরে এসে বসতে গিয়ে বলেঃ বড়ো ব্যস্ত। সময় একেবারে পাচ্ছি না।

সুরঞ্জন বললোঃ তাহলে দিনকাল এখন ভালোই যাচ্ছে, কি বলুন ?

অমিত হেসে তার কৃতজ্ঞতা জানায়।

ঃ তারপর ?

ঃ এখন কি করি বলুন তো ?

ঃ কিসের কি করবেন, বলছেন ?

অমিত বলেঃ বাবার খুব অসুখ। শিগ্‌গির তাঁকে হাসপাতালে না দিলে চলছে না।

সুরঞ্জন কখনো অমিতের বাবাকে দেখেনি। অমিতের মুখে তাঁর সম্বন্ধে সে যা শুনেছে, তাতে মনে মনে তাঁর একটা সুন্দর ছবি সে এঁকে নিয়েছে। সৌম্য সুদর্শন সেই বৃদ্ধের ছুচোখে স্নেহের অফুরন্ত উৎস। মনে মনে সুরঞ্জনও তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

তাঁর অসুস্থতার খবরে সুরঞ্জন একটু বিচলিত হয়ে পড়লো। বললোঃ এখনই হাসপাতালে চেষ্টা করুন। জানাশোনা না থাকলে বা চেষ্টা না করলে হাসপাতালে সিট্ পাওয়া যে এখন এক অসম্ভব ব্যাপার।

ঃ আজ সারাদিন তো সেই জন্যেই ঘুরেছি। কিন্তু কোথাও একটা সিট্ যোগাড় করতে পারলাম না। এখন কি করি, বলুন তো ? আপনার কি কোন জানাশোনা আছে ?

সুরঞ্জন কি একটু ভাবলো। বললোঃ জানাশোনা তো তেমন কিছু নেই। তবে আপনি যদি বলেন, কাল আপনার সঙ্গে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

এমন সময় ঘরে যোগমায়া দেবী ঢুকলেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, ঘরে সুরঞ্জন ছাড়া আর কেউ নেই। তাই অমিতকে দেখে তিনি একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে যান। ডাকেনঃ রঞ্জন—

: কেন?

: তুমি নাকি মিঠুয়াকে বকেছ?

: হ্যাঁ। বকেছি। শুধু বকিনি, ওকে আজ তাড়িয়ে দিয়েছি। ও বুঝি আপনাকে গিয়ে লাগিয়েছে?

যোগমায়া দেবী বললেন: না। নিচে গিয়ে ও কাঁদছিল। একেবারে ছেলেমানুষ—

সুরঞ্জন বলে: ছেলেমানুষ বলেই জানতাম। ও যে এতবড় শয়তান হয়ে উঠেছে, তা এতদিন আমি বুঝতে পারি নি। ও যে কী ভয়ানক দোষ করেছে, তা আপনি জানেন না।

: তা হোক্। এবারকার জন্যে ওকে ক্ষমা করে দাও। ও আর করবে না, বলেছে।

সুরঞ্জন চুপ করে রইলো। যোগমায়া দেবীর কথা সে ফেলতে পারলো না।

যোগমায়া দেবীর পেছনে মিঠুয়া বোধহয় চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়েছিল। তাকে ডেকে তিনি বললেন: যা, দাদাবাবুকে চা দিয়ে আয়। নিচে চল, আর এক কাপ চা নিয়ে আসবি।

মিঠুয়া টেবিলের ওপরে চায়ের কাপ রেখে বেরিয়ে যায়। যোগমায়া দেবীও বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে মিঠুয়া আর এক কাপ চা দিয়ে গেল।

সুরঞ্জন আর অমিত তুজনে চা খেল।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে: কি অসুখ আপনার বাবার?

অমিত বলে: ওখানকার ডাক্তার বলেছে স্ট্রোক—

: তাহলে তো শিগ্‌গির হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। এখন কি রকম আছেন?

: সেন্সলেস্—

সুরঞ্জন মনে মনে হাসে। রোগী জ্ঞান হারিয়েও এখানে হাসপাতালে সিট্ পায় না। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান কী-ই না করেছে।

সুরঞ্জনের মনে পড়ে নিশিকান্তবাবুর কথা। দেশের উন্নতির কি সুন্দর চিত্র তিনি সেদিন এঁকেছিলেন। মনে পড়লে আজও সুরঞ্জনের হাসি পায়।

অমিত বলে : আপনাকে আরেকটা কথা বলা হয় নি।

: কি?

: আমি স্টুডিও খুলেছি।

: তাই নাকি? কোথায়?

: চৌরঙ্গী রোডেই।

একটু থেমে অমিত বলে : বলেছিলাম, চৌরঙ্গী রোডে স্টুডিও খুলবো না। কিন্তু ভেবে দেখলাম, কেন খুলবো না? রিণা আমার কে? কেন আমি তার কথা রাখতে যাবো? সে আমার কোন্ কথা রেখেছে?

সুরঞ্জন বলে : যাক্। আপনি যা চেয়েছিলেন, তাই এখন পেয়ে গেলেন।

: কি চেয়েছিলাম?

: বারে, আপনি কি চেয়েছিলেন, তা আপনিই জানেন না?

অমিত অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। বলে : কি চেয়েছিলাম, বলুন তো?

: কি আবার! চৌরঙ্গী রোডে স্টুডিও—

অমিত সত্যি ভুলে গিয়েছিল। সে বলে : হ্যাঁ। ভুলে গিয়েছিলাম। মনের অবস্থা আজ ঠিক নেই। আপনি একদিন গিয়ে দেখে আসবেন কিন্তু—

: আচ্ছা।

: এখন তাহলে আমি আসি।

একটু থেমে সে বললো : এখন আগরপাড়া যাচ্ছি। কাল একবার আপনি সঙ্গে গিয়ে একটা সিটের চেষ্টা করবেন তো?

সুরঞ্জন কি একটু ভেবে নিল। বললো : বেশ। কাল তাহলে আমি ছুটি নিচ্ছি।

অমিত উঠে দাঁড়ালো।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো ঃ কাল আপনি কখন আসছেন ?

ঃ সকালেই—

বলে অমিত অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে অমিত এলো না।

সুরঞ্জন তার পথ চেয়ে বসে রইলো। অমিত এলে সে তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাবে। একটা সিটের জন্যে ধরাধরি করবে। মিঃ রায়কে যেমন করেই হোক সারিয়ে তুলতে হবে। আজকের পৃথিবীতে তাঁরাই তো একমাত্র ভরসা। তাঁরা চলে গেলে পৃথিবীর সব আলো নিবে যাবে।

দুপুর গড়িয়ে গেল। তবু অমিত এলো না। আর সুরঞ্জন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলো তার। অমিতের ওপর ভারি বিরক্ত হলো সে। লোকটার কোন কথার ঠিক নেই।

বিরক্ত হয়ে সে স্নান করে খেয়ে নিল। যদি অমিত বিকেলে আসে, তবে তাকে বেরুতে হবে তো। সে তৈরী হয়ে বসে রইলো।

বিকেল হলো। তবু অমিতের দেখা নেই।

এই পৃথিবীতে সুরঞ্জনের কেউ নেই। কেউ আছে কিনা, সে জানে না। তবু জগতের যত ঝামেলা তার ওপর। সে যতই দূরে সরে থাকতে চায়, ততই সে জড়িয়ে পড়ে। অমিতের বাবার জন্যে যদি হাসপাতালে সিট্ যোগাড় হয়ে না থাকে, তবে তার জন্যে তার এত মাথা-ব্যথা কেন ? সে কেন বললো যে, সে একবার চেষ্টা করে দেখবে ?

সঙ্গে সঙ্গে এক সৌম্য সুদর্শন বৃদ্ধের ছবি তার মনের ওপর ভেসে ওঠে। সে যদি এই বৃদ্ধের জন্যে হাসপাতালে একটা সিটের ব্যবস্থা করতে পারে, তবে সে নিজেই সবচেয়ে বেশি খুশি হবে। কিন্তু তা কি সম্ভব হবে ?

এখনো তো অমিত এলো না। লোকটা কী—

সন্ধের পর সুরঞ্জন জামাকাপড় বদ্‌লে ঘরে বসে রইলো। আলো জ্বাললো না। কিন্তু দরজা খুলেই রাখলো।

মিঠুয়া একবার এলো। জিজ্ঞেস করলোঃ আলো জ্বেলে দেব, দাদাবাবু?

সুরঞ্জন বললোঃ না।

মিঠুয়া বোধহয় ভাবলো, তার দাদাবাবুর রাগ আজও পড়ে নি। কিন্তু আসলে সুরঞ্জন কারো যেন প্রতীক্ষা করছিল। কার প্রতীক্ষা? অমিতের নিশ্চয়ই নয়। অমিতের প্রতীক্ষার কাল উত্‌রে গেছে। তবে কার প্রতীক্ষা? কেতকীর নয় তো? কেতকীরই। সুরঞ্জন ভাবছিল, এই অন্ধকারে আজ যদি কেতকী আসে, তবে বেশ হয়। সারাদিন বাড়িতে বসে থেকে তার একদম ভালো লাগছিল না।

কিন্তু কেতকীই বা তার কাছে এখন আসবে কেন? যদি আসে, যদি ক্ষমা চায়, তাহলে সুরঞ্জন আজ তাকে ক্ষমা করবে। বলবেঃ ক্ষমা কেন কেতকী? তুমি তো কোন পাপ করো নি—

অন্ধকারে ঘরের দরজাটা হঠাৎ নড়ে উঠলো।

সুরঞ্জন শুয়েছিল। উঠে বসলো। জিজ্ঞেস করলোঃ কে?

ঃ সুরঞ্জনবাবু আছেন?

অমিতের গলা মনে হচ্ছে।

ঃ আছি। আসুন—

উঠে আলো জ্বাললো সুরঞ্জন। বললোঃ এই আপনার সকাল? সারাদিন আমি পথ চেয়ে বসে আছি। চলুন—

অমিত ধীরে ধীরে বললোঃ না। আর যেতে হবে না।

ঃ কেন?

সুরঞ্জন এতক্ষণ অমিতকে ভালো করে দেখে নি। এবার সে চেয়ে দেখলো। তার সমস্ত মুখে অন্ধকার নেমে এলো। অনেকক্ষণ তার মুখে কোন কথা এলো না। সে বসতে ভুলে গিয়েছিল, অমিতকে বসতে বলার কথাও সে ভুলে গিয়েছিল।

কতোক্ষণ তারা সেই ভাবে দাঁড়িয়েছিল, তাদের খেয়াল ছিল না। খেয়াল যখন হলো, তখন সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো : কখন গেলেন ?

অমিত বললো : ভোর রাতে।

: কাজ কখন ফুরোলো ?

: বিকেলে।

হাসপাতালে সিটের জন্যে অমিতকে সঙ্গে নিয়ে সে চেষ্টা করবে, তার আর প্রয়োজন নেই। তাকে আর হাসপাতালে সিটের জন্যে কারো কাছে উমেদারি করতে হবে না, অমিতের ফিরে আসার পথের দিকে চেয়ে আর তাকে সারাদিন হালদার বাগান লেনের অন্ধকার খুপরিতে বসে থাকতে হবে না।

জগতের সবাইকে সব রকমের অসুবিধের হাত থেকে রেহাই দিয়ে সেই সৌম্য সুদর্শন বৃদ্ধ চিরদিনের মতো চলে গেলেন। তাঁর আর কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ রইলো না।

অমিত বললো : বাবার জন্যে দুঃখ নেই। বাবার বয়েস যথেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু দুঃখ হয় খোকনের জন্যে। সে দাদুকে ছাড়া এ জগতের কাউকে চেনে না। আজ বড়ো কাঁদছে সে। সে যে থাকবে কার কাছে, সেইটাই এখন বড়ো সমস্যা।

সুরঞ্জনের মুখে হঠাৎ কোন কথা এলো না।

একটু থেমে সে বললো : বলুন, আমি এখন আপনার কোন্ কাজে লাগতে পারি ?

অমিত বললো : এখন নয়। পরে হয়তো আপনাকে আমার দরকার হতে পারে। কিন্তু কি জানেন ? আপনাকে আর আমার কষ্ট দিতে ইচ্ছে হয় না।

সুরঞ্জন বলে : ওসব কথা থাক্। যখনই আপনার দরকার হবে, আমাকে জানাবেন।

অমিত চলে যাবে। তাকে আজ আবার আগরপাড়া যেতে হবে। সেখানে তার মা আর খোকন একা রয়েছে। এখন কয়েকটা দিন তাদের কাছে তাকে থাকতে হবে।

অমিত চলে যাচ্ছিল।

সুরঞ্জন বলে : এখন রিণা দেবীকে তো একটা খবর দিতে হয়।

অমিত ঘুরে দাঁড়ায়। বলে : কোন দরকার নেই।

একটু থেমে সে বলে : রিণার কথা থাক্। আপনি একবার কাল বিকেলের দিকে আসুন না।

: কোথায়? আগরপাড়ায়?

: না, আমার স্টুডিওতে।

: সে কোথায়?

অমিত সুরঞ্জনকে তার স্টুডিওর ঠিকানা আর ওখানে যাবার ডিরেক্‌শান দিয়ে দিল।

সুরঞ্জন বললো : বেশ। যাবো—

পরের দিন বিকেলে সুরঞ্জন ডিরেক্‌শান মতো অমিতের স্টুডিওতে গেল। অমিত একাই ছিল। কোন লোকজনের ভিড় ছিল না। এখন নতুন তো।

স্টুডিওতে তেমন কোন ভিড় জমে ওঠে নি।

সুরঞ্জন বললো : এখন কটা দিন স্টুডিও বন্ধ রাখতে পারেন না?

অমিত বলে : না। এখন কিছু কিছু অর্ডার পত্র আসছে। কাগজে সেদিন একটা এ্যাড্‌ভার্টাইজ্‌মেণ্ট্ দিয়েছিলাম। তাতেই একটা বড় অর্ডার এসে গেছে। আজ কণ্ট্রাক্ট্ হয়ে গেল। আড়াই হাজার টাকা।

অমিত কণ্ট্রাক্ট ফর্ম বের করে দেখালো।

সুরঞ্জন বললো : উইশ ইওর গুড্ লাক্।

অমিত কানের কাছে মুখ এনে বলে : আরেকটা কথা।

: কি?

: ও এসেছিল।

: কে?

: রিণা।

ঃ তাই নাকি ? উনি খবর পেলেন কি করে ?

ঃ আগে খবর পায় নি। এখানে এসে খবর পেল।

ঃ তারপর ?

ঃ বাবার জন্যে খুব কাঁদলো, দেখলাম। বাবা ওকে খুব ভালো-বাসতেন কিনা।

সুরঞ্জন বললো ঃ আর আপনার জন্যে ?

ঃ না না। আমার জন্যে কাঁদবে কেন ? আমি তো এখনো বেঁচে আছি।

ঃ তা, রিণা দেবী—হঠাৎ কি ভেবে ?

অমিত বলে চলে ঃ রিণা আজ এসেছিল আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে বলে। কাগজে সে আমার স্টুডিওর বিজ্ঞাপন দেখেছে। সে আমাকে চৌরঙ্গী রোডে স্টুডিও খুলতে বারণ করেছিল। তাতে নাকি তার ভীষণ অসুবিধে হবে। আমি তার কথা রাখিনি। চৌরঙ্গী রোডেই আমার স্টুডিও খুললাম। তাই সে খুব রেগে আমার কাছে ছুটে এসেছিল।

স্টুডিওতে পা দিয়েই রিণা যেন তেড়ে এলো ঃ তোমাকে না আমি এখানে স্টুডিও খুলতে বারণ করেছিলাম। তবু তুমি এখানে স্টুডিও খুললে ?

অমিত কোন কথা বললো না। কোন কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। রিণাকে দেখে তার বুকের ভেতরটা কেমন যেন বারে বারে মোচড় খেতে লাগলো। গলা বুজে এলো। গলা দিয়ে কোন কথাই বেরুলো না। সে শুধু অপলক চোখে রিণার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

অমিতের বেশবাস আর তার চেহারার দিকে তাকিয়ে রিণাও কেমন যেন হয়ে গেল। তার রাগ পড়ে গেল। সেও অমিতের দিকে নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো। মুখে কোন কথা নেই।

কতোক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলো ঃ কি হয়েছে তোমার ?

অমিত কিছু বলে না।

ঃ কি? কি হয়েছে, বলো না? চুপ করে আছো যে! বলো কি হয়েছে?

অমিতের ঠোঁট দুটোই শুধু নড়ে উঠেছিল। কোন কথা বেরুলো না।

ঃ আর তুমি চুপ করে থেকো না। ফর গড্‌স্‌ সেক্‌, বলো—খোকন কেমন আছে?

অমিত বলেঃ ভালো—

অমিতের গলা প্রায় শোনা গেল না।

ঃ তবে?

ঃ বাবা নেই—

কথাটা বলতে অমিত একেবারে ভেঙে পড়েছিল।

রিণার আর শোনার কিছু নেই। সে ধীরে ধীরে এক পাশে সরে দাঁড়ায়। রিণা জানে, মিঃ রায় ছিলেন খোকনের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। তিনিই তো তাকে তার বাবা-মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে রেখেছিলেন। এদিকে বাবা-মার মধ্যে ছাড়াছাড়ি। খোকন তার কিছুই বুঝতে পারেনি। তিনিই তো তাকে তার কিছুই বুঝতে দেন নি।

সংসারে যেদিন চরম দুঃখ, সেইদিন খোকন এ পৃথিবীতে এসেছিল। তার আগে ব্যাঙ্ক ফেল মেরেছে, হ্যারিসন রোডের বাড়ি হাতছাড়া হয়ে গেছে। মিঃ রায়ের তখন চরম অর্থ সংকট। ঠিক সেই মুহূর্তে খোকন এসেছিল।

মিঃ রায় বলেছিলেনঃ আঁধার রাতে দুঃখ রাতের রাজা যদি আসে তবে তার কোন অনাদর হবে না।

সত্যি, তার কোন অনাদর হয় নি। আগরপাড়ায় তার যত্নের সমস্ত বন্দোবস্তই তিনি করেছিলেন। খোকনকে কখনও তিনি কাছ-ছাড়া করেন নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাকে আগ্‌লিয়ে রেখেছিলেন।

রিণার মনে পড়ে, তাদের বিয়ের পর যখন সে হ্যারিসন রোডে গিয়ে উঠেছিল, তখন তাঁর সে কি আদর! এক মুহূর্ত তাঁর বৌমাকে না হলে চলতো না। রিণা সেই সরল-হৃদয় বৃদ্ধের আদরের কোন মূল্যই দিতে পারে নি। সে অমিতকে ছেড়েছে। তাতে কি সেই বৃদ্ধের বুকে সে একটা প্রচণ্ড আঘাত দেয় নি।

রিণা একপাশে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। তার দুচোখে জল।

অমিতও তাকে আজ আর কিছু বলে নি।

রিণা চোখের জল মুছে অমিতকে জিজ্ঞেস করেছিল: তুমি আজ সন্ধেয় বাড়ি থাকবে?

অমিত বললো: না।

: কোথায় যাবে?

: আগরপাড়া। খোকন তার দাদুর জন্যে ভীষণ কাঁদছে।

রিণা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কি ভেবে বলে: আজকের দিনটা তুমি আগরপাড়া যেয়ো না। আজকের দিনটা শুধু তুমি বাড়িতে থেকো।

: কেন?

: দরকার আছে।

অমিত ঘুরে দাঁড়ায়। বলে: কোন দরকারই আর থাকতে পারে না।

: থাকে।

একটু থেমে রিণা বলে: তুমি এখনো দেখছি, সেই রকমই আছো।

: কি রকম?

: সেই অভিমানী স্বভাব। হঠাৎ রেগে যাওয়া—

এত দুঃখেও অমিতের হাসি পেল। রিণার এই ধরনের কথায় আজ সে না হেসে কি পারে? বলে: তুমি আমার মন ভোলাতে এসেছো?

রিণা শাসিয়ে ওঠে: বাজে কথা বলো না তো!

অমিত একবার তার হাল্‌কা সিল্কের শাড়ি, স্লিভ্‌লেস্ ব্লাউস, লিপ্‌স্টিক-ঘষা ঠোঁট আর স্যাম্পু করা চুলের দিকে তাকালো।

রিণা আরো সুন্দরী হয়েছে। নিজেকে আরো সুন্দর করে সাজিয়েছে।

কি ভেবে রিণা কাছে এগিয়ে আসে। একহাতে অমিতের কোমরটা জড়িয়ে ধরে বলে ঃ কি রোগাই হয়ে গেছ তুমি। চেহারাটা একেবারে নষ্ট করে ফেলেছো। মানুষ নিজের দিকে তো একটিবার তাকায়। আমি নেই আর কে দেখবে? এই কমাস বোধহয় শুধু খেটেছো। খাওয়া দাওয়া কিছুই করো নি।

অমিত সুরঞ্জনকে বলে ঃ আমি পারলাম না। ভেবেছিলাম, মচ্‌কাবো না। কিছুতেই রিণার কথায় ভুলবো না। যে আমাকে ছুটো খাইয়ে গঞ্জনা দিয়েছে, শুধু গঞ্জনাই দেয়নি, আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো আঘাত যে দিয়েছে—আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে আরেকজনের সঙ্গে মাসের পর মাস ঘর করেছে, তার কাছে শেষে হেরে গেলাম। আমার পৌরুষ গুঁড়ো হয়ে গেল। আমি কেঁদে ফেললাম।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো ঃ তাই নাকি?

রিণা আরো বলেছিল ঃ তোমার চেহারার দিকে তাকিয়ে আমার যে মাথা খুঁড়ে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। তোমার সেই রং কোথায়? তোমার সেই স্বাস্থ্য? বলো তুমি কার ওপর রাগ করে এই প্রতিশোধ নিয়েছো?

চোখের জলে রিণার দুচোখের কাজল ধুয়ে গিয়েছিল। চোখ মুছে বললো ঃ আজ সন্ধেয় তুমি থাকবে তো? কথা দাও—

সুরঞ্জন অমিতকে জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনি কি বললেন?

অমিত বললো ঃ কি আর বলি বলুন তো?

ঃ আপনি কথা দিলেন?

ঃ হ্যাঁ, কথা দিলাম।



পরের দিন সকালে অমিত ঘুম থেকে উঠে সুরঞ্জনের কাছে ছুটে এসেছে।

সুরঞ্জন তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছে।

অমিতকে দেখে সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেঃ কাল রাতে রিণা দেবী এসেছিলেন নাকি ?

অমিত মাথা নেড়ে জানালোঃ হ্যাঁ।

সুরঞ্জন হেসে বললোঃ বেশ। তাহলে তো কাল ভালোই কেটেছে বলুন। বলেই সুরঞ্জন বিদ্যাপতির পদের একটি চরণ আবৃত্তি করে ফেললোঃ

'আজু মম গেহ গেহ বলি মানলুঁ
পেহলুঁ পিয়া মুখচন্দা।'

অমিত সলজ্জভাবে সুরঞ্জনের হাসিতে যোগ দিল।

হাসি থামলে অমিত জিজ্ঞেস করেঃ এখন কি করি, বলুন তো ?

ঃ কেন ?

ঃ রিণা ভীষণ করে ধরেছে।

সুরঞ্জন বলেঃ আগে বসুন। চা খান। তারপর কথা হবে।

চা খাওয়া হয়ে গেলে সুরঞ্জন বললোঃ বলুন, কি হয়েছে আপনার ?

অমিত বলেঃ কাল সন্ধেয় তো রিণা এলো। প্রথমে ভেবেছিলাম, বাড়ি থাকবো না। আগরপাড়া চলে যাবো। রিণা এসে দেখবে, আমি নেই। তালা বন্ধ। তখন বেশ হবে। কিন্তু হলো না। শেষ পর্যন্ত নিজের কাছেই আমি হেরে গেলাম। বাড়ি থেকে চলে যেতে পারলাম না। তার পথ চেয়েই ঘরে বসে থাকলাম।

ঃ তারপর ?

ঃ সে এলো। কতোদিন পরে এলো। আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম, প্রথমে ভেবেছিলাম, তাকে কঠিন আঘাতে ফিরিয়ে দিই। সে আমাকে কম কঠিন আঘাত দেয় নি। আজ তার প্রতিশোধ নিই। কিন্তু শেষে আমি বড়ো দুর্বল হয়ে পড়লাম। এইটেই

আমার সব চেয়ে বড়ো দোষ। শেষ পর্যন্ত আমি কঠিন থাকতে পারি না।

রিণা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে অমিতের পাশে এসে বসলো।

রিণাকে পাশে বসতে দেখে অমিত একটু সরে বসে। রিণা হেসে তাকালো অমিতের দিকে।

ঃ সরে বসলে যে ?

অমিত নিরুত্তর।

ঃ ঘৃণা করছো আমাকে ?

অমিত একটু চুপ করে থেকে বলে ঃ হ্যাঁ, ঘৃণাই—

ঃ দোহাই তোমার! অমন করে বলো না, তাহলে আমি ঠিক মরে যাবো।

রিণা অমিতের কাছে সরে আসে!

অমিত আর সরে যেতে পারে না।

রিণা তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। বলে ঃ আমাকে তুমি ক্ষমা করো। ক্ষমা করো আমাকে। আমি সত্যি দোষ করেছিলাম। তুমি আমাকে যে শাস্তি দেবে, দাও। আমি বুক পেতে নেব। বলো, আমাকে তুমি ক্ষমা করলে ?

অমিত বলে ঃ আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারবো না, রিণা।

অমিতের মুখে নিজের নাম শুনে রিণার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে। সে অমিতের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে ঃ বলো, রিণা রিণা রিণা। আমার যে কি ভালো লাগছে, তোমার মুখে আমার নাম শুনতে—

রিণাকে দূরে ঠেলে দিয়ে অমিত বলে ঃ সুপ্রিয়র কাছে যাও। আমার কাছে আর এসো না—

রিণা বিছানা থেকে নেমে মেঝের ওপর বসলো। ঠিক অমিতের পায়ের কাছে। বললো ঃ তবু তুমি আমাকে ক্ষমা করলে না ? বেশ ক্ষমা না করো, শাস্তি দাও। সব দোষের শাস্তি আছে। আমার দোষের শাস্তি নেই ?

অমিত রিণার দিকে না তাকিয়ে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে ঃ এই কি তোমার দরকারী কথা ?

ঃ হ্যাঁ। এই আমার দরকারী কথা। বলো, আমায় তুমি ক্ষমা করলে ?

ঃ না। তুমি যাও। তুমি শুধু আমার ঘর ভেঙে দিয়ে যাও নি, আমার মনটাকেও ভেঙে দিয়ে গেছ।

রিণা পেছন দিকে হাত দুটো হেলান দিয়ে অমিতের মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে। বলে ঃ হ্যাঁ। আমি তোমার ঘর ভেঙেছি, মন ভেঙেছি—সব ভেঙেছি। আর কি করেছি তা তো দেখতে পেলে না। আমি চলে গিয়েছিলাম বলেই তো তুমি আজ এই সব করতে পেরেছো। আজ চৌরঙ্গী রোডে তোমার স্টুডিও, ছবি, নাম—যা কিছু, সব তো আমি চলে যাবার জন্যেই সম্ভব হয়েছে। আমি বুঝেছি, আমি তোমাকে আড়াল করে রেখেছিলাম। আমি সরে যেতেই তুমি আজ এতোখানি নাম করতে পেরেছো। এখন আমি ফিরে এসেছি। আমাকে ক্ষমা করো।

অমিত কোন কথা না বলে পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকে।

রিণা অমিতের দুপায়ে হাত রাখে। তার আজ কোন লজ্জাই নেই। সে বলে ঃ বেশ দোষই করেছি আমি। দোষের শাস্তি দাও। চুপ করে থেকো না। তুমি আমাকে শাস্তি দাও, শাস্তি দাও—

অমিতের দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ রেখে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে সে বলে ঃ শাস্তি দাও আমাকে তুমি, শাস্তি দাও—

অমিত এই ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। রিণা যে কোনদিন তার কাছে এইভাবে এসে ধরে পড়বে, সে ভাবতে পারে নি। রিণা যখন তাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন থেকেই সে রিণাকে ভাবতো যেন দূর আকাশের পাখির মতো। কোন সময় হয়তো তার দেখা পাবে। কিন্তু আপনার করে কাছে পাবে না। সে সুপ্রিয়রই। তার কেউ নয়।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, রিণা বড়ো অসহায়। তার সব থেকেও যেন এ পৃথিবীতে কেউ নেই। অমিতের মনে বড়ো মায়া হলো রিণার জন্যে।

আবার পরমুহূর্তেই তার মনে হয়, রিণা তাকে স্বার্থপরের মতো ফেলে চলে গিয়েছিল। তখন তো অমিতের সহায় সম্বল কিছুই ছিল না। তখন তো রিণা ভাবেনি তার কথা। তখন সুপ্রিয়ই ছিল তার সব। আজ রিণা তার যে শরীরটাকে তার সাম্‌নে তুলে ধরেছে, তাতে যে সুপ্রিয়র স্পর্শ লেগে আছে। আজ অমিত তাকে ক্ষমা করবে কি করে? সুপ্রিয়র ভালোবাসা, সুপ্রিয়র অনুভব—সে তো এই শরীরটাকে দিয়ে বোধ করেছে।

না। রিণাকে সে ক্ষমা করতে পারব না।

সুপ্রিয়র কথায়, সুপ্রিয়র সঙ্গে তার সম্পর্কের কথায় সে একেবারে পাগলের মতো হয়ে যায়। সুপ্রিয় তাকে রাস্তায় ধরে যে অপমান করেছে, তাও ততো বড়ো নয়। কিন্তু সে তার কাছ থেকে যে রিণাকে কেড়ে নিয়েছে, তার পূরণ পৃথিবীর কোন কিছু দিয়ে হবার নয়।

একদিন রিণার এই শরীরটাই ছিল অমিতের সমস্ত ব্যর্থতার বেদনা লুকোবার সবচেয়ে বড়ো স্থান। সমস্ত পরাভব, সমস্ত গ্লানি সেদিন রিণার শরীরে স্থান পেয়েছে। আর আজ সেই শরীর অন্যের অনুভবে ক্লিন্ন। তাকে সে ফিরে গ্রহণ করবে কি করে?

এখন সে কোন কথাই ভাবতে পারছে না। এখন তাকে কিছুক্ষণ পার্কের হাওয়ায় গা ডুবিয়ে বসে থাকতে হবে। ভাবতে হবে সব কথা। তারপর কিছু একটা ঠিক করা যাবে—রিণাকে সে গ্রহণ করবে কিংবা ফিরিয়ে দেবে?

অমিত কিছু না বলে উঠে দাঁড়ায়। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে সে দরজার দিকে পা বাড়ায়।

রিণাও কি ভেবে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। দুহাত বাড়িয়ে অমিতের পথ আগ্‌লিয়ে ধরে।

ঃ কোথায় যাচ্ছ ? না, যেতে দেবো না আমি। আমাকে শাস্তি দিয়ে যেতে হবে। দাও, শাস্তি দাও—

অমিতকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে সে।

ঃ শাস্তি দাও। শাস্তি না দিয়ে তুমি যেতে পারবে না।

অমিত কেমন যেন হয়ে যায়। সে ইচ্ছে করলে রিণার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তা সে করলো না। সে কেমন যেন হয়ে গেল। সে রিণার কাছে হেরে গেল।

না। হারবে না সে। সে প্রতিশোধ নেবে। রিণার ওপরে সে প্রতিশোধ নেবে। রিণা তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, তার ঘর ভেঙে দিয়ে সে সুপ্রিয়র সঙ্গে ঘর করেছে ক'মাস, আজ তাকে সে শাস্তি দেবে।

রিণাকে বুকের ওপর চেপে ধরে সে তাকে প্রাণপণে নিষ্পেষিত করতে থাকে। রিণার বাহুবন্ধন তবু শিথিল হয় না। চুমু খেতে গিয়ে রিণার ঠোঁটদুটোকে সে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। তবু রিণা মুখ সরিয়ে নেয় না।

পাগলের মতো সে রিণার শিথিল শরীরটাকে নিয়ে বিছানার ওপর ফেললো। রিণা শুধু চোখ বুজে পড়ে রইলো। কোন কথা আর বললো না।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো ঃ কাল তাহলে আপনার আর আগরপাড়া যাওয়া হয়নি ?

অমিত বললো ঃ না। রিণা আর যেতে দিল কই ?

একটু থেমে সে বললো ঃ অথচ আমার কাল আগরপাড়া যাওয়া উচিত ছিল। অশৌচের কাল গেছে মাত্র তিনদিন।

অমিত কি যেন ভাবলো। তারপর হেসে বললো ঃ কাল আবার এক কাণ্ড হয়েছে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে ঃ কি ?

ঃ ঘরে তো খাবার কিছুই ছিল না। আমি শুধু আমার হবিষ্যের আয়োজন করেছিলাম। রিণা থাকবে, খাবে—তা তো আমার জানা ছিল না। জানা থাকলে সেই মতো ব্যবস্থা করে রাখতাম।

ঃ তারপর কি করলেন ?

ঃ কি আর করি। রিণাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এখন তুমি কি করবে ? থাকবে না যাবে ?

রিণা বললো ঃ আমি আজ যাবো না। থাকবো।

ঃ থাকবে ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তবে খাবে কি ? তোমার খাবার মতো কোন ব্যবস্থাই যে নেই।

ঃ দরকার নেই। খাবো না।

ঃ তা কি হয় ?

ঃ কেন হবে না ? একটা দিন না খেলে কিছু হবে না আমার।

অমিত বললো ঃ তাহলে তুমি বসো। আমি বরং তোমার জন্য একটু খাবার কিনে নিয়ে আসি।

অমিত বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

রিণা তাকে ধমক্ দিয়ে বলে ঃ বসো চুপ করে ? আমি তোমাকে বাইরে যেতে দেবো না আজ।

অমিত বলে ঃ তাহলে তুমি কি খাবে ?

ঃ বললাম তো। একটা রাত কিছু না খেলে আমি মরে যাবো না।

ঃ ঘরে হবিষ্যি করবার মতো সামান্য ব্যবস্থা আছে শুধু।

ঃ বেশ তো। তাতেই হবে দুজনের। দুজনেই আজ রাতে হবিষ্যি করবো।

সুরঞ্জন বললো ঃ খুব আনন্দের কথা। কিন্তু সুপ্রিয়র খবর কি ?

অমিত বললো ঃ তাও জিজ্ঞেস করলাম।

রিণা বললো ঃ ওটা একটা স্কাউণ্ড্রেল।

: কেন ?

: ও আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল—

: কি রকম ?

: ও তো অনেক আগেই বিয়ে করেছে। তার এক ছেলে, দুই মেয়ে রয়েছে—

: তাই নাকি ?

: হ্যাঁ। সে কথা কেউ জানতো না। তারপর একদিন তার বউ ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাজির।

: তারপর ?

: সেদিন জানতে পারলাম, সুপ্রিয়টা কতো বড়ো স্কাউণ্ড্রেল! বউকে প্রথমে বললো চলে যেতে।

বউ বলল : যাবো না।

তারপর যা মুখে আসে বলে বউটাকে গালাগাল করলো। তাতেও যখন সে গেল না, তখন সে—

: হ্যাঁ। আমার সাম্‌নেই বউটাকে মারলো। ছি ছি, আমার কি খারাপ লাগলো। সেইদিন থেকে বুঝতে পারলাম, আমি কি ভুলটাই না করেছি। সুপ্রিয় তারপর আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, বউর সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু আমি মনস্থির করে ফেললাম, তোমার কাছে ফিরে আসবো।

সুরঞ্জন হেসে বললো : বলেন কি ? এ সব যে গল্পের মতো মনে হচ্ছে।

অমিত বললো : লিখুন না মশাই। আপনি তো লিখতে পারেন।

সুরঞ্জন বলে : লিখতে পারি। কিন্তু সে খবরের কাগজের রিপোর্ট। গল্প উপন্যাস অন্য জিনিস। আমার আসে না।

অমিত কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর বললো : রিণা বলেছে, সে আর একবার সুপ্রিয়র ওখানে যাবে। তার সুটকেশ আর যা যা আছে, নিয়ে আসবে।

অমিত আবার থামলো। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললো ঃ আপনাকে আমি সবই বলেছি। আপনি যা বলেছেন, তাই করেছি। এখন বলুন, আমি কি করি—

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে ঃ রিণা দেবী কখন গেলেন ?

ঃ রিণা তো যায় নি। এখনও ঘুমুচ্ছে। সারা রাত ঘুমোয় নি কি না। ভোর রাতের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও আর তার ঘুম ভাঙাই নি।

মিঃ গোমেস আর মিসেস্ গোমেসের অনেকদিন হলো কোন খবরই নেই। পাশের বাড়িতেই তাঁরা থাকেন। তেমন কিছু দূরে নয়। কিন্তু তাঁদের কোন খবরই সুরঞ্জন রাখে না।

বাইরে বেরুবার সময় সে দেখে, দরজা বন্ধ। ফেরে যখন, তখনও দেখে, দরজা বন্ধ। এখন গরমের সময়। তবু মিসেস্ গোমেস জানলাগুলো খোলেন না।

মিসেস্ গোমেসের রাণী ফিরলো কি না, কে জানে। মিঃ গোমেসের পায়ে না কোমরে ব্যথা হয়েছিলো, তা সেরেছে কি না, তার খবরও সুরঞ্জন রাখে না।

ওদিকের বাড়ির মেয়েরা সারাদিন সমানে ঝগড়া করে। সকাল হলে যে কলরব সুরু হয়, নিশুতি রাতের আগে তা থামে না। আজকাল আবার তাদের ঝগড়ার মাঝখানে ব্যাটাছেলেদের গলাও শোনা যায়।

নবেন্দুবাবুর স্কুটার যথারীতি নবেন্দুবাবু আর ছবি বৌদিকে পিঠে নিয়ে শব্দ করতে করতে হালদার বাগান লেন দিয়ে ছুটে চলে যায়। মনে হয়, তাঁদের সংসারে এবার যেন শান্তি ফিরে এসেছে। আগেকার দিনগুলি তাঁরা বোধ হয় ফিরে আবার পেয়েছেন। আর বোধ হয় ছবি

বৌদিকে কোন কারণে মদ খেয়ে অজ্ঞান হতে হয় না। তা তাঁর ঠোঁটের পুরু লিপ্‌স্টিক দেখেই বোঝা যায়।

কিন্তু অবিনাশবাবুর ঘড়িতে মাঝে মাঝে সুরঞ্জনকে দম দিতে যেতে হয়। অঞ্জলি দেবী এখন বাপের বাড়ি আরো ঘন ঘন যান। তার বাপের বাড়ির এখন বড়ো বিপদ। যতখানি মাইকা এক্সপোর্ট করবার কথা, তার অনেক বেশি তাঁর বাবা এক্সপোর্ট করেছেন। তারপর কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। অনেক ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছেন, তাও ধরা পড়ে গেছে।

এখন এ ব্যাপারে নিশিকান্তবাবু ভীষণ ব্যস্ত। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে অঞ্জলি দেবীকে প্রায়ই যেতে হয়।

সেদিন সকালে অঞ্জলি দেবীকে আবার বেরুতে দেখে অবিনাশবাবু জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবার কোথায় যাও ?

সুরঞ্জন তখন সেখানে উপস্থিত ছিল।

অঞ্জলি দেবী বললেন ঃ বাপের বাড়ি।

ঃ কাল গিয়েছিলে, এই তো এলে। আবার এখুনি যাচ্ছ ?

ঃ যাবোই তো ! বাবার বিপদ। আর আমি মেয়ে হয়ে ঘরে বসে থাকবো, না ? তাই তুমি চাও ? তোমার কি ? তোমার তো কিছু যাবে না। যাবে আমার বাবার।

অবিনাশবাবুর মুখটা বিরক্তিতে ভরে রইলো। এত কথায় তাঁর মুখের একটা দাগও মিলিয়ে গেল না।

সুরঞ্জন বেরিয়ে এলো। তার কিছুক্ষণ পরে অঞ্জলি দেবীর জুতোর শব্দ হালদার বাগান লেনের গলিতে মিলিয়ে গেল।

সুরঞ্জন সেদিনই ঘরে ফিরে এসে ভেবে দেখলো, সে নিজেকে বড়ো বেশি মেলে দিয়েছে। এবার তার নিজেকে গুটিয়ে আনা দরকার। সবার ভাবনা সে ভাবে, এবার থেকে সে ভাববে শুধু নিজেকে নিয়ে। নিজের কথা সে যে একদম ভাবে না। কেনই বা সে পরের জন্যে ভেবে মরবে ? খানিকটা স্বার্থপর না হলে এই সমাজে মানুষের বাঁচা যায় না।

কিন্তু সে তা পারে কই ?

নিজেকে গুটিয়ে আনলেই সে আর নিজেকে দেখতে পায় না। সে দেখতে পায় একটি করুণ, বিষণ্ণ মুখ। সে মুখ কেতকীর। কেতকীর প্রতি সে একটা অন্ধ আকর্ষণ আজকাল অনুভব করছে। সেই আকর্ষণ দয়া না সমবেদনা ? নাকি ভালোবাসা তার নাম ?

সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

কেতকী আজকাল অনেকখানি সহজ হয়ে উঠেছে।

আগেকার সেই আড়ষ্টতা এখন আর তার নেই।

এখন সে সুরঞ্জনের জন্যে চা নিয়ে আসে। খাবার সময় হলে ডেকে নিয়ে যায় নিচে। তার খাবারের সময় কাছে বসে গল্প করে। এখন তার মুখে হাসির আভাসও দেখা যায়।

তা ছাড়া কেতকী এখন অধিকাংশ সময় তার বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বাবার সেবা-শুশ্রূষার ভার প্রায় সমস্তই সে তুলে নিয়েছে। বাবাকে ধরে বসায়, স্নান করায়, গা মুছিয়ে দেয়, কখনও নিজের হাতে খাইয়ে দেয়। আবার ধরে বিছানায় শুইয়ে দেয়। তাঁকে নিয়েই আজকাল কেতকীর বেলা কাটে।

হেরম্ববাবু মাঝে মাঝে কি ভেবে কেতকীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু কিছু বলেন না। অসহায় শিশু যেমন করে তার মায়ের মুখের দিকে তাকায়।

করবীও আজকাল কেতকীর সঙ্গে মেশে, কথা বলে। কিন্তু করবী আজকাল বড় বেশি বিষয়ী হয়ে উঠেছে। সে ঘরের কথা খুব ভাবে। বাবা, মা, ভাইবোনের দুঃখ সে আর সহ্য করতে পারছে না। অথচ প্রতিকারও করতে পারছে না সে।

চাকরির চেষ্টা সে নানাভাবে করছে। কিন্তু এখনও তার কিছু হলো না। পরীক্ষার রেজাল্টও যদি বের হতো, তাহলে হয়তো তাতে কিছুটা কাজ হতো। আর রেজাল্ট যে ভালো হবে, তারই বা গ্যারান্টি কি ? কম অসুবিধের মধ্যে সে পরীক্ষা দিয়েছে ? বাবার অসুখ, দিদির চলে যাওয়া, তা ছাড়া সংসারের অন্তহীন অভাব-অভিযোগ।

বৌদিকে কোন কারণে মদ খেয়ে অজ্ঞান হতে হয় না। তা তাঁর ঠোঁটের পুরু লিপ্‌স্টিক দেখেই বোঝা যায়।

কিন্তু অবিনাশবাবুর ঘড়িতে মাঝে মাঝে সুরঞ্জনকে দম দিতে যেতে হয়। অঞ্জলি দেবী এখন বাপের বাড়ি আরো ঘন ঘন যান। তাঁর বাপের বাড়ির এখন বড়ো বিপদ। যতখানি মাইকা এক্সপোর্ট করবার কথা, তার অনেক বেশি তাঁর বাবা এক্সপোর্ট করেছেন। তারপর কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। অনেক ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছেন, তাও ধরা পড়ে গেছে।

এখন এ ব্যাপারে নিশিকান্তবাবু ভীষণ ব্যস্ত। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে অঞ্জলি দেবীকে প্রায়ই যেতে হয়।

সেদিন সকালে অঞ্জলি দেবীকে আবার বেরুতে দেখে অবিনাশবাবু জিজ্ঞেস করলেন: আবার কোথায় যাও?

সুরঞ্জন তখন সেখানে উপস্থিত ছিল।

অঞ্জলি দেবী বললেন: বাপের বাড়ি।

: কাল গিয়েছিলে, এই তো এলে। আবার এখুনি যাচ্ছ?

: যাবোই তো! বাবার বিপদ। আর আমি মেয়ে হয়ে ঘরে বসে থাকবো, না? তাই তুমি চাও? তোমার কি? তোমার তো কিছু যাবে না। যাবে আমার বাবার।

অবিনাশবাবুর মুখটা বিরক্তিতে ভরে রইলো। এত কথায় তাঁর মুখের একটা দাগও মিলিয়ে গেল না।

সুরঞ্জন বেরিয়ে এলো। তার কিছুক্ষণ পরে অঞ্জলি দেবীর জুতোর শব্দ হালদার বাগান লেনের গলিতে মিলিয়ে গেল।

সুরঞ্জন সেদিনই ঘরে ফিরে এসে ভেবে দেখলো, সে নিজেকে বড়ো বেশি মেলে দিয়েছে। এবার তার নিজেকে গুটিয়ে আনা দরকার। সবার ভাবনা সে ভাবে, এবার থেকে সে ভাববে শুধু নিজেকে নিয়ে। নিজের কথা সে যে একদম ভাবে না। কেনই বা সে পরের জন্যে ভেবে মরবে? খানিকটা স্বার্থপর না হলে এই সমাজে মানুষের বাঁচা যায় না।

কিন্তু সে তা পারে কই?

নিজেকে গুটিয়ে আনলেই সে আর নিজেকে দেখতে পায় না। সে দেখতে পায় একটি করুণ, বিষণ্ন মুখ। সে মুখ কেতকীর। কেতকীর প্রতি সে একটা অন্ধ আকর্ষণ আজকাল অনুভব করছে। সেই আকর্ষণ দয়া না সমবেদনা? নাকি ভালোবাসা তার নাম?

সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

কেতকী আজকাল অনেকখানি সহজ হয়ে উঠেছে।

আগেকার সেই আড়ষ্টতা এখন আর তার নেই।

এখন সে সুরঞ্জনের জন্যে চা নিয়ে আসে। খাবার সময় হলে ডেকে নিয়ে যায় নিচে। তার খাবারের সময় কাছে বসে গল্প করে। এখন তার মুখে হাসির আভাসও দেখা যায়।

তা ছাড়া কেতকী এখন অধিকাংশ সময় তার বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বাবার সেবা-শুশ্রূষার ভার প্রায় সমস্তই সে তুলে নিয়েছে। বাবাকে ধরে বসায়, স্নান করায়, গা মুছিয়ে দেয়, কখনও নিজের হাতে খাইয়ে দেয়। আবার ধরে বিছানায় শুইয়ে দেয়। তাঁকে নিয়েই আজকাল কেতকীর বেলা কাটে।

হেরম্ববাবু মাঝে মাঝে কি ভেবে কেতকীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু কিছু বলেন না। অসহায় শিশু যেমন করে তার মায়ের মুখের দিকে তাকায়।

করবীও আজকাল কেতকীর সঙ্গে মেশে, কথা বলে। কিন্তু করবী আজকাল বড় বেশি বিষয়ী হয়ে উঠেছে। সে ঘরের কথা খুব ভাবে। বাবা, মা, ভাইবোনের দুঃখ সে আর সহ্য করতে পারছে না। অথচ প্রতিকারও করতে পারছে না সে।

চাকরির চেষ্টা সে নানাভাবে করছে। কিন্তু এখনও তার কিছু হলো না। পরীক্ষার রেজাল্টও যদি বের হতো, তাহলে হয়তো তাতে কিছুটা কাজ হতো। আর রেজাল্ট যে ভালো হবে, তারই বা গ্যারান্টি কি? কম অসুবিধের মধ্যে সে পরীক্ষা দিয়েছে? বাবার অসুখ, দিদির চলে যাওয়া, তা ছাড়া সংসারের অন্তহীন অভাব-অভিযোগ।

তারই মধ্যে তার পরীক্ষা—কতো আর ভালো হবে? ভালো হবে? ভালো না হোক, খারাপ না হলেই সে বাঁচে।

বাচ্চু বড়দিকে পেয়ে আর বাঁশ বাগান দেখতে চায় না। স্থরঞ্জনের কাছে সে আর বাঁশ বাগান দেখিয়ে আনবার জন্যে বায়না ধরে না। এখন সে তার বড়দির কোলের কাছে তার ছোট্ট বিছানাটুকুর দাবি ফিরে পেয়েছে।

কিন্তু যোগমায়া দেবী কেতকীর সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে চলেন। রান্নাঘরে কেতকীর প্রবেশ নিষেধ। মুখে কিছুই তিনি বলেন না। কিন্তু আভাসে-ইংগিতে তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

ওপরে স্থরঞ্জনের ঘরে কেতকীর আসা একটু বেড়েছে। কেতকী একটু সময় পেলেই ওপরে চলে আসে। স্থরঞ্জনের সঙ্গে বসে দুদণ্ড গল্প করে। তারপর চলে যায়।

একদিন স্থরঞ্জন অফিস থেকে ফিরে দেখলো, নতুন চাদর দিয়ে তার বিছানাটা স্থন্দর করে পাতা। টেবিলের ওপরে একটা ফুল-দানিতে কতকগুলি রজনীগন্ধার স্টিক্। টেবিলটাও আজ স্থন্দর করে গোছানো।

মিঠুয়া আজকাল বিশেষ কোথাও যায় না। সে দাদাবাবুর বেরোবার সময় আর ফিরবার সময় ঘরে থাকে। দাদাবাবুর কোন আকস্মিক ফরমাশের জন্যে সে প্রায় প্রস্তুত হয়ে থাকে।

সেদিন ঘরের সাজগোজ দেখে স্থরঞ্জন একটু বিস্মিত হয়ে গেল।

এতক্ষণ চোখে পড়েনি তার। সে চেয়ে দেখলো, দরজায় একটা পর্দাও ঝুলছে। দুদিকের জানলা দুটোও আকাশী রঙের পর্দা গায়ে জড়িয়ে স্থন্দরভাবে সেজে উঠেছে।

স্থরঞ্জন জিজ্ঞেস করে: মিঠুয়া, এ সব কে করেছে রে?

মিঠুয়া এই রকম একটা প্রশ্নের আঁচ করেছিল। বললো: বড়দি।

: কে তাকে এ সব করতে বলেছে?

এবার মিঠুয়া সত্যিই অবাক হয়ে গেল। সে সুরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এ সব করার জন্যে সে কোথায় বড়দির তারিফ করবে, তা নয়। উল্‌টে বড়দির ওপর রেগে যাচ্ছে।

সত্যি, দাদাবাবুর কি যে হয়েছে! দাদাবাবুকে সে রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটের বাসা থেকে দেখে আসছে। তার দাদাবাবু তো কোনদিন এ রকম ছিল না।

সুরঞ্জন বলে: ডাক্ তোর বড়দিকে। কেন সে এমন করেছে?

মিঠুয়া ভয়ে ভয়ে নিচে যায়। বড়দিকে চুপি চুপি বলে: বড়দি, দাদাবাবু রাগ করছে।

বড়দি জিজ্ঞেস করে: কেন রে?

: ঘর সাজিয়ে দিয়েছ বলে।

: তাই নাকি?

: হ্যাঁ। দাদাবাবুর যে আজকাল কি হয়েছে?

: আচ্ছা। চল্ দেখি—

মিঠুয়া বড়দিকে ঘরে রেখে নিচে চলে যায় দাদাবাবুর চা আনবার জন্যে। চা আনতে যদি দেরি হয়ে যায়, তবে আবার বকুনি শুনতে হবে। একে তো দাদাবাবুর মেজাজটা আজকাল ঠিক নেই।

কেতকী জিজ্ঞেস করে: মিঠুয়াকে বকেছেন কেন?

সুরঞ্জন বলে: কই, বকিনি তো?

: রাগ করেছেন তো?

: করবো না?

: কেন করেছেন, বলুন?

: এ সব সাজিয়েছ কেন? কে বলেছে সাজাতে?

কেতকী হেসে বললো: কেউ বলে নি। ইচ্ছে হলো, তাই সাজালাম। চাদর আর পর্দার দামগুলো কাল দিয়ে যাবেন। ফেরিয়ালা কাল দাম নিতে আসবে।

: কিন্তু কি দরকার ছিল এ সব করবার?

: কি দরকার?

বলে কেতকী হাসলো। চারদিক একবার ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে বললো ঃ আজ আপনার জন্মদিন।

সুরঞ্জন আকাশ থেকে পড়লো।

ঃ আমার জন্মদিন? আজ? কে বললো?

ঃ কেউ বলেনি। আপনার জন্মদিন কবে তা তো জানি না। একটা দিন হলেই হলো। ভাবলাম, সেটা আজকে হলে কেমন হয়? তাই—

সুরঞ্জন কিছু না বলে বসে রইলো। তারপর কি ভেবে নিজের মনে হেসে উঠলো। কেতকীও না হেসে পারলো না।

হাসি থামলে সুরঞ্জন বলে ঃ কিন্তু কেতকী, ঘরটা যে এমনিতেই বড়ো অন্ধকার। পর্দা লাগালে, তাতে যে অন্ধকার আরো বেড়ে গেলো।

কেতকী হেসে ঘরে আলো জ্বালালো। বললো ঃ এবার? এবার কেমন লাগছে দেখুন তো ঘরখানা।

সুরঞ্জন কিছু না ভেবেই বলে ফেললো ঃ ঠিক তোমার মতো—

কেতকী এবার লজ্জা পেয়ে যায়। বলে ঃ আপনি আজকাল বড়ো অসভ্য হয়েছেন—

কেতকী ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

সুরঞ্জন ডাকে ঃ কেতকী, শোনো যেও না—

কেতকী দরজা থেকে বলে যায় ঃ দেখি, মিঠুয়া চায়ের কি করলো।

সুরঞ্জন ভাবে বোধহয় কেতকীকে এ কথাটা বলা ঠিক হলো না। কেতকী তাকে ভালোবাসে কিনা সে জানে না। তবে শ্রদ্ধা করে। আজ কি সে একথা বলে কেতকীর শ্রদ্ধা হারালো? সে কেতকীকে অন্য কোনভাবে কথাটা বলে নি। বলেছে তার দুঃখের বোঝাটাকে কিছুটা হাল্‌কা করে দেবার জন্যে। তাতে কেতকী যদি কিছু মনে করে থাকে তো সুরঞ্জন কি করবে?

কয়েকদিন পরে সন্ধের দিকে কেতকী সুরঞ্জনের চা দিতে এসেছিল। সেই-যে সেদিন সে লজ্জা পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, আর আসে নি।

আজ এসে দেখলো, ফুলদানিতে রজনীগন্ধার শুক্‌নো স্টিক্‌গুলো তেমনি রয়েছে। ও গুলো ফেলে দিতে হয় তো? সুরঞ্জন বুঝি তাও জানে না?

কেতকী বলে: একি! এ গুলো এখনো রয়েছে? ফেলে দেবেন তো?

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো: কিসের কথা বলছো, কেতকী?

: এই শুক্‌নো ফুলগুলো—

সুরঞ্জন বলে: মিঠুয়া ও গুলো ফেলে দিতে চাইছিল—

: বেশ তো। ফেলে দিল না কেন?

: আমি মানা করেছি।

: কেন মানা করলেন? শুক্‌নো ফুল ফেলে দেবে, তাতে আপনি মানা করলেন কেন?

: বড় মায়া লাগলো।

: মায়া?

: হ্যাঁ, সেদিন যে তার রূপে আমাকে মুগ্ধ করেছে, আজ তার রূপ নেই বলে তাকে ত্যাগ করবো? সেদিন যে সব ছিল, আজ সে কেউ নয়? আমি এতখানি নিষ্ঠুর হতে পারলাম না।

কেতকী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

সুরঞ্জন কার কথা বলছে? নিশীথের কথা নয় কি? নিশীথ শুক্‌নো ফুল অনায়াসে ফেলে দিতে পারে। তার জন্যে তার মনে কোন দ্বিধা আসবে না। তাকে সে কেমন সহজে পুরীতে ফেলে কলকাতায় পালিয়ে এলো। একবার ভাবলো না, তার কি হবে? কিন্তু সুরঞ্জন? সে যে অন্য ধাতের মানুষ। খাঁটি এবং সুন্দর। ফুলদানির শুক্‌নো ফুল ফেলতে তার মায়া লাগে। সুরঞ্জন কি এ যুগের মানুষ? এই ছোট্ট ঘটনায় তাকে কতো বড় মনে হয়।

সুরঞ্জন চায়ের কাপ খালি করে কেতকীর হাতে দিয়ে বলেঃ তাছাড়া—

ঃ তাছাড়া কি ?

ঃ তাছাড়া তোমার হাতের সাজানো ফুল, আমি কি করে ফেলে দিই বলো তো ?

কেতকী সুরঞ্জনের চোখের ওপর চোখ রেখে বলেঃ আপনার আজকাল কি হয়েছে বলুন তো ?

কেতকী চলেই যাচ্ছিল। সুরঞ্জন তার একখানা হাত ধরে ফেলে তাকে টেনে এনে পাশে বসায়। বলেঃ কি যে হয়েছে, আমি নিজেই জানি না, কেতকী। আজকাল তোমাকে আমার কি যে ভালো লাগে, তা তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না।

কেতকী উঠে চলে যেতে পারলো না। উঠে চলে যাবার শক্তি যেন কেউ কেড়ে নিয়েছে।

সুরঞ্জন ডাকলোঃ কেতকী ?

ঃ কি ?

ঃ চলো আজ একটু বেড়িয়ে আসি।

কেতকী কিছু বললো না। বোধহয় সে একটু ভাবলো। ভাবলো যে, মা কি ভাববে। কিছুদিন আগে নিশীথের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে মা রাগ করেছিল। সে মানে নি। কিন্তু পরিণাম ভালো হলো না। আজ আবার যদি সে সুরঞ্জনের সাথে বেড়াতে যায়, মা কি ভাববে তাকে ? কি আর ভাববে ? যা ভাবছে, তার বেশি তো আর ভাববে না।

কেতকী বলেঃ চলুন—

ঃ তাহলে তুমি নিচে গিয়ে তৈরী হয়ে নাও।

কেতকী নিচে চলে গেল।

সুরঞ্জন তৈরী হয়ে নিচে গিয়ে যোগমায়া দেবীকে বললোঃ কেতকীকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। ওর মনটাকে একটু ভালো করা দরকার। তা নইলে ও মনের যন্ত্রণায় মরে যাবে।

যোগমায়া দেবী কি ভেবে সুরঞ্জনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন: না জেনে ও দোষ করে ফেলেছে বলে সবাই ওকে ঘৃণা করছে। মা হয়ে আমিই কি ওকে কম অভিশাপ দিয়েছি?

সুরঞ্জন বেরিয়ে এসে দেখলো, কেতকী যাবার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে অঞ্জলি দেবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অঞ্জলি দেবী বালিগঞ্জ যাবার জন্যে বোধহয় ট্যাক্সির অপেক্ষা করছিলেন।

সুরঞ্জন সেদিকে তাকাতেই অঞ্জলি দেবীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়।

দুচোখে তাঁর এক কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে গেল।

কেতকী বললো: এই যা—

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো: কি হলো?

: দেখা হয়ে গেল তো?

: তাতে কি হয়েছে। চল, কাছে যাই—

: না। আপনি যান। আমি যাবো না।

: কেন?

: আমার ভীষণ লজ্জা করে।

: চলো, উনি কিছু মনে করবেন না।

দুজনে অঞ্জলি দেবীর কাছে গেল।

অঞ্জলি দেবী জিজ্ঞেস করলেন: দুটিতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

সুরঞ্জন বলে: কোথায় যে যাই, ভেবে পাচ্ছি না।

অঞ্জলি দেবী হেসে বললেন: আমি একটা ভালো জায়গা বাত্‌লে দিতে পারি।

: কোথায়?

: বলবো না।

একটু থেমে অঞ্জলি দেবী বললেন: বললে তো রোজ ওখানে গিয়ে ভিড় করবেন।

সুরঞ্জন হেসে বললো: আমি কথা দিচ্ছি, তাতে আপনাদের কোন অসুবিধেই হবে না।

অঞ্জলি দেবী এক পলকে কেতকীকে দেখে নিলেন। তারপর বললেন: ঢাকুরিয়া লেক। বেশ নিরিবিলি।

সুরঞ্জন কেতকীকে বলে: বেশ, তাহলে চলো, ঢাকুরিয়া লেকেই যাওয়া যাক—

কেতকীর মনে পড়ে, নিশীথ একদিন তাকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ঢাকুরিয়া লেকে গিয়েছিল। তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর ছিল শীতের সময়। লেক তখন একেবারে ফাঁকা। শুধু গাছের আড়ালে অন্ধকারে চলেছিল একালের নায়ক-নায়িকাদের নিবিড় কপোত-কূজন। সেদিন নিশীথ শীতের অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে কেমন যেন মরীয়া হয়ে উঠেছিল।

কেতকীর বুকের ভেতরে লেকের জল টল টল করে ওঠে।

সুরঞ্জন অঞ্জলি দেবীকে জিজ্ঞেস করে: আপনি কোথায় চলেছেন?

অঞ্জলি দেবী বললেন: কোথায় আবার? বাপের বাড়ি—

: তাহলে একটা ট্যাক্সি হলেই চলবে।

অঞ্জলি দেবী বললেন: না। চলবে না।

: আমরা না হয় আপনাকে আপনার বাড়ির সাম্‌নে নামিয়ে দিয়ে লেকে চলে যাবো।

: তাকি হয়? আপনাদের তুজনের এখন একা-একা যাওয়া দরকার। একটু নিরিবিলি চাই। আমি সেখানে বাধা দিতে চাই না।

কেতকী লজ্জা পেয়ে যায়। সে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে থাকে।

সুরঞ্জন বলে: দেখবেন, আপনি থাকলে কোন অসুবিধেই হবে না।

অঞ্জলি দেবী মাথা দুলিয়ে কেতকীর দিকে চোখ টিপে ইশারা করলেন। বললেন : আপনি শুধু আপনার সুবিধে-অসুবিধের কথা ভাবেন কেন ? এবার থেকে আরেকজনের কথা সেই সঙ্গে ভাববেন, বুঝলেন ?

কেতকী মুখ ফিরিয়ে সলজ্জভাবে হেসে উঠলো।

সুরঞ্জন বুঝতে পারলো না, সেই হাসিতে কেন যেন তার বুকের ভেতরটা শির শির করে উঠলো।

অঞ্জলি দেবী বললেন : সেদিন তাহলে আমি ঠিকই ধরেছিলাম। শিকারী বেরালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়।

একটা খালি ট্যাক্সি চোখে পড়তেই সুরঞ্জন ডেকে তাতে অঞ্জলি দেবীকে বসতে বললো।

অঞ্জলি দেবী বললেন : আগে আপনারা উঠুন। আপনাদের তাগিদ এখন বেশি।

সুরঞ্জন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু দেখলো, সঙ্গে কেতকী রয়েছে। এখন অঞ্জলি দেবীকে বলা ঠিক হবে না।

সে কিছু না বলে নিঃশব্দে কেতকীকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসলো। ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করলে সে পেছন ফিরে দেখলো অঞ্জলি দেবী তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখে মুখে তার একটা হাসির আভা।

লেকের পাশে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে তারা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল। এখন লেকে বেশ ভিড়। গরমের সময় সবাই একটু ভিজে বাতাস খোঁজে। নায়ক নায়িকারা খোঁজে একটু নিরিবিলি। লেকে কোথাও আর বসবার জায়গা নেই।

সুরঞ্জন আর কেতকী জলের ধার ঘেঁষে এক জায়গায় ঘাসের ওপর বসলো।

লেকের জলে তখন লাইট পোষ্টের আলো আর অন্ধকার গাছ-গুলো মুখ দেখছিল। গাছের পাতাগুলো কাঁপছিল, লেকের জল ঝিলিমিলি খেলছিল লাইট পোষ্টের আলোর সঙ্গে।

অনেকক্ষণ তারা চুপচাপ বসে রইলো সেই দিকে তাকিয়ে। পেছনে মালাই বরফ ডেকে গেল! আর ডেকে গেল লেমনেড সোডা। বারো-চৌদ্দ বছরের এক ছোকরা খুব সন্দেহজনকভাবে এসে বলে গেল : ঠাণ্ডা আছে, একটা দিয়ে যাবো নাকি, বাবু ?

: না।

সুরঞ্জন তাকে হতাশ করলো।

ছেলেটা চলে গেলে সুরঞ্জন ডাকে : কেতকী—

: উঁ—

: কি ভাবছো ?

কেতকী হেসে বলে : কই, কিছু না তো ?

: হ্যাঁ, ভাবছিলে। নিশীথের কথা ?

সঙ্গে সঙ্গে কেতকী কঠিন হয়ে ওঠে বলে : ওর নাম মনে করতে আমার ঘৃণা হয়। ও যে কী অসাধারণ মিথ্যেবাদী আর লম্পট—

সুরঞ্জনের মনে হলো, সে কেতকীর কাছে নিশীথের নাম করে ঠিক করে নি! তাতে সে তার পুরোনো দুঃখকে জাগিয়ে তুলে তাকে উত্তেজিত করে তুলেছে। নিশীথের নাম সে আর কেতকীর কাছে তুলবে না। কিন্তু তবু ঘুরে ফিরে নিশীথের প্রসঙ্গ আসে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে : নিশীথ কি তোমাকে বিয়ে করেছিল ?

কিন্তু কেন সুরঞ্জন এ সব কথা তাকে জিজ্ঞেস করছে ? এ সব কথা জিজ্ঞেস করার অর্থ কি ?

কেতকা সংক্ষেপে উত্তর দেয় : না।

একটু থেমে সে বলে : আপনি ওর কথা না বলে অন্য কথা বলুন।

সুরঞ্জন চুপ করে বসে থাকে। তারপর নিজের মনে হেসে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে কেতকী জিজ্ঞেস করে : হাসলেন যে ?

সুরঞ্জন বলে : একটা কথা মনে পড়ে গেল।

: কি কথা ?

সুরঞ্জন কি ভেবে আবার হেসে ওঠে।

কেতকী জিজ্ঞেস করেঃ কার কথা?

ঃ আমার কথা।

কেতকী ভাবে, নিজের কথায় কেউ আবার হাসে নাকি? ইনি আবার এক আশ্চর্য ধরনের লোক।

ঃ কি কথা বলুন না?

ঃ আমি মাঝে মাঝে একটা স্বপ্ন দেখি—

বলে সুরঞ্জন আবার হাসতে থাকে।

কেতকী ভয় পেয়ে যায়। কার স্বপ্ন? আর কি স্বপ্নই বা ইনি দেখে থাকেন? সে আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না। ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস করেঃ একটা স্বপ্নই শুধু দেখে থাকেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আশ্চর্য তো! কি স্বপ্ন, বলুন না?

কথাটা জিজ্ঞেস করতে তার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মুখ দিয়ে কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেল।

ঃ শোন তবে—

সুরঞ্জন বলতে আরম্ভ করে।

ঃ একবার আমি একটা কারখানায় কাজ করতাম। তখন খুব ছোট ছিলাম। থার্ড ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যে। অল্প দিনের মধ্যেই আমি মালিকের চোখে পড়ে গেলাম। চোখে পড়ার মত কোন গুণ আমার ছিল না। শুধু হাতের লেখা। মাইনে নেবার সময় যে সই করতাম, তা দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত। আমার সঙ্গে যারা কাজ করতো তারা সবাই টিপ সই করে মাইনে নিত। আমিই শুধু সই করতাম, তাও ইংরেজিতে। হাতের লেখা দেখে মালিক তো ভারি খুশি। বলতেনঃ সুরঞ্জনের হাতের লেখা আমার অনেক কেরানীবাবুদের চেয়েও ভালো। তাই কেরানীবাবুরা আমাকে ভালো চোখে দেখতে পারতেন না। তাঁদের জন্যে মিঃ ব্যানার্জী আমাকে কেরানীর কাজ দিতে চেয়েও দিতে পারলেন না। আমাকে ডেয়ারীতে পড়ে থাকতে হলো।

এতদূর শুনে কেতকী সহানুভূতি জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো: তাই নাকি ? তারপর ?

: মিঃ ব্যানার্জী মাঝে মাঝে ভালোবেসে আমাকে গাড়িতে করে তার বাড়ি নিয়ে যেতেন। বাড়িতে তাঁর ছেলে পুলে কেউ নেই। স্ত্রী বহু আগেই গতায়ু হয়েছেন। ছিল দাদার বিরাট সংসার। আর সেই সংসারের বড়ো আকর্ষণ তার ভাইঝি—আমার বীণাদি। হ্যাঁ, তাঁকে বীণাদি বলেই ডাকতাম।

কেতকী হেসে উঠলো। বললো: বুঝেছি। এই বীণাদিই বোধহয় আপনার স্বপ্নের নায়িকা ? আপনি বুঝি তারই স্বপ্ন দেখেন ?

: শুধু বীণাদির স্বপ্ন দেখি না, আরও একজনের—

: কে সে ?

: শোন তারপর বলছি। বীণাদি তখন আই. এ. পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। আমাকে প্রথম দেখেই বীণাদি বললেন: তুমিই বুঝি সুরঞ্জন ? তোমার কথা কাকুর মুখে যে রোজ কতোবার শুনি। তোমার হাতের লেখা নাকি বাঁধিয়ে রাখবার মতো ? তোমার জন্যেই আমরা রোজ কাকুর কাছে বকুনি শুনি।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেছিল: বকুনি ? আমার জন্যে ?

বীণাদি বলেছিলেন: হ্যাঁ ? তোমার জন্যেই তো ? তোমার হাতের লেখা নাকি সোনার মতো। আর আমাদের লেখা—

নিজেদের সঙ্গে বীণাদি এক নিম্নস্তরের প্রাণীর তুলনা করলেন। বললেন: তা ভাই লেখো দেখি একটু ! তোমার হাতের লেখাটা একটু দেখি।

সুরঞ্জনের হাতে কলমটা গুঁজে দিয়ে বললেন: লেখো না একটু।

সুরঞ্জন একখানা ধব্‌ধবে সাদা কাগজের ওপর বীণাদির কলমটা ধরে তাকিয়ে রইলো। জিজ্ঞেস করলো: কি লিখবো ?

: কি লিখবে, তাও বলে দিতে হবে ? যা খুশি লেখোই না তুমি। তোমার যা মনে আসে।

সুরঞ্জন বলেঃ সেই মুহূর্তে আমার কিছুই মনে এলো না। নিঃশব্দে আমি বীণাদির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। দেখলাম বীণাদির মুখখানি বড়ো সুন্দর। ঠিক তখনই বীণাদি খিল খিল করে হেসে উঠলেন। বীণাদিকে আরও সুন্দর দেখলাম। বীণাদি বললেনঃ কিছু না পাও, আমার নামটাই লেখো না।

হাতে কলম বাগিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলামঃ নামটা কি আপনার ?

ঃ তাও বুঝি জানো না।

সুরঞ্জন বললোঃ না।

ঃ বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাও, লেখো—

ঃ দুধের মতো সাদা কাগজের ওপর কালো কালিতে লেখা বীণাদির নামটা জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগলো। বীণাদি লেখাটা দেখে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন। বললেনঃ আরও একটু কিছু লেখো।

ঃ কি লিখবো ?

ঃ নিজের নামটাই লেখো না।

সুরঞ্জন বলতে লাগলোঃ বীণাদির নামের নিচে আমার নামটা অক্ষয় হয়ে রইলো।

কেতকী জিজ্ঞেস করেঃ অক্ষয় হয়ে রইলো কেমন করে ?

বীণাদি কাগজটা তার টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিলেন। শুনেছি, ওটা তিনি কখনও ছিঁড়ে ফেলেন নি। একবার নাকি হারিয়ে ফেলেছিলেন। পরে আবার তিনি ওটা খুঁজে পেয়েছেন।

কেতকী হেসে জিজ্ঞেস করলোঃ বীণাদির তখন বয়েস কতো ?

সুরঞ্জন তেমনি হেসে বলেঃ মেয়েদের এই একটা বড় দোষ। ছেলেমেয়ের কোন কথা হলেই তারা আগে বয়েসটা জিজ্ঞেস করে বসে।

কেতকী বলেঃ বেশ। আর জিজ্ঞেস করবো না।

সুরঞ্জন বলেঃ বীণাদির বয়েস তখন কতো আর হবে ? ধরো, আঠারো। আর আমার বয়েস তেরো কি চৌদ্দ।

লেকের জলে আলোর ঝিকিমিকি।

সুরঞ্জন সেই দিকে চেয়ে গল্প বলে যায়। আর কেতকী বসে শোনে।

সুরঞ্জনের জীবনে সেই বেদনা-মলিন দিনগুলোর ওপর বীণাদি তাঁর হাতের আশ্চর্য ছোঁয়া বুলিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে সেই দিনগুলো পদ্মের মতো ফুটে উঠলো।

সুরঞ্জনকে আর বেশি দিন কারখানায় কাজ করতে হলো না।

মিঃ ব্যানার্জি বীণাদির কথা শুনলেন। তারপর তাকে মানুষ-তৈরীর কারখানায় পাঠানো হলো।

সুরঞ্জন মিঃ ব্যানার্জির বাড়িতে থাকে। খায় দায়, ইস্কুলে পড়তে যায়। বীণাদির পড়বার ঘরের একপাশে হলো সুরঞ্জনের বিছানা। সুরঞ্জন পড়ে, বীণাদিও পড়েন। সুরঞ্জনের পড়াশোনা বীণাদির তদারকিতে দিব্যি চলতে থাকে।

সুরঞ্জন প্রত্যেক বছর ফার্স্ট হয়েছে আর আনন্দ করেছে বীণাদি। বাড়িসুদ্ধু সবাইকে সে মিষ্টি খাইয়েছে।

সুরঞ্জন যে-বছর স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক্ পাশ করলো, সেই বছরই বীণাদি বি. এ. পাশ করলেন হিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে।

তারপরই বীণাদির সঙ্গে সুরঞ্জনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

সুরঞ্জন হস্টেলে চলে গেল। এবার থেকে সেখানেই তাকে থাকতে হবে।

মিঃ ব্যানার্জি হস্টেলের খরচপত্র দিতেন। বীণাদি চিঠিতে খবর নিতেন। মিঃ ব্যানার্জির বাড়িতে যাওয়াও সুরঞ্জনের কমে এলো। সুরঞ্জনও চিঠি লিখতো বীণাদিকে। সেই চিঠির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বীণাদির চিঠি আসতো: তোমার চিঠিগুলি ভারি সুন্দর। এমন সুন্দর চিঠি লিখতে পারো তুমি। তুমি আরো চিঠি লিখবে আমাকে। সপ্তাহে একখানা করে তোমার চিঠি যেন আমি পাই।

সুরঞ্জনও উৎসাহিত হয়ে আরো চিঠি লেখে। একবার সে তো পদ্যেই একখানা চিঠি লিখে ফেলেছিল। তাতে সে লিখেছিল:

বীণাদি, তুমি যে গার্গী ও তুমি মৈত্রেয়ী, লীলাবতী
তুমি ভারতের স্বপ্ন-কুসুম-কন্যা।
নিবিড় আঁধারে জ্বলে আছো তুমি মেরু-নীলিমার জ্যোতি
স্নেহ-সুমধুর মূর্তি, তুমি অনন্যা।

বীণাদি চিঠিখানা অনেককে দেখিয়েছিলেন। পদ্যটা তার এত ভালো লেগেছিল যে কাঁচের ফ্রেমে ওটা বাঁধিয়ে রেখেছিলেন।

বছর দুই পরে বীণাদির বিয়ে হয়ে গেল। তখন বীণাদি এম. এ. পড়ছিলেন। এম. এ. পড়ার মাঝখানেই বিয়ে হয়ে গেল তাঁর। আর তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হলো না। বিয়েতে অনেকেই এসেছিলেন। একজন শুধু যায় নি। সে সুরঞ্জন। তাকে জানানোই হয় নি।

অনেকদিন চিঠির কোন উত্তর না পেয়ে সুরঞ্জন নিজেই গেল বীণাদির সঙ্গে দেখা করতে। বীণাদির কোন অসুখ করেনি তো?

বীণাদিকে দেখে সে চিনতে পারে না। চেহারায় সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছেন বীণাদি। কেমন মোটা-সোটা হয়ে উঠেছেন তিনি। গায়ে কতো গয়না ঝলমল করছে। সেই সঙ্গে কারুকাজ-করা দামী সিল্কের শাড়ি।

বীণাদিকে আর যেন চেনাই যায় না। বীণাদি যেন আর সে বীণাদি নেই। কপালের সিঁদুরের মতোই তিনি খুশিতে ডগমগ। বীণাদি সেদিন শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছেন। তাঁকে ঘিরে বসেছে অনেকে। সেখানে সুরঞ্জনের যাওয়া চলে না। সুরঞ্জন একা-একা বাইরের ঘরে বসে রইলো।

সন্ধের পরও সে ভিড় ফাঁকা হলো না। বীণাদিকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা-তামাসা করছে। বীণাদিও তাদের তামাসার জবাব দিচ্ছেন। মেয়েদের হাসির রোল বাইরের ঘর পর্যন্ত যথারীতি গড়িয়ে আসছে।

সুরঞ্জন নিঃশব্দে উঠে চলে এলো। ট্রামে-বাসে না উঠে সে হেঁটেই হস্টেলে ফিরলো। হস্টেলে সেদিন রাতে তার চোখে ঘুম এলো না।

কেতকী গল্পের মাঝখানে জিজ্ঞেস করে বসলোঃ আপনি বীণাদিকে ভালোবাসতেন নাকি?

সুরঞ্জন বললো : না।

: তবে তার কথা ভেবে রাতে আপনার ঘুম এলো না কেন?

: কি জানি, সেদিন আমি সারারাত ধরে কাঁদলাম। আমার খালি কান্না পাচ্ছিল। মনে হলো, বীণাদি আজ থেকে পর হয়ে গেলেন।

: উনি তো পর হবেনই। ওঁর বিয়ে হয়েছে। ঘর-সংসার পাত্‌বেন। আপনি তাঁর জন্যে ভাববেন কেন?

: ভাববো না? তুমি বুঝতে পারছো না, আমার জীবনে বীণাদি কি? আমি যখন কারখানার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিলাম, তখনই তো তিনি আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। জগতে আমার কেউ ছিল না। ছিলেন শুধু বীণাদি। সেই বীণাদি সেদিন সবার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছেন। আর অনাহূত আমি বাইরের ঘরে বসে প্রতিটি মুহূর্ত গুন্‌ছি। সব চেয়ে বড়ো কথা কি জানো? সেদিন তিনি আমাকে দেখেও দেখলেন না?

: তাই নাকি? কিন্তু কেন?

: কেন, তা আমি বলতে পারবো না। তোমরা মেয়েরা ভালো করেই বলতে পারবে।

কেতকী চুপ করে গেল।

সুরঞ্জন বলতে লাগলো : সেই থেকে আমি আর মিঃ ব্যানার্জির বাড়ি যেতাম না। একদিন বীণাদির চিঠি এলো। সেদিন আমার কী আনন্দ! বীণাদি তাহলে আমাকে ভোলেন নি। এখন তিনি কতো ব্যস্ত। সেই ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমার কথা ঠিক মনে রেখেছেন। চিঠিতে লিখেছেন : চিঠি দাও না কেন? আমি রোজ ভাবি, তোমার চিঠি আসবে। কিন্তু কই? চিঠি লেখা কি তুমি ছেড়ে দিয়েছো? এমন সুন্দর করে তুমি চিঠি লিখতে। আমার এই ঠিকানায় চিঠি দিও। সারাদিন একা-একা ভালো লাগে না। তোমার চিঠি পেলে আমার খুব ভালো লাগবে।

সুরঞ্জন চিঠিখানা বার বার পড়তে লাগলো। পড়ে বালিশের তলায় রেখে দিল। আবার কিছুক্ষণ পরে চিঠিখানা বের করে পড়তে থাকে সে।

ভেবেছিল, সে চিঠি লিখবে না। কিন্তু পারলো না। বহুদিন পরে আবার সে চিঠি লিখতে বসলো।

সুরঞ্জনের চিঠি গেল। চিঠির উত্তরও এলো।

চিঠির আদান প্রদান চলতে লাগলো আগের মতো।

দিন কাটে। মাস কাটে। বছরও ঘুরে যায়।

এক সময় হঠাৎ বীণাদির চিঠি বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সুরঞ্জন তার অভ্যেস মতো সপ্তাহান্তে একখানা করে চিঠি দিয়ে যায়।

কিন্তু কি হলো বীণাদির? বীণাদি হঠাৎ চিঠি দেওয়া বন্ধ করে দিলেন কেন? একবার তো চিঠির আদান প্রদান বন্ধ হয়েই গিয়েছিল। তারপর আবার বীণাদিই তো নতুন করে চিঠির লেনদেন সুরু করলেন। বন্ধই যদি করবেন, তবে সুরু করলেন কেন? বড়ো আশ্চর্য লাগে সুরঞ্জনের।

সুরঞ্জন ভাবতে থাকে। বীণাদি কি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন্? কিংবা কলকাতার বাইরে চলে গেছেন তিনি?

তা জানিয়েও তো একখানা চিঠি লেখা যায়।

কয়েকখানা চিঠিই তো সে লিখলো। একটিরও তো উত্তর এলো না। সে আর বসে থাকতে পারলো না। একদিন বীণাদির ঠিকানা পকেটে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো।

ভবানীপুরের একটি বাড়ির নম্বরের সঙ্গে পকেটের ঠিকানাটা মিলিয়ে নিয়ে সে কলিং বেল টিপলো। একটু ভয়ে ভয়েই টিপলো। কারণ গেটের একপাশে লেখা: 'Beware of Dogs—কুকুরগুলি হইতে সাবধান'।

চাকর এসে জিজ্ঞেস করলো: কাকে চাই?

একটু থতমত খেয়ে সুরঞ্জন বললো: বীণাদি বাড়ি আছেন?

আপনি কোত্থেকে আসছেন?

: বলো, সুরঞ্জনবাবু এসেছেন।

নামটা শুনে চাকরটা কিছুক্ষণের জন্যে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে তাকে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় পাশে-বাঁধা কুকুরগুলো তাকে দেখে একসঙ্গে ডেকে উঠলো।

সুরঞ্জন বোধ হয় একটু চম্‌কে উঠেছিল। তাই দেখে চাকরটা বললো: ভয় পাবেন না। বাঁধা আছে।

ওপরের একটা ঘরে তাকে নিয়ে বসালো সে। বললো: আপনি বসুন। উনি এখুনি আসছেন।

সুরঞ্জন বসে রইলো একা। চারদিকে তাকাতে লাগলো। বিরাট বাড়ি। ঘরগুলোও তেমনি বিরাট-বিরাট। মোজাইক্‌-করা মেঝে। চারদিক সাহেবী কায়দায় সাজানো। এমন বিরাট ঘরের মধ্যে, সাজানো দামী আসবাবপত্রের মধ্যে নিজেকে বড়ো অসহায় লাগছিল সুরঞ্জনের। একবার সে ভাবলো, এসে বোধহয় সে ভালো করেনি।

কিন্তু এসেই যখন পড়েছে সে, তখন দেখা না করে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? আর চলে যাবে বললেই তো চলে যাওয়া যায় না। সিঁড়ির ধারে যে কুকুরগুলো বাঁধা আছে। তারা কি ছেড়ে কথা বলবে?

কতোক্ষণ পরে বীণাদি ঘরে এলেন।

: এই-যে সুরঞ্জন, কখন এলে?

: বেশিক্ষণ নয়।

কাছে এগিয়ে এসে বীণাদি ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললেন: তুমি এখানে এলে কেন?

সুরঞ্জন শক্‌-খাওয়া মানুষের মতো হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো।

: কেন বীণাদি, আমি কি এসে ভুল করলাম?

: চুপ্‌!

বীণাদি তারপর একটা চেয়ারে বসলেন। হাতে একখানা ইংরেজি ম্যাগাজিন্‌ টেনে নিয়ে মাথাটা আড়াল করে জোরে জোরে জিজ্ঞেস করলেন: কেমন আছো তুমি?

বীণাদির কথা বলার ভঙ্গিতে সুরঞ্জনের ভারি আশ্চর্য লাগলো। বীণাদি পাগল হয়ে যাননি তো ?

সুরঞ্জন চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে বললো : ভালো আছি, বীণাদি। আপনি ?

বীণাদি কোন জবাব দিলেন না।

পাশের ঘরে কার পায়ের শব্দ শুনে বীণাদি ডাকলেন : রমেশ—

রমেশ সাড়া দিল।

বীণাদি তাকে আদেশ করলেন : বাবুর জন্যে খাবার এনে দাও।

রমেশ চলে গেলে বীণাদি উঠে গিয়ে পাশের ঘর, বারান্দা একবার ঘুরে এলেন।

: সুরঞ্জন—

: বীণাদি—

: তোমার চিঠিগুলো সব আমার হারিয়ে গেছে।

: হারিয়ে গেছে ?

: হ্যাঁ।

: কি করে হারালো ?

একটু থেমে সুরঞ্জন বলে : আর হারালোই বা! ওগুলো তো আর এমন কিছু মহামূল্য সম্পদ নয় যে তার জন্যে আফ্‌সোস করতে হবে।

বীণাদি বললেন : না সুরঞ্জন। বুঝতে পারছো না এখানে কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে। অনেকদিন ধরে তোমার চিঠি আমি পাচ্ছি না।

: সে কি বীণাদি, আমি যে গত সপ্তাহ পর্যন্ত আপনাকে চিঠি লিখেছি।

: তাহলে আর বলতে হবেনা। সব চিঠি কারো হাতে গিয়ে পড়েছে।

বীণাদির চিঠিতেই সুরঞ্জন জানতে পেরেছিলেন, তাঁর স্বামী ম্যাজিষ্ট্রেট্। এই ছোটখাটো ব্যাপারে মাথা গলাবার তাঁর কি সময়

আছে? তাঁর হাতে গিয়ে চিঠি পড়ার সম্ভাবনা কোথায়? আর পড়লোই বা তাঁর হাতে। তাতে তো এমন কিছু লেখা থাকে না, যাতে বীণাদির বিপন্ন বোধ করবার কারণ ঘটতে পারে।

বীণাদি বলেন: খান দুয়েক চিঠি উনি পড়ে ফেলেছেন। পড়ে তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বলেছি সব কথা। সেই থেকে উনি যেন কেমন হয়ে গেছেন।

: তাই নাকি?

: সেই থেকে চিঠি লেখা আমি বন্ধ করে দিয়েছি।

রমেশ মিষ্টি দিয়ে গেল।

সুরঞ্জন মিষ্টির প্লেটে হাত দিতে পারলো না।

বীণাদি চুপি চুপি বললেন: খাও সুরঞ্জন। এভাবে বসে থাকলে সবাই আরও সন্দেহ করবে?

অগত্যা সুরঞ্জন খেতে থাকে।

বীণাদি বলেন: সুরঞ্জন, কিছু মনে করো না' তুমি আর আমাকে চিঠি লিখো না।

সুরঞ্জন কোন রকমে মুখের খাবার গলায় ঠেলে দিয়ে বললো: আচ্ছা।

: আর তুমি কখনো এখানে এসো না। আমি মরে গেলেও না। কেমন?

গলাটা বুজে গিয়েছিল সুরঞ্জনের। সে অতি কষ্টে বললো: আচ্ছা।

সুরঞ্জন আর কিছু না বলে উঠে দাঁড়ালো। সে আর বসতে চাইছিল না। সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে যেন সে বাঁচে।

তাকে রুমালে মুখ মুছতে দেখে বীণাদি জিজ্ঞেস করে: আর খেলে না যে?

: আর খাবো না বীণাদি। আমি এখন চলি।

: এসেছো যখন, তখন আর একটু বসো।

: আর কেন?

ঃ আর তো আসবে না। তোমার চিঠিও আর পাবো না।

কিছুক্ষণের মধ্যে গেটে গাড়ি এসে দাঁড়ালো।

বীণাদি উঠে গেলেন। ফিরে এসে বললেন ঃ উনি এসে গেছেন। একবার দেখা করে যাও।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রণববাবু ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কে ?

জবাব দিলেন বীণাদি। তিনি বললেন ঃ সুরঞ্জন। যার কথা তোমাকে বলেছিলাম।

প্রণববাবু বললেন ঃ সুরঞ্জন ? তা যত ছোটো বলেছিলে, ও তো তত ছোটো নয়।

ঃ এখন বড়ো হয়ে উঠেছে। ওকে কতো ছোটো দেখেছিলাম।

প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখন কি করছে ও ?

বীণাদি জবাব দিলেন ঃ জার্নালিজ্‌ম্ পাশ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন।

ঃ আমার কাছে একটা কাজ খালি আছে। করবে নাকি জিজ্ঞেস করো। তবে কেরানীর কাজ। কারখানার কাজ নয়।

সুরঞ্জন তড়িতাহতের মতো প্রণববাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু সে তাঁর মুখটা দেখতে পেল না। তিনি ততক্ষণে ভেতরের দিকে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন।

সুরঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো।

বীণাদি উঠবার জন্যে উস্‌খুস্ করতে লাগলেন।

সুরঞ্জন বললো ঃ আমি এখন আসি, বীণাদি। আর তো দেখা হবে না।

ঃ এসো—

বীণাদি গেট পর্যন্ত সুরঞ্জনকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

সুরঞ্জনের মনে পড়ে, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বীণাদি বলেছিলেন ঃ আর চিঠি দেবে না তো ?

ঃ না।

ঃ কাজটা করবে না কি ?

ঃ না।

সুরঞ্জন কেতকীকে বলেঃ সেইদিন বীণাদির কাছ থেকে চিরদিনের মতো চলে এলাম।

কেতকী জিজ্ঞেস করলোঃ বীণাদি এখন কেমন আছেন ?

ঃ জানি না।

কেতকী আকাশের দিকে তাকালো। আকাশটা কখন মেঘে ঢেকে গেছে। সে মন দিয়ে গল্প শুনছিল। এতক্ষণ আকাশের খবর রাখে নি।

কেতকী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। এসময় এ রকম মেঘ মাঝে মাঝে ওঠে। তাতে বৃষ্টি হয় না।

সে সুরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করেঃ এতে হাসির কি আছে ? আপনি হাসছিলেন কেন ?

সুরঞ্জন বলেঃ না। এতে হাসির কিছুই নেই। সে জন্যেও আমি হাসি নি। আমি হেসেছিলাম একটা স্বপ্নের কথা ভেবে।

ঃ কি স্বপ্ন ?

সুরঞ্জন হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে সে বলেঃ স্বপ্ন দেখি, আমি সার্কাস দেখতে গিয়েছি। কাছেই বসে আমি সার্কাস দেখছি। একটা লোক আর একটা মেয়ে খেলা দেখাচ্ছে। সব শেষে লক্ষ্য-ভেদের খেলা। কাঠের একটা বড়ো দরজার মতো পাটার ওপরে মেয়েটা গা এলিয়ে দিয়ে দাঁড়ালো। লোকটা কতকগুলো শান-দেওয়া বড় বড় ছুরি হাতে নিয়ে মেয়েটার দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলো। কিন্তু আশ্চর্য, একটা ছুরিও মেয়েটার গায়ে লাগলো না। তার চার-পাশে সব কটা গিঁথে বসতে লাগলো। হাতের সব ছুরি ফুরিয়েছে। আছে মাত্র একটা ছুরি। সেই ছুরিটা বসিয়ে দিতে পারলে খেলা শেষ।

সবাই দম বন্ধ করে বসে আছে।

ওস্তাদ খেলোয়াড় শেষের ছুরিটা ছুঁড়ে মারলো। ছুরিটা কোথায় গেল? মেয়েটা খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে কাঠের পাটা থেকে উঠে এলো। ছুরিটা তো কাঠের গায়ে লাগে নি।

সঙ্গে সঙ্গে সুরঞ্জন ব্যথায় আর্তনাদ করে চেয়ার থেকে পড়ে গেল।

ছুরিটা তার ঠিক বুকেই লেগেছে।

সুরঞ্জন হাসতে হাসতে কেতকীকে বললো: আমি মরে গেলাম।

কেতকী তার হাসিতে যোগ দিতে পারলো না। বললো: এ একটা বাজে গল্প। এমন জানলে গল্পটা শুনতাম না।

সুরঞ্জন বললো: আরো আছে।

: কি?

: মেয়েটা কে জানো?

: কে?

: বীণাদি।

: আর লোকটা বুঝি—

: হ্যাঁ। প্রণববাবু।

এবার দুজনে হেসে উঠলো।

সুরঞ্জন বললো: চলো। এবার ফেরা যাক।

কেতকীর এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার ইচ্ছে ছিল না। সে বলে: আর একটু বসা যাক।

কিন্তু বেশিক্ষণ বসা হলো না। ঝড় উঠলো। ধুলো উড়িয়ে, পাতা উড়িয়ে ঝড় ছুটে এলো।

কেতকী আর সুরঞ্জন উঠে দৌড়োতে আরম্ভ করলো বাসের স্টপেজের দিকে। কিন্তু তারা ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারলো না। সুরঞ্জন একা থাকলে হয়তো অসুবিধে হতো না। কিন্তু কেতকীর জন্যে সে জোরে ছুটতে পারলো না। ঝড়ের দাপটে সে তার শাড়ি সাম্‌লিয়ে ছুটতে পারছিল না। বারে বারে দাঁড়িয়ে তাকে কাপড় ঠিক করে নিতে হচ্ছিল।

ঝড় যদিও-বা থামলো। কিন্তু তাদের বৃষ্টির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হলো। বৃষ্টিতে ভিজে তারা একেবারে চুপ্‌সে গেল। ভিজে শাড়িতে শরীর ঢেকে রাখা কেতকীর পক্ষে দায় হয়ে উঠলো।

এ অবস্থায় বাসে ওঠা যাবে না।

বাধ্য হয়ে তাদের ভিজতে ভিজতে ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করতে হলো।

সেদিন সকালে সুরঞ্জন চা খাচ্ছিল, করবী এসে বললোঃ দাদা, আপনাকে বাবা একবার ডেকেছেন।

সুরঞ্জন একটু অন্যমনস্ক ছিল। তাই প্রথমবারে ঠিকমতো শুনতে পায়নি কথাটা। তাই সে জিজ্ঞেস করলোঃ কে ডেকেছেন?

ঃ বাবা।

ঃ কেন?

ঃ জানি না।

সুরঞ্জন একটু ভেবে বললেঃ বলো, আমি একটু পরে আসছি।

ঃ আচ্ছা।

করবী চলে যাচ্ছিল। সুরঞ্জন ডাকলোঃ করবী—

করবী ফিরে এলো।

ঃ কি?

ঃ পরীক্ষার রেজাল্ট কি?

করবী মুখ নিচু করে বললোঃ পাশ করেছি।

ঃ অনার্স?

ঃ পেয়েছি।

ঃ সাবাস্‌। এই তো চাই! আর তুমি এমন খবরটা লুকিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিলে?

ঃ লুকোই নি তো ?

সুরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে বলে ঃ কই বলো নি তো ?

করবী মুখ টিপে হাসছিল। মুখ টিপে হাসলে সত্যি করবীকে সুন্দর দেখায়। সুরঞ্জন তাকে দেখছিল চেয়ে চেয়ে।

ঃ এ আর এমন কি বলার মতো খবর ?

ঃ বারে! বলার মতো খবর নয়? তুমি পাশ করেছ, অনার্স পেয়েছ। এটা খবর নয়। তুমি যতই যা করো, মিষ্টিটুকু ফাঁকি দিতে পারবে না।

করবী হাসলো। বললো ঃ মিষ্টি আমি খাওয়াবো না কি ?

সুরঞ্জন বলে ঃ তবে কে খাওয়াবে? আমি ?

করবী হেসে বললো ঃ হ্যাঁ, আপনিই তো খাওয়াবেন।

ঃ বারে! পাশ করলে তুমি আর মিষ্টি খাওয়াবে কোন্ হরিদাস পাল।

ঃ হরিদাস পাল সব করছেন, আর এটুকু করতে পারবেন না ?

ঃ আমি ও সব কিচ্ছু জানি না। আমার মিষ্টি চাই।

ঃ উঃ! কী লোভী রে বাবা! আপনি কিন্তু আজকাল বড় লোভী হয়ে উঠেছেন।

সুরঞ্জন হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। করবী তাকে লোভী বললো কেন? সত্যিই কি কোন বিষয়ে তার লোভ বেড়ে গেছে ? সত্যিই কি তাই ?

সুরঞ্জন হেসে ওঠে। বলে ঃ মানুষ যত পায়, তার তত লোভ বাড়তে থাকে। আমার দোষ কি বলো ?

করবী বলে ঃ হয়েছে, হয়েছে। অত বড় বড় কথায় কাজ নেই। আমি চাকরি করি, তারপর মিষ্টি খাওয়াবো।

ঃ ততদিন আমি মিষ্টির পথ চেয়ে থাকবো? সে হবে না। তুমি এখুনি গিয়ে মাকে বলো, আমি মিষ্টি খেতে নিচে আসছি।

ঃ আচ্ছা—

করবী নিচে নেমে গেল।

কিন্তু করবীকে হেরম্ববাবু আজ পাঠিয়েছিলেন কেন ?

সুরঞ্জন ভাবতে লাগলো।

হেরম্ববাবু কোনদিন তো কোন দরকারে তাকে ডেকে পাঠান না। করবীও তার কাছে কখনো কোন দরকারে আসে না। তবে আজ কি হলো ? কার কথা বলবেন হেরম্ববাবু ? কেতকীর কথা ? কিংবা করবীর কথা ?

করবী পাশ করেছে। এবার কি তার চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে ? কিংবা অন্য কিছু ?

সুরঞ্জন ভাবতে ভাবতে নিচে নেমে গেল।

হেরম্ববাবুর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করলো : আপনি আমায় ডেকেছেন ?

হেরম্ববাবু মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন : হ্যাঁ। বসো—

সুরঞ্জন বসলো।

হেরম্ববাবুর মুখে কোন কথা নেই।

সুরঞ্জন বললো : শুনেছেন, করবী পাশ করেছে। অনার্সও পেয়েছে—

হেরম্ববাবু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বললেন : এখন কি পাশ-ফেলের কোন দাম আছে ? করবী পাশ করে কি করবে ?

অনেকক্ষণ ধরে কথাটা সুরঞ্জনের মনের মধ্যে বাজতে থাকে। করবীর পাশের মূল্য কি ? কিন্তু সে হেরম্ববাবুর মতো নিরাশাবাদী নয়। সে ভাবে, এত বড় এই দেশ। করবীর কোথাও কি কোন ব্যবস্থা হবে না ?

এ বিষয়ে হেরম্ববাবুকে বিশ্বাস করানো অসম্ভব। তাই অন্য কথা বলাই ভালো।

সে বলে : আমাকে ডেকেছিলেন কেন ?

হেরম্ববাবু এদিক ওদিক তাকান। কেউ কোথাও নেই। তিনি ইশারায় সুরঞ্জনকে কাছে ডাকেন। সুরঞ্জন চেয়ারটাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে যায়।

আস্তে আস্তে তিনি বলেন : জানো রঞ্জন, বড়ো কষ্ট—

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে : কেন ? পায়ে কি আবার ব্যথা বেড়েছে ?

: পায়ে নয়। পা তেমনি অসাড় হয়েই আছে।

: তবে ?

হেরম্ববাবু একটু থেমে বলেন : রাতে একটুও ঘুম আসে না চোখে।

: তাই নাকি ? কবে থেকে ?

: একমাস হলো, ঘুমোতে পারছি না আমি। চোখে কিছুতেই একটু ঘুম আসে না।

করুণ চোখে তিনি চেয়ে রইলেন সুরঞ্জনের মুখের দিকে।

: একবার ডাক্তারকে বলবে ? যদি কোন ওষুধ দেয়—

সুরঞ্জন বলে : ঠিক আছে। আমি এখুনি যাচ্ছি।

হেরম্ববাবু বললেন : এখুনি যাবার দরকার নেই। সন্ধের পর যেও।

সুরঞ্জন হেরম্ববাবুর কথায় কান না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তারের কাছে সন্ধের পর গেলেও সে পারতো। কিন্তু সন্ধেটাকে সে কেতকীর জন্যে হাতে রাখতে চায়।

কাল কেতকী তাকে বলে রেখেছে, আজ সন্ধেয় সে আবার তার সঙ্গে বেরোবে।

সেদিন কেতকী লেকে আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাইছিল। নিরিবিলিতে বসে গল্প শুনতে তার খুব ভালো লাগছিল। কিন্তু ঝড় এসে পড়লো ; তাই বাধ্য হয়ে বৃষ্টিতে ভিজে তাদের বাড়ি ফিরতে হলো।

তাই সে কাল বলে রেখেছে, আজ সন্ধেয় সে সুরঞ্জনের সঙ্গে বেরোবে। সুরঞ্জনও কথা দিয়েছে। আজ সন্ধেয় সে কেতকীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাবে। সন্ধেটাকে তাই সে সরিয়ে রাখতে চায়।

ডাক্তারের কাছে গিয়ে সে হেরম্ববাবুর কথা বললো। জিজ্ঞেস করলো : ওঁর পায়ের কিছু উন্নতি হচ্ছে, ডাক্তারবাবু ?

হাসপাতাল থেকে আসার পর থেকে ইনিই হেরম্ববাবুর চিকিৎসা করছেন। হাসপাতালের ডাক্তার এঁর কাছেই হেরম্ববাবুকে দেখাতে বলেছিলেন।

সেইমতো চিকিৎসা চলছিল বেশ।

আজ হঠাৎ ডাক্তারবাবু বললেন : ওঁর পায়ের আশা ছেড়ে দিন।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে : তার মানে ?

: অত্যন্ত পরিষ্কার। শরীরের আর কোন ভাইটালিটি নেই। অনেক ওষুধ দিয়েছি। পায়ের সারবার কোন লক্ষণই দেখছি না। ভেতরে আর কিছু নেই। বুঝেছেন ?

: তাহলে কি বলতে চান ? পা-টা সারবার কোন উপায় নেই ?

: না। নার্ভগুলো সব শুকিয়ে গেছে। টিস্যুগুলো কাজ করছে না।

: মানে প্যারালিসিস্ ?

: তাই।

সুরঞ্জন চুপ করে বসে রইলো। মনটা বড়ো ভেঙে গেল তার। তাহলে যতদিন হেরম্ববাবু বেঁচে থাকবেন, ততদিন তাঁকে শুধু অসহায় দৃষ্টিতে তাঁর অবশ পায়ের দিকে বারে বারে তাকাতে হবে। কিছুই করবার নেই।

সুরঞ্জন বললো : তাহলে ঘুমের ? উনি যে রাতে একটুও ঘুমাতে পারছেন না।

: তার ওষুধ আমি দিচ্ছি।

কতকগুলো ট্যাবলেট দিলেন তিনি। সুরঞ্জনের হাতে দিয়ে বললেন : একটু সাবধানে রাখবেন। রোগীর কাছ থেকে দূরে রাখাই ভালো। কেন বুঝতে পারছেন তো ?

সুরঞ্জন মাথা নেড়ে বললো : আচ্ছা।

তারপর সে খুব চিন্তিত মুখে ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে এলো।

রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ তার মনে পড়লো, হেরম্ববাবুর পা সারবে না —একথা যোগমায়া দেবী কিংবা হেরম্ববাবু যদি জানতে পারেন,

তাহলে তো ভীষণ ভেঙে পড়বেন তাঁরা। যদি ডাক্তারবাবু কোন সময় কথাটা বলে ফেলেন তাঁদের কাছে, তাহলে ভারি মুশ্‌কিল হবে।

সুরঞ্জন আবার ফিরে গেল। ডাক্তারবাবুকে বারণ করে এলো, যেন তিনি কখনো কথাটা কোথাও না বলেন।

শ্যামবাজারের মোড়ের কাছেই ডাক্তারখানা। ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে সুরঞ্জন মোড়ের দিকে এগুলো।

এই সকালে কতো মানুষ চলেছে। তাদের কতো কাজ! এত সকালেই এত ব্যস্ততা! হঠাৎ তার মনে হলো, পৃথিবীতে কতো মানুষ! কতো রকমের তাদের দুঃখ! তবে সে হেরম্ববাবুর দুঃখকেই এত প্রাধান্য দিচ্ছে কেন? দুঃখ জমালেই দুঃখ বাড়ে। মন থেকে দুঃখকে মুছে ফেলতে হবে। ভিড়ের মধ্যে সে হেরম্ববাবুর দুঃখকে হারিয়ে ফেললো। মনটা হাল্‌কা হয়ে উঠলো তার।

তার ওপর আজ সন্ধেয় কেতকীর সঙ্গে বেড়াতে যাবার ভাবনায় মনটা তার খুশিতে দুলে উঠলো। মনের আনন্দে সে অনেকখানি মিষ্টিও কিনে ফেললো। করবী পাশ করেছে। সে আজ সবাইকে মিষ্টি খাওয়াবে।

বাড়িতে যোগমায়া দেবী সুরঞ্জনের হাতে মিষ্টি দেখেই বলে উঠলেন ঃ একি! এত মিষ্টি কেন?

সুরঞ্জন হেসে বলে ঃ করবী যে পাশ করেছে।

করবী কোথায় ছিল, বেরিয়ে এসে বললো ঃ জানো মা, উনি মিষ্টি খাবেন বলে আমার সঙ্গে সে কী ঝগড়া!

সুরঞ্জন বলে ঃ বড়ো অপরাধ করেছি। তার জন্যে [illegible]

সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

সুরঞ্জন এক ফাঁকে কেতকীর হাতে ট্যাবলেটের প্যাকেটটা দিয়ে বলে ঃ বাবার ওষুধ। রাতে একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিও। একটার বেশি দিও না। একটু সাবধানে রেখো। কেমন?

কেতকী জিজ্ঞেস করে ঃ সাবধানে কেন?

ঃ ঘুমের ওষুধ তো! বিষ কিনা—

ঃ বিষ ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তবে বাবাকে এ ওষুধ কেন খাওয়াচ্ছেন ?

ঃ ডাক্তারবাবু দিয়েছেন। ঘুম হবে বলে—

কেতকীকে ওষুধের কথা বুঝিয়ে দিয়ে সুরঞ্জন ওপরে উঠে আসে। এবার সে কাগজটা একটু পড়বে। তারপর অফিসে যাওয়ার জন্যে তৈরী হবে।

নিচে নবেন্দুবাবুর স্কুটারের শব্দ শোনা গেল। তিনি আজ একটু সকাল-সকাল বেরিয়ে গেলেন। এত সকালে তো তিনি কোনদিন বেরোন না। ছবি বৌদি হয়তো তাঁর পথের দিকে চেয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছেন।

ছবি বৌদির জন্যে আর কষ্ট হয় না সুরঞ্জনের।

একটু পরেই মিঠুয়া হাতে একখানা চিঠির পাঠোদ্ধার করতে করতে ঘরে ঢোকে। সুরঞ্জন তার দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে কাগজে মন দেয়।

মিঠুয়া চিঠিখানা পড়তে থাকে। চিঠিখানা পড়া শেষ হয়ে গেলে সে ডাকে ঃ দাদাবাবু—

সুরঞ্জন কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকায়।

ঃ কি ?

ঃ চিঠি—

ঃ কার চিঠি ?

ঃ আমার।

ঃ তোর চিঠি ?

সুরঞ্জন একটু অবাক হয়। এই ক বছরে মিঠুয়ার কাছে কেউ চিঠি দেয় নি। সেও কাউকে চিঠি লেখে নি। আজ আবার তাকে কে চিঠি লিখলো ? চিঠি দেবার মতো তার কে-ই বা আছে ?

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে ঃ কে দিয়েছে ?

মিঠুয়া বলে : মুলুক থেকে এসেছে। আমার সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দেবে।

দেশে মিঠুয়ার যে সম্পত্তি আছে, তা তার জ্ঞাতিরা ফিরিয়ে দেবে বলে চিঠি দিয়েছে। মিঠুয়া চিঠিখানা সুরঞ্জনের হাতে দেয়। সুরঞ্জন চিঠিখানা হাতে নিয়ে পড়ে দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু চিঠিখানা হিন্দীতে লেখা। সুরঞ্জন তা পড়তে পারে না।

সুরঞ্জন বলে : কি লিখেছে, পড় দেখি, শুনি।

মিঠুয়া থেমে থেমে যেটুকু পড়লো, তাতে বোঝা গেল, মিঠুয়ার বাপের সম্পত্তি তার এক জ্ঞাতি ভোগদখল করছিল। গাঁয়ের চাপে সে তা ফেরৎ দিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু মিঠুয়া না হলে সে তা ফেরৎ দেবে না।

সুরঞ্জন একটু চুপ রইলো। মিঠুয়াকে তাহলে এবার ছেড়ে দিতে হয়।

এ জগতে সুরঞ্জনের নিজের বলতে কেউ নেই। ছিল কেবল মিঠুয়া। সে এই ক বছরে তার একেবারে নিজের লোক হয়ে গিয়েছিল। আজ সে চলে যাবে। যদি চলে যায়, তার নিজের বলতে আর কে রইলো? এবার থেকে কে তার স্নানের জল ঠিক করে রাখবে? কে তার ঘর আগ্‌লাবে? কে তার দেখাশোনা করবে?

সুরঞ্জন হঠাৎ কেমন একটা শূন্যতা বোধ করতে লাগলো।

কিন্তু তাই বলে মিঠুয়াকে যেতে না দেওয়া কি তার উচিত হবে? সে দেশে ফিরে গেলে তার সম্পত্তি ফিরে পাবে। আর এখানে থেকে তার কি হবে?

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে : তাহলে এখন তুই কি করবি?

: কি করবো, তুমিই বলো, দাদাবাবু।

সুরঞ্জন বলে : তুই যা ভালো বুঝবি, করবি। আমার কিছু বলার নেই। বুঝলি?

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মিঠুয়া চলে গেল।

কি ভাবলো, সেই জানে। যাই ভাবুক মিঠুয়া, সুরঞ্জনের কিন্তু তাকে ছাড়বার ইচ্ছে নেই।

সেদিন সে মিঠুয়াকে রাগের মাথায় চলে যেতে বলেছিল। সেদিন সে ভাবে নি। মিঠুয়া যদি চলে যায়, সে যে কতো একা হয়ে পড়বে, সেদিন সে তা ভেবে দেখেনি। আজ মিঠুয়ার চলে যাবার সম্ভাবনায় সে বড়ো অসহায় বোধ করছে।

মিঠুয়ার চলে যাওয়া কি কিছুতেই বন্ধ করা যায় না?

কিন্তু কেনই বা সে মিঠুয়ার যাওয়া বন্ধ করবে?

তার নিজের অসুবিধের কথা সে এত বড়ো করেই বা ভাবছে কেন? না। সে আর নিজের অসুবিধের কথা বড়ো করে ভাববে না। মিঠুয়া যদি দেশে ফিরে গিয়ে তার সম্পত্তি ফিরে পায়, তবে সে তাকে আর বাধা দেবে না।

সুরঞ্জন কাগজটা নামিয়ে রাখে।

মনটা তার আজ বড়ো খারাপ হয়ে গেছে।

সে স্নান করলো। খেতে বসলো। মিঠুয়া নিচ থেকে খাবার নিয়ে এলো। সুরঞ্জন খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলো: কিছু ঠিক করলি?

মিঠুয়া কিছু বললো না।

সুরঞ্জনকে ছেড়ে চলে যেতে হয় তো মিঠুয়ারও কষ্ট হচ্ছে। শুধু সুরঞ্জনের সঙ্গেই নয়, এ বাড়ির সকলের সঙ্গেই সে বড়ো জড়িয়ে পড়েছে। তা থেকে বেরিয়ে পড়া তার পক্ষে সত্যি কষ্ট হবে।

খাওয়া সেরে সুরঞ্জন কাপড় ছাড়ছিল। মিঠুয়া বললো: আমি যাবো, দাদাবাবু—

: যাবি?

: হ্যাঁ।

: চলে যেতে তোর কষ্ট হবে না?

মিঠুয়া চুপ করে রইলো।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো: তাহলে কবে যাবি?

: কাল।

: কালই চলে যাবি তুই?

মিঠুয়া কিছু বললো না।

ঃ তাহলে যা যা নিবি, গুছিয়ে নে।

সুরঞ্জন একটু থামলো। তারপর বলে ঃ তুই চলে গেলে আমার বড়ো কষ্ট হবে রে! সঙ্গে সঙ্গে মিঠুয়া কোন কথা বলতে পারলো না। একটু থেমে সে বলে ঃ আমি আবার ফিরে আসবো, দাদাবাবু?

ঃ একবার গেলে আর কি তুই আসবি?

ঃ আসবো দাদাবাবু। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।

মিঠুয়ার চোখে জল এসে পড়লো। সে চোখ মুছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো।

সুরঞ্জন বেরিয়ে গেল।

হালদার বাগান লেনে সন্ধে নামলো।

সুরঞ্জন অনেক আগেই বাড়ি ফিরেছিল। আজ আবার বেরুবে সে, কেতকীকে কথা দিয়েছিল। সন্ধে হলো, তবু তার বেরুবার উৎসাহ দেখা গেল না। কাল মিঠুয়া চলে যাবে। আজ তার তাই কিছুই ভালো লাগ'ছিল না।

এই ক বছরে মিঠুয়াকে সে আপনার করে নিয়েছিল। মিঠুয়াকে একটু বাংলা, একটু ইংরেজি শিখিয়েছে সে। তাতেই মিঠুয়া কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

সেই মিঠুয়া যে তাকে ছেড়ে কোনদিন চলে যাবে, তা সে কখনো ভাবতে পারে নি। কিংবা তার মতো মিঠুয়াও এখানকার অন্ধকারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সেও সকলের মতো এখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু কোথায় পালাবে সে? কোথায় আলো আছে? অন্ধকার থেকে পালিয়ে সে যদি আলোয় যেতে না পারে, যদি আরো গাঢ় অন্ধকারে গিয়ে সে হারিয়ে যায়, তবে তার এই পালাবার জন্যে এত আকুতি কেন?

মিঠুয়া যেতে চাইছে, যাক। সে তাকে বাধা দেবে না।

এদিকে কেতকী সুরঞ্জনের অপেক্ষা করে বসেছিল। যাবার জন্যে সে তৈরী হয়ে আছে। সুরঞ্জন এখনো আসছে না দেখে সে ওপরে উঠে এলো।

ঃ যাবেন না ?

ঃ হ্যাঁ যাবো। চলো—

সন্ধের অন্ধকারে তারা দুজনে বেরিয়ে পড়লো।

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে কেতকী জিজ্ঞেস করলোঃ আজ কোথায় যাবেন ?

সুরঞ্জন একটু ভেবে বলেঃ চলো, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যাই—

ঃ চলুন—

দুজনে ট্র্যামে উঠে পড়লো।

এস্‌প্লানেডে এসে তারা ট্র্যাম বদল করলো। বাঁদিকে আলো, ডানদিকে অন্ধকার নিয়ে ট্র্যাম ছুটে চললো।

ক্যালকাটা ক্লাবের কাছে তারা ট্র্যাম থেকে নেমে হাঁটতে লাগলো পাশাপাশি।

ট্র্যামে তারা পাশাপাশি বসে এসেছে, এতক্ষণ তারা পাশাপাশি হাঁটছে। কিন্তু সুরঞ্জন কোন কথাই বলে নি।

কেতকী জিজ্ঞেস করেঃ আপনার আজ কি হয়েছে, বলুন তো ?

সুরঞ্জন বলেঃ কিছু হয়নি তো ?

ঃ তবে ? কথা বলছেন না, চুপচাপ রয়েছেন। শরীর খারাপ না কি ?

ঃ না।

কেতকী সুরঞ্জনের মুখের দিকে তাকালো। বললোঃ নিশ্চয়ই আপনার কিছু হয়েছে। কি হয়েছে, বলুন না।

সুরঞ্জন বলেঃ মিঠুয়া কাল চলে যাবে। তাই মনটা ভালো লাগছে না।

কেতকী বলেঃ চলে গেলে আবার তো আসবে। তাতে মন খারাপ করবার কি আছে ?

ঃ না। ও আর ফিরে আসবে না। এই অন্ধকার থেকে যে যায়, সে আর আসে না।

কেতকী নিজের দিকে ফিরে তাকালো। সে ও তো এই অন্ধকার থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবার তো ফিরে এসেছে। এই অন্ধকার থেকে যে যায়, তার বোধহয় আর ফিরে আসা ঠিক নয়।

তবে সে ফিরে এলো কেন?

ফিরে না এসে সে আর কোথায় যেত? যাবারই বা তার স্থান কোথায়?

সুরঞ্জন হঠাৎ ডাকলো ঃ কেতকী—

ঃ উঁ—

ঃ সাম্‌নে কে আসছে বলো তো?

কেতকী চেয়ে দেখলো।

এ কি? এ যে নিশীথ! সঙ্গে তার একটি মেয়ে। মেয়ে কেন? মেয়েটি কে? নিশীথ বোধহয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আগে এসেছিল। এখন ফিরছে। সুরঞ্জন চেয়ে দেখল, তার পোষাকের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। এখনো চোঙা প্যান্ট, ছুঁচোলো জুতো এবং—। নিশীথ কেতকী আর সুরঞ্জনের দিকে তাকালো। তাদের দেখলো। তারপর পাশ কাটিয়ে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

কেতকী সুরঞ্জনকে বললো ঃ একবার ওকে ডাকুন না।

সুরঞ্জন এদিক ওদিক তাকালো। ডাকতে পারলো না।

কেতকী বলে ঃ একবারটি। প্লিজ্—

সুরঞ্জনের ডাকতে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কেতকী ছাড়ে না। বলে ঃ ডাকুন না একটি বার। ও চলে গেল যে—

সুরঞ্জন চেঁচিয়ে ডাকলো ঃ নিশীথবাবু—

নিশীথ ডাক না শুনেই চলে যাচ্ছিল। সুরঞ্জন আবার ডাকলো। তারপর কেমন একটা জিদের বশে সে নিশীথের দিকে জোরে-জোরে হাঁটতে লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে নিশীথের কাছে এসে পড়লো। ডাকলো ঃ নিশীথবাবু—

তবু নিশীথ চলে যাচ্ছিল। পাশের মেয়েটি ফিরে তাকিয়ে নিশীথকে বললো : দেখো তো, তোমাকে কে যেন ডাকছে—

নিশীথ দাঁড়িয়ে গেল।

সুরঞ্জন বললো : এই যে নিশীথবাবু, আপনি যে আমাদের চিনতেই পারলেন না।

নিশীথ যেন সত্যিই চিনতে পারছে না? কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো : সত্যি চিনতে পারছি না। আপনাকে কোথায় দেখেছি, বলুন তো—

সুরঞ্জনের আপাদমস্তক দপ্ করে জ্বলে উঠলো। মনে মনে বললো : ইতর কোথাকার!

সুরঞ্জন বললো : মনে করুন দেখি, কোথায় দেখেছেন।

কেতকীও হাঁটতে হাঁটতে ততক্ষণে এসে হাজির।

এবার সুরঞ্জন কেতকীকে দেখিয়ে বলে : দেখুন তো, একে দেখে চিনতে পারেন কিনা।

নিশীথ মাথা নেড়ে বললো : না তো—

সুরঞ্জনের চোখের সাম্‌নে সমস্ত কিছুই যেন এক নিমেষে দুলে উঠলো।

কেতকী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো : তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না?

সুরঞ্জন চেঁচিয়ে উঠলো : স্কাউণ্ড্রেল!

নিশীথ গলা চড়িয়ে বলে উঠলো : শাট্ আপ্।

কেতকী এগিয়ে এলো। বললো : ভালো করে চেয়ে দেখো, আমি কেতকী—

নিশীথ বলে : আমি চিনি না।

: চেনো না? আমাকে তুমি দেখেও চিনতে পারলে না?

: না। বলছি তো চিনি না, চিনি না—

কেতকী সুরঞ্জনের হাত ধরলো। বললো : চলে আসুন। ও আমাকে আজ চেনে না যখন—

রাগে সুরঞ্জনের মাথার ভেতর আগুন জ্বল্‌ছিল। নিশীথের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে কেতকীর সঙ্গে ফিরে চলে।

কেতকী নিশীথের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। বড়ো আঘাত পেল সে আজ। সুরঞ্জন ভাবে, আজ কেন সে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এলো? সে তো অন্য কোথাও যেতে পারতো। কিন্তু নিশীথের সঙ্গে যে আজ এখানে এভাবে দেখা হবে, তা কি সে জানতো?

কেতকীর মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। তার দিকে তাকানোই যায় না।

এক পাশে গিয়ে তারা চুপচাপ বসলো। কারো মুখে কোন কথাই নেই।

সুরঞ্জন বলে: দেখলে, কি রকম শয়তান—

কেতকী মুখ ঘুরিয়ে নিল। কোন কথা বললো না।

দূরে একটা বিজ্ঞাপনের রঙীন আলো জ্বল্‌ছিল, নিবছিল। সুরঞ্জন সেই দিকে চেয়ে রইলো। কেতকী এখন কি ভাবছে? সে কি নিশীথের সঙ্গে গড়ের মাঠে বেড়াতে আসার কথা ভাবছে? কিংবা পুরীর হোটেলের দিনগুলির কথা?

যা-ই ভাবুক সে। তার চোখে জল ছিল না। তার শুক্‌নো দুচোখে পুরু অন্ধকার জমে উঠছিল।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে: এত কি ভাবছো, কেতকী?

কেতকী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে: কই না তো?

: ভেবে আর কি হবে, কেতকী? অঙ্কের গোড়ায় যদি ভুল থেকে যায়,অঙ্ক আর মেলে না। ভুল উত্তর হয়, তাই না?

কেতকী সুরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু সে সুরঞ্জনকে দেখছে না। তার দু চোখ অনেক দূরে চলে গেছে।

সুরঞ্জন বলে: আমি কিন্তু ওকে চিনে ফেলেছিলাম। তাই আমি কোনদিন ওকে সহ্য করতে পারি নি। তার জন্যে তুমিই কি আমার ওপর কম রাগ করেছ?

কেতকী তেমনি চেয়ে রইলো। চোখে তার পলক পড়ে না। এমন নির্বাক, নিস্পন্দ চোখ সুরঞ্জন কখনও দেখে নি। কেতকী যেন তাকে আর দেখতেই পাচ্ছে না। সুরঞ্জন বলে: তার কবিতাও ভালো লাগে না, পরের উপকার করতেও ভালো লাগে না। ওর শুধু নিজেকেই ভালো লাগে। ও কেবল সুযোগ খোঁজে। অন্য কোথাও গিয়ে সে হয়তো ছবির ভক্ত হয়ে যাবে কিংবা গানের পাগল হয়ে যাবে। যেখানে যেমনটি দরকার—

সুরঞ্জন একটু থামলো। তারপর বলে: এতদিন তুমি ওকে দেখলে, তবু চিনতে পারলে না?

কেতকীর চোখে পলক পড়লো।

সুরঞ্জন বলে: কথা বলছো না যে! কথা বলো—

কেতকী কি কথা বলবে, খুঁজে পায় না।

সুরঞ্জন বললো: আজ একটা ঝড় উঠলে বেশ ভালো হতো, তাই না?

এবার কেতকী হেসে উঠলো। বললো: কেন বলুন তো?

: দুজনে মিলে সেদিনের মতো ভিজতাম। ভিজে কাপড়ে দৌড়ে ট্র্যামে কিংবা ট্যাক্সিতে উঠে পড়তাম।

কেতকী কোন কথা বললো না। কিন্তু ঠোঁট থেকে তার হাসিটুকু ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল না।

সুরঞ্জন বলে: এই তো ভালো লাগছে। হাসবে, কথা বলবে। দেখবে, তখন ভালোই লাগবে। কি হবে ভেবে? ওই শয়তানটার কথা ভেবে কি কিছু কূল-কিনারা পাবে তুমি?

কেতকী করুণ মুখে একটু হাসলো।

: কি? আর ভাববে?

কেতকী একটা দীর্ঘশ্বাস রেখে বললো: না। আর ভাববো না।

মুখে তার করুণ হাসিটি আরো করুণ লাগছে।

সুরঞ্জন ভাবে, সেদিন ঝড় উঠেছিল। তাতে কেতকীর গায়ের কাপড় বড়ো বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। আজ অবশ্যি ঝড় ওঠে নি।

ঝড় ওঠার কোন লক্ষণও আকাশে নেই। কিন্তু সুরঞ্জন বুঝতে পারে, আরো বড়ো ধরনের একটা ঝড় উঠেছে আজ কেতকীর মনের মধ্যে। তার মনটা আজ বড়ো বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে।

কেতকী বলে ঃ আর আমি ভাববো না। আপনি গল্প বলুন—

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে ঃ গল্প ?

ঃ হ্যাঁ। বীণাদির গল্প—

ঃ বীণাদির গল্প যা ছিল, তা তো তোমাকে বলেছি। আর কিছু জানি না।

ঃ বীণাদি এখন কেমন আছেন ?

ঃ খবর রাখি না। তবে মন্দ থাকার কথা নয়।

ঃ আপনি আর চিঠি দেন না ?

ঃ না

ঃ কেন ?

ঃ বীণাদির বারণ—

কেতকী আবার চুপ করলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলে ঃ যাই বলুন, বীণাদি কিন্তু আপনাকে ভালোবাসতো।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো ঃ কি করে বুঝলে ?

কেতকী বলে ঃ আমার তো মনে হয়।

সুরঞ্জন বলে ঃ বীণাদিকে আমি আদর্শ মেয়ে বলে জানতাম। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।

ঃ তা করুন। উনি আপনাকে ভালোবাসতেন বলেই তো প্রণববাবু আপনাকে ঈর্ষা করতেন। বীণাদিকেও খানিকটা অবিশ্বাস—

ঃ সেই জন্যেই তো বীণাদিকে আর চিঠি দিই না। ওঁদের সুখের দিকে তাকিয়ে আমি সরে এলাম।

কেতকী আবার চুপ করলো।

আবার নীরবতার মধ্যে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

কেতকী চেয়ে দেখলো, সাম্‌নে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের শ্বেত বিস্ময়! মাথার ওপরে বিস্তীর্ণ আকাশ তাদের দিকে চেয়ে আছে।

পেছনে গঙ্গার বুক থেকে একটা জাহাজের বাঁশি কাঁপতে কাঁপতে ভেসে গেল। হয়তো জোয়ার এসেছে। জাহাজটা নোঙর তুলে মহাসাগরের দিকে এবার যাত্রা করবে। তাই ডাঙাকে শেষ মিনতি জানিয়ে যাচ্ছে সে।

কেতকী বললো ঃ চলুন, এবার ফেরা যাক।

সুরঞ্জন বলে ঃ আর একটু বসো, কেতকী। এখানে কেমন নিস্তব্ধ। ফিরলে তো আবার সেই গরমে, অন্ধকারে গিয়ে পচতে হবে।

কেতকী বসে কান পেতে রইলো। যদি আবার জাহাজের বাঁশি বাজে, সে শুনবে। জাহাজের বাঁশি একটা বিষণ্ণ সুরের মতো ভেসে এলো।

কেতকী বললো ঃ শুনুন জাহাজের বাঁশিটা। ভারি মিষ্টি, না?

সুরঞ্জন বলে ঃ চলো, আজ গঙ্গার ধার দিয়ে একটু বেড়িয়ে যাই।

কেতকী কি ভাবলো। বললো ঃ আজ থাক। আর একদিন বিকেল-বিকেল আসবো। অনেকক্ষণ গঙ্গার ধারে বসে জাহাজের বাঁশি শুনবো।

একটু থেমে সে বলে ঃ আপনার জাহাজের বাঁশি শুনতে ভালো লাগে না?

ঃ ভালো লাগে বৈ কি! খুব ভালো লাগে।

ঃ আমার কী যে ভালো লাগে ঐ জাহাজের বাঁশি।

কিছুক্ষণ কেতকী চোখ বুজে বসে রইলো। তারপর বাতাসে একটা নিশ্বাস রেখে বলে ঃ তাহলে চলুন। আজ ফেরা যাক।

তুজনে হাঁটতে লাগলো।

কেতকী কান পেতে আছে, যদি জাহাজের বাঁশিটা আবার শোনা যায়।

বাড়ি ফিরে সুরঞ্জন দেখলো, মিঠুয়া তার জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলেছে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেঃ কি রে? কাল কখন যাচ্ছিস?

মিঠুয়া দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বললোঃ কাল সকালের ট্রেনেই যাবো।

ঃ একা যেতে পারবি তো?

ঃ পারবো।

সুরঞ্জন হিসেব করে মিঠুয়ার হাতে তার টাকা দিয়ে দিলো। বললোঃ সাবধানে নিয়ে যাস। কেমন? আর গিয়ে একটা চিঠি দিবি।

একটু থেমে সুরঞ্জন বলেঃ আর ভালো না লাগলে চলে আসবি, বুঝলি?

মিঠুয়া মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

সেদিন রাতে সুরঞ্জন নিচে গিয়ে খাবার খেল। কাল মিঠুয়া চলে যাচ্ছে। এবার থেকে তো তাই করতে হবে। খেয়ে ওপরে আসবার সময় সুরঞ্জন হেরম্ববাবুকে ওষুধ খাওয়াবার কথা কেতকীকে মনে করিয়ে দিয়ে এলো।

সকাল হলো।

আজ মিঠুয়া চলে যাবে।

মিঠুয়া তাই আজ কোন্ ভোরে উঠে পড়েছে।

সুরঞ্জনেরও ঘুম ভেঙে গেছে। সে আর বেশিক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকতে পারলো না।

দাদাবাবু উঠে পড়েছে দেখে মিঠুয়া নিচ থেকে চা তৈরী করে নিয়ে এলো। মিঠুয়া আজ শেষ চা তৈরী করে খাইয়ে যাচ্ছে। আর মিঠুয়া কোনো সকালে তার মুখের কাছে চায়ের কাপ এগিয়ে ধরবে না।

ক'বছরের দুঃখ-সুখের সঙ্গী মিঠুয়া আজ চলে যাবে।

সুরঞ্জন তাকে কতো দিন বকেছে। এই তো সেদিন সে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল রাগ করে। তবু মিঠুয়া রাগ করে চলে যায় নি।

সে কাউকে কিছু বলে নি। শুধু যোগমায়া দেবীর কাছে গিয়ে কেঁদেছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে কষ্ট হচ্ছিল সুরঞ্জনের।

হকার আজ বেশ সকালেই কাগজ দিয়ে গেছে। সুরঞ্জন কাগজটা খুলে পড়তে থাকে। মিঠুয়া চায়ের কাপ নিয়ে নিচে নেমে যায়।

আজ আবার নিশিকান্তবাবুর একটা জলো বিবৃতি কাগজে বেরিয়েছে। সুরঞ্জন সেটা পড়ে আর নিজের মনে হাসে। ভাবে, একবার অঞ্জলি দেবীকে ডেকে ওটা দেখাবে নাকি?

অঞ্জলি দেবীকে ওটা আর দেখানো হলো না।

নিচ থেকে কিসের একটা গোলমাল কানে আসছে।

কিসের গোলমাল এই সকালে? অঞ্জলি দেবীর ঘর থেকে নয় তো?

করবী ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকলো: দাদা—

: কেন?

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে সে। তাই হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতেই সে বলে: বড়দির ঘুম ভাঙছে না কেন?

সুরঞ্জন কাগজ ফেলে উঠে দাঁড়ালো: কি? কেতকীর ঘুম ভাঙছে না?

হঠাৎ তার মনে পড়লো, কাল হেরম্ববাবুর ঘুমের ওষুধ সে কেতকীর হাতে দিয়ে এসেছিল। কেতকী কি সে ওষুধ নিজেই খেয়েছে?

একসঙ্গে কয়েকটা সিঁড়ি টপ্‌কে সে নিচে যোগমায়া দেবীর ঘরে এসে দাঁড়ালো। দেখলো, যোগমায়া দেবী কেতকীকে কোলে নিয়ে বসে কাঁদছেন। ছোট্ট-শিশুকে মা যেমন করে কোলে নিয়ে বসে ঘুম পাড়ায়।

যোগমায়া দেবী কেতকীর ঘুম ভাঙাবার কতো চেষ্টাই করছেন। তবু কেতকীর ঘুম আর ভাঙে না।

যোগমায়া দেবী এতদিন কেতকীকে কাছে আসতে দিতেন না। তাঁকে ছোঁওয়া, এমন কি রান্নাঘরে ঢোকাও ছিল তাঁর বারণ। আজ

সব বারণ চুকে গেছে। তিনি কেতকীকে বুকে চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে ডাকছেনঃ কেতকী, কেতকী রে, চেয়ে দ্যাখ্ কে এসেছে। ওঠ্, ওঠ্ মা—

সুরঞ্জনও কাছে বসে কেতকীর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলো।

কেতকীর কোন সাড়া নেই। চোখ দুটি বোজা। নাড়ি দেখলো। কোন স্পন্দন নেই। নিজেরই হাতের স্পন্দন তাকে প্রতারণা করতে লাগলো বার বার।

সুরঞ্জন কোন কথা না বলে কেতকীর বালিশের তলায় হাত দিল। তার অনুমানই সত্য। ওষুধের প্যাকেটে একটাও ট্যাব্লেট নেই। কেতকী তাহলে সবগুলি খেয়েছে। খেয়ে সে এই অন্ধকার সাঁতরিয়ে আলোর জগতে চলে গেছে।

কেতকী নেই?

হঠাৎ সুরঞ্জনের গলাটা কে যেন সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরলো।

কেতকী কাল রাতেও তো ছিল। হ্যাঁ, তার সঙ্গেই তো সে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে বেড়িয়ে ফিরে এসেছে।

এখন সুরঞ্জনের মনে পড়ছে, কাল পথে নিশীথের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছিল। নিশীথ কেতকীকে চিনতে পারে নি। তখন থেকেই কেতকী যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। তাকে নিশীথের কথা ভুলে যাবার জন্যে সে কতো অনুরোধ করেছিল। মনে হয়েছিল, সে বুঝি ভুলে গেছে নিশীথের কথা।

সুরঞ্জনের আরো মনে পড়ে, কাল জাহাজের বাঁশি শুনে কেতকীর বড়ো ভালো লেগেছিল। সেও কি তাহলে আজ সেই জাহাজের মতো এই পৃথিবীর বন্দর ছেড়ে চলে গেল? কিন্তু সে যে তাকে একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছিল? সেখানে সে যে বসে বসে অনেক জাহাজের বাঁশি শুনবে বলেছিল?

কেতকী আর কোনদিন জাহাজের বাঁশি শুনতে গঙ্গার ধারে যাবে না। কিংবা তাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধও করবে না।

যোগমায়া দেবী কেঁদে উঠলেন : কেতকী, অভিমান করিস্ নি মা, চোখ খোল্। একটিবার চোখ খোল্, মা। শোন্, আমি তোকে ক্ষমা করেছি। আমি তোকে—

যোগমায়া দেবী কেতকীর চোখের পাতা খুলে তাকে ডাকছেন। তবু কেতকী জাগছে না। তখন তিনি সুরঞ্জনকে বলেন : রঞ্জন, বলো কি করলে কেতকী জাগবে। কেতকী যে জাগছে না আমার—

সুরঞ্জন উঠে এলো। ডাকলো মিঠুয়াকে। তাকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিল। বললো : দেরি করবি না। সঙ্গে করে, দরকার হলে ট্যাক্সি করে নিয়ে চলে আসবি।

পেছন ফিরতেই বাচ্চু এসে তার হাত ধরে ফেললো। জিজ্ঞেস করলো : দাদা, বড়দির কি হয়েছে? বড়দি কথা বলছে না কেন?

সুরঞ্জন বলে ? বড়দির ঘুম ভাঙছে না, ভাই।

: আর ভাঙবে না ?

সুরঞ্জনের বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠলো। বাচ্চু তার বড়দির কোলের কাছে পাখির মতো ছোট্ট একটা বাসা বেঁধেছিল। আজ বুঝি সেটা চিরদিনের মতো ভেঙে গেছে।

বাচ্চু জিজ্ঞেস করে : বলো না দাদা, বড়দির আর ঘুম ভাঙবে না ?

সুরঞ্জন হাত দিয়ে বাচ্চুর মুখে চাপা দেয়।

মুখ সরিয়ে নিয়ে বাচ্চু বলে : বড়দি তাহলে আর বাঁচবে না ? বড়দি মরে গেছে ? ওপরের দাদুর মতো তার ঘুম ভাঙবে না আর ?

সুরঞ্জন কিছু বলতে পারে না।

তার মনে পড়ে, একদিন সে বাচ্চুকে বলেছিল, মৃত্যু মানে বড়ো ধরনের একটা ঘুম। সেদিন কি সে জানতো যে, কেতকী তার বুকটাকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে একদিন তেমনি এক বড়ো ধরনের ঘুমে ঘুমিয়ে পড়বে, যে ঘুম তার আর কোনদিন ভাঙবে না ? সে-ই তো কেতকীর হাতে ঘুমের ওষুধ তুলে দিয়েছিল। তখন যদি সে জানতো এই হবে—

তার এই বেদনার কৈফিয়ৎ সে কার কাছে দেবে? কে শুনবে তার স্বগত সংলাপ? আজ বাচ্চুকে দেওয়া তার সেই উত্তরের পায়ে মাথা কুটেও সে তার এই চরম ক্ষতির কোন কূল খুঁজে পাবে না।

সুরঞ্জন হেরম্ববাবুর ঘরে গেল।

হেরম্ববাবুর কাছে কেউ নেই। তিনি নিঃশব্দে বিছানায় পড়ে আছেন। সুরঞ্জনের পায়ের শব্দ শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: কে?

: আমি—

: রঞ্জন?

: হ্যাঁ।

: কেতকী চলে গেল?

সুরঞ্জন একটু চুপ করে থেকে বললো: হ্যাঁ।

হেরম্ববাবু বললেন: বেঁচে গেল সে।

ডাক্তার এলো কিনা দেখবার জন্যে সুরঞ্জন বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু এলেন।

কেতকীকে পরীক্ষা করে উঠে এসে ডাক্তারবাবু সুরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলেন: ওষুধটা কোথায় ছিল?

সুরঞ্জন বললো: ও-ই তো তার বাবার দেখাশোনা করতো। ওর কাছেই ছিল।

: কোন 'ইন্‌সিডেন্ট' ছিল বোধ হয়।

সুরঞ্জন মুখ নিচু করে বলে: তা ছিল।

: তবে ওকে ওষুধটা রাখতে দিলেন কেন? কাল আপনাকে বলে দিলাম সাবধানে রাখবার জন্যে।

সুরঞ্জন নিজের ভুলের জন্যে নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগলো। কিন্তু আজ শত ধিক্কারেও তো আর কেতকীকে ফিরে পাওয়া যাবে না।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সুরঞ্জন বেরিয়ে গেল।

ডিস্‌পেন্‌সারিতে গিয়ে ডাক্তারবাবু হাসপাতালে টেলিফোন করলেন।

এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি এলো।

কিন্তু কেতকীকে যোগমায়া দেবী কিছুতেই ছাড়বেন না। বুকে জড়িয়ে ধরে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন তিনি।

সুরঞ্জন তাকে বুঝিয়ে বললেন : চিকিৎসার জন্যে এখন কেতকীকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার। কেতকী আবার সেরে উঠবে। আপনি কিছু ভাববেন না।

যোগমায়া দেবীর হাতের গ্রন্থি শিথিল হলো।

কেতকীকে তিনি ছেড়ে দিলেন।

চোখ বুজে মাটিতে পড়েছিলেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : রঞ্জন, কেতকী আবার ফিরে আসবে তো?

সুরঞ্জন কোন কথা না বলে বেরিয়ে এলো।

কেতকীকে ওরা প্রথমে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তারপর লাশকাটা ঘরে।

সুরঞ্জন সারাদিন বসে থেকে সন্ধের পর বাড়ি ফিরে এলো।

দেখলো, মিঠুয়া ঘরে রয়েছে। সে তাহলে আজ দেশে চলে যায় নি।

সুরঞ্জন নিচে যেতে পারলো না। সে কাকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে? কেতকী সকলের অজ্ঞাতে তার বুকটাকেই যে সব চেয়ে বেশি বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেছে, তা তো কেউ জানে না। তাকেই বা আজ সান্ত্বনা দেবে কে?

নিচের কেউ আর ওপরে এলো না। এলো শুধু বাচ্চু। সুরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো : দাদা, বড়দি?

সুরঞ্জন কোন উত্তর না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সুরঞ্জন ভেবে দেখলো, তার স্নেহের নীড় ভেঙে গেছে, সে আজ ঘুমোবে কোথায়?

করবী বাচ্চুকে ধরে নিয়ে গেল।

সারাদিন সুরঞ্জন কিছু খায় নি। রাতেও কিছু খেল না। ঘরে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো সে।

রাতে ঘুম এলো না তার চোখে। তার চোখের সব ঘুম যে কেতকী কেড়ে নিয়ে গেছে। সে ঘুমুবে কি?

চোখে তার ঘুম এলো না।

কেতকী আজ রাতে লাশকাটা ঘরে শুয়ে আছে।

অসংখ্য মৃতদেহের পাশে সেও খানিকটা অন্ধকার আর শীতলতা পেয়েছে। এযুগে সে জন্মেছিল। তাই কিছুটা অন্ধকার আর কিছুটা শীতলতা তার অবশ্যই প্রাপ্য। তাই নিয়ে সে আজ রাতে লাশকাটা ঘরে শুয়ে আছে।

পিঠের নিচে হয়তো ইঁদুরেরা ছুটে বেড়াচ্ছে। অন্ধকার আর শীতলতার সঙ্গে তাদের পায়ের শব্দ মিশে যাচ্ছে একেবারে।

ডাক্তারেরা কি এখন তার অমন সুন্দর দেহটাকে কেটে কেটে ঘুমের ওষুধটুকু খুঁজছে কিংবা খুঁজছে কোথায় ভালোবাসা লুকানো আছে? পাঁজরের নিচে আঁধারের গভীরে ডাক্তারেরা কোন্ নাম খুঁজে পেয়েছে আজ?— নিশীথ না সুরঞ্জন? কাকে সে আজ তার শেষ ভালোবাসা দিয়ে গেল?

সেই ভালোবাসাকে আড়াল করে রেখেছিল তার যে দেহটা আজ তা হয়তো টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে পড়ে আছে লাশকাটা ঘরে। কাল তা ছিল অক্ষত। কাল রাতে কেতকী তো বেঁচেছিল। আজ নেই সে। ফুলের মতো তার দেহটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ডাক্তারেরা আজ হয়তো গবেষণা চালাচ্ছে।

কাল সকাল হবে। সবাই জাগবে। কেতকী আর জাগবে না। কিছু লোলুপ মাছি তার দেহের গন্ধে উড়ে আসবে। আর কিছু পিঁপড়ে। তারাও কেতকীকে ছাড়বে না। তারাও দল বেঁধে আসবে। কেতকীর লোভনীয় দেহটাকে তারাও টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে বয়ে নিয়ে যাবে।

সুরঞ্জনের চোখে ঘুম এলো না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে শুধু মনে মনে লাশকাটা ঘরের ছবি আঁকতে লাগলো।

গলি থেকে ইঁদুরের পায়ের শব্দ শোনা যায়। একটা বাদুড় বোধহয় একটা ইঁদুরকে ধরেছে। ইঁদুরের চিৎকারে গলির অন্ধকার ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। রাস্তার নেড়ি কুকুরগুলো হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে হালদার বাগান লেনের রাতটাকে সচকিত করে তোলে। তারপর ইঁদুরটার কান্না থেমে যায়। কুকুরের ডাকও আর শোনা যায় না। হালদার বাগান লেন নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সুরঞ্জনের চোখে আজ রাতে ঘুম আসে না।

তার মনে পড়ে রান্নাঘরে বালতির জলে কয়েকমাস আগে একটা ইঁদুর পড়ে মরে যাচ্ছিল। সে তা দেখেছে। কেমন ধুঁকতে ধুঁকতে অসহায় ভাবে ইঁদুরটা বাঁচবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বাঁচলো না সে। কয়েক মিনিট বাঁচবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে ধীরে ধীরে টান হয়ে নিচে পড়ে গেল। আর নড়লো না, ওঠার চেষ্টাও সে আর করলো না। শুধু শেষ কটা বুদ্‌বুদ্‌ রেখে সে বাঁচার পৃথিবী থেকে মুছে গেল।

সুরঞ্জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখলো। সে ইচ্ছে করলে কি ইঁদুরটাকে বাঁচাতে পারতো না? পারতো। কিন্তু সে ইঁদুরটাকে বাঁচালো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখলো সেই অসহায় মৃত্যু-দৃশ্য।

কেতকীও আজ তেমনি অসহায় ভাবে মরলো।

আজ রাতে নিশীথ নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। কোন বেদনা আজ তার ঘুমকে স্পর্শ করতে পারবে না। সে হয়তো কোনদিনই কেতকীর মৃত্যু-সংবাদ পাবে না। পেলেও তার মনে কোন ঢেউ উঠবে না, কোন ঢেউ ভাঙবে না।

কাল সন্ধের কথা মনে পড়লো সুরঞ্জনের।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যাবার পথে নিশীথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। নিশীথকে সুরঞ্জনই দেখেছিল। কেতকী দেখতে পায় নি। কেন সুরঞ্জন কেতকীকে নিশীথের দিকে তাকাতে বললো? সে যদি না বলতো, তাহলে কেতকী নিশীথকে দেখতে পেত না। নিশীথের কাছ থেকে চরম আঘাতটি সে হয়তো পেত না।

আর যা-ই হোক, সেই আঘাত বুকে নিয়েই তো কেতকী মরেছে।

সুরঞ্জনের মনে পড়ে, নিশীথ কেতকীকে দেখেও না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছিল। সুরঞ্জনই তাকে ডাকলো। নিশীথ তবু চিনতে পারলো না কেতকীকে। কেতকীকে সে-ই তো তার বাপ-মায়ের নিরাপদ আশ্রয় থেকে ছিন্ন করে বিডন স্ট্রীট, তারপর পুরীতে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সে তার সঙ্গে করেছে ভালোবাসার অভিনয়। তারপর তাকে সেখানকার হোটেলে ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছে চোরের মতো। কেতকীকে ফেলে এসেছে, সেই সঙ্গে মোটা অঙ্কের দেনাও ফেলে এসেছে সে। তারপর থেকে নিশীথ নিরুদ্দেশ।

এখন নতুন নায়িকার সঙ্গে চলেছে তার প্রেমের নতুন অভিনয়।

কেতকী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল : তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না ?

সুরঞ্জন চেঁচিয়ে উঠেছিল : স্কাউণ্ড্রেল !

নিশীথ গলা চড়িয়ে বলে উঠলো : শাট্ আপ্ !

কেতকী এগিয়ে এলো। বললো : ভালো করে চেয়ে দেখো, আমি কেতকী।

নিশীথ বললো : আমি চিনি না।

: চেনো না ? আমাকে তুমি দেখেও চিনতে পারলে না ?

: না। বলছি তো চিনি না, চিনি না—

কেতকী সুরঞ্জনের হাত ধরলো। বললো : চলে আসুন, ও আমাকে আজ চেনে না যখন—

তারপর থেকেই তো কেতকী কেমন যেন হয়ে গেল। মুখে তার কথা ছিল না। দুচোখে হাসি ছিল না। নিজের মধ্যে সে হারিয়ে গিয়েছিল।

সুরঞ্জন বলেছিল : কি হবে ভেবে ?

একটা দীর্ঘশ্বাস রেখে কেতকী বলেছিল : না। আর ভাববো না।

না। কেতকী আর কোনদিন ভাববে না। নিশীথ তাকে কেন চিনতে পারলো না, কেন তাকে সে ভুলে গেল—এসব কথা সে কোন

দিনই ভাববে না। পৃথিবীর সমস্ত ভাবনা চুকিয়ে দিয়ে সে চলে গেছে আজ।

কিন্তু আজ রাতে বাচ্চু কার কাছে ঘুমুচ্ছে? সে কি ঘুমোতে পারছে আজ? সে তার বড়দিকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। গল্পের কিংবা ছড়ার নায়িকার মতো বড়দি তার কাছে কল্পনার বিষয় হয়ে গিয়েছিল। তার বড়দি আবার ফিরে এলো। কল্পনার কাজলা-দিদিকে সে তার বড়দির মধ্যে ফিরে পেল। আবার তার বড়দি চলে গেল কেন? আর কি তার বড়দি ফিরে আসবে?

বাচ্চু আজ হয়তো অন্ধকার বিছানায় হাত বুলিয়ে বড়দিকে খুঁজছে।

আর যোগমায়া দেবী?

তিনি হয়তো আজ চোখের জলে আশীর্বাদ করছেন। সেদিন তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি তাকে। আজ নিজে থেকে তাকে ক্ষমা করলেন। কিন্তু কেতকী তো জেনে যেতে পারলো না যে, সে তার মায়ের ক্ষমা পেয়েছে। আহা, কেতকী যদি জেনে যেতে পারতো, তাহলে সে কতো সুখেই না মরতে পারতো!

কেতকী এই ক্ষমাহীন পৃথিবী থেকে বড়ো দুঃখ নিয়ে চলে গেছে।

সুরঞ্জন অবশ্যি তাকে ক্ষমা করেছিল। কিন্তু কোনদিন সে মুখ ফুটে কেতকীকে সেকথা জানায় নি।

সুরঞ্জন ভাবে, আর কেতকী কি ফিরে আসবে এই পৃথিবীতে? এই দুঃখ-ব্যথাময় জগতে সে কি আবার ফিরে আসতে চাইবে?

সুরঞ্জন হঠাৎ কেমন যেন হয়ে যায়। মনে মনে বলে: না কেতকী, তুমি আর কখনো এই পৃথিবীতে এসো না। এখানে মানুষের বাঁচার জন্যে কতো দুঃখ, কতো বেদনা—সে তো তুমি দেখে গিয়েছ। এখানে স্নেহ নেই, দয়া নেই, ভালোবাসা নেই। শুধু ঘৃণা, প্রতারণা আর অবিশ্বাস। তুমি আর এ পৃথিবীতে ফিরে এসো না।

সুরঞ্জনের চোখে কিছুতেই ঘুম এলো না।

সুরঞ্জন কেতকীকে বাঁচাতে চেয়েছিল। হ্যাঁ, পুরী থেকে ফিরে

আসার পর কেউ যখন তাকে ক্ষমা করলো না, তখন সুরঞ্জন তাকে মনে মনে ক্ষমা করেছিল। শুধু ক্ষমাই করেনি, তার ভালোবাসার কথাও ইংগিতে জানিয়েছিল। তাতে সাড়াও দিয়েছিল কেতকী। নিশীথ যে-কেতকীকে নিজের হাতে খুন করেছিল, সুরঞ্জন ক্ষমা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। তার ভালোবাসায় কেতকী সত্যিই বেঁচে উঠেছিল। কিন্তু কাল আবার নিশীথের সঙ্গে তার দেখা হয়ে সব গোলমাল হয়ে গেল। আবার নিশীথ তাকে খুন করলো। এবার আর সুরঞ্জন তাকে বাঁচাতে পারলো না।

সুরঞ্জন ভাবে। না, নিশীথ নয়। সে-ই তো কেতকীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী। সে কেন ঘুমের ওষুধ কেতকীর হাতে তুলে দিয়েছিল? যোগমায়া দেবী ছিলেন, করবী ছিল। কিংবা সে নিজেই তো রোজ রাতে একটা করে ট্যাবলেট্ হেরম্ববাবুকে খাইয়ে আসতে পারতো। সে কেন হেরম্ববাবুকে ওষুধ খাওয়ানোর ভার কেতকীর হাতে দিল? তার যখন পূর্ব 'ইন্‌সিডেন্ট্' ছিল, তখন তার হাতে ওভাবে বিষ তুলে দেওয়া কি ঠিক হয়েছে তার?

সুরঞ্জনের কপালের রগ্ দুটো ফুলে উঠেছে। সে কপালটা বালিশের ওপর চেপে ধরে চোখ বুজে পড়ে রইলো।

ভোরের প্রথম কাক ডেকে উঠলো। সকাল হতে তাহলে আর বেশি দেরি নেই। কবে রূপনারাণের তীরে এক মন্দিরে সে ঘণ্টাধ্বনি শুনেছিল। সকালে-সন্ধেয় সেখানে রোজ কাঁসর-ঘণ্টা বাজতো। সে তার জীবনের এক অতীত অধ্যায়। আজ কাকের কণ্ঠস্বরের মধ্যে সে সেই আরতির কাঁসর-ঘণ্টা শুনতে পেল। কাকের কণ্ঠস্বর যে এতো মধুর হতে পারে, সে এই প্রথম জানলো।

ধড়মড় করে সে বিছানার ওপর উঠে বসলো।

তার তো আর দেরি করা চলে না।

তাকে যে এখুনি কেতকীর কাছে যেতে হবে।

কেতকী লাশকাটা ঘরে একা শুয়ে আছে। হয়তো সে পথ চেয়ে

আছে তার। তার আর দেরি করা কি ঠিক হবে? কেতকীর সঙ্গে সে কোনদিন এভাবে দেখা করতে যায় নি। কেতকীকে সঙ্গে নিয়েই সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। আজ কেতকী আগে গিয়ে অপেক্ষা করছে হাসপাতালে। সেইখানে দেখা হবে তার। কবিরা একেই বলেছেন বুঝি 'অভিসার'।

সুরঞ্জন আজ কেতকীর 'অভিসারে' যাবে।

হঠাৎ এক টুক্‌রো কবিতার লাইন তার মনে বেজে উঠলো ঃ 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য—।'

গানের কলির মতো ছন্দে, গানে বাজতে লাগলো কথাগুলি।

সে উঠে পড়লো।

বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুলো। ঘরে ফিরে এসে কাপড় ছাড়লো। তারপর দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লো।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে সে ভাবলো, ঠিকই করেছে সে। অন্ধকার থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়ে সে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। নইলে যোগমায়া দেবী, বাচ্চু বা করবীর সাম্‌নে দিয়ে তার বেরোনো শক্ত হতো।

হাসপাতালের পেছনে সূর্য উঠলো।

এমন বিষণ্ণ সূর্য সুরঞ্জন কখনো দেখেনি।

আকাশটা মেঘলা ছিল। কিন্তু শেষ-গ্রীষ্মের মেঘলা দিন তো কোনোদিন এমন করুণ হয়ে দেখা দেয়নি তার জীবনে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে শুয়ে সে কতোদিন মেঘলা আকাশ দেখেছে। বৃষ্টির জলে ভিজেছে। সারাদিন সারারাত কিছু পেটে যায় নি। তবু সেই সব সকাল কখনো এত বিষণ্ণতা নিয়ে আসে নি।

আকাশের দিকে চেয়ে তার কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু এলেন।

সুরঞ্জনকে ডেকে বসতে বললেন। কাল 'পোষ্ট মর্টেম' হয়ে গেছে। 'পিওরলি স্যুইসাইড্' কেস। ডাক্তারেরা এই মর্মে রিপোর্ট

দিয়েছেন। এখন পুলিশ থেকে রিপোর্ট এলেই ডেড্ বডি দিয়ে দেওয়া হবে। 'ডেথ্ সার্টিফিকেট' রেডি।

কেতকী তাহলে সব ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। এখন একটিমাত্র ছাড়পত্র বাকি। তারপর কেতকী আর এ পৃথিবীর কেউ নয়, এই গ্রহের কেউ নয়।

সুরঞ্জন বেঞ্চির একপাশে বসে রইলো।

দেখতে দেখতে হাসপাতালের সাম্‌নে ভিড় বাড়তে লাগলো। এ্যাম্বুলেন্স, স্ট্রেচার, ডাক্তার, নার্স আর ওষুধের গন্ধে তার অনুভূতি-গুলো ধীরে ধীরে কেমন যেন ভোঁতা হয়ে এলো। এখন সে কে, কেন বসে আছে এখানে—কিছুই মনে পড়ে না তার। সে এখন শুধু একটা নামহীন অস্তিত্ব মাত্র। কিংবা একটা প্রাণহীন আয়না সে। সাম্‌নে দিয়ে যারা চলে যাচ্ছে, তাদের ছবি তার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে মাত্র। কোন অনুভূতি নেই।

আবার ভিড় ফাঁকা হয়ে এলো।

মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে অনেক। দুপুর গড়িয়ে গেছে কখন।

সুরঞ্জন কেমন যেন বোধশক্তিহীন মানুষের মতো ডাক্তারবাবুর টেবিলের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালো। ডাক্তারবাবুও ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কি চাই ?

সুরঞ্জনের মুখ দিয়ে মাত্র দুটি শব্দ বেরিয়ে এলো : কেতকী গাঙ্গুলি—

বিরক্তির সুরে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন : কে ?

সুরঞ্জন তেমনি নিষ্প্রাণের মতো বললো : স্যুইসাইড্ কেস্—

: ও। রিপোর্ট এসে গেছে। আপনি ডেড্ বডি নিয়ে যেতে পারেন। লোকজন এসেছে ?

: আজ্ঞে না।

: তবে নেবেন কি করে ? এই নিন ডেথ্ সার্টিফিকেট আর পুলিশ রিপোর্ট।

সুরঞ্জন তার অসাড় হাতে কাগজ দুখানা ধরলো। কাগজ দুখানা নিয়ে সে তখনই চলে যেতে পারলো না।

ডাক্তারবাবু বললেনঃ লোকজন না থাকলে হিন্দু সৎকার সমিতিতে খবর দিন। ফোন করুন। তারা গাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

তিনটের সময় হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি এলো।

সুরঞ্জন ফুল কিনে আনলো। একটা অগুরু সেন্টও।

ঃ তোমাকে কোনদিন কিছু দিই নি। আজ তোমাকে শুধু এই ফুল দিলাম।

কেতকীর দুপাশে সতেজ রজনীগন্ধার স্টিকগুলিও শুয়ে রইলো। আর মাঝখানে ঝরা বাসিফুলের মতো কেতকীর করুণ শুকনো মুখ। কিছুই পায়নি সে এ পৃথিবীর। শুধু কিছু দুঃখ আর কিছু যন্ত্রণা। সারা মুখে তার শুধু সেই স্মৃতিই লেগে আছে।

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।'

শ্মশান ঘাটে পৌঁছোতে চারটে বেজে গেল।

ডোমেরা চিতা সাজিয়ে দিল।

না। এ কেতকীর চিতাশয্যা নয়, এ যেন তার বাসর-শয্যা।

সুরঞ্জন তার বুকের ওপর রজনীগন্ধাগুলিকে সযত্নে শুইয়ে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন জ্বলে উঠলো। গঙ্গার ওপারে সূর্য অস্ত গেল। সূর্যাস্তের রঙের সঙ্গে চিতার রং মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

আগুন নিবলে সুরঞ্জন গঙ্গা থেকে জল এনে চিতার ওপর ঢাললো। এবার শান্তি। কেতকীর সব জ্বালা-যন্ত্রণার পরম শান্তি।

চিতা কখন নিবে গেছে। সুরঞ্জন জানে না। সে গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে ছিল। মনে বাজছিল তার—

'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;

পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

গঙ্গার জলে অন্ধকার নেমেছে। সুরঞ্জন জলে নেমে গেল। একটা ডুব দিল। বিড় বিড় করে বললোঃ ক্ষমা করো, ওকে ক্ষমা করো, মা। আমি তার হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

গঙ্গার জলে দুফোঁটা চোখের জল রেখে সুরঞ্জন উঠে এলো।

ভিজে কাপড়ে হাঁটতে হাঁটতে সে হঠাৎ চম্‌কে উঠলো। জাহাজের বাঁশি।

কেতকী বলেছিলঃ আজ থাক্। আর একদিন বিকেল বিকেল আসবো। অনেকক্ষণ গঙ্গার ধারে বসে জাহাজের বাঁশি শুনবো।

একটু থেমে সে বলেছিলঃ জাহাজের বাঁশি শুনতে আপনার ভালো লাগে না?

সুরঞ্জন মনে মনে বললোঃ তোমাকে গঙ্গার ধারেই রেখে গেলাম, কেতকী। এবার থেকে সারাদিন সারারাত তুমি শুধু জাহাজের বাঁশিই শুনবে। দূরে চলে-যাওয়ার বাঁশি—

তারপর সামনে একটা খালি ট্যাক্সি দেখে সে আর কোনদিকে না তাকিয়ে তাতে উঠে পড়লো।

কয়েকমাস পরের কথা।

সূর্য কতোবার উঠেছে, কতোবার ডুবেছে। ব্যস্ত পৃথিবী দিনরাত্রির মালা গেঁথে চলেছে। তার মালা-গাঁথার যেন অন্ত নেই।

কেতকী কবে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে, তা আর কারো মনে নেই।

সুরঞ্জনেরই শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

যোগমায়া দেবী কেতকী সম্বন্ধে ভীষণ নীরব। হেরম্ববাবু আরো বেশি নীরব। আর কে আছে? বাচ্চু কেন জানিনা, মাঝে মাঝে বাঁশবাগান দেখতে যেতে চায়। কেতকীর কথা কারো মনে পড়ে না। কেতকীর কথা এ পৃথিবী মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলেছে।

শুধু যখন সন্ধে হয়, কলকাতার পথে পথে আলো জ্বলে ওঠে, একটা ট্র্যাম শ্যামবাজারের মোড় থেকে বিকট শব্দ করতে করতে এস্প্লানেডের দিকে ছুটে যায়, তখন সুরঞ্জনের চোখের সাম্‌নে বিদিশার রাত ভেসে ওঠে, সেই সঙ্গে ফুটে ওঠে শ্রাবস্তীর আশ্চর্য কারুকার্য।

মিঠুয়া দেশে চলে গেছে।

দেশ থেকে সে চিঠি দিয়েছিল। ভালো আছে সে। সম্পত্তি পেয়ে গেছে। শিগ্‌গির সে 'শাদি' করে বউ ঘরে আনবে। সে আর এখন কলকাতায় আসবে না।

সুরঞ্জন তাকে বিয়ে-থা করে দেশে সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করতে লিখে দিয়েছে।

হালদার বাগান লেনের এই বাড়ির আরো কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

অমিত আর রিণা রায় গত সপ্তাহে এবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। যাবার সময় অমিত বা রিণা কেউ সুরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করে যায় নি। অবশ্যি তার সঙ্গে দেখা করে যাবারই বা কি দরকার? হয়তো দেখা করে যাবার সময় হাতে ছিল না তাদের।

যাই হোক, তারা হালদার বাগান লেনের অন্ধকার থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। তারা কোথায় গিয়ে উঠেছে, তাও সুরঞ্জনের জানা নেই। চৌরঙ্গী পাড়ায় অমিতের স্টুডিওতে গেলে বোধহয় জানা যাবে। সুরঞ্জন একবার তার স্টুডিওতে যাবে। কিন্তু সময় করে উঠতে পারছে না।

অঞ্জলি দেবী মাঝে একদিন অবিনাশবাবুর সঙ্গে বেদম ঝগড়া করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তারেরা তাঁকে পরীক্ষা করে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, আর কিছু হবে না। অবিনাশবাবু

কিছুতেই হাসপাতালে যাবেন না। অঞ্জলি দেবীও কিছুতেই তাঁকে ছাড়বেন না। শেষে অসহায়ভাবে অবিনাশবাবু সেদিন সুরঞ্জনের কাছে ছুটে এসেছিলেন। সুরঞ্জনও সেই কথা বললোঃ যান। একবার দেখিয়ে আসুন। দেখুন, ডাক্তারেরা কি বলে?

অবিনাশবাবু বলেছিলেনঃ ওরা যদি হাসপাতালে থাকতে বলে?

সুরঞ্জন বলেছিলঃ তাহলে থেকে যাবেন।

ঃ হাসপাতালে আমি থাকতে পারবো না। এমনি যাবো, দেখাবো, চলে আসবো। বুঝেছেন? আমার যে নিজের ঘরে না শুলে ঘুম আসবে না চোখে।

হালদার বাগান লেনের এই অন্ধকার ঘর যদি কেউ ভালোবেসে থাকেন, তবে তিনি অবিনাশবাবু। ভাঙা ঘড়ি, পুরোনো বই আর ভাঙা আসবাবপত্রের ভ্যাপ্‌সা গন্ধ আর পচা অন্ধকার না হলে তিনি ঘুমুতে পারবেন না। এই ইঁদুর আর আরশুলা-চষা অন্ধকারের সঙ্গে তিনি একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছেন। তার বাইরে আলোর জগতে গেলে তিনি বুঝি আর বাঁচবেন না।

অঞ্জলি দেবী অবিনাশবাবুকে বাড়ি বদ্‌লাতে বলেছিলেন। কিন্তু অবিনাশবাবু তাঁর অন্ধকার ঘরের বাইরে মরে গেলেও যাবেন না। অঞ্জলি দেবী তাই কদিন অবিনাশবাবুর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে শেষে রেগে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন। যাবার সময় বলে গিয়েছেনঃ আর যদি ফিরি—

বলে তিনি একটা কঠিন শপথ নিয়ে গেছেন।

এখন ছবি বৌদি আর নবেন্দুবাবু কেমন আছেন, সুরঞ্জন জানে না। তবে দেখে মনে হয়, তাঁরা ভালোই আছেন। মাঝে তাঁদের মধ্যে যে একটা গরমিল দেখা গিয়েছিল, তা বোধ হয় মিটে গেছে। এখন মাঝে মাঝে ছবি বৌদি নবেন্দুবাবুর পেছনে স্কুটারে বসে বেড়াতে যান। বেশবাস ও প্রসাধনের মধ্যে সেদিনের কথা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে। তাঁদের স্কুটার আগেকার মতোই ধুলো উড়িয়ে পথচারীদের বিস্মিত করে দিয়ে শ্যামবাজারের মোড়ের দিকে ছুটে চলে যায়।

মাঝে একদিন গুরুদাসবাবু হাতে একখানা বই খবরের কাগজে মুড়ে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ পড়বেন নাকি? বেশ ভালো বই—

সুরঞ্জন বলেছিলঃ আমার এখন সময় নেই। তার চেয়েও বড়ো কথা, আমার ও সব বই পড়তে ভালো লাগে না। আপনি অন্য কাউকে দিন। তাঁর কাজে লাগবে।

গুরুদাসবাবু তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ হাসি দিয়ে তাঁর চরিত্রের বিশেষ দিকটি চাপা দিতে দিতে বেরিয়ে যান। বলে যানঃ ভালো লাগে না? আচ্ছা আচ্ছা। অনেককে তো দেখলাম। সব ধোয়া তুলসীপাতা। পরে বই চেয়ে নিয়ে পড়ে না তো, যেন কামড়ে কামড়ে খায়।

লোকটাকে সুরঞ্জনের আজকাল ভারি খারাপ লাগে। এই বাড়ির পরিবেশের সঙ্গে লোকটা আশ্চর্যভাবে মিশে গেছে। কিন্তু আর কিছুর জন্যে না হলেও অন্ততপক্ষে লোকটার কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্যে তাকে শিগ্‌গির এ বাড়ি ছাড়তে হবে। লোকটা কী? মাসে মাসে ভাড়া নিতে আসে। আর ওই সব বই পড়ার জন্যে সুরঞ্জনকে প্রলোভন দেখায়। সুরঞ্জন বলেঃ আমার রুচিতে বাধে। কিন্তু তবু কি লোকটা তাকে ছাড়ে?

সেদিন ছুটি ছিল।

তাই একটু বেলা করে সুরঞ্জন ঘুম থেকে উঠলো।

মুখ হাত ধুয়ে বসে কাগজ পড়ছিল সে।

কিছুক্ষণ পরে করবী এলো। জিজ্ঞেস করলোঃ একি? আপনি কখন উঠলেন?

সুরঞ্জন কাগজটা নামিয়ে করবীর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

করবীর মুখের সঙ্গে কেতকীর মুখের কোথায় যেন একটা মিল আছে। মিলটা যে কোথায়, তা সুরঞ্জন ঠিক ধরতে পারে না।

করবী সুরঞ্জনের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে বলে : আমি একটু আগে এসে দরজা বন্ধ দেখে গিয়েছিলাম।

সুরঞ্জন বলে : একটু আগে আমি উঠেছি।

: বাব্বা। এতো বেলা অব্দি আপনি ঘুমোতে পারেন? রামায়ণের বিশেষ এক ব্যক্তি কিন্তু আপনার ঘুম দেখে লজ্জা পাবে।

সুরঞ্জন একটু হাসলো। বললো : বসো করবী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

: আমি এখুনি আসছি।

করবী বেরিয়ে যাচ্ছিল। সুরঞ্জন ডাকে : করবী—

করবী ঘুরে দাঁড়ায়।

: একটু বসে যাও। কি এমন তাড়া তোমার আজ?

: মা আপনার জন্যে চা তৈরি করে বসে আছে যে! চা-টা নিয়ে আসি।

করবী ছুটে গিয়ে চা নিয়ে এলো।

করবীকে বসতে বলে সুরঞ্জন চায়ের কাপে চুমুক দিল।

করবীর এভাবে বসে থাকতে ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। কিছু না পেয়ে পিঠের ওপরকার বিনুনিটা টেনে এনে খুলে আবার বিনুনি করতে থাকে সে।

সুরঞ্জন চেয়ে চেয়ে করবীকে দেখছিল। তুমি দিন-দিন এমন শুকিয়ে যাচ্ছো কেন বলো তো, করবী? কি হয়েছে তোমার? শরীরটা কি ভালো যাচ্ছে না?

করবী মুঠোর মধ্যে বিনুনিটার দিকে তাকিয়ে বললো : বড়ো পরিশ্রম গেছে কদিন—

: পরিশ্রম? কোথাও চাকরি পেয়েছো নাকি?

: না। চাকরি আর পেলাম কই?

: তবে?

: কতো চেষ্টাই তো করলাম। যে কোন একটা চাকরি পেলেই করি। কিন্তু হলো কই?

ঃ কোথায় কোথায় চেষ্টা করেছিলে ?

করবী অনেকগুলো জায়গার নাম করলো।

তারপর মুখ শুকিয়ে বললো ঃ একটা কিছু কোথাও হলো না। সব জায়গা থেকে ফিরে ফিরে এলাম।

সুরঞ্জন বললো ঃ শুধু বি.এ. অনার্স পাশ করে কিছু হবে না। টাইপ রাইটিং শিখেছো ?

ঃ শিখেছি তো—

ঃ তবু তোমার চাকরি হলো না ?

ঃ না—

সুরঞ্জন হেসে বলে ঃ তাহলে ঠিকমতো চেষ্টা করতে পারো নি।

করবী এবার যেন একটু রেগে উঠলো ঃ আর কিভাবে চেষ্টা করতে বলেন ? ভদ্রলোকের মেয়ে আমি। যে সব জায়গায় গেছি, শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছি। আর যা সব অভিজ্ঞতা পেয়েছি, তা বলা যায় না।

ঃ আমার কথায় রাগ করলে, করবী ?

ঃ রাগ করি না আমি। রাগ করিনি। কিন্তু বড়ো দুঃখ হয়। জানেন ? এতো কষ্ট করে পাশ করলাম। কিন্তু কি হলো ? একটা চাকরি কোথাও পেলাম না।

একটু থামলো করবী। তারপর বলে চললো ঃ বাবা অসুস্থ। চোখের সাম্‌নে দেখতে পাচ্ছি তো, মা কতো কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছেন। আপনি আমাদের দেখছেন, তাই চলছে। নইলে কি অবস্থা হতো বলুন তো আমাদের ?

আবার থামলো করবী। বললো ঃ আর আপনিই বা চিরদিন আমাদের দেখবেন কেন ? আপনি রাগ করবেন না। আপনার মতো মানুষ হয় না। আপনার মতো কেউ কাউকে দেখে না।

করবীর মুখে প্রশংসা শুনে সুরঞ্জন হো হো করে হেসে উঠলে। বললো ঃ এতো প্রশংসা আমার সইবে না, করবী। এই গুরুপাক প্রশংসায় হয় তো ফেটে যেতে পারি—

করবী তার হাসিতে অংশ নিতে পারলো না। সে বললো ঃ আর কতোদিন আপনি আমাদের দেখবেন, বলুন ?

সুরঞ্জন বলে ঃ যতদিন বেঁচে আছি। না, যতদিন আমার চাকরি আছে—

করবী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে ঃ এ আপনার অন্যায় সাহায্য।

ঃ অন্যায় কেন ?

ঃ অন্যায় নয় ?

ঃ ?

ঃ আপনি তাহলে আমাদের কোনদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে দেবেন না।

সুরঞ্জন ভাবে, করবী ঠিক কথাই বলেছে। সে এই বয়েসে প্রবীণের মতো কথা বলেছে তাকে। ওদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে দেওয়া উচিত। করবীর মধ্যে এবার আত্মসম্মান বোধ জাগছে। তার অযাচিত সাহায্যকে করবী আর বেশিদিন সহ্য করতে পারবে না।

কিংবা এ হলো করবীর নিজের ক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত বিশ্বাস। নিজের সম্বন্ধে অতিরিক্ত উচ্চ ধারণা।

করবী বলে ঃ আপনি আর কতো দেবেন ? আমাদের অভাবের তো অন্ত নেই। জোড়া-তালি দিয়ে আর কতোদিন চলবে ?

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে ঃ জোড়া-তালি কেন ?

ঃ জোড়া-তালি বৈ কি ! কিছু মনে করবেন না। আপনি যা দেন, তাতে কোনরকমে বাড়িভাড়া আর খাওয়াটা আমাদের চলে। আমাদের কাপড়-চোপড়, বাচ্চুর পড়া, বাবার ওষুধ। এ সব ?

ঃ বারে এ গুলো বললেই তো আমি দিই।

ঃ আপনি কেন দেবেন ? কতোদিনই বা দেবেন ?

করবী একটু থামলো। কি যেন ভাবলো। তারপর বললোঃ আমার নিজের কাপড় ছিল না, জামা ছিল না। মা আমাকে কিছুদিন তার কাপড়খানা পরে বেরুতে দিয়েছিল। সেখানাও

কয়েকদিন পরে ছিঁড়ে উঠলো। পায়ের চটিতে পেরেক মেরে মেরে তাতে আর পেরেক মারবার জায়গা ছিল না। পেরেক উঠলে আর ওতে পা রাখা যেত না। পরে তারও অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো। বাইরে বেরুবার মতো আর কিছু বাকি রইলো না। না একখানা কাপড়, না এক জোড়া জুতো। তখন—

: কি করলে তখন ?

: সংসার খরচের যে টাকা দিয়েছিলেন আপনি, তা থেকে পঁচিশটা টাকা মার কাছ থেকে ধার নিলাম। মা কিছুতেই দেবে না। মাকে কতো বোঝালাম : চাকরির খোঁজে আমাকে বেরুতে হবে, মা। পঁচিশটা টাকা দাও। মাসের শেষের দিকে তোমাকে দিয়ে দেব।

মার হাত কাঁপছিল। তবু মা আমাকে পঁচিশটা টাকা দিল। টাকা নিয়ে কাপড় কিনলাম একখানা, আর এক জোড়া চটি—

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো : তারপর ?

করবী নিজের মনে বলে যেতে লাগলো : তারপর মাসের শেষ হয়ে আসছে। হিসেবের টাকা তো ? মা একদিন আমাকে ডেকে বললো টাকার কথা। আমিও ভাবলাম, তাইতো! টাকা কোথায় পাই ? একদিন মেডিক্যাল কলেজের সাম্‌নে দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, ভেতরে অনেক লোক যাচ্ছে। এক জায়গায় কিসের একটা লাইনও পড়েছে। ভাবলাম, হয় তো চাকরি-বাকরির লাইন। সত্যি, তখন আমি জানতাম না ব্যাপারটা। এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম : এখানে কিসের লাইন ?

ভদ্রলোক আম্‌তা আম্‌তা করে সরে গেলেন।

আরেক ভদ্রলোককে করবী জিজ্ঞেস করলো। তিনি একপাশে সরে এসে বললেন : বাড়িতে তিন চারটে বাচ্চা। খাওয়াতে পরাতে হবে তো। পেরে উঠছি না। তাই—

করবী জিজ্ঞেস করলো : তাতে কি হয়েছে ? এখানে লাইন দিয়েছেন কেন ? কোন চাকরি-বাকরি ?

ঃ না।

ঃ তবে?

ঃ রক্ত দিয়ে কিছু টাকা—

ঃ রক্ত দিয়ে টাকা?

ঃ হ্যাঁ। দেখছেন না, এটা 'ব্লাড্ ব্যাঙ্ক'?

করবী চেয়ে দেখলো, রক্তের মতো লাল বড়ো বড়ো হরপে 'ব্লাড্ ব্যাঙ্ক' লেখা। এতক্ষণ লেখাটা তার চোখে পড়েনি। সে শুধু লাইনটাই দেখছিল। লেখাটা পড়ে দেখেনি এতক্ষণ।

এখন তার যেন হুঁশ হলো।

সেও তো তা হলে কিছু রক্ত দিতে পারে। রক্ত বিক্রি করে টাকা নিয়ে সে মার হাতে দিতে পারে।

সে আর কিছু চিন্তা না করে লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো: আমি যদি রক্ত দিই, নেবে?

ঃ হ্যাঁ। তবে মেয়েদের লাইন ওপাশে। যদি লাইনে দাঁড়াতে চান, এই বেলা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ুন। এর পর লাইন বড়ো হয়ে যাবে। আপনি তাতে বাদও পড়ে যেতে পারেন।

করবী মেয়েদের লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। দারোয়ান একটা কাগজে তার নাম টুকে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর করবী সাম্‌নের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো: খুব কষ্ট হয় বুঝি?

মেয়েটি বললো: না কষ্ট নয়। শুধু একটা ছুঁচ ফোটাবার ব্যথা। তারপর চুপচাপ শুয়ে থাকা। ক'মিনিট বাদে আপনাকে খানিকটা দুধ আর কিছু ফল দেবে খেতে। খেয়ে নেবেন। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটু থেমে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো: আপনি বুঝি এই প্রথম?

করবী বলে: হ্যাঁ। কেন? আপনি এর আগে দিয়েছেন নাকি?

মেয়েটি হাসলো। বললো: এই নিয়ে দশবার। মাসে তো একবার আসতেই হয়। বিশেষ করে শেষের দিকে—

কলকাতায় টাকার বিনিময়ে রক্ত বিক্রি করা যায়, তা করবী এই প্রথম জানলো। বি. এ. পাশ করেছে সে। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটা তার জানা ছিল না। অনেক গরীব সংসারের এটা যে শেষ সম্বল, সে যদি আগে জানতো, তাহলে অনেক আগেই সে এসে এখানে লাইনে দাঁড়িয়ে যেত।

করবী বলে ঃ আমি কিন্তু জানতাম না।

মেয়েটি বলে ঃ আমিও জানতাম না। আমার স্বামীর মুখেই শুনেছিলাম একবার। ও মাঝে মাঝে এসে রক্ত দিয়ে টাকা নিয়ে যেত। প্রথম প্রথম আমি বারণ করতাম। ও কিন্তু শুনতো না।

ঃ আপনার স্বামী এখন কোথায়?

মেয়েটি তার ধবধবে সিঁথিটা দেখিয়ে দেয়। বলে ঃ ছেলেমেয়ে তিনজন রেখে গেছে। খাওয়াতে পরাতে হবে তো?

এবার মেয়েটির নাম ডাকলো। মেয়েটি হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলো। বললো ঃ এরপর কিন্তু আপনার নাম ডাকবে। ভয় পাবেন না। ভয়ের কিছু নেই।

বলে মেয়েটি ভেতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি টলতে টলতে বেরিয়ে এলো।

করবী তাকে ওভাবে বেরিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলো ঃ একি! আপনি এমন করে হাঁটছেন কেন?

মেয়েটি বললো ঃ ও কিছু নয়। বাড়ি গিয়ে খেয়ে একটু ঘুম দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

ততক্ষণে করবীর নাম ডাকতে সুরু করেছে।

করবী ভয়ে ভয়ে ভিতরে গেল। বুকটা টিপ্ টিপ্ করছিল তার। কি জানি, কি করবে? হাসপাতাল সম্বন্ধে তার আগে থেকেই ভয় ছিল। আজ আবার সেখানে তাকে তার গায়ের রক্ত দিতে হবে। শরীরের সমস্ত রক্ত ভয়ে হিম হয়ে আসছে। এ অবস্থায় হয়তো ডাক্তার তার গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত খুঁজে পাবে

না। জলই বেরিয়ে আসবে শুধু। হয়তো তাকে ফিরিয়ে দেবে ডাক্তার।

সে মনে সাহস আনবার চেষ্টা করে।

ডাক্তার হাতে ছুঁচ ফোটালো, টিউব লাগালো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঝোলানো বোতলের মধ্যে রক্ত ফিন্‌কি মেরে পড়তে লাগলো। না, জল নয়, লাল তাজা রক্ত। করবী চোখ বুজলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে ডাক্তার বোতল বদ্‌লালো। সে বোতলটাও ভরে গেল। তারপর করবীর ছুটি।

সে বিছানার ওপর উঠে বসলো। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে একটু।

বেয়ারা এক গেলাস তুধ দিয়ে গেল। করবীর খেতে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ডাক্তারবাবু তা খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

অগত্যা করবীকে তুধটুকু খেতে হলো।

তারপর কয়েকটা টাকা আর এক প্যাকেট্ ফল হাতে নিয়ে করবী মাটিতে পা দিল। কিন্তু একি ! মাটিতে ঠিকমতো তার পা পড়ছে না কেন ? মাথাটা কেমন টলছে যেন ! শরীরটা বড়ো বেশি হাল্‌কা হয়ে গেছে তার। হঠাৎ চোখ তুটো তার কেমন যেন হয়ে গেল। একটা গাঢ় কালো পর্দা যেন তার চোখের সাম্‌নে নেমে এলো। সাম্‌নের ডাক্তারবাবু, রক্ত নেবার যন্ত্রপাতি—সমস্ত কিছু যেন একটা ছুঁচ-ফোটানো অন্ধকারে ডুবে গেল।

ডাক্তারবাবু বললেন : কি হলো ? একটু বসে যাও। কিছুক্ষণ পরে ঠিক হয়ে যাবে।

করবী সাম্‌নের বেঞ্চিটায় বসে পড়লো।

হাতের টাকা আর ফলের প্যাকেট্ আল্‌গা হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। সে ওগুলো শক্ত করে ধরে রইলো।

মিনিট দশেক বসে থেকে সে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে হাঁটছে সে। যদি পড়ে যায়। ধীর পায়ে সে ট্র্যামের স্টপেজে এসে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ পরে ট্র্যাম এলো। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল তার। ট্র্যামে

বসে সে ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ছাড়লো। যেন কতোদিন সে পৃথিবীর বাতাসে নিশ্বাস নেয় নি।

শ্যামবাজারের মোড়ে ট্র্যাম থেকে নেমে সে বাড়ির দিকে হেঁটে চললো। এইটুকু পথ হাঁটতেও তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। মেপে মেপে পা ফেলে সে হালদার বাগান লেনের কালো গলিটায় ঢুকলো।

বাড়িতে এসে মার হাতে সে টাকা আর ফলের প্যাকেট্‌টা গুঁজে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। যোগমায়া দেবী অবাক হয়ে গেলেন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ টাকা কোথায় পেলি রে ?

করবী সংক্ষেপে বললো ঃ পেয়েছি।

ঃ কিন্তু কোথায় পেলি টাকা ? কে দিয়েছে তোকে, বল্‌ ?

ঃ রোজগার করে এনেছি।

যোগমায়া দেবী আরো রেগে ওঠেন। রাগে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে।

জিজ্ঞেস করেন ঃ রোজগার করে এনেছিস যদি, অমন. করছিস কেন ? চোখমুখ বসে গেছে, টল্‌ছিস মাতালের মতো। বল্‌, কোত্থেকে টাকা এনেছিস ? কে দিয়েছে তোকে টাকা ?

ঃ বলেছি তো—

ঃ ফের মিথ্যে কথা বল্‌ছিস ? লুকোচ্ছিস আমার কাছ থেকে ? সর্বনাশী, বল্‌ কি করে টাকা নিয়ে এলি ?

কথা বলতে করবীর ভালো লাগছিল না। সে শুধু চেঁচিয়ে ওঠে ঃ মা—

যোগমায়া দেবী রাগের মাথায় টাকা আর ফলের প্যাকেট্‌ টান্‌ মেরে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেন। বলেন ঃ আমি ছোঁব না এ টাকা, নেবো না—

করবী অতি কষ্টে বিছানা থেকে নেমে এসে টাকা আর ফলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে মার হাতে দিয়ে তাঁর পায়ের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। বলে ঃ এই তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি মা, কোন

অসৎ কাজ করে টাকা আনি নি। তুমি আমাকে মিছিমিছি সন্দেহ করো না। আমি তাহলে ঠিক মরে যাবো।

এবার করবী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

যোগমায়া দেবী তাকে তুলে নিয়ে বিছানায় বসালেন। তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

ঃ তাহলে তুই কি করে টাকা পেলি, বল্ ?

করবী প্রথমে একটু ইতস্তত করলো। তারপর সে বলেই ফেললো ঃ ব্লাড্ ব্যাঙ্কে রক্ত বিক্রি করে টাকা এনেছি, মা—

যোগমায়া দেবী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুকের ভেতরটা তাঁর কেমন যেন দুলে উঠলো। শুধু বললেন ঃ রক্ত বিক্রি করে টাকা এনেছিস্ তুই ?

করবী কোন কথা বলতে পারলো না। গলাটা বুজে গিয়েছিল তার।

যোগমায়া দেবীর চোখ ফেটে জল এলো। তিনি অসহায়ের মতো ককিয়ে উঠলেন ঃ তুই রক্ত বিক্রি করে টাকা নিয়ে এসেছিস্, হতভাগী। তোর রক্ত-বিক্রি-করা টাকা আমি ছোঁব না, ছোঁব না—

বিছানার ওপর টাকা আর ফলগুলো ছুঁড়ে দিয়ে তিনি রান্না ঘরে ঢুকে দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

সুরঞ্জন করবীর মুখে তার বেদনার এই বিবৃতি শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

করবী তার শরীরের রক্ত বিক্রি করে টাকা এনে তার মার হাতে দিয়েছে সংসার চালাবার জন্যে। মা কেঁদেছেন। মুখের ওপরে টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

কিন্তু টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিলেই যদি সমস্যার সমাধান হতো, তাহলে সুরঞ্জনের ভাববার কোন কারণ ছিল না।

সেইদিনই যোগমায়া দেবীকে টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে দোকান থেকে চাল ডাল কিনতে হয়েছে। করবী বিছানা থেকে নেমে গিয়ে পঙ্গু বাবাকে ফলগুলো খাইয়ে দিয়ে এসেছে। বাবা কতোদিন

অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর মুখে কোনদিন এক ফোঁটা ফলের রস দিতে পারে না ওরা। যে ভাবেই হোক, আজ তো করবী তাঁর মুখে একটু ফলের রস তুলে দিতে পারলো। হেরম্ববাবুও জিজ্ঞেস করলেন না, কি করে ফলগুলো এলো, কে তাদের এভাবে ফলগুলো দিল।

অতি দুঃখেও মানুষের হাসি পায়। সে হাসি অসহায়ের হাসি। সুরঞ্জনেরও আজ হাসি পেল। মানুষ রক্ত বিক্রি করে এখন পেটের ভাত যোগাড় করে, বাঁচবার জন্যে করে কী মর্মান্তিক সংগ্রাম! এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম মানুষের কবে শেষ হবে?

করবীও হাসলো। বললো : তবু বলেন, আমি ঠিকমতো চেষ্টা করিনি। আর কি করলে ঠিকমতো চেষ্টা করা হবে, বলুন? এবার তাই করবো।

সুরঞ্জন বসে কি ভাবতে লাগলো।

একটা নিশ্বাস ফেলে সে বললো : ঠিক আছে। তোমাকে চেষ্টা করতে হবে না। এবার থেকে তোমার হয়ে আমিই চেষ্টা করবো।

: থাক্। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

: কেন?

: চাকরি আমি করবো না।

সুরঞ্জন অবাক হয়ে গেল করবীর উত্তর শুনে। বললো : চাকরির জন্যে এত ঘুরলে, এত চেষ্টা করলে। আমি বলছি, চেষ্টা করে একটা চাকরি জুটিয়ে দেব। তা তুমি করবে না? চাকরিই যদি করবে না, তবে এত চেষ্টা করছিলে কেন?

করবী মুখ নিচু করে বসে রইলো। কোন কথা বললো না।

: করবী?

করবী মুখ তুলে তাকালো শুধু। তার সারা মুখে লেগেছে অসহ্য অন্ধকার। সুরঞ্জন ভালো করে চেয়ে দেখলো, করবীর মুখে সেদিনের মসৃণতা নেই, সরল সৌন্দর্যের সেই দীপ্তির লেশটুকুও নেই।

এই ক মাসে করবীর যেন অনেক বয়েস বেড়ে গেছে। সে যেন হঠাৎ বুড়ো হয়ে গেছে। এই বয়েসেই সে পৃথিবীর তিক্ততম অভিজ্ঞতা পেয়েছে। রক্ত বিক্রি করে ক্ষুধার্ত সংসারের মুখে ভাত জোটাতে চেষ্টা করেছে সে।

অভিজ্ঞতার আর বাকি রইলো কি?

এই গ্রহের দুঃখে জ্বলে পুড়ে সে এই বয়েসে পোড়া-মাটির পুতুলের মতো রুক্ষ হয়ে উঠেছে।

করবী চুপ করে থাকে। হঠাৎ বলে ওঠে: আমার মনে হয়, দিদি ঠিকই করেছিল।

: কি ঠিক করেছিল, করবী?

করবী শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

: বললে না তো, কেতকী কি ঠিক করেছে?

: দিদি স্যুইসাইড্ করে ঠিকই করেছে।

: কেন? তুমিও কি সেইভাবে চিন্তা করছো না কি?

: অন্তত এ যন্ত্রণা তো আর সইতে হবে না।

: কি তোমার যন্ত্রণা?

করবী কি তা হলে কেতকীর মতো ইতিমধ্যেই তার অভিজ্ঞতার পাত্র কানায় কানায় ভরে ফেলেছে? তা নইলে, তার মুখে আজ এ কথা কেন?

সুরঞ্জন একটু যেন ভয় পেয়ে গেল। সে আর করবীর মনের ভেতরে উঁকি মেরে তার যন্ত্রণা খুঁজতে ভরসা পেল না।

শুধু বললো: ঘরটা বড়ো অন্ধকার, না করবী?

করবী বললো: বড়ো অন্ধকার। দিদি আর কিছু না পারুক, এই অন্ধকার থেকে তো পালিয়ে বাঁচতে পেরেছে। আর তো তাকে এই অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে মরতে হবে না।

করবী চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলো। তারপর বললো: জানেন? আমরা চারদিক থেকে শেষ হয়ে গেলাম। বড়দি গেল, মেজদির আর কিছু নেই। সেও পাগল হয়ে গেছে—

সুরঞ্জন বলেঃ হ্যাঁ, করবী। যূথিকার কথা জিজ্ঞেস করবো, কতোদিন ভাবি। কিন্তু ভুলে যাই। কি হয়েছিল বলো তো যূথিকার ?

করবী বলেঃ মেজদি আগে খুব ভালো ছিল জানেন ? কিন্তু পাকিস্তান থেকে আসবার সময় গুণ্ডারা ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তিনদিন বাদে তাকে ওরা বর্ডারের কাছে ফেলে দিয়ে যায়। তারপর থেকে মেজদি এই রকম হয়ে গেছে।

নিচে থেকে যোগমায়া দেবীর গলা শোনা গেল। তিনি করবীকে ডাকছেন।

করবী নিচে নেমে গেল।

সুরঞ্জন ভাবে, একালের সব চেয়ে বড়ো অভিশাপ তা হলে যূথিকাকে মাথা পেতে নিতে হয়েছে। কিন্তু তাতে যূথিকা আর বাঁচলোনা। যূথিকা এই ভাঙা-যুগের বিষ পাত্র মুখে নিয়ে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল।

সুরঞ্জন ভাবে, সে কিন্তু ভাগ্যবান। সে এ যুগে জন্মে অনেক কিছু জেনে যেতে পারলো। অনেক—অনেক। যা অন্য কোনকালে জন্মালে তার পক্ষে জানা সম্ভব হতো না।

সুরঞ্জন মনে মনে ভাবে ঃ কেন, এরা একালে জন্মেছিল ? যেকালে রক্ত বিক্রি করে পেট চালাতে হয় মেয়েদের, দেশ-বিভাগের বিষ কুমারী কন্যাদের আকণ্ঠ ধারণ করতে হয় কিংবা যুগের যন্ত্রণাকে নিষ্ঠুরতম প্রতারণার মধ্য দিয়ে জীবনে স্বীকার করে নিতে হয়, সে যুগে এরা জন্মালো কেন ?

কিছুক্ষণ পরে করবী হাতে একখানি চিঠি নিয়ে ওপরে উঠে এলো। চিঠিখানা সে খুলেছে। মনে হয়, পড়েছেও।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে ঃ চিঠি এলো না কি ?

করবী নীরব।

ঃ কার চিঠি ? তোমার ?

মাথা নেড়ে করবী জানালো, সে চিঠি তারই।

: কোত্থেকে এলো ?

করবী কিছু না বলে সুরঞ্জনের হাতে চিঠিখানা দেয়।

সুরঞ্জন এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে ফেলে। বলে: বাঃ! সুখবর তো! এত বড়ো চান্স ক জনের ভাগ্যে আসে? ইউ আর লাকি, করবী। আই কন্‌গ্রাচুলেট্ ইউ।

একটু থেমে সে বলে: দেখো করবী, তখন কিন্তু ভুলে যেও না।

সুরঞ্জন এতক্ষণ করবীর মুখের দিকে তাকায় নি। এবার সে তার মুখখানা ভালো করে তাকিয়ে দেখে। সারা মুখে তার যেন এক-আকাশ অন্ধকার গড়িয়ে পড়েছে।

এমন একটা সুসংবাদ এসেছে করবীর। এখন তো করবীর আনন্দে নেচে ওঠার কথা। তার বদলে মুখখানা তার একেবারে কালো হয়ে গেছে। কিন্তু কেন?

কিছুক্ষণ আগে করবী তার সঙ্গে গল্প করে নিচে গেছে। তখনও তো তার মুখ এমন অন্ধকার ছিল না। চিঠিটা হাতে নিয়ে সে মুখটা এমন করে ফেললো কেন?

সুরঞ্জন বলে: কি হলো? কথা বলছো না যে?

করবী চিঠিখানা সুরঞ্জনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে।

সুরঞ্জন তাকে বারণ করেছিল। কিন্তু করবী শোনে নি। ততক্ষণে সে চিঠিখানা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলেছে।

সুরঞ্জন বললো: ছিঁড়ে ফেললে চিঠিখানা?

সে তাকিয়ে দেখলো, করবীর সমস্ত শরীর কাঁপছে থর থর করে।

একটা সিনেমা কোম্পানী থেকে করবীর চিঠি এসেছে। তাকে নায়িকার ভূমিকায় মনোনীত করা হয়েছে। অন্যান্য কথাবার্তা বলার জন্যে তাকে একটা নির্দিষ্ট দিন সন্ধেয় যেতে বলা হয়েছে।

এ তো শুভ সংবাদ!

এতে রাগ করবার কি আছে? এ চিঠি কি ছিঁড়ে ফেলতে আছে? এ চিঠি তো মাথায় ছুঁয়ে রেখে দেবার কথা!

করবী কিনা তা এক নিমেষে ছিঁড়ে ফেললো? ছি ছি, এ কী করলো করবী! এ রকম একটা চান্স! করবী নষ্ট করে ফেললো। সৌভাগ্য মানুষের জীবনে একবার আসে। আর কি এমন সুযোগ করবীর ভাগ্যে কখনো আসবে?

সুরঞ্জন বললোঃ তোমাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে, করবী তুমি বসো একটু। শান্ত হও।

করবী নিঃশব্দে বসলো।

সুরঞ্জন কাগজটা টেনে এনে করবীকে একটু আড়াল করে নিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর করবী বলেঃ ভেবেছিলাম কাউকে বলবো না।

সুরঞ্জন চোখের সাম্‌নে থেকে কাগজটা সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করেঃ কি বলবে না ভেবেছিলে?

ঃ আমার সিনেমায় নামার কথা।

ঃ কাউকে বলবে না মানে? সবাই তো জানবে। সবাই তো তোমার ছবি দেখতে যাবে।

করবী শুধু্ বলেঃ না। কেউ জানবে না।

একটু থেমে সে বললোঃ সিনেমায় নামা তো নয়, নরকে নামা।

কঠিন ভাবে একটু হাসলো করবী। তারপর বলেঃ সে ওঠা নয়। নেমে যাওয়া। একেবারে নেমে যাওয়া—

সুরঞ্জন বলেঃ কিন্তু অনেকে তো সিনেমায় নেমে নাম করছে, টাকা করছে। তা ছাড়া, এ যুগটাই তো সিনেমার যুগ। সিনেমায় নামবার জন্যে লোকে কতো উমেদারী করে। অথচ তুমি—

করবী বলেঃ আমি কিন্তু কোনদিন সিনেমায় নামার কথা ভাবি নি।

ঃ তবে?

ঃ একজন আমাকে তার নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, সিনেমাই সব। সিনেমায় নামতে না পারলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ঃ তাই নাকি ?

হাসলো সুরঞ্জন। জিজ্ঞেস করলো ঃ তারপর ?

ঃ তারপর আর কি ? যা হবার তাই হলো। এখন আমার সে নেশা কেটে গেছে।

ঃ কিন্তু নেশাটি ধরিয়েছিল কে ?

করবী একটু থেমে বলে ঃ তুষার দা।

ঃ তুষার ?

সুরঞ্জন তুষারের নাম শুনে চম্‌কে ওঠে। তা হলে শুধু নিশীথ নয়, তুষারও হালদার বাগান লেনের অন্ধকারে আরেক আঁধারের পদাবলী রচনা করেছে। তাহলে নিশীথই সব নয়, তুষারও আছে তার সঙ্গে।

তুষারের চেহারাটা সুরঞ্জনের চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে।

চোঙা প্যান্ট, ছুঁচোলো জুতো, রং বেরঙের কামিজ, মাথায় সিঙাড়া-ছাঁদের চুল এবং ফ্রেঞ্চ-কাট্ দাড়ি। তার মধ্যে বর্তমানের এত অন্ধকার জমা হয়ে আছে, তা সুরঞ্জনের জানা ছিল না।

তুষারকে সে নিশীথের সঙ্গে এ বাড়িতে বহুবার দেখেছে। তা ছাড়া হালদার বাগান লেনের পূজো এবং তার আনুষঙ্গিক বিচিত্রানুষ্ঠানে সে তুষারের ক্ষমতা দেখেছে। বিচিত্রানুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব তো ছিল তারই ওপর।

একদিন পানের দোকানের সাম্‌নে দিয়ে যেতে যেতে সুরঞ্জন তার কথাবার্তায় তার স্বভাবের সামান্য পরিচয় পেয়েছিল মাত্র। সিনেমার লাইনে তার প্রচুর জানাশোনা আছে, সেবার সে বুঝেছিল। কিন্তু করবী যে তার ফাঁদে ধরা দিয়েছে, তা তো তার জানা ছিল না।

করবীর ওপর ছিল সুরঞ্জনের গভীর বিশ্বাস। সে অন্তত কেতকীর মতো নয়। তার এক স্বতন্ত্র সত্তা আছে। সেই সত্তা সহজে নুয়ে পড়ে না।

আজ করবী তার সেই বিশ্বাসকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল।

করবী বলে ঃ একদিন আমি বেরুচ্ছিলাম। পানের দোকানের সাম্‌নের বেঞ্চিতে তুষারদা বসেছিল। আর কেউ ছিল না। আমাকে

দেখে সে হাসলো। আমিও হাসলাম। তারপর দাঁড়িয়ে তাকে ইশারায় ডাকলাম।

তুষার এলো। করবী তাকে জিজ্ঞেস করলো: নিশীথদার খবর কি, জানেন? সে কোথায় এখন?

তুষার বলেছিল: সে নিশিকান্তবাবুকে ধরে একটা বড়ো কন্ট্রাক্ট পেয়ে গেছে। এখন তো সে বাইরে।

: তাই নাকি?

তুষার দাঁড়িয়ে রইলো।

করবী বললো: এই কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম। আচ্ছা, এখন আমি আসি—

তুষার জিজ্ঞেস করে: কোথায় যাচ্ছো?

: একটু কাজে।

: তাই নাকি? কাজ-টাজ করছো তাহলে? কোন্ অফিস?

: কাজ নয়। কাজের খোঁজে—

: চাকরি করছো না?

: চাকরি পেলাম কই যে করবো?

তুষার চুপ করলো।

করবীও আর যেন চলে যেতে পারলো না। মুখ নিচু করে একটু ভাবলো। তারপর বললো: একটা চাকরি জুটিয়ে দিন না, তুষারদা। আপনার তো অনেক জানাশোনা।

: চাকরি?

বলে তুষার প্যাণ্টের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

করবী বললো: একটা চাকরি না করলে আর চলছে না। আমাদের বাড়ির অবস্থা সবই তো জানেন। বাবা বিছানায় শুয়ে প্রায় এক বছর—

করবী আরো কি বলতে যাচ্ছিল।

তুষার বললো: আচ্ছা দেখি। চেষ্টা করে দেখবো। তবে কথা দিতে পারছি না। কোন খবর পেলেই জানাবো।

: আমি কি করে জানতে পারবো ?

: কেন ? এখানেই দেখা পাবে।

: আচ্ছা।

করবী চলে যায়।

কদিন বাদে আবার তুষারের সঙ্গে করবীর দেখা।

করবী ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো : কোন খোঁজ পেলেন ?

হেসে তুষার বললো : এই যা। ভুলে গিয়েছিলাম। যা ব্যস্ত ! একেবারে মনে ছিল না।

করবী বলে : বড়ো প্রয়োজন।

: ঠিক আছে। আমি এবার চেষ্টা করে দেখছি।

: আচ্ছা।

সেদিনও করবী চলে গেল কাজের খোঁজে।

রোজ সে কাপড়ে ধুলোবালি লাগিয়ে, চটির তলা ছিঁড়ে, মুখ শুকিয়ে ফিরে আসে।

কোথাও সে একটা সামান্য কাজও পেল না।

কদিন পরে তুষারের সঙ্গে তার আবার দেখা হলো।

তুষারকে ডেকে সে জিজ্ঞেস করলো : কোনো খবর পেলেন, তুষারদা ?

তুষার বললো : এখনও কোনো খবর পাই নি, করবী। বাজার বড়ো খারাপ। এই বাজারে চাকরি-বাকরি পাওয়া বড়ো শক্ত।

তুষার কি যেন ভাবলো একটু। করবী তার সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে ছিল। তুষার তাকে কোনো আশার কথা শোনাতে পারলো না। অথচ সে ভেবেছিল, তুষারকে দিয়ে তার কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। তার কতো জানাশোনা !

তুষার জিজ্ঞেস করলো : তুমি একবার কলেজে থিয়েটার করেছিলে, না ?

করবী তার এই এক্সট্রা-কোয়ালিফিকেশানের কথাও অনেক জায়গায় বলেছে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় নি। আজও সে তুষারকে অভ্যস্ত সুরে বললো: একবার নয়, কয়েকবার করেছি। প্রাইজও পেয়েছি। নৃত্যনাট্যেও ভালো করেছি একবার।

: তাই নাকি?

: হ্যাঁ। সার্টিফিকেটও পেয়েছি।

: তা হলে তুমি সিনেমায় নামবে?

করবী অবাক হয়ে গেল। বললো: সিনেমায়?

: কেন? পারবে না?

করবী থিয়েটার করেছে। তাই বলে সিনেমায় কি সে পার্ট করতে পারবে? সে কতো শক্ত!

তুষার বলে: সিনেমায় পার্ট করা অনেক সহজ। দেখছো না, আজকাল কতো মেয়ে সিনেমায় নামছে। কতো নতুন নতুন নাম। আরে, তুমি তো তবু দু একবার থিয়েটার করেছ। কিন্তু এমন অনেক সিনেমার নায়িকাকে আমি জানি, সিনেমাতেই তাদের হাতে খড়ি।

করবী বলে: না তুষারদা, সে বড়ো শক্ত। আমি পারবো না।

তুষার তাকে সাহস দেয়। বলে: খুব পারবে। থিয়েটারে কতো অডিয়েন্সের সাম্‌নে তুমি পার্ট করতে পারলে। ছবিতে কিন্তু ডিরেক্টার আর ক্যামেরা-ম্যানের সাম্‌নে তুমি পার্ট করতে পারবে না?

করবী চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবে।

সে সিনেমায় নামবে? রূপোলি পর্দায় তার ছবি দেখার জন্যে হাজার-হাজার লোক ভিড় করবে? সারা দেশের লোক তার নাম শুনে চম্‌কে উঠবে? দু হাতে তার আসবে টাকা! বাড়ি, গাড়ি— কতো কি! সে আর ভাবতে পারে না।

নিজের মনে সে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠে।

সে হবে ফিল্ম একট্রেস্! অসম্ভব!

তুষার বলেঃ যদি রাজী থাকো তো, বলো। আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। এক ডিরেক্টার একটা নতুন বই তুলবে। নতুন নায়ক-নায়িকার দিকে তার ঝোঁক বেশি।

করবী ভাবে, এমন চান্স! এ তো অবিশ্বাস্য!

বলেঃ আমি কিছু ভেবে উঠতে পারছি না, তুষারদা।

তুষার বলেঃ বেশ। এখনই তোমাকে কিছু বলতে হবে না। তুমি ভাবো, চিন্তা করো। দুদিন পরে আমাকে জানালেও চলবে। তাহলে আমি তোমার একটা ইণ্টারভিউর ব্যবস্থা করে দেব।

করবী আর কিছুই বলতে পারলো না।

সেদিন এক অফিসে তার ইণ্টারভিউ ছিল। সে অন্যমনস্কভাবে সেখানে গেল। পথে যেতে যেতে সে ভাবে, সে সিনেমায় নেমেছে। তার অভিনয় দেখবার জন্যে হাজার-হাজার জনতা ভিড় করেছে। এক আশ্চর্য অনুভূতিতে তার সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সেদিন সে যেন এই পৃথিবীর মাটিতে ছিল না, একেবারে রূপোলি পর্দায় সে যেন চলে গিয়েছিল। সেখানেই সে নাচছিল, গাইছিল, তার আশ্চর্য অভিনয়ে সেখানে সে হাজার-হাজার দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়োচ্ছিল।

বাড়ি ফিরে সে কাউকে কিছু বললো না। নিজের মনে সে রূপোলি পর্দায় অভিনয় করে চললো। বাচ্চুকে সে কোনদিন বিশেষ আদর করে না। সেদিন তাকে সে খুব করে আদর করলো। যূথিকা তাই দেখে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। সে তখন বাচ্চুকে ছেড়ে দিয়ে তার মেজদির গাল দুটো টিপে দিয়ে পালিয়ে গেল।

যূথিকা ক্ষেপে গিয়ে তাকে যা-তা করে গালাগাল করলো। তাতেও করবী দমলো না। একটু পরেই ফিরে এসে সে তার মাথার ছোট ছোট চুলগুলো টেনে দিয়ে তার পাশে বসে পড়লো। বললোঃ জানিস্ মেজদি—

ঃ কি?

করবী তার এই এক্সট্রা-কোয়ালিফিকেশানের কথাও অনেক জায়গায় বলেছে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় নি। আজও সে তুষারকে অভ্যস্ত সুরে বললো ঃ একবার নয়, কয়েকবার করেছি। প্রাইজও পেয়েছি। নৃত্যনাট্যেও ভালো করেছি একবার।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ হ্যাঁ। সার্টিফিকেটও পেয়েছি।

ঃ তা হলে তুমি সিনেমায় নামবে ?

করবী অবাক হয়ে গেল। বললো ঃ সিনেমায় ?

ঃ কেন ? পারবে না ?

করবী থিয়েটার করেছে। তাই বলে সিনেমায় কি সে পার্ট করতে পারবে ? সে কতো শক্ত !

তুষার বলে ঃ সিনেমায় পার্ট করা অনেক সহজ। দেখছো না, আজকাল কতো মেয়ে সিনেমায় নামছে। কতো নতুন নতুন নাম। আরে, তুমি তো তবু দু একবার থিয়েটার করেছ। কিন্তু এমন অনেক সিনেমার নায়িকাকে আমি জানি, সিনেমাতেই তাদের হাতে খড়ি।

করবী বলে ঃ না তুষারদা, সে বড়ো শক্ত। আমি পারবো না।

তুষার তাকে সাহস দেয়। বলে ঃ খুব পারবে। থিয়েটারে কতো অডিয়েন্সের সাম্‌নে তুমি পার্ট করতে পারলে। ছবিতে কিন্তু ডিরেক্টার আর ক্যামেরা-ম্যানের সাম্‌নে তুমি পার্ট করতে পারবে না ?

করবী চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবে।

সে সিনেমায় নামবে ? রূপোলি পর্দায় তার ছবি দেখার জন্যে হাজার-হাজার লোক ভিড় করবে ? সারা দেশের লোক তার নাম শুনে চম্‌কে উঠবে ? দু হাতে তার আসবে টাকা ! বাড়ি, গাড়ি—কতো কি ! সে আর ভাবতে পারে না।

নিজের মনে সে খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

সে হবে ফিল্ম একট্রেস্ ! অসম্ভব !

তুষার বলেঃ যদি রাজী থাকো তো, বলো। আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। এক ডিরেক্টার একটা নতুন বই তুলবে। নতুন নায়ক-নায়িকার দিকে তার ঝোঁক বেশি।

করবী ভাবে, এমন চান্স! এ তো অবিশ্বাস্য!

বলেঃ আমি কিছু ভেবে উঠতে পারছি না, তুষারদা।

তুষার বলেঃ বেশ। এখনই তোমাকে কিছু বলতে হবে না। তুমি ভাবো, চিন্তা করো। দুদিন পরে আমাকে জানালেও চলবে। তাহলে আমি তোমার একটা ইণ্টারভিউর ব্যবস্থা করে দেব।

করবী আর কিছুই বলতে পারলো না।

সেদিন এক অফিসে তার ইণ্টারভিউ ছিল। সে অন্যমনস্কভাবে সেখানে গেল। পথে যেতে যেতে সে ভাবে, সে সিনেমায় নেমেছে। তার অভিনয় দেখবার জন্যে হাজার-হাজার জনতা ভিড় করেছে। এক আশ্চর্য অনুভূতিতে তার সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সেদিন সে যেন এই পৃথিবীর মাটিতে ছিল না, একেবারে রূপোলি পর্দায় সে যেন চলে গিয়েছিল। সেখানেই সে নাচছিল, গাইছিল, তার আশ্চর্য অভিনয়ে সেখানে সে হাজার-হাজার দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়োচ্ছিল।

বাড়ি ফিরে সে কাউকে কিছু বললো না। নিজের মনে সে রূপোলি পর্দায় অভিনয় করে চললো। বাচ্চুকে সে কোনদিন বিশেষ আদর করে না। সেদিন তাকে সে খুব করে আদর করলো। যূথিকা তাই দেখে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। সে তখন বাচ্চুকে ছেড়ে দিয়ে তার মেজদির গাল দুটো টিপে দিয়ে পালিয়ে গেল।

যূথিকা ক্ষেপে গিয়ে তাকে যা-তা করে গালাগাল করলো। তাতেও করবী দমলো না। একটু পরেই ফিরে এসে সে তার মাথার ছোট ছোট চুলগুলো টেনে দিয়ে তার পাশে বসে পড়লো। বললোঃ জানিস্ মেজদি—

ঃ কি?

ঃ তোকে না—আমি একখানা খুব সুন্দর শাড়ি কিনে দেব।

ঃ ধেৎ—

ঃ হ্যাঁ রে, সত্যি বলছি। আমি দেখে এসেছি। শাড়িটা কি সুন্দর! পরলে তোকে যা মানাবে—

যূথিকা কি ভাবে। বলে ঃ না ভাই, নেবোনা। লোকে যা-তা বলবে।

ঃ কি বলবে?

ঃ কি-না বলবে। বলবে, ওকে শাড়ি দিল কে?

করবী বলে ঃ যে যাই বলুক। আমি কিন্তু তোকে ওই শাড়িখানা কিনে দেব।

যূথিকা বলে ঃ খবরদার দিস না। তাহলে কিন্তু মাকে আমি বলে দেব।

ঃ তুই যাকে খুশি বল্। আমি তোকে শাড়িটা দেবই। মেজদি, আমার মেজদি—

করবী সুর করে বলতে থাকে আর বেশ করে যূথিকার গাল দুটো ধরে টিপতে থাকে। যূথিকা তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে না পেরে তাকে বলে ঃ বলে দেব, মাকে ঠিক বলে দেব—

করবী তাকে এবার জোরে বুকে জড়িয়ে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে যূথিকা চেঁচিয়ে ওঠে ঃ না না। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমাকে—

তবু করবী তাকে ছাড়ে না।

যূথিকা ডাকে ঃ মা—

রান্নাঘর থেকে যোগমায়া দেবী সাড়া দেন ঃ কেন?

ঃ দ্যাখোনা, এটা কেমন গুণ্ডামি করছে—

বাচ্চু ছুটে এসে লাফ মেরে যূথিকার চুলটা টেনে দিয়ে পালায়।

রাতে বিছানায় শুয়ে করবীর চোখে ঘুম আসে না।

কি বইতে নামতে হবে, সে জানে না। কিভাবে পার্ট করতে হবে, তারও সে কিছুই জানে না। শুধু সে অনুভব করে, কতো আলো

এসে পড়েছে তার মুখে। সে শুনতে পাচ্ছে। কতো রকমের বাজনা বাজছে তার চারদিকে, তাকে ঘিরে ক্যামেরাম্যানের ক্যামেরা রেডি হয়ে আছে। দূরে ডিরেক্টার দাঁড়িয়ে তাকে ডিরেক্শান দিচ্ছেন।

তখন যদি সে পার্ট ভুলে যায়। কেউ প্রম্প্ট্ করে দেবে না?

না। পার্ট সে ভুলবে কেন? পার্ট সে ভুলবে না। ভালো করে সে মুখস্থ করে যাবে। স্যুটিং আরম্ভ হবার আগে সে একবার ভালো করে স্ক্রিপ্ট্টা পড়ে নেবে। ডিরেক্টার বলবেন: টেক্—

সে তখন চোখে মুখে হাসি টেনে আনবে। আলোর ফোয়ারায় স্নান করে সে সুন্দর করে বলবে তার পার্টটুকু।

ডিরেক্টার বলবেন: কাট্!

আলো নিবে যাবে। ক্যামেরা অচল হবে। ডিরেক্টার এগিয়ে এসে হেসে বলবেন: এক্সিলেণ্ট!

করবী ঘুমোতে পারে না।

সে একবার তুষারের মুখে স্যুটিং এর গল্প শুনেছিল।

পরের দিনই সে তুষারকে বলতে গেল। কিন্তু তুষারের দেখা পেল না সে।

মনে মনে ভাবে, তুষারদা কেন এমন? তার মুখ থেকে কথাটা নেবার জন্যে তার আজ পানের দোকানের সাম্‌নে থাকা উচিত ছিল না কি?

আবার ভাবে সে, তুষারদার কতো কাজ! কতো লোকের সঙ্গে তার জানাশোনা! কতো ব্যস্ত সে! তার কি রোজ এখানে এসে বসে থাকা সম্ভব?

আর তারই বা কাল সময় নেবার কি প্রয়োজন ছিল? সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেই হতো, সে নামবে। সিনেমায় নামা তো আর সহজ কথা নয়! কতো বড় একটা চান্স! তাতে ভেবে দেখবার কি আছে? বলে দিলেই হতো: ঠিক আছে, তুষারদা। আমি নামবো।

তাহলে রাতের ঘুমটা এভাবে নষ্ট হতো না তার।

সেদিন রাতেও সে ঘুমোতে পারলো না।

সে ঘুম-চোখে দেখতে লাগলো, হাজার-হাজার দর্শক তার ছবি দেখবার জন্যে এসে ভিড় করেছে। কলকাতার বড়ো বড়ো সিনেমা হলের সাম্‌নে তার ছবি বড়ো করে এঁকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। আর অজস্র কৌতূহলী চোখ ট্র্যাম-বাস থেকে গোগ্রাসে গিলছে তার ছবি।

কিন্তু সে তখন কোথায়?

সে তখন নিশ্চয়ই হালদার বাগান লেনের এই অন্ধকার ঘুপ্‌সি ঘরে শুয়ে নেই। সে তখন বালিগঞ্জ কিংবা টালিগঞ্জ কিংবা নিউ আলিপুরের একটা চোখ-ধাঁধানো বাড়িতে নিত্য-নতুন সাজগোজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। সেখানে বাবা সেরে উঠেছে। বাইরে পাঠিয়ে তার ট্রিট্‌মেণ্ট করানো হয়েছিল। বাবা এখন লাঠি ছাড়াই সাম্‌নের বাগানে পায়চারি করতে পারে, বেড়াতে যায়।

মার শরীরটাও এখানে এসে একটু সেরেছে। টক্‌টকে লাল-পাড় শাড়ি, হাতে গয়না, কপালে সিঁদুর। একবেলা তো তাঁর ঠাকুর-ঘরেই কাটে। তাঁর জন্যে একটা ঠাকুর-ঘর করে দিয়েছে সে। এখানে এসে তিনি আবার ঠাকুর পেতেছেন।

বাচ্চু এখন ইংরেজি ইস্কুলে পড়তে যায়। ইস্কুলের বাস আসে, তাকে নিয়ে যায়। মেজদিও অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে। তাকেও দেখতে শুনতে আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

এখন বড়দির কথা তার বড় বেশি মনে পড়ে। সে স্যুইসাইড্‌ করলো। বেঁচে থাকলে সে এখন কতো সুখেই না থাকতে পারতো। কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল স্যুইসাইড্‌ করে মরবার জন্যে?

সত্যি, বড়দির জন্যে তার বড়ো দুঃখ হয়। সে কিছুই দেখে যেতে পারলো না। সিনেমায় নেমে সে কতো উন্নতি করেছে, বড়দির আর তা দেখা হয়ে উঠলো না। সে শুধু হালদার বাগান লেনের সেই অন্ধকার বাড়ির স্মৃতি নিয়েই চলে গেল।

করবী হাত বাড়িয়ে বাচ্চুকে খোঁজে। বাচ্চুটা গড়াতে গড়াতে কোথায় চলে গেছে। তাকে সে কাছে টেনে আনে। তার ঘুমন্ত মুখে চুমো খায়ঃ সোনার টুক্‌রো ভাইটি আমার!

কিন্তু করবীর কাছে এখন হালদার বাগান লেনের এ বাড়িটা আরো বেশি অন্ধকার লাগছে।

লাগলোই বা! আর বেশিদিন তো তাকে এখানে থাকতে হচ্ছে না।

কখন রাত ভোর হবে? সে গিয়ে তুষারদাকে বলবে, সে রাজী আছে।

সেদিন সে তুষারের দেখা পেল।

তাকে দেখে তুষার জিজ্ঞেস করলোঃ ভেবে কি ঠিক করলে?

করবী বললোঃ আমি নামতে রাজী আছি, তুষারদা।

ঃ তা হলে একদিন চলো আমার সঙ্গে। ডিরেক্টারের সঙ্গে কথা বলে আসবে।

ঃ চলুন। কবে যাবেন বলুন?

তুষার একটু ভেবে বললোঃ বেশ। কালই চলো।

করবী জিজ্ঞেস করেঃ কাল কখন?

ঃ কাল বেলা তুটোর পর।

ঃ বেশ। আপনার কোথায় দেখা পাবো?

ঃ এখানেই।

ঃ আমি ঠিক তুটোর সময় এসে যাবো। আপনি একটু আগে থেকে আসবেন, কেমন?

ঃ আচ্ছা।

পরের দিন করবী তুটোর একটু পরে পানের দোকানের সাম্‌নে এসে দেখলো, তুষার আগে থেকেই এসে সেখানে বেঞ্চিতে বসে আছে।

করবীকে দেখে তুষার উঠে এলো।

দুজনে পাশাপাশি শ্যামবাজারের মোড়ের দিকে এগোলো। পাঁচ মাথার মোড়ে তুষার একটা ট্যাক্সি নিল। দুজনে তাতে পাশাপাশি বসলো। ট্যাক্সিটা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে ছুটে চললো।

বেশি দূর নয়, বিবেকানন্দ রোড।

বিবেকানন্দ রোডে পড়ে ট্যাক্সিটা একটু ঘুরে গেল। পাশের একটা গলিতে তুষার ট্যাক্সিটাকে দাঁড়াতে বলে নেমে পড়লো।

করবী ট্যাক্সিতেই বসে রইলো। তুষার তাকে বলে গেল : দেখি, বাড়ি আছে কিনা। থাকলে আমি আসছি, তোমাকে নিয়ে যাবো।

করবী বললো : কেন আমিও সঙ্গে যাই না? ট্যাক্সিটাকে মিছিমিছি দাঁড় করিয়ে রেখে কি লাভ?

তুষার হেসে বললো : ভাড়াটা কে দেবে?

করবী তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

তুষার বললো : ভাড়াটা ওর কাছ থেকেই আদায় করতে হবে তো।

সাম্‌নে কিছু দূর গিয়ে তুষার একটা বাড়িতে ঢুকে পড়লো।

করবী চুপচাপ ট্যাক্সিতে বসে রইলো। বুকটা তার ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছিল। কি জানি, তাকে যদি ডিরেক্টারের পছন্দ না হয়?

কিছুক্ষণ পরে তুষার ফিরে এলো। তার হাতে দুটো টাকা। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সে করবীকে বললে : এসো—

করবীর ট্যাক্সি থেকে নামতে দেরি হচ্ছিল। আনাড়ির মতো নাম্‌তে গিয়ে তার পায়ে শাড়িটা জড়িয়ে যায়। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দরজার পাল্লায় লেগে হাতের আঙুলটা একটু ছড়ে গেল। সেদিকে তাকাবার এখন সময় নেই করবীর। সে তুষারের পেছন পেছন হাঁটতে থাকে।

মি. সরকার নিচের ড্রইং রুমে বসেছিলেন। হাতের কাছেই টেলিফোন। টেবিলের ওপর ছাইদানিতে জ্বলন্ত বর্মী চুরুট। পাশেই কয়েকখানা ফাইল। দেয়ালে খান দুয়েক বিলিতি ক্যালেণ্ডার। সেগুলোর ছবি করবীর চোখে না পড়ে পারলো না।

করবী আর তুষার সামনের দুটি পৃথক্ সোফায় বসলো।

করবী মুখ নিচু করেই বসেছিল। তারই ফাঁকে সে একবার মি. সরকারকে দেখে নিয়েছে।

মি. সরকারের চেহারা ডিরেক্টারের মতোই বটে। রংটা একটু ময়লা। কিন্তু লম্বা-চওড়া চেহারায় তাঁকে বেশ মানিয়ে গেছে। গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী। পায়ে শুঁড়-তোলা চটি জুতো।

মি. সরকারের গলার স্বরে তাঁর প্রতি করবীর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। যেমনি স্পষ্ট, তেমনি পুরুষালি। ঠিক ডিরেক্টারের মতোই গলার স্বর!

তুষারকে মি. সরকার বললেনঃ সাতদিন আগে থেকে আমার আজ মধ্যমগ্রাম যাবার অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ছিল। কাল তোমার টেলিফোন পেয়ে সে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট বাতিল করে দিলাম। আজই এই কিছুক্ষণ আগে প্রোডিউসার ফোন করে আমাকে ডাকছিল। ছবি সম্বন্ধে কিছু জরুরী ডিস্কাসান্ আছে। আমি বলে দিলাম, আজ আর হবে না। আজ তোমরা আসবে কি না—

তুষার বললোঃ ওকে তো এনে আপনার কাছে হাজির করলাম। এখন আপনি ওকে টেষ্ট করে দেখুন। চলবে কিনা। আমার তো মনে হয়, চলবে। কলেজে অনেকবার থিয়েটার করে প্রাইজ পেয়েছে।

মি. সরকার মাথা নেড়ে হাসলেনঃ তাই নাকি? বেশ—

করবী মুখ নিচু করে বসে রইলো।

মি. সরকার জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার নাম কি?

করবী মুখ তুলে বললোঃ করবী গঙ্গোপাধ্যায়।

মি. সরকার বললেনঃ নামটাও চলবে। বেশ নাম। গলাও তো ভালো আছে। গান-টান জানো নাকি?

ঃ না। তবে নৃত্যনাট্যে নেচেছি।

ঃ ভেরি গুড্।

: আমি এই রকম মেয়েই খুঁজছিলাম। একটু নাচ-জানা। ছবিতে একটা নাচের সিন্ আছে কি না।

করবী জিজ্ঞেস করে: বইটার নাম কি?

মি. সরকার বললেন: 'কেন এত দেরি'।

: কার লেখা?

: আমারই। খুব আপ্-টু-ডেট প্লট্। প্রেমের এমন বিউটি আজ পর্যন্ত কেউ কোন বইতে দেখাতে পারে নি। এখন সবই নির্ভর করছে তোমার ওপর। তুমি কেমন ফোটাতে পারো, দেখা যাক্।

সবাই চুপ করে থাকে।

করবী ভাবে। সে কি পারবে তেমনটি ফোটাতে, মি. সরকার যেমনটি চান?

তুষার জিজ্ঞেস করে: তা হলে ওকে আপনার পছন্দ হয়েছে তো?

মি. সরকার চুরুটে দুটো টান দিয়ে বললেন: তা এখন কি করে বলি, বলো? ট্রায়াল না দিয়ে কিছুই বলা যাবে না।

: ফিগারের দিক থেকে বা অ্যাপিয়ারেন্সের দিক থেকে আপনার মনে লেগেছে তো?

: তা চলবে। কিন্তু ফিগার বা অ্যাপিয়ারেন্স তো আর সব নয়। অভিনয় মানে ক্যারেক্‌টার অ্যানালিসিস্‌টাই হলো বড়ো কথা। সেটা দেখতে হবে।

: সেটা কি আজ দেখবেন? না, অন্য দিন।

করবীর দিকে তাকিয়ে মি. সরকার বললেন: আজ তো সবে আলাপ হলো। আর একদিন তুমি এসো। সেদিন তোমার ট্রায়াল হবে। কেমন?

তুষার বলে: তা হলে আজ আমরা উঠি। কবে ও আসবে, বলে দিন।

মি. সরকার ডায়েরির পাতা উল্‌টিয়ে বললেন: পরশু দিন এসো।

করবী জিজ্ঞেস করলো: কখন?

: বিকেল চারটেয় এসো। সেদিন তোমাকে আগে স্ক্রিপ্‌ট্‌টা

পড়ে শোনাবো। তারপর ক্যারেক্‌টারটা বুঝিয়ে দেব। তারপর হবে তোমার ট্রায়াল।

তুষার বলেঃ আমার তাহলে সেদিন আসবার কোন দরকার আছে?

মি. সরকার বললেনঃ কোন দরকার নেই।

ঃ তা হলে আমাদের ফিরবার ট্যাক্সি ভাড়াটা দিয়ে দিন।

মি. সরকার মানিব্যাগ থেকে দুটো টাকা বের করে তুষারের হাতে দিলেন। তারপর করবীকে বললেনঃ তুমিও সেদিন ট্যাক্সি করে চলে এসো। আমি ভাড়া দিয়ে দেব, কেমন? আর হ্যাঁ, একা আসতে পারবে তো?

করবী বললোঃ পারবো।

নমস্কার করে দুজনে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়লো।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তুষার করবীকে বলেঃ ওঁর ইচ্ছে ছিল, বিচিত্রাকে তাঁর বইয়ের হিরোইন্ করবেন। আমিই সেদিন টেলিফোনে বলে কয়ে—

তুষারের কথায় করবী কিছু না বলে ট্যাক্সির বাইরে চেয়ে রইলো।

সেদিন তুষার বলেছিল, নতুন নায়ক-নায়িকার দিকে মি. সরকারে ঝোঁক বেশি। আজ বলছে, বিচিত্রাকে হিরোইন্ করবার ইচ্ছে ছিল ওঁর। তুষার উল্‌টো পাল্‌টা কথা বলছে কেন? বললোই বা। তাতে তার কি? এখন তো তার মি. সরকারের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। তার আর ভাবনা কি?

করবী বললোঃ কিন্তু তুষারদা, আমি পারবো তো? আমার যে বড়ো ভয় করছে?

তুষার সাহস দেয়। বলেঃ ভয় কি? তাছাড়া উনি তো তোমাকে প্রথমে দেখিয়ে দেবেন। দেখবে, ঠিক পেরে যাবে।

তবু করবীর ভয় যায় না।

যদি স্যুটিং-এর সময় তার পার্ট ভুল হয়ে যায়। পার্ট মনে করতে গিয়ে যদি এক্সপ্রেশানে ভুল হয়ে যায়।

ভয়ে ভয়ে দুটো দিন কাটলো।

সেদিন তাকে চারটের সময় মি. সরকারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। মি. সরকার তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকবেন।

কি জানি, তুষারদা যে আবার বলছিল, তাঁর ঝোঁক বিচিত্রার দিকে। বিচিত্রার নামেই তো এখন হাজার-হাজার দর্শক ভিড় করে। পারবে সে বিচিত্রার সঙ্গে পাল্লা দিতে। তাদের পাড়ায় গত সরস্বতী পূজোর বিচিত্রানুষ্ঠানে সে বিচিত্রার নাচ দেখেছিল। সে কী পোষাক! পাড়ার লোকেরা বলেছিল, সাহসী মেয়ে বটে বিচিত্রা! কতোটুকু পোষাকে সে নেচে চলে গেল। কেউ কেউ বলেছিল, ও টুকু না পরলেও তো ওর চলতো। আবার কেউ বলেছিল, ও যা মেয়ে, শুধু দু গজ হাওয়া পরেও নেচে যেতে পারে।

কিন্তু পাড়ায় যাদের বিন্দুমাত্র রুচি আছে, তারা কিছু না বলে উঠে এসেছিল।

করবী ভাবে, সে কি বিচিত্রার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে?

•

সুরঞ্জন বলে: তুমি তখন টাকার কথা ভুলে গিয়ে নামের কথাই বেশি করে ভাবছিলে। নামের চেয়ে বিচিত্রার সঙ্গে প্রতিযোগিতা। তাই না?

করবী বলে: সত্যি। তখন আমি টাকার কথা বা নামের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। তখন কি করে মি. সরকারের মন জয় করবো, তাই ছিল আমার একমাত্র চেষ্টা। কেন না, তাঁর মন জয় করতে পারলে আর তখন আমায় আট্কায় কে?

: যাক্। সেদিন তুমি মি. সরকারের কাছে কখন গেলে?

: চারটের একটু আগেই। তাই তো কথা হয়েছিল। তুষারদার আর সেদিন যাবার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

নিচের ড্রইংরুমে মি. সরকার বসেছিলেন।

টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। ইশারায় করবীকে

তিনি বসতে বলে ফোনে কথা বলে যেতে লাগলেন। ছবির সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল।

মি. সরকার কখন টেলিফোন ছাড়বেন, করবী তার অপেক্ষা করে বসে রইলো। কিছুক্ষণ পরে মি. সরকার টেলিফোন নামিয়ে রেখে করবীর দিকে ঘুরে বসলেন। স্ক্রিপ্‌ট্‌টা হাতে নিয়ে তিনি বললেন: তোমাকে প্রথমেই একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

করবী বললো: বেশ। বলুন কি কথা—

: তুমি ফিল্মে নামলে তোমার বাড়ির দিক থেকে কারো কোন আপত্তি থাকবে না তো? হ্যাঁ, বাই দি বাই, বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?

করবী বললো: বাবা মা আর আমরা দু বোন, এক ভাই।

: বাবা কি করেন?

: বাবা অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন প্রায় এক বছর।

: আর বোনেরা?

: আমি এখন বড়ো। ভাইটি সব থেকে ছোট।

করবী ইচ্ছে করেই একটা মিথ্যে কথা বললো। কারণ সে তখন মি. সরকারের নজরে পড়বার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছিল।

মি. সরকার গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন: বাবা মা কি আপত্তি করবেন?

করবী বলে: আমার যতদূর মনে হয়, আপত্তি করবেন না।

: একথা জিজ্ঞেস করছি কেন, বুঝতে পারছো তো? ধরো, তোমাকে সিলেক্ট করা হলো। তারপর বাড়ি থেকে আপত্তি উঠলো। তুমি নামতে পারলে না। তাতে আমাদের অনেক সময় আর পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যায়।

করবী বললো: আমার বেলায় তা হবে না।

: বেশ। আজ তোমাকে শুধু স্ক্রিপ্‌ট্‌টা পড়ে শোনাবো। আর ক্যারেক্‌টারটা অ্যানালিসিস্‌ করে দেব। আরেকদিন হবে তোমার ট্রায়াল। কেমন?

স্ক্রিপ্‌টের ফাইলটা খুলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার চা খাওয়া হয়েছে ?

করবী বললো : চা আমি খাবো না। থাক্‌—

মি. সরকার করবীর কথা শুনলেন না। তিনি কলিং বেল টিপলেন। একজন আয়া এসে দাঁড়ালো। মি. সরকার বললেন : দু কাপ চা আর দুটো স্যাণ্ডউইচ্‌—

আয়াটি মাথা নিচু করে চলে গেল।

মিঃ সরকার স্ক্রিপ্‌টের ফাইলটা বন্ধ করে মুখে মুখে গল্পটি বলতে লাগলেন : এক কলেজের প্রফেসারকে নিয়ে গল্প। কলেজটি একটি গার্লস্‌ কলেজ। আর প্রফেসার হচ্ছেন এক মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক। অনেকদিন ধরে প্রফেসারী করছেন। চমৎকার পড়ান। শেক্সপীয়ার যখন পড়ান, তখন সবাই মুগ্ধ হয়ে শোনে। যেমনি প্যাশান্‌, তেমনি ইমোশান্‌। সবাই ভাবে, তারা যেন স্টেজের ওপরে শেক্সপীয়ারের কোন বইয়ের অভিনয় দেখছে।

ইন্দিরা সেনগুপ্ত সেই কলেজেরই ইংরেজী অনার্স ক্লাসের ছাত্রী। যেমনি রূপ, তেমনি পড়াশুনায় আগ্রহ। নোট নিতে নিতে কোন সময় চোখ তুলে তাকালে প্রফেসারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। ইন্দিরা তখনই বুঝতে পারে, প্রফেসারের আলোচনার খেই হারিয়ে গেছে। তখন তিনি বলেন : আই বেগ ইওর পার্ড্‌ন্‌। হোয়াট আই ওয়াজ্‌ ডিস্‌কাসিং ?

আর কেউ নয়। ইন্দিরাই উঠে দাঁড়িয়ে বলে : মিরাণ্ডা ওয়াজ্‌ টকিং উইথ্‌—

সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসার তার মুখের কথাটা লুফে নিয়ে বলেন : থ্যাঙ্ক্‌ ইউ। আই অ্যাম্‌ সো হ্যাপি। মিরাণ্ডা ওয়াজ টকিং উইথ্‌ ফার্ডিন্যাণ্ড।

লেক্‌চার চলতে থাকে। বেল্‌ পড়ে। প্রফেসার ক্লাস থেকে বেরিয়ে যান।

আবার একদিন বাসে ইন্দিরার সঙ্গে প্রফেসারের দেখা হয়।

প্রফেসার দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। ইন্দিরা বসে। তার পাশের সীট্‌টা খালি। ইন্দিরা হেসে প্রফেসারকে তার পাশে বসতে বললো।

প্রফেসার তার পাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন তার বাড়ির নানা কথা। ইন্দিরা জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনি কোথায় থাকেন, স্যার।

প্রফেসার বলেন ঃ বিবেকানন্দ রোড—

ঃ যাবো একদিন স্যার আপনার বাড়ি—

ঃ এসো। খুব খুশি হবো।

আরেক দিনের কথা। ক্লাসের পর ইন্দিরা এসে প্রফেসারকে বললো, তিনি তাঁর একখানা বই তাকে দিতে পারেন কিনা। প্রফেসার বললো ঃ নিশ্চয়ই দেব। কবে চাই, বলো?

ইন্দিরা বললো ঃ কাল। যাবো আপনার বাড়ি?

ঃ কি দরকার? কাল আমি বইটা কলেজেই নিয়ে আসবো।

পরের দিন প্রফেসার তাকে বইটা দিলেন। ইন্দিরা বললো ঃ আমার জন্যে আপনাকে কষ্ট করতে হলো—

প্রফেসার বললেন ঃ তাতে আমি খুশি হয়েছি। তোমার জন্যে কি বলে—

ইন্দিরা লজ্জা পেয়ে যায়।

তারপর একদিন প্রফেসার ক্লাসে পড়াচ্ছেন। পড়ানোতে তাঁর তেমন উৎসাহ নেই। ইন্দিরা ক্লাসে ছিল না। তাই তিনি ক্লাসটা জমাতে পারছেন না। কিছুক্ষণ পরে দরজায় গানের মতো সুর ভেসে এলো ঃ মে আই কাম্‌ ইন্‌—

প্রফেসার চেয়ে দেখলেন, ইন্দিরা। বললেন ঃ ইয়েস্‌ কাম ইন্‌। কিন্তু কেন এত দেরি?

মি. সরকার বললেন ঃ বুঝতে পারছো, কেন বইটার নাম 'কেন এত দেরি'?

হেসে করবী বললো ঃ পেরেছি।

মি. সরকার বলে চললেন ঃ বুঝতেই পারছো, তখন সারা ক্লাসের অবস্থা কি? সব্বাই হো হো করে হেসে উঠলো। আর ইন্দিরা মাথা

নিচু করে সকলের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গিয়ে তার নিজের সীটে বসলো।

প্রফেসার খুব জমিয়ে পড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ক্লাসটা সেদিন আর কিছুতেই জমলো না। ক্লাসের পর ইন্দিরা এসে প্রফেসারকে বললো : স্যার, ক্লাসে এমন ভাবে বললেন ?

: আরে বলি নি। হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। তুমি ছিলে না বলে ক্লাসটা জম্‌ছিল না একেবারে।

: কেন ?

: কেন, আমি তা কি করে বলি, বলো ?

ইন্দিরা দাঁড়িয়ে রইলো। চলে গেল না। প্রফেসার বললেন : মনটা বড়ো দমে গিয়েছিল তোমাকে দেখতে না পেয়ে।

: মানে ?

: মানে অতি সহজ। বুঝতে পারছো না ?

ইন্দিরা ক্রুদ্ধ স্বরে বললে : বটে ! আমি আজই প্রিন্সিপ্যালের কাছে কম্‌প্লেন করবো। কি ভেবেছেন ? আমরা কেউ আপনার ক্লাস করবো না। আমি তো নয়ই—

: ইন্দিরা—

ইন্দিরা গট্‌ গট্‌ করে হেঁটে চলে যায়।

ইন্দিরা কিন্তু কোন কম্‌প্লেনই করে নি। পরের দিন থেকে সে যথারীতি ক্লাস করেছে। কিন্তু মুখটা বড়ো গম্ভীর।

করবী বললো : তারপর ?

এমন সময় আয়া স্যাণ্ডউইচ্‌ আর চা দিয়ে গেল। দুজনে চা আর স্যাণ্ডউইচ্‌ খেলেন।

মি. সরকার বলে চললেন : কয়েকদিন পরের কথা। সেদিন সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। প্রফেসার বাড়িতে বসে ভাবছিলেন, কলেজে যাবেন কি না। হঠাৎ কি খেয়াল হলো ওয়াটার প্রুফটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটা ট্যাক্সি করে কলেজে পৌঁছলেন।

ফার্স্ট পিরিয়ডে তাঁরই অনার্সের ক্লাস। কলেজে মেয়েরা কেউ আসে নি। যারা এসেছিল, তারা সব চলে গেছে। প্রফেসারও ফিরে চলে যাচ্ছিলেন। প্রিন্সিপ্যাল বললেন: বাড়ি যাচ্ছেন, স্যার?

: হ্যাঁ স্যার—

: এই বৃষ্টিতে?

: এই বৃষ্টিতে আসতে পারলাম। আর যেতে পারবো না?

: তাহলে আসুন—

প্রফেসার চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার মনে হলো, ক্লাসরুমটা ঘুরে যাবেন। ক্লাসরুমের সাম্‌নে গিয়ে মনে হলো, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তিনি দরজাটা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ভেতরে ছিল ইন্দিরা। একা। দরজা বন্ধ করে সে ফ্যানের হাওয়ায় তার ভিজে শাড়িটা খুলে শুকিয়ে নিচ্ছিল। সে ভেবেছিল, দরজা বুঝি ঠিকমতো বন্ধই আছে। কিন্তু আসলে দরজাটাকে ঠিকমতো বন্ধ করতে পারে নি সে।

প্রফেসারকে দেখে ইন্দিরা চম্‌কে উঠে লাফ মেরে কাপড়টা নিয়ে গায়ে জড়াতে থাকে। সে ভেবেছে, বুঝি প্রফেসার ক্লাস নিতে এসেছেন।

করবী জিজ্ঞেস করলো: প্রফেসার তখন কি করলেন? চলে এলেন না সেখান থেকে?

মি. সরকার বললেন: আরে না না। চলে আসবেন কেন? চলে এলে তো ড্রামা নষ্ট হয়ে যেত।

তারপর কলেজে থিয়েটার হবে। তার জন্যে রিহার্সেল দিতে হবে। ইন্দিরা হলো নায়িকা। প্রফেসার ডিরেক্টার। থিয়েটারে ইন্দিরা নাচলো। অভিনয়ের পর ট্যাক্সি করে প্রফেসার তাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে এলো।

তারই মধ্যে পরীক্ষা এসে পড়লো।

একদিন ইন্দিরাকে প্রফেসারের বাড়ি আসতে হলো। তাঁর বাড়িতে এসে সে ছাখে, বাড়িতে তাঁর স্ত্রী রয়েছেন। গণ্ডাখানেক ছেলেমেয়েও আছে।

তারপর ইন্দিরার ভীষণ রকমের মনের পরিবর্তন হলো। কিছুই পড়াশুনা করতে পারছে না সে। কিছুই মনে থাকছে না তার। মাথা ঘুরে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

একদিন প্রফেসার বাড়ি ফিরছিলেন। ইন্দিরা রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা করলো। বললো সব কথা।

প্রফেসার বললো: ইন্দিরা, আমিও ভাবছিলাম একটা কথা। চলো, আমরা কোথাও—

ইন্দিরা বলে: কিন্তু আপনার স্ত্রী, আপনার ছেলেমেয়ে—

: সে জন্য আমি ভাবছি না।

: ওদের আপনি ত্যাগ করবেন?

: ঠিক তাই—

সেদিন ঠিক হয়, পরের দিন ইন্দিরা হাওড়া স্টেশনে যাবে। প্রফেসার তাকে নিয়ে বাইরে কোথাও চলে যাবেন।

পরের দিন হাওড়া স্টেশনে প্রফেসার গিয়ে পায়চারি করছেন। সাড়ে দশটায় ট্রেন। ইন্দিরার আর দেখা নেই। দশটা বেজে গেল। সওয়া দশটা, সাড়ে দশটা। ট্রেন ছেড়ে গেল। পৌনে এগারোটার সময় ইন্দিরা এসে হাজির।

: এসেছো? এসেছো ইন্দিরা? কিন্তু 'কেন এত দেরি'?

মিঃ সরকার বললেন: এই খানেই গল্পটির শেষ। গল্পটি কেমন বলো তো?

করবী শুধু বলে: ভালো।

: গল্পটি আমারই। সিনারিওটাও আমারই করা। এখন কথা হচ্ছে, তুমি ইন্দিরার পার্টটা করতে পারবে কিনা—

হঠাৎ করবীর বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠলো।

মিঃ সরকার বললেন: তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভয় পেয়ে

যাচ্ছ ? আরে, ভয়ের কিছু নেই। আমি তোমাকে ক্যারেক্‌টারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি—

করবীর কেমন অস্বস্তি লাগছিল। সে একবার সোজা হয়ে বসে। আবার সোফায় হেলান দিয়ে বসে। কিন্তু কিছুতেই যেন সে ঠিক হয়ে বসতে পারছে না।

মি. সরকার বললেন : প্রথমে অতি সাধারণ কলেজের ছাত্রী। তারপর অনিচ্ছা। তারপর রাগ। সেই রাগ থেকে অনুরাগ। তারপর গভীর ভালবাসা। তারপর 'জেলাসি' মানে ঈর্ষা। তারপর ঈর্ষার অবসান। এবং শেষে মিলন।

করবী বলে : মিলন ?

মি. সরকার বলেন : কেন নয় ? অডিয়েন্স পয়সা দিয়ে বিচ্ছেদ দেখতে আসবে না কি ? এখনকার অডিয়েন্সকে আগেকার দিনের মতো আহাম্মক ভেবো না।

মি. সরকার একটা চুরুট ধরালেন। চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন কিছুক্ষণ। বললেন : এখন তুমি পারবে কিনা, বলো—

করবী বললো : একটু চিন্তা করতে দিন, স্যার।

: বেশ। তুমি চিন্তা করো। কিন্তু বেশি সময় দিতে পারবো না। পারবে কিনা, কালই তুমি জানিয়ে দিয়ে যেও।

: আচ্ছা। তাই হবে, স্যার।

করবী উঠে নমস্কার জানিয়ে চলে যাচ্ছিল।

মি. সরকার বললেন : তোমার ট্যাক্সি ফেয়ারটা না নিয়ে তুমি চলে যাচ্ছ যে !

করবী বলে : গল্প শুনতে শুনতে সব ভুলে গিয়েছিলাম।

: ভেরি ইন্টারেস্টিং। তাই না ?

: হ্যাঁ। খুব—

মি. সরকার করবীর হাতে একখানা দশটাকার নোট গুঁজে দিলেন।

: কাল তাহলে তুমি কখন আস্‌ছো ?

ঃ চারটের সময়। হ্যাঁ, প্রফেসারের রোলটা কে করছে ?

ঃ এখনও ঠিক হয় নি। জন কয়েক ট্রায়াল্ দিয়ে গেছে। কিন্তু আমার পছন্দ হচ্ছে না।

করবী সেদিন ট্র্যামেই ফিরলো। ফিরে মার হাতে দশটা টাকা দিল।

মা রেগে জিজ্ঞেস করলো ঃ আবার রক্ত বিক্রি করেছিস ?

করবী বললো ঃ না মা। একটা চাকরি হওয়ার কথা হচ্ছে। সেখান থেকে আপাতত দিয়েছে। কাজটা হলে আরও দেবে। অনেক দেবে। তখন কিন্তু আমাদের আর এ বাড়িতে থাকা হবে না। ভালো বাড়ি দেখে চলে যাবো। বাবার চিকিৎসা করাবো। আর তোমার জন্যে—

ঃ চুপ্ চুপ্।

মা হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

করবী লক্ষ্য করলো, মার ঠোঁট দুটো কাঁপছে ধীরে ধীরে।

সুরঞ্জন একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললো ঃ তুমি তাহলে ঠিক করে ফেললে ইন্দিরার ভূমিকায় নামবে ?

করবী বললো ঃ তখনও পুরোপুরি ঠিক করে উঠতে পারি নি। তবুও সেদিন মি. সরকারের কাছে বিকেল চারটের সময় গেলাম। গিয়ে দেখি, একটি মেয়ে মি. সরকারের সঙ্গে বসে কথা বলছে। যেমনি দেখতে শুনতে, তেমনি সাজগোজ। টিপ, লিপ্স্টিক, বিউটি স্পট্ কিছুই বাদ পড়ে নি। কথায়-বার্তায় আমার চেয়ে অনেক স্মার্ট। মি. সরকার আমাকে দেখে বসতে বললেন। আমি বসলাম। কিন্তু বিশেষ খুশি হতে পারলাম না। মিঃ সরকার আমার সঙ্গে কোন কথা বললেন না। আমাকে বসিয়ে রেখে মেয়েটির সঙ্গে সিনেমার কথা বলে যেতে লাগলেন। বড়ো অস্বস্তি লাগছিল আমার। মনে হচ্ছিল, উঠে চলে আসি। কিন্তু চলে এলে তো আমার আর যাবার পথ থাকবে না।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি চলে গেল।

মি. সরকার তাকে বললেনঃ কাল তাহলে তুমি এসো। তৈরি হয়েই এসো।

মেয়েটি হেসে বলে গেলঃ আই অ্যাম্ অল্ওয়েজ্ রেডি।

মি. সরকার হাসলেন।

মেয়েটি চলে গেলে তিনি করবীর দিকে চেয়ে বললেনঃ তুমি কি ঠিক করলে, বলো? এই মেয়েটি ইন্দিরার রোলে ট্রায়াল দিতে এসেছিল। শুধু তোমারই জন্যে ওকে ঠেকিয়ে রেখেছি। তুমি যদি বলো পারবে না, তাহলে কালই আমি ওকে ফাইন্যাল কথা দিয়ে দিই।

করবী ভাবলো, যদি সে রাজী না হয়, তাহলে এত বড়ো একটা চান্স হাতের মুঠোয় এসে চলে যাবে। আর কি কোনদিন এমন চান্স আসবে? মেয়েটাকে তো সে দেখলো। যেন এখুনি পেলে এখুনি নেয়।

করবী আর কিছু ভাবলো না।

সে কথা দিল। বললোঃ না, আমিই করবো।

হাসলেন মি. সরকার। বললেনঃ বেশ। তাহলে আজ ট্রায়াল দাও। তারপর কি ভেবে কলিং বেল্ টিপলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আয়াটা এলো। মি. সরকার বললেনঃ ওম্লেট আর চা—

আয়া চলে গেল।

মি. সরকার বললেনঃ কোন্ সিন্টা ট্রায়াল দেবে, বলো?

করবী বললোঃ আপনার যেটা খুশি।

মি. সরকার কি ভেবে নিলেন একটু। বললেনঃ সেই সিন্টা— যেখানে ইন্দিরা রাস্তায় প্রফেসারের সঙ্গে দেখা করে বলছে, তার কিছুই মনে থাকছে না, কি যে হবে তার কে জানে—

বলে মি. সরকার সেই অংশটা সিনারিও থেকে পড়ে শোনালেন। তারপর বললেনঃ এখানে ইন্দিরার খুব এক্সপ্রেশান্ আছে। এক্সপ্রেশান দিয়ে বলতে হবে।

আয়া চা আর ওম্‌লেট দিয়ে গেল।

করবীর ও সব খেতে ইচ্ছে ছিল না। ভয়ে বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছিল, তার।

মি. সরকার বললেন : বসে রইলে কেন? খেয়ে নাও।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও করবী ওম্‌লেট আর চা খেল।

তারপর তাকে উঠতে হলো। ট্রায়াল দিতে হলো। মুখে সে এক্সপ্রেশান্‌ আনলো। মুভ্‌মেণ্ট দেখালো। কিন্তু কিছুতেই মি. সরকারের পছন্দ হলো না।

আবার ট্রায়াল দিল করবী। মি. সরকার বললেন : কিছুই হচ্ছে না।

এবার মরীয়া হয়ে করবী পার্ট করলো।

মি. সরকার বললেন : ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

স্ক্রিপ্‌টের পাতা উল্‌টিয়ে ধরে তিনি বললেন : বৃষ্টির দিনের সিন্‌টা করো দেখি, তাহলে কিছুটা বোঝা যাবে। তুমি বসো। আমি পড়ে শোনাচ্ছি।

মি. সরকার স্ক্রিপ্‌ট্‌টা পড়ে শোনালেন।

কলেজের একটা নির্জন রুম। ফ্যান্‌ চালিয়ে ইন্দিরা তার ভিজে কাপড়টা খুলে শুকিয়ে নিচ্ছে। একটু গুন্‌ গুন্‌ করে গান করছে। প্রফেসার ঘরে ঢুকবেন।

মি. সরকার উঠে দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বললেন : নাও, ওঠো—

করবী জিজ্ঞেস করলো : হিরোর পার্ট কে করবে?

মি. সরকার বললেন : কে আবার হিরো? আমিই হিরো। আমিই প্রফেসারের পার্ট করবো।

করবী শুধু বললো : আপনি?

: হ্যাঁ আমি। তুমি নাও—

করবী উঠে ট্রায়াল দিল।

মি. সরকার একটু থেমে বললেন : ব্যাপারটা কি হচ্ছে, জানো? সিচুয়েশানটা তুমি মোটেই ধরতে পারছো না।

করবীর মনটা বড়ো দমে যায়। আর কি রকম সিচুয়েশান ধরতে হবে? আর কী অভিনয়ই বা করতে হবে?

করবী আবার একথাও ভাবে, ফিল্মে অভিনয় হয়তো সহজ নয়। হয়তো সত্যিই তার ঠিক মতো হচ্ছে না। সে আবার ট্রায়াল দেয়।

মি. সরকার বললেন : হচ্ছে না। কিছু যেন ত্রুটি থেকে যাচ্ছে।

করবী কোথায় যেন শুনেছিল, সিনেমার নায়িকাদের লাজ-লজ্জা থাকলে চলে না। তাকেও মি. সরকারের ডিরেক্‌শান মতো ধীরে ধীরে তার লজ্জা খুলে ফেলে দিতে হলো।

সেই অবস্থায় সে ট্রায়াল দিল। এবং সিনের শেষের দিকে মি. সরকার হিরোর পার্ট করতে এসে এমন ভাব দেখালেন, তাতে সে সত্যি ভয় পেয়ে গেল।

তারপর করবীকে বুকে তুলে নিয়ে এক অশ্লীল রকমের হাসি হেসে উঠলেন মি. সরকার।

তখন করবীর নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হলো। তার মনে হচ্ছিল, সে যদি কোন রকমে মি. সরকারের হাত থেকে ছাড়া পায়, তাহলে এক নিশ্বাসে সে ছুটে বাড়ি পালাবে।

এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠলো। হাত বাড়িয়ে মি. সরকার টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে দিলেন। মি. সরকারের হাত থেকে যখন সে ছাড়া পেল, তখন সে সর্বস্বান্ত হয়েছে। তখন তার ছুটে পালাবার শক্তি ছিল না। হাঁপাচ্ছিল সে। কাঁপছিল ঠক্ ঠক্ করে।

এখন সে বুঝতে পারলো, এখানে এসে সে ভাল করে নি। তাকে তুষারদা কেন এখানে নিয়ে এলো?

মি. সরকারের ডিরেক্‌শান মতো অভিনয় করতে গিয়ে সেদিন করবীকে তার জীবনের তিক্ততম অভিজ্ঞতাটি নিয়ে বাড়ি ফিরতে হলো।

কোন কথা না বলে সেদিন করবী একপাশে দাঁড়িয়ে শাড়িটাকে ভালো করে পরলো। মি. সরকার বললেন : একটু বসে যাও, করবী। আমি দেখলাম, তুমি পারবে।

করবী যন্ত্রের মতো সোফায় বসলো। তার গলা শুকিয়ে আস্‌ছিল। সে বললো: একটু জল—

মি. সরকার কলিং বেল্‌ টিপলেন। উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে এলেন।

আয়া এলো। মি. সরকার বললেন: এক গ্লাস জল—

আয়াটা করবীর দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল।

তাতে করবীর আরো বিশ্রী লাগছিল। আয়াটা তাহলে সমস্তই জানে। আয়া জল দিয়ে গেল। করবী জলটুকু ঢক্‌ ঢক্‌ করে খেয়ে বসে রইলো। মি. সরকার টেবিলের ড্রয়ার টেনে পঞ্চাশটা টাকা বের করে গুনে করবীর হাতে দিলেন।

কোন কিছু না ভেবে করবী টাকাটা তুলে নিয়ে তার ব্যাগে পুরলো। মি. সরকার খুচরো কয়েকটা টাকা দিয়ে বললেন: এই নাও তোমার ট্যাক্সি ফেয়ার। আবার কবে আস্‌ছো?

ঘুরে তাকালো করবী।

মি. সরকার বললেন: কাল অন্যদের ট্রায়াল। তুমি পরশু এসো।

করবী কিছু বললো না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো। বিবেকানন্দ রোডে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরলো। ট্যাক্সিতে বসে দুপাশের দুটো কাচ নামিয়ে দিয়ে সে কলকাতা শহরকে দেখতে দেখতে চললো। যেন সে কলকাতা শহরকে এই প্রথম দেখছে। না, সে বুঝি কলকাতা শহরকে দেখছিল না। সে বর্তমান কালকে দেখছিল।

আজ করবী মানুষের প্রতি, মানুষের সভ্যতার প্রতি তার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। সে ভাবছিল, সমস্ত কিছু যদি একটা মাটির ঢেলা হতো, তাহলে তাকে লাথি মেরে ভেঙে পাগলের মতো হাসতে হাসতে সে কোথাও ছুটে চলে যেত।

সিনেমার নায়িকা সাজার আকাঙ্ক্ষা তার আর নেই।

সে এখন তার ঘরের অন্ধকার বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদতে পারলেই খুশি। সে আর কিছু চায় না।

এ জগতের কাছ থেকে তার আর বেশি কিছু প্রত্যাশা নেই।

তবু তাকে অভিনয় করে যেতে হবে।

আজকের টাকাটা হাসিমুখে তাকে মার হাতে তুলে দিতে হবে। মা যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে এই অর্থ উপার্জনের কাহিনী।

তাই হলো।

হাসতে হাসতে সে যোগমায়া দেবীর হাতে টাকাগুলো দিয়ে বললো : এই নাও মা, এ সপ্তাহের মাইনে—

মা নোটগুলো গুনে অবাক হয়ে বললেন : এক সপ্তাহে পঞ্চাশ টাকা!

: হ্যাঁ মা। এর পর আরো বাড়তে পারে।

: তাই নাকি ?

যোগমায়া দেবী টাকাগুলো মুঠোয় পুরে হাতদুটো কপালে ঠেকালেন। বললেন : ঠাকুর। এবার তাহলে তুমি মুখ তুলে চেয়েছো। আর বিমুখ হয়ো না, ঠাকুর। মেয়েকে আমার সুস্থ রেখো।

যোগমায়া দেবী কেঁদে ফেললেন।

মার কান্না সইতে পারলো না করবী। সে অন্ধকার বিছানার দিকে এগোলো। তারপর বিছানায় গিয়ে লুটিয়ে পড়লো।

যোগমায়া দেবী জিজ্ঞেস করলেন : আলো জ্বেলে দেব রে ?

: না মা। অন্ধকার ভালো লাগছে।

যোগমায়া দেবী সেখান থেকে চলে যেতেই সে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে নিজের মনে কাঁদলো। এ পৃথিবীর কেউ জানলো না, কেউ শুনলো না, সেদিন রাতে সে কেন কেঁদেছিল।

পরের দিন সে বাড়ি থেকে বেরুলো না।

যোগমায়া দেবী জিজ্ঞেস করলেন : আজ যাবি না ?

: না মা, আজ আমার ছুটি।

তার পরের দিনও করবী বেরুলো না দেখে মা আবার জিজ্ঞেস করলেন : আজও তোর ছুটি ?

করবী বললো ঃ মা, আমার ও চাকরি ভালো লাগছে না।

ঃ সে কি রে ? এমন ভালো চাকরি। সপ্তাহে পঞ্চাশ টাকা। পরে আরো বাড়তো। তুই ছেড়ে দিবি ?

করবী কিছু বললো না।

যোগমায়া দেবী বললেন ঃ লোকে একটা কাজ পাচ্ছে না। তুই পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এলি ?

আরো কতো কী বলতে বলতে তিনি রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

করবী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

তারপর থেকে করবীর আর বাইরে বেরুবার কোন তাড়া নেই। হঠাৎ একদিন মি. সরকারের একখানা চিঠি এলো। পত্র-পাঠ দেখা করবার নির্দেশ ছিল তাতে। করবী চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিল। দেখা করতেও গেল না।

মাস খানেক পরে যোগমায়া দেবী করবীকে বললেন ঃ আর-যে চলে না রে! ইস্কুলে বাচ্চুর নাম কাটা গেছে। কিছু টাকা চাই যে রে! আছে তোর কাছে ?

করবী বললো ঃ তুমি কিছু ভেবো না, মা। বাচ্চুর মাইনে দেবার ভার আমি নিলাম।

বাবা-মা তার মাইনে-পত্র দিয়েছিলেন, আর সে ছোট ভাইটার মাইনে দিতে পারবে না ? কতোই বা মাইনে বাচ্চুর ?

কিন্তু সে দেবে কোত্থেকে ? কোথায় টাকা পাবে সে ?

পরের দিনই সে ব্লাড্ ব্যাঙ্কে গেল। যদি কিছু ব্যবস্থা হয়। না হয় সে আর একবার কিছু রক্ত বিক্রি করে আসবে। কাউকে বলবে না সে। কেউ জানবে না।

ব্লাড্ ব্যাঙ্কের ডাক্তারবাবু সব শুনে বললেন ঃ কিন্তু আর তো রক্ত কেনা হয় না।

করবী বলে ঃ আমার যে টাকার বিশেষ প্রয়োজন ।

ডাক্তারবাবু বললেন ঃ উপায় নেই। আপনার রক্ত নিলে

আপনিও তো রক্তহীন হয়ে পড়বেন। তার মানে অসুখে পড়বেন। তখন আপনাকেই আবার রক্ত দিতে হবে। সে রক্ত কে দেবে?

করবী মুখ শুকিয়ে ফিরে এলো।

বাচ্চুর মাইনে আর দেওয়া হয় নি।

করবী সুরঞ্জনকে বললোঃ আজ আবার মি. সরকারের চিঠি এলো। এখন কণ্ট্রাক্ট করবার জন্যে ডেকে পাঠাচ্ছে। আমি যাবো না। ফিল্মে নামবার আমার আর কোন মোহ নেই। এখন ফিল্মের নামে ঘেন্না হয়। আই হেট্ ইট্। আর লোকটার প্রোফেসানই বোধহয় এই—

সুরঞ্জনের মনে একই সঙ্গে ক্রোধ এবং ঘৃণা ফেটে পড়ছিল।

কিন্তু সে কাকে কি বলবে? চারদিকের চিত্রই তো এই! সে কি তা জানে না? সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের শ্মশানভূমিতে আজ শুধু নিশাচরদের উৎপাত! সেখানে সে কি করতে পারে?

তার হাতে কি ক্ষমতা আছে?

কলম ছিল তার হাতে, ছিল লেখার ক্ষমতা। কিন্তু তার হাত দুটো যে বেঁধে দিয়েছেন তার কাগজের অফিসের ডিরেক্টার। কিছু লেখার ক্ষমতা আর নেই। কলমটাকে ভোঁতা না করতে পারলে যে তার চাকরিটাই থাকবে না।

করবী বলেঃ আপনি বলেছিলেন, আমি ঠিক মতো চেষ্টা করিনি। আর কি ভাবে চেষ্টা করতে হবে, বলুন? আপনি কি এখনও বলবেন, আমি ঠিকমতো চেষ্টা করিনি?

সুরঞ্জন একটা নিশ্বাস ফেলে বললোঃ না। তা আর তোমাকে বলতে পারবো না, করবী। তবে তোমার কাজের চেষ্টা এবার আমিই করছি। তুমি কিছু ভেবোনা।

করবী সেদিন বলেছিল, চাকরি করবে না।

কিন্তু পরে সে তার মত বদ্‌লেছে। সে ভেবে দেখেছে, চাকরি তাকে করতেই হবে। চাকরি না করলে তার চলবে না। সংসার

চালাবার জন্যে মার হাতে টাকা তুলে দিতে হবে। বাচ্চুর লেখা-পড়ার জন্যে টাকা চাই। বাবার চিকিৎসার জন্যে টাকা চাই। এতগুলো লোকের কাপড়-চোপড়। বাড়ি ভাড়া—

না। সে চাকরি করবেই। কিন্তু কোথায় পাবে সে মনের মতো চাকরি? সে বেশি কিছু চায় না। শুধু ভদ্রভাবে বাঁচতে চায়। সেই বাঁচার মধ্যে যেন কোন গ্লানি না থাকে।

সুরঞ্জন সেদিন করবীর কথা শোনে নি। সে দু এক জায়গায় করবীর চাকরির জন্যে চিঠি লিখেছিল।

করবীও পরে একদিন এসে বলে গেছে, সে চাকরি করবে।

সুরঞ্জনও বলেছে, সে তাকে খারাপ চাকরি কখনই দেবে না।

নদীয়া জেলার এক ইস্কুলের হেড্‌মিস্ট্রেস্ সুরঞ্জনের বিশেষ পরিচিত। তাঁকেও সে একখানা চিঠি লিখেছিল। তাঁর স্কুলে একটি মাস্টারির চাকরিও যদি করবীর হয়। কয়েকদিন পরে তার চিঠির জবাব এলো। করবীকে চাকরি দিতে তিনি রাজী হয়েছেন। ফ্রি-কোয়ার্টারেরও ব্যবস্থা আছে।

সেদিন চিঠিখানা পেয়েই সুরঞ্জন নিচে গেল।

যোগমায়া দেবী আর করবীকে ডেকে সে খবরটা দিল।

সুরঞ্জন করবীকে জিজ্ঞেস করলো: যাবে তুমি ওখানে?

করবী কি ভাবলো একটু। বললো: যাবো—

যোগমায়া দেবী বললেন: তাহলে চল্, আমরা সবাই চলে যাই। এখানে থাকতে আর আমার একদম ভালো লাগছে না। যা ছিল, সব তো এখানে খুইয়েছি। রঞ্জন, তুমি কি বলো?

সুরঞ্জন বললো: তাহলে তো আপনাদের ভালোই হয়।

করবী বললো: বেশ। তাই চলো।

পরের দিনই সুরঞ্জন করবীকে সঙ্গে নিয়ে নদীয়া থেকে ফিরে এলো। করবীর তো বেশ ভালো লেগেছে। হেড্ মিস্ট্রেস্‌কে তার খুব ভালো লেগেছে।

তারপর তারা একদিন সত্যি সত্যি চলে গেল।

যাবার সময় যোগমায়া দেবী সুরঞ্জনকে ধরে খুব কাঁদলেন। বলেছিলেনঃ এ বাড়ি ছেড়ে যেতে আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। শুধু তোমার জন্যেই প্রাণটা কাঁদছে। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি জানি, কোন জন্মে তুমি আমার ছেলে ছিলে।

হেরম্ববাবু বললেনঃ রঞ্জন, তুমিও আর বেশিদিন এখানে থেকো না। কোথাও বাড়ি পেলে চলে যেও।

সুরঞ্জন ভাবতে পারে নি, ওরা এত শিগ্‌গির চলে যাবে। তাই ওদের যাবার আয়োজন দেখে তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। সে কাউকে কিছু না বলে ওপরের ঘরে এসে শুয়ে থাকলো।

করবী সুরঞ্জনকে দেখতে না পেয়ে ওপরে এলো।

ঃ যাবার সময় একটু পায়ের ধুলো দেবেন না?

করবী সুরঞ্জনের পায়ের ধুলো নিল।

সুরঞ্জন চোখ খুলতেই পারলো না। করবী এগিয়ে এসে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললোঃ কখনো যদি মনে পড়ে—

ঃ পড়বে না।

ঃ যাবেন তো?

ঃ যাবো না।

করবীর মনে মেঘ জমেছিল সকাল থেকেই। এবার তা ভেঙে পড়লো।

সুরঞ্জনের কপালের ওপর কয়েক ফোটা চোখের জল রেখে করবী বললোঃ জানি, দিদি ছিল আপনার সব। তবু যদি মনে পড়ে, যাবেন। আপনার প্রতীক্ষাতেই থাকবো। , যাবেন তো?

সুরঞ্জন কোন কথাই বলতে পারলো না।

ঃ কথা দিলেন? কি?

ঃ দিলাম।

এখানে আর সুরঞ্জনের ভালো লাগছে না।

সেও যেন পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। বন্ধন যা ছিল, সব গেছে। কিংবা করবী তাকে এক নতুন বাঁধনে বেঁধে রেখে গেছে। এখন এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও ভালো লাগছে না তার। কেতকীর মৃত্যুর পরেও তার এতো খারাপ লাগে নি।

নবেন্দুবাবু-ছবি বৌদিরা ইতিমধ্যে কোথায় উঠে চলে গেছেন। নিচের করবীরা চলে গেল। অঞ্জলি দেবী সেই-যে গেছেন ফিরে আর আসেন নি। সম্ভবত আর তিনি ফিরে আসবেন না।

এখন শুধু নিচের অবিনাশবাবু আর সুরঞ্জন।

গুরুদাসবাবু কাল এসে সুরঞ্জনকে বললেন বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্যে।

বাড়িটা ভেঙে ফেলার জন্যে কর্পোরেশান থেকে নোটিশ এসেছে। গুরুদাসবাবু এখন এ বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি বানাবেন। তিনি নিজেও সেদিন স্বীকার করলেন, এ বাড়িতে আর চলছে না। বয়েস অনেক হয়েছে এ বাড়ির।

গুরুদাসবাবু বললেনঃ সেদিন নিশিকান্তবাবুকে পূজো দিয়ে রেখেছিলাম কেন, এখন বুঝতে পারছেন তো? এখন তিনিই তো আমার ভরসা। সেদিন আমি গিয়েছিলাম। এখন তিনি ছাড়া আমার উপায় নেই।

সুরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে বললোঃ আমিই আপনাকে বলবো বলে খুঁজছিলাম। কালই আমি চলে যাচ্ছি।

গুরুদাসবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ বাড়ি পেয়ে গেছেন তাহলে?

ঃ হ্যাঁ।

: বেশ। চললেন তা হলে সবাই ?

: হ্যাঁ। আর কেন ?

: কিন্তু অবিনাশবাবুকে নিয়ে যে হয়েছে মুশ্‌কিল—

: কেন ?

: উনি যে বাড়ি ছাড়তেই চাইছেন না।

: তাই নাকি ?

: বলছেন, এ বাড়ি ছাড়লে উনি নাকি মারা যাবেন। দেখুন তো কী জ্বালা—

পরের দিন যখন সুরঞ্জন ঠেলা গাড়িতে তার মালপত্র তুলে নিয়েছে, তখন অবিনাশবাবু বেরিয়ে এসে সুরঞ্জনের হাত ধরে হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। বললেন: আপনিও চললেন আমাকে ছেড়ে ? আমাকে সবাই ছেড়ে চলে গেল, জানেন ? আমি এখন কি করবো বলুন তো ?

: আপনিও চলুন—

: না। আমি চলে গেলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে পাপ করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করবে কে ?

বলে অবিনাশবাবু সুরঞ্জনের হাত ছেড়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সুরঞ্জন জানে, আজ সারাদিন তিনি দরজা খুলবেন না।

সুরঞ্জন বাড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো।

সব শূন্য!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার।

এই বাড়িতে অঞ্জলি দেবী, রিণা রায়, ছবি বৌদি, কেতকী আর করবীর স্মৃতি মিশে আছে। তারা সবাই ভালোভাবেই বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। বিশেষত কেতকী। সে আর কোনদিন জাহাজের বাঁশি শুনতে চাইবে না।

সবাই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যেতে চেয়েছে। তার জন্যে তাদের প্রাণান্তকর প্রয়াস সে দেখেছে। কিন্তু সুরঞ্জন জানে, আলো নয়—অন্ধকার থেকে আরেক গাঢ়তর অন্ধকারে তারা হারিয়ে গেছে। আলোর মুখ তারা কোনদিন দেখবে না।

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী—পুরাণের এই পঞ্চকন্যা অসতী হয়েও যদি পুণ্যশ্লোকা হতে পারেন, তবে অঞ্জলি দেবী, রিণা রায়, ছবি বৌদি, কেতকী আর করবী—এ যুগের এই পঞ্চকন্যা মানুষের শ্রদ্ধা না পাক, কোনদিনও কি মানুষের সহানুভূতি পাবে না? তারা এ কালের পৃথিবীতে জন্মেছিল, এ কালের পৃথিবীতে মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছিল—কেউ যেন সে কথা ভুলে না যায়। আর একথাও কেউ যেন না ভোলে,—যা হয়েছে, যা ঘটেছে, তার জন্যে দায়ী তারা নয়।

তারা এ যুগের পঞ্চকন্যা।

সুরঞ্জন বেরিয়ে এলো। ভাবলো, যেদিন সব মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, সেদিনও বুঝি পৃথিবীতে এমনি শূন্যতা নেমে আসবে। রূপনারাণের তীরের সেই শূন্য পরিত্যক্ত পাখির বাসার মতো।

ঠেলা গাড়ি ততক্ষণে চলতে আরম্ভ করেছে। ঠেলাওয়ালা সাম্‌নে কাদের দেখে চেঁচাচ্ছে ঃ তফাৎ যাও। খবরদার—

সুরঞ্জনের এই মুহূর্তে কেন জানিনা মিঠুয়ার মুখটা মনে পড়লো।

সুরঞ্জন যেদিন [illegible] বাগান লেনের এ বাড়িতে প্রথম এসেছিল, সেদিনের কথা তার মনে পড়ে।

ঠেলাওয়ালা সাম্‌নে কাদের দেখে সমানে চেঁচাচ্ছে ঃ তফাৎ যাও, খবরদার—

সুরঞ্জন চেয়ে দেখলো, মি. গোমেস আর মিসেস্ গোমেস আজ বহুদিন পরে গির্জায় চলেছেন।